বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৬

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

গান।

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাই ত আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥

ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে,
চল্‌ব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিব্‌ল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে,
শূন্যে আমার উঠ্‌ল তারা সারে সারে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪ বৈশাখ, ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ওঁ

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে—পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণমুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়—কিন্তু তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া। সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই—প্রবীনতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎস ধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক। আমার এই খোলা জানালাটার কাছে বিশ্রাম শয্যায় শুয়ে আমি আমার

ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখ্‌তে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র-উপদেশে-ভরা অতি পুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেক দিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রখর—তা'তে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূরবিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটিমাত্র তালগাছ এতবড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটু খানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্।

জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরাসন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে,

যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে তা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজ পত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে নি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্প-পল্লবে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয় বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতি বসন্তেই সে বারেবারে নূতন বেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকৃত তাহলে এর দ্বারাই দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সে দিন আমি সেই ঝোড়ো দলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপ নিবাসীরা এখনো সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করে নি। আমি

তাদের ক্ষমার দাবীও করি নে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তি ভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করি নি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রালোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্য সাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে। সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণ-ভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশু-মহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছু ডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেই জন্যে যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশু দিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানি নি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাই নি। কিন্তু এখন দিন শেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শান্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট,

কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই জন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয়কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, জড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খোলা চিঠি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু।

আপনার চিঠি ঠিক সেই সময়ে আমার হাতে এসেছে, যখন আমার অবসন্ন মনকে চাগিয়ে তোলবার জন্য, আপনার মুখের উৎসাহের বাণী আমার মনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি কিছুদিন থেকে আমার লেখার হাত ক্রমে গুটিয়ে নিচ্ছি। লেখবার প্রবৃত্তি সকলের পক্ষে অদম্য ত নয়ই—স্বাভাবিকও নয়। অতএব অবলীলাক্রমে লেখা সকলের সাধ্য নয়। আমাদের মত লেখকদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সে হচ্ছে লেখবার অপ্রবৃত্তি, এবং এই আন্তরিক অপ্রবৃত্তির সঙ্গে যোঝাযুঝি করে' তার উপর জয়ী হওয়া যে কত কঠিন, কত আয়াসসাধ্য, তা লেখকমাত্রেরই অন্তর্যামী জানেন। তার উপর দুঃখের বিষয় এই যে, আর পাঁচ রকম হাতের কাজের মত, লেখার অভ্যাসটা কালক্রমে দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় না। একবার হাত তৈরি হয়ে গেলে, বাজনা লোকে অন্যমনস্ক হয়েও বাজাতে পারে, কিন্তু লেখা, মন না দিয়ে, শুধু হাত দিয়ে কেউই লিখতে পারে না, সম্ভবত এক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছাড়া।

আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরে, আমার প্রকৃতির এই ধাতুগত অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি, ফলে আমার অন্তরাত্মা বর্ত্তমানে, একসঙ্গে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আমার দেহ ও মন, তাদের বিশ্রামের হাল-বকেয়া সমস্ত পাওনা, একযোগে সুদসুদ্ধ আদায় করে নেবার চেষ্টায় আছে। আলস্য যখন দেহকে এবং অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে, তখন লেখক-মাত্রেরই পক্ষে, অন্তত কিছুদিনের জন্য সাহিত্যের কারখানা থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। কেননা মনের এ অবস্থায় আমাদের সকল লেখাপড়া একান্ত নিরর্থক, আছোপান্ত বৃথা বলে মনে হয়।

"Of making many books there is no end and much study is a weariness to the flesh"—বাইবেলের সেই অতি পুরোণো কথা এ বিষয়ের শেষকথা বলে বিশ্বাস করতে সহজেই ইচ্ছা যায়।

আপনার চিঠি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছয়, তখন আমি মনে মনে Vanity of vanities all is vanity—এই মন্ত্র জপ করছিলুম; কেননা এ মন্ত্র মনের সনাতন ঔষধ, হৃদয়ের সকল ক্ষতের অব্যর্থ মলম। এ সংসারে আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে মানুষের লাঞ্ছনা—একদিকে প্রকৃতির হাতে, আর একদিকে মানুষের হাতে। মানুষ যেমন অশেষ দুঃখ নিজে পায়, তেমনি অশেষ দুঃখ পরকে দেয়। মানুষের এই দুঃখ আর এই পাপকেই যদি সার সত্য বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে ভেবে দেখুন ত, মনের অবস্থা কতটা আরামের হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় "জীবন মিথ্যা

আর মৃত্যুই সত্য”—এই বিশ্বাস মানুষের মনে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা এনে দেয়। জীবনের বিরাট ট্রাজেডিকে farce স্বরূপে দেখতে শিখলেই, আমরা যথার্থ মায়ামুক্ত হই। তবে মুস্কিল এই যে, এ সব কথা যত সহজে মুখে আনা যায়, তত সহজে মনে বসানো যায় না। দুনিয়াকে ফাঁকি বলে, আমরা কেউ আর নিজের দুঃখকে ফাঁকি দিতে পারি নে।

সে যাই হোক, একথা নিশ্চিত যে, এ রকম পীড়িত মনোভাব যে-কথার পিছনে আছে, সে কথা নিছক নৈরাশ্যের উক্তি হতে বাধ্য; সুতরাং সে কথার মূল্য বিকারের প্রলাপের চাইতে বড় বেশি নয়। তা ছাড়া মনের কৃষ্ণপক্ষ অপরকে দেখাবার মত বস্তুও নয়। নিজের মনের মেঘের ছায়া সমাজের মনের উপর ফেলবার কোনও সার্থকতাও নেই; বিশেষত এদেশে। এমনিই আমরা কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানসম্বন্ধে যথেষ্ট নিরুদ্যম যথেষ্ট নিশ্চেষ্ট। জীবনের উপর আমাদের শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা বিশ্বাস পর্য্যন্ত নেই, এবং তার কারণ আমাদের নিজের উপর নিজের ভক্তি নেই, আস্থা নেই। সুতরাং আমাদের জাতীয় মনের মজ্জাগত অবসাদকে প্রশ্রয় দেবার অধিকার আমাদের কারও নেই। “ততঃ কিম্” ভর্তৃহরির এই প্রশ্ন সেই জাতিই করতে পারে, যে জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের কৃতিত্বের বলে জয়যুক্ত হয়েছে। এ প্রশ্ন আজকের দিনে জিজ্ঞাসা না করা ইউরোপের পক্ষে যেমন ছেলেমি, জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে তেমনি জ্যাঠামি। মানসিক রক্তহীনতাকে আমি কখনই আধ্যাত্মিকতা বলে ভুল করিনি। আধ্যাত্মিকতা অর্থে আমি বুঝি আমাদের জীবাত্মাকে, আমাদের জ্ঞানের বলে কর্ম্মের বলে ভক্তির বলে শতদলে ফুটিয়ে তোলা, মুঁজিয়ে দেওয়া নয়; আমাদের প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিকে ব্যক্ত করে

তোলা, চেপে দেওয়া নয়। আত্মশক্তিকে অস্বীকার করাই ত মানুষের সকল দুর্গতির মূল। ভগবান মানুষকে একমাত্র ঐ শক্তিই দান করেছেন, ভগবানের দানকে অগ্রাহ্য করে, কেউ আর মানুষ হতে পারে না। অতএব ঔদাস্যের ও নৈরাশ্যের বাণী প্রচার করতে আমি কখনই ব্রতী হব না। "Vanity of vanities all is vanity". এ কথার বিরুদ্ধে আমাদের সকল মনপ্রাণ নিত্য প্রতিবাদ করে।

আর এক কথা। আমার বিশ্বাস দেশের লোককে আশার কথা, আনন্দের কথা শোনানই এ যুগের লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য, নৈরাশ্যের কথা, ঔদাস্যের কথা নয়। আনন্দই হচ্ছে একমাত্র প্রকাশ করবার, দশদিক ছড়িয়ে দেবার, দশের মনে চারিয়ে দেবার বস্তু; অপর পক্ষে বেদনা দশের মন থেকে ছাড়িয়ে, দশদিক থেকে কুড়িয়ে নিজের অন্তরে সঞ্চিত ও ঘনীভূত করাই সকলের পক্ষে না হোক, অন্তত লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য; কেননা যে পরের ব্যথায় ব্যথী নয়, সে পরকে কখন আনন্দ দিতে পারে না। নব্য-আলঙ্কারিকদের আদি-গুরু আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলে গিয়েছেন যে, ক্রৌঞ্চমিথুন বধে বাল্মীকির মনের শোক যদি তাঁর মুখে শ্লোকের আকার ধারণ না করত, অর্থাৎ তিনি যদি নিজের অন্তরের বেদনা পরের আনন্দের সামগ্রী করে তুলতে না পারতেন, তাহলে তিনি মানব-সমাজে শাশ্বতী সমা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না।

এর থেকে ধরে নিচ্ছি মানুষের দুঃখ দূর করবার শক্তি যখন আমাদের নেই, তখন নিজের অন্তরের বেদনা, অপরের আনন্দের সামগ্রী করে তোলাই সকলের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। কে বলতে পারে যে, কবির সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির চাইতে কম সত্য। এ

ব্রত কিন্তু এদেশে উদ্‌যাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে। সুতরাং আশা করি আপনার মুখ থেকে আমরা নিত্য নব আনন্দের বাণী শুনতে পাব।

আমরা চেষ্টাচরিত্তির করে বড়জোর আশার বাণী প্রচার করতে পারি, তার বেশি কিছু করতে পারি নে, কেননা আনন্দ সৃষ্টি করবার শক্তি ভগবান আমাদের দেন নি। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২০ বৈশাখ, ১৩২৬

সম্পাদকের নিবেদন।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, জনৈক অতি কৌতূহলী এবং সেই সঙ্গে অতি কৌশলী লোক কোন এক রোগের সুযোগে মিছে করে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেন, তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধদের মধ্যে "কে কাঁদে আর কে বলে যাকগে," বেঁচে থাকতেই সেটা জেনে যাবার জন্য।

দেশময় যখন "সবুজ পত্রে"র মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গিয়েছে তখন ও পত্রের আবার সাক্ষাৎ পেলে, লোকের মনে সহজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে আমি ঐরূপ কোনও মতলবে উক্তরূপ কৌশল অবলম্বন করেছি।

"সবুজ পত্র" বন্ধ করবার প্রস্তাবের ভিতর অবশ্য কোনরূপ চাপা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একজন সাহিত্যিক-পলিটিসিয়ান নই; সুতরাং আমার কথার ভিতর কোনরূপ গূঢ় মতলব থাকবার কথা নয়, কেন না তা থাকলে সে কথা সাহিত্য হয় না। আর আমি পারি না পারি সাহিত্যই রচনা করতে চেষ্টা করি। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে "সবুজ পত্রে"র মৃত্যুর জনরবের প্রসাদে ও-পত্র সম্বন্ধে লোকমতের কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছি। উপরোক্ত মতলবী ব্যক্তি তাঁর চতুরতার ফলে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সম্ভবত সে জ্ঞান তাঁর তেমন মুখরোচক হয় নি। এ

সত্য সকলে না জানলেও সকলের জানা উচিত যে আসলে ভুল ধারণার উপরেই সকলে সুখে জীবন ধারণ করে। সে যাইহোক "সবুজ-পত্রে"র মৃত্যুসংবাদে বাঙলার একদল লোক দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, বিশেষত যখন "ও বালাই গেছে বাঁচা গেছে" এমন কথা কোনও দৈনিক সাপ্তাহিক, কিম্বা মাসিক পত্রে অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। "সবুজ পত্রে"র মতামতে যাঁরা সায় দিতে পারেন না, দেখতে পাচ্ছি, তাঁরাও এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নন যে, ও-পত্রের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণও আছে। কেন না যার প্রাণ নেই অর্থাৎ যা মৃত, তার আর অকাল মৃত্যু কি করে ঘটতে পারে।

(২)

যখন দেশের অন্তত জনকতক লেখকও চান যে "সবুজপত্র" "বেঁচে থাক্ চিরজীবি হয়ে," তখন যতদিন পারি ও-পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তি যে অতঃপর সংকল্পে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছি, তার কারণ অনেকের মতে আপাতত ও-পত্রের প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্যও বটে।

কেন কর্ত্তব্য সে কথাটা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ী জর্ম্মাণ সেনা যখন প্যারিস নগরীকে ঘিরে বসেন, তখন প্যারিসের আবালবৃদ্ধ-

বনিতা সকলে একবাক্যে বলে উঠেছিল, "il faut etre là"—অর্থাৎ "এখানে আমাদের থাকা চাই"। অথচ কেন যে থাকা চাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে শতকরা নিরনব্বই জন তার কোনও উত্তর দিতে পারত না। কেননা তাদের দ্বারা প্যারিস রক্ষার কোনরূপ সাহায্য হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অথচ এক প্রাণীও প্যারিস ত্যাগ করলে না, এমন কি অতি নিরীহ স্থূলকায় মুদি-পসারীরাও নয়। কারণ এ বিষয়ে প্যারিসের কোনও নাগরিকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, "il faut etre là"—নাগরিক-দের পক্ষে স্বেচ্ছায় প্যারিসে অবরুদ্ধ হয়ে থাকাটা ফলের দিক থেকে দেখলে একটা মস্ত অকাজ কিন্তু আত্মার দিক থেকে দেখলে যে একটা বড় কাজ, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যখন একটা বড় গোছের দায় জাতির ঘাড়ে এসে পড়ে তখন নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার ভারবহন করবার অধিকার যে সকলেরই আছে, এই মহা সত্যের সন্ধান প্যারিসিয়ান মাত্রেই নিজ অন্তরে লাভ করেছিল, এর প্রমাণের জন্য তারা কোনও যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে নি।

আজকের দিনেও আমরাও একটা যুগসন্ধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি, সুতরাং যাঁদের স্বদেশের প্রতি স্বজাতির প্রতি মমতা আছে, তাঁদের প্রতিজনের পক্ষেই যে যেখানে আছেন, তাঁর পক্ষে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা কর্ত্তব্য, কেননা নানারকম ভীষণ সমস্যা আমাদের চারদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। সংক্ষেপে "il faut etre là" যদিচ আমরা ঠিক জানিনে যে এইরূপ দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও সার্থকতা আছে, কি নেই।

(৩)

বর্ত্তমান ভারতে যে সমস্যাটা সব চাইতে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে আমাদের পলিটিকাল সমস্যা পলিটিকাল হিসাবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নগণ্য জাত, এ হীনতা আমরা কেউ প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। ফলে এই অসন্তোষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর শুধু বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে এসেছে। তার পর এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব্বে যা ছিল অসন্তোষ তা এখন দাঁড়িয়েছে অশান্তিতে। এ অশান্তির ভোগ পৃথিবীর সকল দেশের রাজা প্রজাকে কিছুদিন ধরে কিছু না কিছু ভুগতেই হবে, তার জন্য কোন পক্ষেরই হা হুতাশ করবার প্রয়োজন নেই। এ অশান্তির মূলে আছে বিশ্বমানবের সেই মুক্তির আশা, সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সেই মুক্তির প্রয়াস, এক কথায় মানুষের সেই আত্মজ্ঞান, যা এই যুদ্ধের ক্রোড়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে। মানুষ তার মনশ্চক্ষে আজ যে সভ্যতার সাক্ষাৎ পেয়েছে, কাল হোক্ পরশু হোক্ মানব সমাজে সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবেই হবে, কেউ তা চিরদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হতে পারে যে আমার এ বিশ্বাস ভুল। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা ভুল ধারণার উপরেই সকলে যে জীবন ধারণ করে, আমার এ মত ত আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছি।

এই নব আশায় আমাদের বুক বাঁধতে হবে, এবং এই নব-সভ্যতা গড়বার দায়িত্ব আর পাঁচজনের মত আমাদেরও ঘাড় পেতে নিতে হবে; এই কথাটা স্মরণ রেখো যে, এই মুক্তির পথে অশেষ বাধা, অসংখ্য বিঘ্ন আছে। কোন বিষয়ে বাধা পেলে হতাশ হয়ে পড়াটা

আমাদের জাতিগত স্বভাব, আমরা যদি সত্য সত্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের চিরাগত স্বভাবকে পদে পদে অতিক্রম করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এ সত্য আমরা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ কোনও কাম্যবস্তু একমাত্র কামনার বলে লাভ করতে পারে না, যদি না তার পিছনে সাধনার বল থাকে,—আর সাধনার অর্থ হচ্ছে বাধা অতিক্রম করবার ইচ্ছা ও জ্ঞান শিক্ষা ও শক্তি। সিদ্ধিলাভের পক্ষে মানুষের দ্বিবিধ বাধা আছে, এক বাইরের আর ভিতরের। এই বাইরের বাধা গুলিই বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে, কেননা চর্ম্মচক্ষুর সম্পর্কই হচ্ছে বহির্জগতের সঙ্গে। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে নিজের ভিতরকার বাধাই হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় বাধা, এবং এই বাধা অতিক্রম করতে না পারলে মুক্তিলাভ করতে কেউ পারে না, কোন ব্যক্তিও নয় কোন জাতিও নয়। আমাদের নিজের প্রকৃতিই যে আসলে আমাদের দীন করে রাখে, এ সত্য সকলের নিকট প্রত্যক্ষ নয়, তারপর যাঁর কাছে প্রত্যক্ষ তাঁর কাছেও সে সত্য প্রিয় নয়। নিজের প্রকৃতির উপর জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, এ যুদ্ধে হৃদয়াবেগের সাহায্য পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে বাহিরের বাধা দূর করতে যখন আমরা অগ্রসর হই, তখন রোষ ও ক্ষোভ আবেগ ও আক্রোশ প্রভৃতি মনোবৃত্তি আমাদের প্রবল সহায় হয়। এদের সহায়তায় অবশ্য আমরা সব সময়ে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি নে। এ জাতীয় মনোবৃত্তি মানুষকে উত্তেজিত করে কিন্তু তার পথ নির্দ্দেশ করতে পারে না, এরা যে জন্মান্ধ। সুতরাং আমরা

যদি জীবনে মুক্তপুরুষ হতে চাই তাহলে আমাদের মনকে মুক্ত করতে হবে, জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। যে জাতি-গঠনের কথায় দেশ আজ মুখরিত, তার গোড়ার কথা এবং শেষ কথাও হচ্ছে স্বজাতীর মন গড়ে তোলা।

(৪)

বাইরের অবস্থার যে বদল দরকার এ কথা আমি অস্বীকার করিনে, কেননা আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য নই। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর মানুষ হয়ে ওঠা যে কতদূর কঠিন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ম্যালেরিয়ার ভিতর বাস করে' অনশনক্লিষ্ট লোকে কেবল মনের জোরে যে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে, মনের এতাদৃশ অলৌকিক শক্তির উপর আমার কোন প্রকার ভরসা নেই। বাইরের অবস্থা যত অনুকূল হবে, দেহ ও মনে আমরা মানুষ হয়ে ওঠবার যে তত সুযোগ পাব, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যে দেশের মহা উপকার সাধন করছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র কল কারখানার সাহায্যে আমরা যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারব না; কল তা—সে বসনেরই হোক আর শাসনেরই হোক, মানুষ গড়তে পারে না, কেননা ঘটনা এই যে মানুষেই কল গড়ে। বাহিরের অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সে অবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্ব লাভের

সুযোগ দেয় মাত্র, তার বেশি কিছু করতে পারে না। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আর না করা, করতে পারা আর না পারা, নির্ভর করে তার মন আর চরিত্রের প্রবৃত্তি ও শক্তির উপর।

মানুষের মন যে তার দেহের চাইতে বড়, তার আত্মশক্তিই যে সব চাইতে বড় শক্তি, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু হচ্ছে মনের স্বরাজ্য, এবং এই স্বরাজ্য লাভের প্রধান সহায় হচ্ছে সাহিত্য। বাঙালীর মন বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে, এই বিশ্বাস এই আশাই হচ্ছে "সবুজ পত্রে"র আন্তরিক কথা। এ কথা শুনে অনেকে বলতে পারেন—"সবুজ-পত্র' ত কিছুই গড়ে না, শুধু অনেক জিনিষ ভাঙ্গে। এর উত্তর যে মনের দেশেও কারাগারের দেয়াল ভাঙ্গার নামই গড়া।

(৫)

পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কাজ করতে পারে তাকে ছোঁয় না, আর যে কাজ করতে পারে না তাতেই গিয়ে হাত লাগায়। এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার ফলে মানুষের ঢের চেষ্টা বিফল হয়, ঢের কাজ বিগড়ে যায়। আশা করি এ রকম ভুল আমরা করে বসব না। ভারতবর্ষকে এ যুগে বাঙালী যা দিতে পারবে, এবং বিশেষ করে বাঙলাই তা দিতে পারবে,—সে হচ্ছে তার হাতের কাজ নয় মনের কাজ। স্বদেশকে আমাদের প্রধান দানই হবে সাহিত্যদান। এ দান যে কি আকার ধারণ করবে তার পরিচয় নেওয়া এবং সেই

সঙ্গে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করাটাও আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ পরের কথায় আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হতে পারি, এবং তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ত হবেই এবং ভারতবর্ষের কোনও লাভ হবে না। বৈষ্ণবকূল ত্যাগ করলেই যে তাঁতিকূল লাভ করা যায় না, এ সত্য এদেশে ইতর সাধারণেও জানে। যাঁরা সাহিত্য চর্চ্চা করেন তাঁদের চিরদিনই কাজের লোকদের কাছ থেকে নানারূপ বাজে কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এ সব কথায় অবশ্য কর্ণপাত করতে হবে কিন্তু মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।

(৬)

আমরা সকলেই এখন দেশের পূজায় রত হয়েছি। এ পূজায় কেউ বা দান করবেন বস্ত্র, কেউ বা অন্ন, কেউ বা সুবর্ণ কিন্তু আমরা দান করতে পারব শুধু ধূপ দীপ আর পুষ্প। এই তিন দানের মূল্য যে কি সে বিষয়ে, একটি প্রাচীন ইতিহাস এখানে কীর্ত্তণ করি। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে সুবর্ণ নামক জনৈক ঋষি সায়ম্ভুব মনুকে প্রশ্ন করেন যে ধূপ দীপ পুষ্পের দ্বারা পূজা করবার সার্থকতা কি। ভগবান মনু পুষ্পদানের এইরূপ গুণকীর্ত্তণ করেন—

* * * "দেবগণ কুসুমগন্ধ দ্বারা তুষ্ট হন, যক্ষ ও রাক্ষসগণ কুসুম দর্শনে সন্তুষ্ট হন, নাগগণ সম্যকরূপে পুষ্প উপভোগ করিলে তুষ্টি লাভ করে, আর মানবগণ আঘ্রাণ দর্শন ও উপভোগ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।"

সায়ম্ভুব মনুর এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি ভারতীর পায়ে যে

পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন, তার আঘ্রাণে ও দর্শনে বিশ্বের লোক মোহিত হয়ে গিয়েছে এবং তা উপভোগ করবার জন্য দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলেই লালায়িত হয়ে উঠেছে। মনু আরও বলেন যে—

"কুসুমগণ দেবগণকে তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করে; তাঁহারা সংকল্প সিদ্ধ অতএব প্রীত হইয়া মানবগণের মনোরথ ইপ্সিত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করেন" * * *

এ অবশ্য মস্ত আশার কথা, তবে তা এযুগে কতদূর ফলবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

এ দান করবার সাধ্য অবশ্য আমাদের নেই, কেন না প্রতিভার স্পর্শ ব্যতীত কোন ভাষাতেই কাব্যের ফুল ফুটে ওঠে না। তারপর আসে ধূপদানের মাহাত্ম্যের কথা, এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে মনুর বচন উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ধূপদান করাও আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, আমরা বড়জোর কালেভদ্রে ধূনো দিতে পারি, কিন্তু সে শুধু মশা তাড়াবার জন্য।

এখন দীপদানের সুফল শুনুন—

"দীপজ্যোতি ঊর্দ্ধগ ও অন্ধকার বিনাশক। এই নিমিত্ত ঊর্দ্ধগতি দান করে, এ বিষয়ে এই নিশ্চয় আছে। দীপদান হেতু দেবগণ তেজস্বী প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশমান হইয়াছেন, এবং দীপদান না করিয়া রাক্ষসগণ তামসভাবে লাভ করিয়াছে, অতএব দীপদান করা বিধেয় হইয়াছে। মানব আলোকদান হেতু চক্ষুষ্মান ও প্রভাযুক্ত হয়, অতএব দীপদান করিয়া হিংসা করিবে না, এবং তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না" * * *

আমরা "সবুজ পত্রে"র অন্তরে মনের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করব এবং স্বদেশকে যদি কিঞ্চিত-মাত্র আলোকদানে সমর্থ হই, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হব, কারণ আমরা চাই যে সকলে চক্ষুষ্মান ও

প্রভাযুক্ত হন। যাঁরা আলোকে ভাল বাসেন না তাঁদের নিকট আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা যে দীপদান করতে যত্নবান হয়েছি সে দীপকে, "হিংসা করিবে না, তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না"। বলা বাহুল্য অন্ধকারেই মানুষ ভয় পায়।

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের সপ্তনবতিতম অধ্যায় হতে অনূদিত, কিন্তু এ অনুবাদ আমার কৃত নয় বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এর জন্ম; সুতরাং এর ভাষার জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নব-বর্ষ।

শ্রীমান চিরকিশোর
কল্যাণীয়েষু—

নববর্ষ আর নবহর্ষ, এদেশে এ দুই বস্তু এক কবিতা ছাড়া আর কোথাও মেলে না। আর আমাদের জীবনটা আর যাই হোক কবিতা নয়, যদি কিছু হয় ত সে এক মহা হ য ব র ল। তাই নতুন বছর প্রতি বৎসর আমাদের শুধু নতুন করে জ্বালাতে আসে, কিন্তু তাতে বেশি কিছু যায় আসে না। অভ্যাসের গুণে ও-জ্বালা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এবার বৈশাখ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দেখা দিয়েছেন। আকাশ এক সঙ্গে এমন লাল ও করাল হয়ে উঠেছে আর বাতাস এতটা উত্তপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটেছে যে, মনে হয় যেন কাছে-কোলে কোথাও আগুন লেগেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে উপর থেকে অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, আর পশ্চিম থেকে একটানা একরোখা হাওয়া বইছে, যার স্পর্শে মুখ পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়; আর দিনভর কানে আসছে তার হা হা হো হো শব্দ আর নাকে ঢুকছে তার চন্দনের নয়, গন্ধকের গন্ধ। এ আকাশ এ বাতাস আমাদের বাঙলা দেশের নয়, এমন কোনও পোড়া দেশের, যার উপর রুদ্রের রোষ-কষায়িত নেত্রের দৃষ্টি পড়েছে।

সিন্ধুদেশে একটি সহর আছে যার তুল্য গরম জায়গা, থারমমেটরের মতে ভূ-ভারতে আর নেই, যতদূর মনে পড়ছে, সে সহরটির নাম হচ্ছে শক্কর। শুনতে পাই সে দেশের অধিবাসীরা বলে যে, ভগবান যখন শক্কর তৈরি করেছেন তখন নরক সৃষ্টি করবার আর কি প্রয়োজন ছিল। নরকের এক প্রদেশের দান্তের চোখে-দেখা বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে দেখতে পাবে যে, শক্কর বাসীদের এ প্রশ্ন মোটেই অসঙ্গত নয়।

"E già venia su per le torbid' onde
un fracasso d' un suon pien di spavento,
per cui tremavano ambedue le sponde.

non atrimenti fatto che d' un vento
impetuoso per li avversi ardori,
che fier la selva senza alcun rattento;

li rami schianta, abbatte e porta fuori;
dinanzi polveroso va-superbo,
e fa fuggir le fiere, e li pastori"

অস্যার্থ—

"নদীর অপর-পার থেকে একলম্ফে তার ঘোলাজল ডিঙিয়ে এমন একটি বিকট শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছল, যা শুনে আমাদের মন আতঙ্কে ভরে উঠল, আর যার ধাকায় নদীর উভয়কূল থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এ শব্দ সেই বাতাসের চীৎকারধ্বনি, যে বাতাস আগুনের তাড়নায় ছুটে পালিয়ে আসছে এবং সুমুখে গাছপালা যা-পড়ে তাকেই অবিরাম প্রহার করছে।

এই রুক্ষ-বায়ু গাছের সব ডালপালা ভেঙে মাটির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার সে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাতাস সুমুখে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে মহাদর্পে তেড়ে আসছে, আর কি পশু কি মানুষ সকলকেই মারের চোটে খেদিয়ে দিচ্ছে।"

এ বৎসর বৈশাখের রোষে আমরা দান্তের নরকের নবমচক্রে যে পড়ে গিয়েছি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জানো কি পাপে মানুষের এ নরক বাস হয়?—দান্তে বলেন সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস না করায়। আমরা যে এ অপরাধে অপরাধী সে জ্ঞান আমার ছিল না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে নানা রকমের orthodoxy আছে, সম্ভবত আমরা তার ভিতর কোন একটার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছি। সেই পাপেই আমাদের এই শাস্তি।

আসলে সত্য কথা এই যে শুধু শঙ্কর কেন, ভগবান যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন আর নরক তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল? আগুন এদেশে চিরকালই জ্বলেছে—তাই না বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনার ধন হচ্ছে নির্ব্বান, আর সনাতন ধর্ম্মের কাম্য ও গম্যস্থান, স্বর্গ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে যাবার জন্য তেমনি লালায়িত হতেন, যেমন আমরা হই, সিমলে দারজিলিং যাবার জন্যে এবং দুই-ই এক কারণে অর্থাৎ হাওয়া বদলাবার জন্যে। এর প্রমাণ তাঁদের সঞ্চিত পূণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা স্বর্গ ছেড়ে আবার দেশে ফিরে আসতেন, যেমন আমাদের পুঁজি-পাটা খরচ হয়ে গেলে আমরা সিমলে দারজিলিং থেকে আবার দেশে নেমে পড়ি। আমার বিশ্বাস আমাদের কাব্যে দর্শনে পুঁথিতে পাঁজিতে যে "ভবসাগর" উত্তীর্ণ হওয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে, সে ভবসাগর

হচ্ছে কালাপানী। এবার মরে আমরা কে না আবার বিলেতে জন্মাতে চাই!

দেখতে পাচ্ছ গরমে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে এত বেফাঁস বকি! আসল কথা এই যে, নববর্ষ আমাদের প্রাণে নব হর্ষ না আনুক, আমাদের মনে নব-আশা এনে দেয়। বাইরে ঝড় বইলেও মানুষ তার অন্তরে "ন মুঞ্চতি আশা বায়ু" এ হচ্ছে শাস্ত্র বচন, তারপর ভাষাতেও বলে, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। অতএব সকলে মিলে, আশা করা যাক যে এবার বর্ষশেষে আমাদের হর্ষের কারণ ঘটবে।

(২)

গরম দেশে বাস করার ভিতর সুখ না থাক স্বস্তি আছে। সে দেশে মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে, আর বাদবাকী অংশটা ঝিমিয়ে কাটাতে পারে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে বেদ উত্তরমেরুতে রচিত হয়েছিল, এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের প্রথমত বেদের এবং দ্বিতীয়ত উত্তর-মেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, আমার নেই, অতএব উক্ত মন্ত্র প্রথমে উত্তরমেরুতে কিম্বা দক্ষিনমেরুতে উচ্চারিত হয়েছিল সে কথা বলতে আমি অপারগ। তবে বেদ যে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বাণী নয়, তার প্রমাণ "মা দিবাং সাপ্সি" এই বৈদিক নিষেধ বাক্য। আজও দেখতে পাচ্ছি শীতপ্রধান দেশের সভ্যতার মূলকথা ঐ একই। ইউরো-পের দেবতারা যে জাগ্রত এ কথা কে অস্বীকার করবে? সে কালের আর্য্যেরা এদেশে এসে আমাদের দিবানিদ্রা ভাঙাতে একবার চেষ্টা

করেছিলেন, তারপর জলবায়ুর গুণে তাঁরা নিজেরাই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন, এবং দিবানিদ্রার নাম যোগনিদ্রা দিয়ে বেদের অবিরোধে সেই নিদ্রাসুখ অনুভব করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে নানারকম পারলৌকিক সুখস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তারপর ফাঁক পেয়ে আমরা বহুদিন ধরে দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছিলুম, ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে আর এক দল আর্য্য এসে আমাদের সে নিদ্রা আবার ভঙ্গ করেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য নানা দেশ থেকে নানা জাতি এসে আমাদের যথেষ্ট হয়রান পরিশান করেছে, কিন্তু "মা দিবাং সপ্সি"—এ হুকুম আমাদের উপর তারা কেউ জারি করে নি। মোগল-পাঠান আমাদের দেহ নিয়ে অনেক টানাটানি করেছে কিন্তু তারা আমাদের মনের উপর হস্তক্ষেপ করেনি, অর্থাৎ তারা আমাদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়নি। বলা বাহুল্য ঘুমোয় আসলে শরীর, মন শুধু শুয়ে পড়ে।

এই নব ইউরোপীয় সভ্যতাই আমাদের মনকে এমনি জাগিয়ে তুলেছে যে, সে মনে ওঠবার এবং ছোটবার প্রবৃত্তি এক রকম অদম্য হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা উঠতে গেলেই আমাদের বাসগৃহের ছাদ আমাদের মাথায় চড় মারে আর ছুটতে গেলেই তার দেয়াল আমাদের বুকে ঘুঁষো মারে। আর অমনি আমরা বাঁ হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়ে ডান হাত বুকে দিয়ে কান্না জুড়ে দিই। সে কান্নার সুর ললিত আর তার বুলো হচ্ছে এই যে, যে মাথার মত চরম মাথা আর যে বুকের মত নরম বুক পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই, ছিল না, এবং থাকতে পারে না, সেই মাথা ও সেই বুকে এত চোট লাগে। এই ব্যাপারটারই নাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তি। এ অশান্তির ফল ভালই হোক আর মন্দই হোক, এর জন্য দায়ী ইউরোপের সাদা মানুষ, ভারতবর্ষের

কালা আদমি নয়। প্রথমত ইংরাজি শিক্ষা ঠুকঠাক করে আমাদের শুধু জনকতকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছিল, তারপরে এই যুদ্ধ একঘায়ে দেশশুদ্ধ লোকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছে। আজকের দিনে দেশের লোক কি চায় তা তারা ঠিক না জানলেও, যা আছে তাতে তারা যে সন্তুষ্ট নয় এ ত চোখে আঙুল-দেওয়া সত্য। আমাদের এ অশান্তির পরিচয় পেয়ে যাঁরা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, তাঁরা বলেন, তোমরা যা চাও সে হচ্ছে আকাশের চাঁদ। তথাস্তু। কিন্তু চাঁদ চেয়ে তার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধচন্দ্র পেলে মানুষের বুক ত জুড়িয়ে যায়ই না, উপরন্তু মাথা গরম হয়। দেশের কথা এইখানেই খতম করা যাক। ও-কথা বলতে গেলেই হা হুতাশ করতে হয় এবং আমার বিশ্বাস আমরা সাহিত্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের যথেষ্ট অপব্যয় করেছি, এখন অন্তত কিছু দিনের জন্য, আমাদের পক্ষে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য,- মনের বলাধানের জন্য।

(৩)

দেশের অশান্তির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিদেশের শান্তির কথা পাড়া যাক। এ বিষয়ের বিচার আমরা খুব দূর থেকে খুব একটা উঁচু জায়গায় বসে করতে পারব, অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের রায় যথেষ্ট উদার, যথেষ্ট নিরপেক্ষ হবে; বিশেষত সে রায়ের যখন কোনও ফয়সালা নেই। পরের সমস্যার সহজ মীমাংসা কে না করতে পারে? তা ছাড়া এ বিষয়ে মতামত দেবারও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে League of Nations, একটি Original member অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে আমাদের আর

কিছু লাভ হোক আর না হোক আমরা গাছে না উঠতেই এক কাঁধি নামাবার অধিকার পেয়েছি। "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!"

ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে যে, "মন্দের ভিতর থেকে ভাল বেরয়"। এই যুদ্ধটা যতই আসুরিক, যতই পাশবিক হোক না কেন, এর ভীষণ আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে একটা আকাশ বাণী শোনা গিয়েছে। এর দিগন্তব্যাপী তোপের আওয়াজ ভেদ করে এই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল যে, এ হচ্ছে প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই আকাশ বাণীতে আমিও বিশ্বাস করেছিলুম, কেননা এ হচ্ছে আশার বাণী। জানই ত মানুষে যাকে বিশ্বাস বলে সে শুধু আশারই বেনামদার, সুতরাং ইউরোপের শান্তি-বচনে বিশ্বাস স্থাপন করে' আমি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই নি, পরিচয় দিয়েছি শুধু এই সত্যের যে, আমিও মানুষ অর্থাৎ মূলত আশাজীবি।

তবে আমার প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, আশাই বলো আর বিশ্বাসই বলো, যতক্ষণ না তা স্পষ্ট একটা আকার ধারণ করে, ততক্ষণ তা মনের ভিতর দিয়ে শুধু আনাগোনা করে, সেখানে আসন পায় না। এই সংহার-নাটকের যখন দম ফুরিয়ে আসবে তখন তা যে মিলনান্ত হবে আমার এ বিশ্বাস থাকলেও উপসংহারটা যে ঠিক কি রকম হবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অতঃপর উইল্‌সন সাহেবের কল্পিত সাঙ্গোপাঙ্গ শান্তির প্রস্তাব যখন মূর্ত্তিমান হয়ে বিশ্বমানবের চোখের সুমুখে খাড়া হল তখন মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম, কেননা শুধু যে ধরাছোঁয়ার মত একটা জিনিষ পেলুম তাই নয়, দেখা গেল তাঁর মনগড়া শান্তির চোদ্দটি পদ আছে। বাঙলার জনৈক রসিক লেখক বলে গিয়েছেন যে, "রচনটা গদ্য কি পদ্য তা

চেনা যায় শুধু চোদ্দয়"। এই সূত্রের উপর নির্ভর করে, সহজেই বিশ্বাস করেছিলুম যে এই সংহার নাটকটি অতি বিজিগিচ্ছি গদ্য হলেও এর উপসংহার হবে পদ্য, শুধু পদ্য নয়, একেবারে চতুর্দ্দশপদী কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'সনেট'। এতে মনে একটু অহঙ্কারও হলো এই ভেবে যে শেষটা জয় আমাদেরই হলো কেননা উইল্‌সন সাহেব আমাদেরই দলের লোক অর্থাৎ তিনি একাধারে অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। ভাল কথা উইল্‌সন সাহেবের Essays পড়েছে? চমৎকার লেখা। যে হাত থেকে State নামক হাজার দুয়েক শুকনো পাতার গ্রন্থ বেরিয়েছে, সেই হাত থেকে যে অমন সব সরস প্রবন্ধ বেরতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। মধ্যে থেকে একটি অবান্তর কথা বলে নিলুম, এই প্রমাণ করবার জন্য যে আইনের অধ্যাপক হলেও মানুষে অবসর মত রসালাপ করতে পারে। যাক ও সব কথা, এখন আবার শান্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা ত আশা করেছিলুম মস্ত কিন্তু ফলে দাঁড়াল কি?—

দেখা যাচ্ছে যে এই কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের হাড়গড়া সন্ধিপত্রে যা আছে, সে হচ্ছে শুধু দেনা পাওনার হিসেব-নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ বাঁটোয়ারা, এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"— কবিতার বদলে অঙ্ক। আমরা চেয়েছিলুম দেখতে সভ্যতার একটা নতুন প্রাণ চিত্র কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শুধু পৃথিবীর একটি নতুন মানচিত্র।

(৪)

এই প্রস্তুত শান্তির গুণাগুণ তিনিই বুঝতে পারেন যিনি

আজীবন রেখা ও সংখ্যা নিয়ে কারবার করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক পাওয়া দুর্লভ যিনি একাধারে পাকা জরিপ-আমিন ও পাকা সুমোর-নবিশ, কেননা মানব সমাজে কেউ পারে মাপতে আর কেউ পারে গুণতে। মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতে একদল উকিল আছেন যারা নাকি ম্যাপ বোঝেন ভাল, আর উক্ত আদালতে একদল ব্যারিষ্টার আছেন যাঁরা নাকি হিসেব বোঝেন ভাল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। মোটামুটি মানুষ ঐ দুই ধাতেরই হয়ে থাকে। লোকে বলে আমাদের দেশে পলিটিক্সের যে দু'-দল হয়েছে, তার কারণ এরা দু'দল দু'জাতের লোক, মডারেটরা বোঝে ভাল হিসেব, আর Extremists-রা নক্সা! আমি যে এ দু'দলের কোন দলেরই নই, তার কারণ আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরয় তা রেখাও নয় সংখ্যাও নয়, ছেরেপ অক্ষর। সীমার জ্ঞান ও অর্থের জ্ঞান আমারও আছে, কিন্তু সে অন্য ক্ষেত্রে। তবে পৃথিবীতে থাকতে হলে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সঙ্গে একটা মোটামুটি রকমের পরিচয় সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। সেই পরিচয়ের বলে আমি বলি, পৃথিবীর একটা নতুন নক্সা পাঁচজনে সহজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু বিশ্বমানবকে সেই সঙ্গে পঞ্চীকৃত করা তাদৃশ্য সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই ত যত মুস্কিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই দেখনা কেন, পাঁচজনে মিলে যত সহজে পৃথিবীর কালী করেছেন তত সহজে তার নক্সা তৈরি করতে পারছেন না। গোল

বেধেছে তার রঙ দেওয়া নিয়ে। এ মানচিত্রে রেখার সঙ্গে বর্ণের মহা দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছে, বর্ণ কোথাও বা সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চাচ্ছে কোথাও বা বিভক্ত হতে আপত্তি করছে। জর্ম্মাণী বলছে, এ সন্ধি ত আসলে বিচ্ছেদ। অপর পক্ষে ইতালি বলছে, এ সন্ধিতে ত সমাস হল না। এই দুই আপত্তিই উঠছে বর্ণের দিক থেকে। এ দুই আপত্তির এমন কোনও সদুত্তর নেই যা সকলে বিনা বাক্যব্যায়ে গ্রাহ্য করে নিতে বাধ্য, তার কারণ ইউরেপের এই নূতন ভাগ বাটোয়ারার গোড়ায় একটা গলদ আছে।

এই নূতন বন্দোবস্তের গোড়ার কথা হচ্ছে Self-determinations of Nations অথচ nation যে কাকে বলে সে বিষয়ে এই বন্দোবস্তকারীদের মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। Nation-এর মূল কোথায়, জমিতে না জাতিতে? যারা একদেশে বাস করে তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে তাদের জমি ভাগ করে নিলে তাদের nationality রক্ষা হয় না। এই হচ্ছে জর্ম্মানীর কথা; অপর পক্ষে যারা এক জাতের লোক তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে বিদেশকে আত্মস্মাৎ না করলে তাদের nationality-ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই হচ্ছে ইতালির কথা। Nation শব্দের এই দুটি বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই যত গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসল কথা ও-দুয়ের কোন অর্থই পরীক্ষায় টেঁকে না, কেননা এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে তেমনি এক জাতের লোক নানা দেশে বাস করে। তা ছাড়া ইউরোপের কোন প্রদেশই একদেশ নয়; কেননা তার প্রতি দেশের চৌহদ্দি ক্রমান্বয়ে বদলাচ্ছে; ইউরোপের কোন জাতিই একজাতি

নয় কেননা তার প্রতি জাতির শরীরে নানা জাতির রক্ত আছে। এক কথায় ইউরোপের সব বর্ণই সঙ্কীর্ণ বর্ণ এবং এ বর্ণের ধর্ম্ম হচ্ছে চারিয়ে যাওয়া, কতকগুলি সরল রেখার ভিতর তাকে আটক রাখবার যো নেই।

কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে, nation শব্দের যে অর্থই হোক পলিটিক্‌সে ও-শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই জনসমূহ যারা এক রাজ্যভুক্ত এবং যাদের ভিতর সর্ব্ব প্রধান বন্ধনসূত্র হচ্ছে চিরাগত একশাসন, একপালন। প্রতি nation নিজের মনে নিজের nationality-র ভিত্তি যাই ভাবুক, প্রতি nation অপর সকল nation-কে শুধু পলিটিকাল nation হিসাবেই মানে এবং তার সঙ্গে কারবার করে। রাজনীতির দরবারে এই হিসেবটাই সব চাইতে বড় হিসেব বলেই রেখার সঙ্গে শুধু বর্ণের নয় সংখ্যারও বিবাদ ঘটে। পলিটিক্‌সে লোকবলও একটা কম বল নয়, সুতরাং ইউরোপের এই নতুন বন্দোবস্তে যে nation-এর লোক সংখ্যা বাড়ছে সেই খুসি হচ্ছে আর যে nation এর কমছে সেই ব্যাজার হচ্ছে, অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, এ ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে ইউরোপের রাজশক্তির যোগ-বিয়োগ। উইলসন সাহেব আশা করেন যে ঐ মহাদেশের রাজশক্তির এই বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণের ফলে পৃথিবীতে চিরশান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু এ আশা ফলবতী হবে কি না, সে বিষয়ে তিনিই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিয়েছন। মানুষ যে কত নির্ব্বোধ তার একটি উদাহরণ তাঁর New Freedom গ্রন্থেই পড়েছি। উইলসন সাহেব বলেন যে Newton যখন এই জড়-জগতের laws of motion আবিষ্কার করলেন, তখন ইউরোপ ধরে নিলে যে ঐ একই law রাজনীতিতে প্রযুজ্য, অমনি সে দেশের রাজমন্ত্রীরা

balance of power-এর সৃষ্টি করতে বসে গেলেন। এ balance টিকলে না, কেননা জড়জগৎ আর মনোজগৎ এক নিয়মের অধীন নয়। এখন জিজ্ঞাসা করি আজকের দিনে বড় বড় রাজমন্ত্রীরা সেই পুরোণো balance of power ছাড়া আর কি রচনা করতে বসেছেন? নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, এবার নাকি এ balance তার গড়নের হিকমতে মানবসমাজকে stable equilibriun দান করবে। মানবজীবন কিন্তু ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত। ঘড়ির দম বন্ধ না হলে ওর দোল বন্ধ হয় না। অতএব এ পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে কোন একটা অবস্থায় স্থির থাকবে না। একমাত্র মৃত্যুই মানুষকে চিরশান্তি দিতে পারে। মহাভারতে দেখতে পাই স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ও শান্তি পর্ব্বের মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। সুতরাং এই শান্তি পর্ব্বই যে ইউরোপের ইতিহাসের শেষ পর্ব্ব, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

(৫)

ইউরোপ মায় আমেরিকা সমগ্র পৃথিবী নয় এবং ইউরোপের বাইরেও মানুষ আছে সুতরাং দেখা যাক, তাদের কি ব্যবস্থা হল।

এই শান্তির দরবারে স্থির হয়ে গিয়েছে যে সমগ্র আফ্রিকা এবং বেশির ভাগ এসিয়ার সব জাতিই নাবালক। পলিটিকাল হিসেবে যারা স্বরাট নয় পূর্ব্বেই বলেছি ইউরোপের কোন Nation-ই তাদের সাবালক বলে স্বীকার করে না। তাই এই নাবালকদের জন্য সব উছি নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং যতদিন তারা সাবালক না হয় ততদিন এই উছিরাই তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা।

তবে এই প্রশ্নটা মনে সহজেই উদয় হয়, এই নাবালকেরা কবে সাবালক হবে? নাবালকের উছি নিযুক্ত করা মাত্র যে তার নাবালকত্বের মেয়াদ বেড়ে যায় ইউরোপের সকল আইনের ত এই কানুন। তারপর শুনতে পাচ্ছি উক্ত উছিরা এই সব নাবালকদের শিক্ষার ভার হাতে নেবেন—তাদের মানুষ করে তোলবার জন্য। এ অবশ্য ভরসার কথা, তবে ভয়ের কথা এই যে, ইউরোপীয় মতে শিক্ষা-পদ্ধতির একটা মোটা কথা এই যে, "Spare the rod and spoil the child."

যাকগে ও সব পরের কথা। আমাদের অবস্থা যে ঠিক কি দাঁড়াল সেটা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। League of nations-এর হিসাবে আমরা হলুম সাবালক আর nation হিসেবে থাকলুম নাবালক। একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক দেখতে পাচ্ছ পৃথিবীতে আমরা ছাড়া কেউ হতে পারে না, আমরাই হচ্ছি মানবসমাজে এক-মাত্র living contradiction, এবং সম্ভবত এই contradiction-টা আবহমান কাল living থাকবে।

এত লম্বা বক্তৃতা করবার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, পৃথিবীর ভাবনা ভেবে কোনও লাভ নেই। ও-বস্তুটা যখন গোল তখন ওকে চৌকোস করবার চেষ্টা বৃথা; বিশেষত তাদের পক্ষে যাদের হাতে হাতুড়ি নেই। তার চেয়ে Voltaire-এর উপদেশ শিরোধার্য্য করা ঢের ভাল। মানুষের কাছে তাঁর শেষ কথা এই—

"Cultivate your garden"—অতএব এসো তুমি আমি সাহিত্যের চর্চ্চা করি, কেন না আমরা ঐ সাহিত্যের চাষ ছাড়া আর কিছু করতে পারব না।

(৬)

আর এক কথা, কোমর বেঁধে সাহিত্যের চাষ করাও আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। ভারতবাসীর মন গড়ে তোলবার দায় বর্ত্তমানে বিশেষ করে বাঙালীর ঘাড়েই পড়েছে, এবং সে দায় এড়াবার আমাদের অধিকার নেই, কেননা এ দায় আর কেউ বহন করতে পারবে না।

এ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা একটি বিরাট পুরুষরূপে দেখতে শিখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি যার শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। কোন্ প্রদেশ তার কোন্ অঙ্গ তাও একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাব যে এই বিরাট পুরুষের বাহু আর বোম্বাই যে তার উদর এ বিষয়ে দেশশুদ্ধ লোক এক মত। পূর্ব্বে আমরা দাবী করতুম যে বাঙলাই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের হৃদয়, অতএব মাদ্রাজ তার পদ। মাদ্রাজ অবশ্য এতে আপত্তি করত এবং সে আপত্তি হালে হোমরুল দলে গ্রাহ্য হয়েছে। এই দলের পলিটিসিয়ানদের মতে, ভারতবর্ষের হৃদয় এখন তার বাঁ-দিক থেকে বদলি হয়ে ডানদিকে, এক কথায় বাঙলা থেকে সরে গিয়ে মাদ্রাজে স্থিতিলাভ করেছে। এ কথার প্রতিবাদ করবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের হৃদয় কেড়ে নিলেও তার পা আমাদের ঘাড়ে অদ্যাবধি কেউ চাপিয়ে দেয় নি। কেন দেয় নি, তার ভিতর একটু রহস্য আছে। আমাদের নব-পেট্রিয়টরা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন যে, এ বিরাট পুরুষের পা বলে কোন অঙ্গই নেই, এ যে চলে না, এই হচ্ছে এর বিশেষত্ব ও মহত্ব। এ কথা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য, কেননা

জনরব যে এই নব-পেট্রিয়টরাই হচ্ছেন দেশের আগামী শাসনকর্ত্তা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে বাকী থাকল শুধু একটি অঙ্গ—মস্তক। তাই আজ আমরা দাবী করতে পারি যে, বাঙলাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মস্তক, আমাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নেই, কেননা ও-অঙ্গের ভার নিজস্কন্ধে নিতে আমরা ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। ওর অন্তরে মস্তিস্ক নামক যে পারার মত পদার্থটি আছে তা মানুষের মনকে শেখায়-পড়ায়, তার বাহুকে শাসন করে, তার উদরকে অতি মাত্রায় স্ফীত হতে দেয় না, তার হৃদয়ের রক্তকে পরিষ্কার করে, তার পরে তা এমন সব ন্যায়ের বিধান দেয় যা মেনে চলা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এ ছাড়া ঐ মস্তিষ্ক নামক পদার্থটি "আইডিয়া" নামক এক অবস্তুর সৃষ্টি করে যাকে অন্তরে স্থান দিয়ে মানুষের সোয়াস্তি থাকে না, অথচ যার কাছ থেকে একদম পালানও মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ অবস্তুর চর্চ্চা কাজের লোকেরা একেবারেই করতে নারাজ; অতএব এর চর্চ্চা এ যুগে আমাদেরই করতে হবে, কেননা আমরা যে জাতকে-জাত যে unpractical, এ সত্য ত সর্ব্বলোক-বিদিত। এই খানেই মনে করিয়ে দিই যে মানুষে যাকে সাহিত্য বলে—তার জন্মস্থান হচ্ছে ঐ মস্তিষ্ক। সুতরাং আমরা যখন প্র্যাকটিকাল নই তখন আমাদের পক্ষে একমনে সাহিত্য রচনা করাই শ্রেয়, বিশেষত যখন আমরা না করলে ও-কাজ ভারতবর্ষে আর কেউ করবে না। ভাববার চিন্তোবার আর কারও সময় নেই তারা সব বড় কাজে ব্যস্ত।

বীরবল।

ভবভূতি।

—:০:—

কি মেঘ গম্ভীর শ্লোক উঠিলে উচ্চারি,
নির্ভয় প্রবল কণ্ঠে কি মহা ঝঙ্কার!
সহস্র বর্ষেরো পরে প্রতিধ্বনি তারি,
আছে ভরি ভারতের প্রান্তর কান্তার।
তবু কি করুণ গীতি, তবু কি মধুর!
ক্রন্দনে লুটায়ে পড় এমন কাতর!
বীরের বিরহ-গাথা অপরূপ সুর;
কুসুম-কোমল তুমি হে বজ্র-কঠোর!
এত প্রেম কে শিখালে তরুণ ব্রাহ্মণ?
এত গর্ব্ব? তবু তুমি কর নাই ভুল;
শোভিল তোমারি ভালে বিজয়-চন্দন;
—কাল নিরবধি আর পৃথিবী বিপুল।
আজি যে সহস্র কণ্ঠে উঠে তব স্তুতি
হে কঠিনে সুকুমার কবি ভবভূতি!

৪ঠা মাঘ ১৩২৫।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রতিধ্বনি।

——:o:——

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি, চারিদিকে শুধু
প্রতিধ্বনি। কে আছ নির্ভীক বীর হেথা ?
এই বদ্ধ, অন্ধ কারাগৃহ ভাঙ্গি, বঁধু,
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে যাও ; দূর কর ব্যথা।
যুগযুগান্তর পূর্ব্বে কোন্ কথা কবে
উচ্চারিত হ'য়েছিল প্রতিশব্দ তার
প্রাচীর প্রহত হ'য়ে, বার বার, বার,
ফিরে আসে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত রবে।
যদি এর আবেষ্টনী ভেঙে ফেলা যেত !
আকাশের তলে শব্দ যদি প্রাণ পেত !
কি আনন্দে মাতিয়া উঠিত দশদিক,
মানুষ কি চোখে ধরা দেখিত চাহিয়া,
জীবন কি গান জানি, উঠিত গাহিয়া !
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে যাবে কে মোরে, নির্ভীক ?

২২শে মাঘ ১৩২৫।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রেম।

—:০:—

দার্শনিক-বিজ্ঞ কহে—তারে বল প্রেম ?
অবিদ্যার মোহ সেতো মানব অন্তরে।
বিদেশী পিত্তল সেও স্বর্ণরূপ ধরে,
তারে বল আর কিছু—সে তো নহে হেম।

বৈজ্ঞানিক হেসে কহে—সৃজনের ধারে
বৃত্তি এক প'ড়ে আছে প্রকৃতিরচন,
অভাবে স্বভাব সৃষ্টি—জনমে জীবন
যৌন-নির্ব্বাচন বৃত্তি—প্রেম বল তারে ?

কবি কহে—পণ্ডিতের বন্ধ্যাহিয়া মাঝে
প্রেমের জনম কভু সম্ভবে না সাজে !

সেতো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি—সারা বিশ্ব শুধু শ্যামময়,
বাঁশীটি বাজেনি যার হৃদি-বৃন্দাবনে
সে কভু বুঝিতে পারে—প্রেম কারে কয় !

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

রূপ।

নিয়ে নিমেষের প্রাণ
হাসিয়া পলক,
ফুলের এলান বুকে উষার আলোকে খুলিয়া ঝলক,
কোথায় মিলায়!
কাটে,—সে পরশটুকু ভাবিয়া ফুলের, আকুল দিবস
তার অজানায়।
মিলাইয়া গিয়াছে নিমেষে,
তাই সে—অমিয়-গলা শিশিরের কণা;
কুসুমের সকল জীবন
ঘিরিয়া থাকিত যদি হ'ত সে—বেদনা।

এলে তুমি যৌবনের
শ্রাবণ উষায়,
ঢালিয়া হৃদয় মনে অযুত সাধনে আকাঙ্খা আশায়
যে রূপ-প্লাবন,
প্রাণের গোপনে সে যে ঘুমায়ে পড়েছে, তারি স্বপনেতে
বিভোর জীবন!
রূপ সে যে বাঁশরীর সুর,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে উড়ে চলে যায়;
স্তব্ধতার নিবিড় অন্তর
পরশে শিহরি দিয়া নিভৃতে ঘুমায়।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

উড়ো-চিঠি।

——:*:——

এপ্রিল ২২, ১৯১৯।

জীবনকুমার

তোমার উপরে আমি যে মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলুম সেটা তোমার কাছে আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেননা তোমার শেষ চিঠি পড়ে' একেবারে ডবল খুসি হয়েছি। তুমি হয়ত মনে মনে ভাববে যে, সে চিঠিখানার মধ্যে এমন কি অপরকে খুসি করবার মত পরমাশ্চর্য্য খবর ছিল! তা যে-খবর ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটা কিছু করবে বলে' মনস্থ করেছ।

আমার দ্বিতীয় দফা খুসি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছ। আমার বিশ্বাস যে, "Pen is mightier than the sword," এ-কথাটা একটুকু অতি-রঞ্জিতও নয়, অতি-মণ্ডিতও নয়। লেখনী অসির চাইতে mightier ত বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা subtler-ও। ব্রাহ্মণের স্থান যে ক্ষত্রিয়ের চাইতে উঁচুতে ধরা হয়েছে সেটা খামখেয়ালেও নয়, বা খোসখেয়ালীতেও নয়। অসি দান করে—মৃত্যু, আর লেখনী—অমৃত। অসি জীবন নিতেই পারে—লেখনী জীবন দিতেও পারে। তাই ত এ দেশে আজ লেখনীর এত প্রয়োজন, অবশ্য যদি সেই লেখনীর পিছনে এমন একটা মস্তিষ্ক থাকে যে-

মস্তিষ্কের চিন্তাশীলতা অধর্ম্ম নয় অকর্ম্মও নয়। তবে তুমি সাহিত্য-মন্দিরের পূজারি হয়ে কেবলই পুরোনো মন্ত্র আওড়াবে, না নিজে উদ্যোগ করে' সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ধ্যান ধারণাও করবে তা শুধু তোমার উপরেই নির্ভর করে। তবে তোমাকে এইখানে এই কথাটা বলে' রাখছি যে, মন্ত্রের যে গুণ তা মানুষের জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু ইত্যাদি Vocal instruments-গুলোর মধ্যেই নেই, আছে তা তার অন্তরে, যেখানে মানুষ বচনশীলতায় মুখর সেখানে নেই, আছে তা যেখানে সে আত্মোপলব্ধিতে প্রখর। মন্ত্র হয়ে ওঠে কেবল বাক্য, যখন সেই মন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। বাক্যের জোর তখনই, যখন তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্র, মন্ত্রের গুণ তখনই যখন তা সেই মানুষের আত্মার সত্যে ও শক্তিতে অভিষিক্ত।

কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তুমি জীবন উৎসর্গ করবে জেনে সুখী হলেও আমি তোমার একটা প্রশ্ন শুনে একটু দমে গিয়েছি—সাহিত্য-জগতে তোমার সাফল্য সম্বন্ধে। তুমি যে জিজ্ঞেস করেচ, আজ যে বাঙলা দেশের সাহিত্য-সভায় দুটো দল গড়ে' উঠল, যার এক দলকে পুরাতন ও অন্য দলকে নূতন-পন্থী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এই দু' পন্থীর মধ্যে কোন্ পন্থা পান্থজনের শ্রেয়? এ প্রশ্নে তোমার কৃতার্থতা সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই একটু দমে' গিয়েছি এই জন্যে যে, ও-প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে সন্দেহ ও সংশয়। আর সন্দেহ ও সংশয়ের মানে হচ্ছে নিজের অন্তর থেকে সেই বিষয়ে একটা কোন স্পষ্ট তাগিদ না আসা। অন্তরের এই তাগিদই হচ্ছে মানুষের সত্য; সুতরাং সেই পন্থাই তার পন্থা। মানুষ যতক্ষণ না এই রকম তাগিদ তার অন্তর থেকে পায় ততক্ষণই তার প্রশ্ন—এটা করি না ওটা

ধরি? এ রকম দু' নৌকোয় পা রাখলে আর যাই হোক, নৌকো চলে না। কিন্তু যা হোক এ সম্বন্ধে তোমায় আমি একটা ব্যক্তিগত মত দিতে পারি। আমার দৃঢ় ধারণা যে বাঙলা-সাহিত্যে আজ আমরা যে পন্থাই অবলম্বন করি না কেন, আজ আমরা সেখানে বৌদ্ধ দোঁহার সুর ভাঁজতে গেলে যতখানি ঠকব, বৈষ্ণব পদাবলীর তান সাধতে গেলেও ঠিক ততখানিই ঠকব। কেননা আজ আমরা বৌদ্ধও নই বৈষ্ণবও নই—অর্থাৎ অন্তরে।

আসলে পুরাতন পন্থা ও নূতন পন্থা কতকটা সত্যি হলেও ও-সম্বন্ধে তর্কটার অনেকখানিই বাজে। বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আসল খাঁটি কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, তা প্রথমে বাঙলা হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত তা সাহিত্য হওয়া চাই। এই হলেই আর কোন সংজ্ঞাই সেটাকে বাঙলা-সাহিত্যের ফলাহারে অপাংক্তেয় করে' রাখতে পারবে না।

এত বড় একটা কথার মুখে তর্কের খাতিরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে, যদি কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক কামস্কাটকাবাসী এক জোড়া যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করে' একখানা উপন্যাস লেখেন তবে সে গ্রন্থকে বাঙলা-সাহিত্যের জাতে তুলে নিতে হবে কি না? তা বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে না কি?—নিশ্চয় তাকে জাতে তুলে নিতে হবে। সাহিত্য-বৃক্ষের নানা শাখা যেমন কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি। এখন যদি বাঙালী-ঐতিহাসিক বাঙলা-ভাষায় একখানি মেক্সিকোর ইতিহাস লেখেন তবে তা বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ হবে কি না? মেক্সিকোর ইতিহাস যদি বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে তবে কামস্কাটকার প্রণয়-

কাহিনীই বা কেন করবে না? বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের কথা, সেটা নির্ভর করবে তার দোষ গুণের উপরে—তা সাহিত্যের খাঁটি জিনিস, না মেকি মাল—তার উপরে।

এই ধর না কেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঙলা রামায়ণ মহাভারত রচনা করলেন তেমনি যদি কোন কবি ইলিয়ড ও অডেসির গল্প নিয়ে বাঙলা মহা-কাব্য রচনা করেন, তুমি কি মনে কর তাহলে তা বাঙলা-সাহিত্যে ফেলা হ'য়ে থাকবে। বাঙালী-মনের এমন সংকীর্ণতা হবে না বলে' আমাদের সবারই প্রাণপণে আশা করা উচিত। তা যদি হয় তবে ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট, রোমিও-জুলিয়েত, ওথেলো ইত্যাদি নাকচ, বায়রনের ডনজুয়ান, চাইল্ড-হ্যারল্ড ইত্যাদি কাব্যগুলো নাকচ—ফরাসী-সাহিত্যেরও ঐ রকম অবস্থা দাঁড়াবে। তোমার সূত্র অনুসারে দেখতে পাচ্ছ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি রকম একটা হুলুস্থূল বেধে যাবে। এর উত্তরে যদি বল যে, অন্য দেশের সঙ্গে বাঙলা দেশের তুলনা! বাঙলা দেশ গড়ে' উঠেছে divine dispensation-এ। তবে অবশ্য নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। তবে এইখানে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

* * * *

থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোলে আম্রবন ছায়ে"

এ মনের ভাব মানুষের একটা চিরন্তন ভাব। "আম্রবন ছায়ে"র "ক্ষুদ্র কোণ" যতই গভীর কোণ হোক না কেন যতই মধুর কোণ

হোক না কেন, সেই খানেই মানুষের মন চিরকাল আঁটবে না, আঁটবে না। মানুষের জীবন-তারে গুণ গুণ করে একটা সুর চিরদিন, গুঞ্জিত হচ্ছে যদি কান পাততে জান তবে কান পেতে শোন, সে সুর হচ্ছে ঐ—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এই সুর যে থামাতে চায় সে বৃহৎকেই থামাতে চায়, মহৎকেই অস্বীকার করতে চায়—এ যেন সান্ধ্য-আকাশের একটা মাত্র তারার পানে চেয়ে সমস্ত আকাশটাকেই ভুলে যাওয়া—সমস্ত আকাশটাকেই অস্বীকার করা।

সে যা হোক আমাদের সাহিত্যে নূতন ও পুরাতন এই শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা তোমায় স্পষ্ট করে' বলছি।

প্রথমে দু'দলের দু'জনা চরম পন্থীকে নেওয়া যাক। একজন বলছেন—আমাদের অতীতের অনুকরণ কর। আর একজন বলছেন—ইয়োরোপের অনুকরণ কর। আমার মনে হয় এ দু'জনের কেউই বর্ত্তমানে বাঙলা-সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দিতে পারবেন না। কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ হচ্ছে মানুষ যা নয় তারই খেলা করা—যে ভঙ্গীটা আত্মার নয় সেই ভঙ্গীটা তার মনের ভিতরে কল্পনা করে' তাই কালি কলমের সাহায্যে কাগজের উপরে আঁকা। কিন্তু সৎ-সাহিত্য, স্থায়ী-সাহিত্য হচ্ছে তাই যাতে ফুটেছে আত্মার চেহারা। কেননা এক আত্মাই হচ্ছে সৎ—আত্মাই হচ্ছে অজর অমর অক্ষয়, কাল তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না। এ হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা—যাঁকে আমরা পূর্ণ অবতার বলে মানি।

আসলে যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমরা চলে' এসেছি সে অতীতকে আজ আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব না, আর আজ যে বর্ত্তমানটা আমাদের সামনে এসে পড়েছে সেটাকে আমরা থুড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে পারব না। আর এতে অপমান বোধ করবারও কোন প্রয়োজন নেই বা এতে প্রাচীন ঋষিদের গৌরব ক্ষুণ্ন হ'ল কল্পনা করে' চোখের জল ফেলবারও কোন কারণ নেই।

আমাদের অতীতকে যে আমরা খুলতে পারব না আর আমাদের বর্ত্তমানকে যে আমরা ভুলতে পারব না—ইচ্ছা করলেও নয়—এটা বিশেষ করে প্রমাণিত হয়েছে আমাদেরি সাহিত্য-সাধারণ-তন্ত্রের দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে। একজন হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি মাইকেলের জীবনী জান। ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা এদেশে আমদানী হবার পর বিলিতি সভ্যতার ঢেউয়ে মধুসূদন যেমন নাকানি-চুবোনি খেয়ে ছিলেন বাঙলা দেশের কিম্বা সমস্ত ভারতবর্ষের আর কেউ তেমন খান নি। তাঁর আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছিল বিলিতি। কিন্তু তাঁর কলম থেকে স্থায়ী যা বেরুল তা হচ্ছে "মেঘনাদ-বধ"। আর এই "মেঘনাদ-বধ" কেউ যদি ইংরাজিতে অনুবাদ করে' বিলেতে ছাপান তবে তা পড়ে' এ কথা কেউ বলবে না যে তা একজন ইংরেজ কবির রচনা। মাইকেলের সার্ট-ওয়েষ্টকোট ফুঁড়ে যে আত্মা বেরিয়েছিল তা আর যাই হোক ইংলিশ-ম্যানের আত্মা নয়।

অন্যদিকে আবার আছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলায় তাঁর যা ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল সেটা চাটনি হিসেবে। এ-দেশে ত তিনি

ইংরেজি শিক্ষার "পিল" বরদাস্ত করতে পারলেনই না, বিলেতে গিয়েও যে তিনি সে শিক্ষাকে মটন চপের মতো কাঁটা চামচের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে উদরস্থ করতে পেরেছিলেন তা অন্তত তাঁর "জীবন স্মৃতি" পড়ে' মনে হয় না। তবুও আজ যদি কেউ তাঁর "গীতাঞ্জলি" মৈথিলি ভাষায় রূপান্তরিত করে তবে সেটা বিদ্যাপতির রচনা বলে' কেউ ভুল করতেন না নিশ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন বড় কবি এ কথা তুমি মান। তাঁর প্রতিভা অমানুষী এটাও তুমি স্বীকার কর। এই রবীন্দ্রনাথই একদিন বৈষ্ণব কবিতার রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে সেই সুর আপনার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজীয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ফল হচ্ছে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়েসে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তোমাকে এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর "জীবন-স্মৃতি" তে লিখেছেন, "ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। * * * *। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গেনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যে নিজের রচনা সম্বন্ধে কেবল বিনয়ই প্রকাশ করেছেন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণের গানে আজ আমরা "দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর" দিতে পারি নে, কারণ এ যুগের আমরা রাধাকৃষ্ণকে ঠিক তেমনি সত্য করে'

পেতে পারিনে, যেমন করে' সে যুগের তাঁরা পেতেন। এই দেখছ না আজকাল আমরা রাধাকৃষ্ণের লম্বা-চওড়া আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সুরু করেছি। আর এইটাই প্রমাণ যে আজকার আমাদের রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির জমাখরচের কাজিল দাঁড়িয়েছে। আসলে ভক্তির চাইতে আমাদের জ্ঞানের দিকটা বেড়েই চলেছে। তাই আজ গাঁয়ের যমুনার কুলুকুলু রবই আমাদের দু' কান জুড়ে বসে' নেই, আজ ধরণীর সপ্তসিন্ধুর কলকল ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত ভরে' উঠেছে। ভক্তির দোষ সংকীর্ণতা— জ্ঞানের গুণ উদারতা। ভক্তির, সে হচ্ছে কূপ; জ্ঞানের সে হচ্ছে বারিধি। ভক্তির কূপ বলেই হয়ত তা শান্ত ও শীতল, কিন্তু শান্ত ও শীতলতাকে বড় করে বিশালতাকে কে অস্বীকার করবে?

এইখানে তুমি নিশ্চয় তর্ক তুলবে। তুমি বলবে যে রবীন্দ্রনাথের ছেলে বয়েসের কাঁচা রচনায় পাকা রঙের ও রসের আশা করা অন্যায়। এবং সেই আশা করে' এবং তাই না পেয়ে তারই উপরে সমস্ত বাঙালী কবির, তথা সমস্ত বাঙালী জাতির, mental Psychology-র ব্যাখ্যা দাঁড় করান কেবল তর্কে জয়লাভ করবার জন্যেই। তুমি হয়ত বলবে যে রবীন্দ্রনাথ যদি ঐ পথ প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন তবে হাত পাকবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কলমের মুখ থেকে এমনি সব পদাবলী ফুটে বেরুত যা "খেয়া"র সুর বা "গীতাঞ্জলি"র গানকে ছাড়িয়ে উঠত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গোপবালাদের মতো যে যমুনা-পুলিনের পথ ধরে' চলল না এইটেই মস্ত প্রমাণ যে রবীন্দ্রনাথের তা সত্য নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথই কেন?—নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে' সত্যেন দত্ত করুণানিধান

পর্য্যন্ত কারো কবি-আত্মাই যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরু ছায়ায় কলম নিয়ে বসে' গেল না। বসবে কি? যমুনা যে আজ শুকিয়ে উঠেছে—আর কদম্বের শাখা প্রশাখা দিয়ে হয়ত মালগাড়ীর "ওয়াগন" তৈরী হচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে বাঙলার কবিরা সব যোট বেঁধে জোর করে' বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ও গভীরতর সত্যটাকে অস্বীকার করে' আসছেন? আমি কিন্তু তা মনে করি নে।

মানুষের মধ্যে এক কবির জীবনেই কবি-আত্মার সঙ্গে তার বুদ্ধির সংগ্রাম সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয় তবে কবি অ-কবিই হয়ে উঠতে পারেন, সু-কবি হন না। যা হোক মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখেছেন। কিন্তু শোন "ব্রজাঙ্গনা"য় তিনি লিখেছেন—

নাচিছে কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা-রমণ।
চল সখি! ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

চাতকী আমি স্বজনি! শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও-চরণ!

কিম্বা—

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?

কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাকে এ বিরলে, সতি !
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না জানে বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে ?

কিম্বা—

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গো-ধূলি, কোথায় রহিল মাধব ?

কিন্তু আবার এর পরেই "বীরাঙ্গনা-কাব্য" থেকে শোন—

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচ-কুলোদ্ভবা ;
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।

কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুল-রাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল—কুসুম—ফল—পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বারে,—মহোৎসব যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে

রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট ; গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ?

আর বেশি শোনাবার দরকার নেই। একদিকে "ব্রজাঙ্গনা" আর একদিকে "বীরাঙ্গনা"। এ দুয়ের সুরে কোন প্রভেদ অনুভব করতে পারো ? কোন প্রভেদ দেখতে পাও ? এ দুই সুরে ঠিক সেই প্রভেদ, যে প্রভেদ মিথ্যা কথায় ও সত্যের বাণীতে। আসলে মধুসূদন যে ব্রজের গান গেয়েছেন সে গানে সুরও জমে নি আর তালও কেটেছে। তাতে আমাদের "দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর" ফোটে নি। "ব্রজাঙ্গনা-কাব্য" বাস্তবিক পক্ষে ব্রজাঙ্গনাবধ কাব্য হয়ে উঠেছে।

আসলে আমাদের সাহিত্য সৎ হয়ে উঠবে সেইখানে, যেখানে আমরা সত্য। অতীতের বীজ আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেই, আর আজ আমাদের বাহিরে যে আলোক যে বাতাস রয়েছে, সেই আলোক সেই বাতাসে সেই বীজ যে আকারে ফুটে বেরুবে সেইটেই হবে আমাদের আসল সত্য। এই আজকার আলোকের পাত যদি আমরা আমাদের চোখে পড়তে না দিই, আজকার বাতাস যদি আমরা আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতে না দিই তবে আমাদের রক্তে সেই অতীতের বীজ পচে' উঠে আমাদের শরীর মনকেই দূষিত করবে, তাতে করে' সত্যই বল আর সমাজই বল দুয়েরই মরণের পথ ফলাও হ'তে থাকবে। ফলে, আমাদের জাতীয় জীবনের সনাতনত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধত্বই পাকা হয়ে উঠবে, যৌবন

তাকে কোন দিনই আক্রমণ করতে পারবে না। এটা অনেকের পক্ষে আরামের অবস্থা হলেও সকলের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

মানুষ চলতে চলতে তার আপনার পরিচয় লাভ করে। মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার মনের চলার নিরিখ। ওই মনের চলা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোই নেই, কোন শাস্ত্রের পাতেও নেই, কোন অস্ত্রের হাতেও নেই। কেননা মানুষের চলাই হচ্ছে তার প্রথম সত্য। কারণ চলারই অর্থ হচ্ছে জীবনকে পাওয়া। আর এ সত্য মানুষের নিজের গড়া নয়—এ সত্য ভগবানের। এই জন্মে হাজার শাস্ত্রও আজ আমাদের বেঁধে রাখতে পারছে না—লক্ষ্য অস্ত্রও পারবে না।

"অতীত" যতই উৎকৃষ্ট, যতই মহান, যতই যা-কিছু হোক না কেন তার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তা "বর্ত্তমান" নয়। আর "বর্ত্তমানের" একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তা "ভবিষ্যতকে" গড়ে তুলতে পারে। "বর্ত্তমানের" এই সুবিধাকে আঁকড়ে ধরে' যদি আজ আমরা কাজে না লাগাই তবে হয়ত আবার আর একদিন আসবে যখন আবার "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র" এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে আমাদের তর্ক করতে বসে' যেতে হবে। বর্ত্তমান যে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ভবিষ্যতই কে গড়ে' তুলতে পারে এর জন্যে দোষী কাল। কাল জিনিসটার পিছনে ফেলে-আসা জিনিসের মধ্যে কিছুমাত্র মায়া নেই, তার সমস্ত অনুরাগ অনাগত যে তার জন্যে। মানুষের জগতের এই সব নিয়মকে যত দিন না এক নতুন বিশ্বামিত্র এসে উল্‌টে দিতে পারছেন ততদিন আমাদের সাহিত্যেও এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ করতে পারবে না। ব্যষ্টির জীবনে যাই হোক না কেন সমষ্টি জীবনের দিক থেকে

এই কালের প্রভাবকে আমরা জানি বলেই 'কাল-মাহাত্ম্য' 'যুগ-ধর্ম্ম' ইত্যাদি কথাগুলো আমরা মানি।

তুমি হয়ত এখানে বলে' বসবে যে কালকেই কি বড় করে তুলতে হবে? মানুষের will বলে কি কোন পদার্থই নেই, পুরুষকার বলে' কি কোন বস্তুই নেই? কালকে পরম করে' দেখাও যা, দৈবকে চরম করে' মানাও তাই। আর খেতে শুতে উঠতে বসতে যেতে দৈবকে মেনে মেনেই ত এ জাতটা গেছে। জীবনকুমার, তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ভুল পাঠ করেছ। দৈবকে মেনে মেনে এ জাতটা যায় নি, এ জাতটা গিয়েছে পুরুষকারকে না মেনে মেনে। তুমি নিশ্চয় বলবে যে আমি হেঁয়ালি আওড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আর ও-কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে দৈবও সত্য, পুরুষকারও সত্য। কেন না ভগবানও আছেন আর মানুষও আছে। কেবল দৈবকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে জড়, আর খালি পুরুষকারকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে দানব। তাই বড় মঙ্গল সেইখানে যেখানে মানুষ ভগবানের সঙ্গে মিলেছে, মঙ্গলে জয় ও জয়ে মঙ্গল সেইখানে, যেখানে মানুষের পুরুষকারের দ্বারা দৈবই সার্থক হয়ে উঠছে, যেখানে ভগবানের গুপ্ত-বাণীকে মানুষ আপনার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পেরেছে। ওইখানেই মানুষের পরাজয় নেই, তার জয়ে অমঙ্গল নেই। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে সবার পক্ষে ভগবানের বাণী পাওয়া কি সম্ভব? তা সম্ভব নয় বলেই আমাদের সব সময় পুরুষকারকে জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের সে পুরুষকার আমাদের অজ্ঞাতসারেও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হতে একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবপদাবলী আর কোথায় পুরুষকার। হয়ত আরও কিছুক্ষণ কলম চালালে তার মুখে ভাষাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নেহাৎ পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব কি ঐ রকমের একটা কিছু এসে যাবে। কাজেই আজ এই খানেই কসে' দাঁড়ি টানলুম। ইতি

তোমার সেকালের

মৃত্যুঞ্জয়।

মুক্তির ইতিহাস।

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে বলে', হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বল্‌লেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানা ঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আন, আর একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বল্‌লে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে' হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ তলায় এসে ঠেকেচে। থাক্‌বার মধ্যে আছে মরুৎ-ব্যোম, তা' সে যত চাই।"

চতুর্ম্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চার জোড়া গোঁফে তা' দিয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা ভাল, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এস, দেখা যাক্‌!"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ্‌ তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিং, না দিলেন নখ, আর দাঁত যা দিলেন তা'তে চিবোনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগ্‌বার মত হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের সখ

রইল না। এই প্রাণীটি হচ্চে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাইহোক্, সৃষ্টিকর্ত্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুট্‌তে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে, দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি অপ্ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এই রকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড় খুসি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখ্‌তে ভাল বাসেন বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুট্‌তে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোনগতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাটকরার বড় সুবিধে।

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখ্‌লে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারদিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, তার গুহা কেউ কাড়ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলা-মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উস্কে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

অত্যন্ত যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা যখম হল দেয়াল ততটা হল না তবু চূণ বালি খসে' দেয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে লাগ্‌ল।

এতে মানুষের মনে বড় রাগ হল। বল্‌লে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে!"

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠেপড়ে ডাণ্ডা চালালে যে ওর আর লাথি চল্‌ল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বল্‌লে, "আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বল্‌লে, "তাইত একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা! তোমারই ধর্ম্মের মত ঠাণ্ডা!"

একে ত গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়া-পড়শিরাও ভাবে আওয়াজটা ত ঠিক ভক্তি-গদ্‌গদ শোনাচ্চে না।

মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে মুখ ত একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বল্‌লেন, "নিশ্চয় তোমারি কীর্ত্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েচ!"

যম বল্‌লেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করচে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বল্‌লেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বে না।"

মানুষ বল্‌লে, "ছিছি তাতে হিংস্রতার বড় প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েচি। খাসা আস্তাবল!"

ব্রহ্মা জেদ করে বল্‌লেন "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বল্‌লে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে, তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কি, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু তার সামনের দুটো পায়ে কসে রসি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চল্‌তে লাগ্‌ল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখ্‌তে পান, তার হাঁটুর বাধন দেখ্‌তে পান না। তিনি নিজের কীর্ত্তির এই ভাঁড়ের মত চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, "ভুল করেচি ত!"

মানুষ হাত জোড় করে বল্‌লে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কি? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেই খানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন, "যাও, যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে!"

মানুষ বল্‌লে, "আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা!"

ব্রহ্মা বল্‌লেন, "সেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

—— —:০:——

(১)

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে সেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বোধ হয় ত্রিবেদী মহাশয়ের শেষ রচনা। এর সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বেদ ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তাঁর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন। এবং আমরা, তাঁর শ্রোতারা সমস্ত স্থানোচিত গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হয়ে' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সভা ভঙ্গ করি। শুনেছি এই ঘটনাটি আমাদের দেশের দু'একজন যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের ভিতরকে তার বাহিরের দিঘির পার বলে' বিভ্রম জন্মায়, তা বিশ্ব-বিদ্যার আলয়ের উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ উঠেছে। সে সন্দেহের নিরাসন কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করুক আর না-ই করুক এই ব্যাপারটি রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য স্থষ্টির একটি মর্ম্ম কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কোনও দেশেই সুলভ নয়। আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ ও বেদাঙ্গ—এদু'য়ের সঙ্গে কেবল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়, মনের নাড়ীরও নিগূঢ় যোগ

ছিল। কিন্তু এ পাণ্ডিত্য তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে নি। এ বিদ্যাকে তিনি অতি সহজ লঘুভাবেই বহন করতেন। কারণ এই জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ বেদাঙ্গ সবই ছিল তাঁর সতেজ ও সবল মনের খাদ্য-পানীয়, সঞ্চিত ধনের বোঝা নয়। এই জন্য তার লেখার কোনও জায়গায় পাণ্ডিত্যের ছাপ ঠেলে ওঠে নি। তাঁর সজীব ও সরস মন পাণ্ডিত্যকে বাহন মাত্র করে' নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর 'সুন্দর হাস্যে' উদ্ভাসিত, তাঁর চিরনবীন 'সুন্দর হৃদয়ের' 'মাধুর্য্য-ধারায় অভিষিক্ত'। তাঁর বৈজ্ঞানিক-নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান সমস্তই পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে' উঠেছে।

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ পাঠ্য ছিল জড়-বিজ্ঞান। এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন কোন মহলের দরজা খুলেছে, এবং কোন প্রাসাদে রাজ-কন্যারা জেগে উঠছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘুম ভাঙছে; সেই বিচিত্র কাহিনী যুবক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এ গুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান-কাণ্ড এবং তার আচার্য্যেরা ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কতটা অধিকার করেছিল হেল্‌মহোৎসের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী-প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান চর্চ্চা ও বিজ্ঞান প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে অনন্য

সাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দান করেছে। মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় তাঁকে সমস্ত রকম অনুদরতা ও আতিশয্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছে।

আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইন থেকে আরম্ভ করে' বাইস্‌ম্যান, ডিভ্রিস্, ও নব-মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবুক মন তাতে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছে। তাঁর সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা এই নবীন জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান পতনের অন্ধকার পথ কতটা আলোকিত হয় তিনি পরম কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে' দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সেতুর মতন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল-কুয়াশাহীন দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের তমসাবৃত মহাদেশের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে, এবং সাহিত্যের অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে।

অদীর্ঘায়ু জীবনের শেষভাগে ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, দার্শনিক-চিন্তা ও সাহিত্যের রস প্রতিভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙলা-সাহিত্যকে এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করে' গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক সম্মিলনীতে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ধারা-বাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর অনেকগুলিই 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল আমাদের নিত্য ঘরকন্নার ব্যবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ, এবং আধ্যাত্ম জ্ঞানের পারমার্থিক জগতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক লোকে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতের যে মূর্ত্তি কল্পনা করে বা করতে বাধ্য হয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই একটু কেটে ছেঁটে, অল্প-বিস্তর মেজে ঘসে' নিজের কাজ আরম্ভ করেন। কেননা সে কাজই হল এই ব্যবহারিক জগতের বস্তু ও ঘটনার, স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পথে চলতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্ত্বের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে তাদের সমাবেশে জগতের যে মূর্ত্তিটি গড়ে' ওঠে সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যবহারিক জগতের মূর্ত্তি নয়। যে মূলের টীকা আরম্ভ হল, টীকা শেষ হলে দেখা গেল সে মূলই নেই। ফলে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক সম্বন্ধটা কি, এবং এই দুই কল্পিত জগতের কোন অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে যেমন কঠিন, তেমনি কৌতূহল-কর। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে পরমার্থিক সত্যের সম্বন্ধ অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতটি মাঝে পড়ে' প্রশ্নটিকে আরও ঘোরাল করে' তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্যা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ হয় সর্ব্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষা এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই কয়টি বাঙলা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্যার অধিক সূক্ষ্ম, অধিক গভীর ও অধিক সরস আলোচনা য়ুরোপেরও কোনও

দেশের ভাষা দেখাতে পারবে কিনা সন্দেহ করা চলে। কেননা আধুনিক জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে যে নিকট পরিচয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চ্চায় যে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্দ্রসুন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে বর্ত্তমান য়ুরোপের সারস্বত-সমাজেও তা সুদুর্লভ। আমাদের দুর্ভাগ্য রামেন্দ্র-সুন্দর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় পান নি। এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটা দেবার মত দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(২)

৺রামেন্দ্রসুন্দরের সব স্মৃতি সভাতেই বক্তারা তাঁর স্বদেশ-প্রীতির কথা তুলেছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান এখন আমাদের মনে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অনুভবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি তার পক্ষেই বেশিক্ষণের জন্য দেশকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এই বেদনার নিত্য অনুভূতি আমাদের স্বদেশ-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। এ ব্যাথা রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কত মর্ম্মান্তিক ছিল, তাঁর লেখার সঙ্গে অল্পমাত্রও যার পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

দেশের যাঁরা কর্ম্মী তাঁদের স্বভাবতই চেষ্টা হবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্ত্তমানকে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া। রামেন্দ্রসুন্দর লোকে যাকে কাজের লোক বলে ঠিক তা ছিলেন না। যে রজোগুণের প্রাচুর্য্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্ম্মকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না তাঁর প্রকৃতিতে সে রজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার

জগৎ ছাড়া কাজের জগতের চলাফেরা তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশপ্রীতি এক জায়গায় তাঁর এই প্রকৃতিকে জয় করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর কাজে তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি এর জন্য অকাতরে নিজের সময় ও স্বাস্থ্য, দান করে' গেছেন। মনে হয় এ না হলে তিনি হয়ত জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে আমাদের আরও অনেক বেশি দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশের যে ভাষা ও সাহিত্যের বিগ্রহকে তিনি বিশেষ ভাবে পূজা করতেন, তার কাজের আহ্বান রামেন্দ্রসুন্দর কোনও মতেই উপেক্ষা করতে পারেন নাই।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা বোধ হয় আধুনিক হিন্দুর স্বদেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। আমাদের দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিন্দু-মাত্রও শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেই। তাঁরা যে কথায় বা বক্তৃতায় এই সভ্যতায় গৌরব করেন না এমন নয়। কিন্তু যদি কোনও আলাদীন একরাত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপকে (প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইংলণ্ডকে কেননা ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায় তাতে তাঁরা হর্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন। এর অবশ্য এক কারণ—রুচির প্রভেদ, মানুষের সকল বিষয়েই যখন রুচির তফাৎ রয়েছে, তখন কেবল সভ্যতার বেলাতেই দেশের সকলের রুচি এক হবে এমন আশা করা চলে না। কিন্তু এর নিঃসন্দেহ প্রধান কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের একান্ত অভাব। যে

একমাত্র সজীব ও সবল সভ্যতাকে আমরা জানি সে হ'ল আধুনিক য়ুরোপের হালের সভ্যতা। এবং সে সভ্যতা যখন বর্ত্তমানে সাংসারিক হিসাবে অতি প্রবল তখন তাতে যে আমাদের মনকে মুগ্ধ এবং বাসনাকে প্রলুব্ধ করবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কেবল হালের য়ুরোপেই একান্ত নিবদ্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল তার আস্বাদ তিনি বিশেষ ভাবেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলিরও তাঁর নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন মানুষের সভ্যতার বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র্য। সেইজন্য চোখের সামনে আছে বলেই বর্ত্তমান তাঁর কাছে অসঙ্গত রকম বড় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ প্রীতিমান ও গভীর শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। অথচ সে প্রীতিতে কোনও মোহ ছিল না, সে শ্রদ্ধায় কোনও গোঁড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা যে বিশাল মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। সেইজন্য ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও তার আদর্শের সঙ্গে স্বষ্টির ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলনা করে' এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিশ্বাসও তাঁর খুব দৃঢ় ছিল যে অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই মাথা হেঁট করে' দাঁড়াতে হবে না। কেন না তিনি সেই ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন যে ভারতবর্ষ বেদ ও উপনিষদ্ সৃষ্টি করেছে, কপিল ও শাক্যমুনিকে জন্ম দিয়েছে, যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার

ঋষি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনও বিদ্যাকেই উপেক্ষা করে নাই ; যে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় দিগ্বিজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করে' প্রব্রজ্যা নিয়েছে। হিন্দুর এই প্রাচীন সভ্যতা রামেন্দ্রসুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল, এবং তিনি তাঁর স্বদেশবাসিকে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার ফল তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বাঙলা অনুবাদ, তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ,' তাঁর বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই কাজেই তাঁর শক্তিকে বিশেষ করে' নিয়োজিত করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঋত বা নিয়মের তিনি উপাসক ছিলেন তাতে ব্যবস্থা অন্যরূপ। রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল মৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর। ভাবহীন ও শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যের হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা কেমন মুর্ত্তি ধারণ করে তা আমরা জানি ; এবং রুদ্ধচক্ষু শ্রদ্ধার কাছে তার কি লাঞ্ছনা তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু ভাবুক ও শ্রদ্ধাশীল চক্ষুষ্মান ও পণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কি মূর্ত্তি বিরাজ করে রামেন্দ্রসুন্দর তার পরিচয় আমাদের দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবনাতেই তার যবনিকা পড়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে তার অপসারণেরও কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

১২ই জুলাই, ১৯১৯

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

ওমর-খৈয়াম।*

ফার্সি আমরা জানি নে, কিন্তু ও-ভাষার বড় বড় কবিদের নাম আমাদের সকলেরই নিকট সুপরিচিত। হাফেজ ও সাদীর নাম ভদ্রসমাজে কে না জানে? ওমর-খৈয়ামের নাম কিন্তু দু'দিন আগে এদেশে কেউ শোনে নি, এমন কি ফার্সি-নবিশেরাও নয়। যদিচ এযুগের সমজদারদের মতে তিনিই হচ্ছেন ইরাণদেশের সব চাইতে বড় কবি।

আজকের দিনে ওমর যে আমাদের একজন অতিপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন, সে ইউরোপের প্রসাদে। ওমর প্রায় হাজার বছর আগে পারস্যদেশের নৈশাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তাঁর কবিত্বের খ্যাতি কালক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্—সাহিত্যসমাজে তাঁর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে এসেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ-কবি ওমরকে আবিষ্কার করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' ইউরোপের চোখের সুমুখে ধরে দেন।

আকাশ-রাজ্যে একটি নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিক-সমাজ যেমন চঞ্চল ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, মনোরাজ্যে এই নব-নক্ষত্রের আবিষ্কারে ইউরোপের কবি-সমাজ তেমনি চঞ্চল ও উৎফুল্ল

* শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ওমর-খৈয়ামের "রুবেইয়াৎ" নামক কবিতা-গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত। সঃ সঃ

হয়ে উঠলেন। ফলে এযুগে ইউরোপের এমন নগর নেই যেখানে এই নব কাব্যরসের ঐকান্তিক চর্চ্চার জন্য একাধিক কাব্যগোষ্ঠী গঠিত হয় নি। এই নব নক্ষত্রের একটি নব উপাসক-সম্প্রদায়ও সে দেশে গড়ে উঠেছিল, শুনতে পাই গত যুদ্ধে সে সম্প্রদায় মারা গেছে। সে যাইহোক, সেকালের এসিয়ার কবিতা একালের ইউরোপের হাতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমরাও তার অপূর্ব্ব রূপ দেখে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

(২)

এ কবিতার জন্ম হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। ওমর-খৈয়াম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত। তিনি সারা জীবন চর্চ্চা করেছিলেন শুধু বিজ্ঞানের, কাব্যের নয়। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তিনি সেকালের সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই জ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে গুটি-কয়েক চতুষ্পদী রচনা করেন, এবং সেই চতুষ্পদীক'টিই তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ। এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবত এক ভর্ত্তৃহরি ছাড়া আর কেউ কখন হন নি। ভর্ত্তৃহরির সঙ্গে ওমরের আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।

ওমরের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জান্‌তে চাই

* * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে?— * *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর-খৈয়াম বলেন—
"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্যমিথ্যা কিছুই নাই"।

ওমর যে সেকালের মুসলমান সমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্ম্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপরপক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনও নূতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

(৩)

এস্থলে কেউ বলতে পারেন যে "Vanity of vanities—all is vanity" এসিয়ার এই প্রাচীন বাণী ত দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের কানে পৌঁচেছিল। বাইবেলের একটা পুরো অধ্যায়ে (Ecclesiastes) ত ঐ কথাটারই বিস্তার করা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে; অতএব ওমরের বাণীর ভিতর কি এমন নূতনত্ব আছে যাতে-করে সে বাণী ইউরোপের মনকে এতটা পেয়ে বসেছে?—

নূতনত্ব এই যে—ওমরের মতে, যে প্রশ্ন মানুষে চিরদিন করে' আসছে, বিশ্ব কোনদিনই তার উত্তর দেয় না, কেননা দিতে পারে না। তাঁর চোখে এই সত্য ধরা পড়েছিল যে, এ বিশ্বের অন্তরে হৃদয় নেই, মন নেই, এ জগৎ অন্ধ নিয়তির অধীন, সুতরাং তার ভিতর-বাহির দুই-ই সমান অর্থহীন, সমান মিছে। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"ঊর্দ্ধে অধে, ভিতর বাহির, দেখ্‌ছ যা সব মিথ্যা ফাঁক,
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী, পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক।"

* * * *

সত্ত্ব ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রিদিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাজকবি ভর্তৃহরির মত জেরুজিলামের রাজকবিরও মুখে, "Vanity of vanities—all is vanity" এ বাক্যের অর্থ "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য"। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইহুদী কবি দুজনেই এই বিশ্বের অন্তরে "এমন একটি সার সত্য, এমন একটি নিত্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন, যেখানে মানুষের মন দাঁড়াবার স্থান পায়, এবং যার সাক্ষাৎকার লাভ করলে মানুষ চিরশান্তি, চির আনন্দ লাভ করে"। ওমার খৈয়ামের মতে, ও হচ্ছে শুধু মানুষের মন-ভোলানো কথা—আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা ব্রহ্মও মিথ্যা। পূর্ব্বোক্ত রাজকবিরা মানুষের চোখের সুমুখে একটি অসীম আশার মূর্ত্তি খাড়া করেছিলেন, ওমর-খৈয়াম করেছেন অনন্ত

নৈরাশ্যের। ওমরের বাণী আমাদের মনকে জাগিয়ে তোলে, কেননা এ যুগে আমরা কেউ জোর করে বলতে পারি নে যে, আমরা সৃষ্টির গোড়ার কথা আর শেষ কথা জানিই জানি।

(৪)

এতক্ষণ ধরে ওমরের দর্শনের পরিচয় দিলুম এই কারণে যে, এই দর্শনের জমির উপরই তাঁর কবিতার ফুল ফুটে উঠেছে। যাঁদের মতে "জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য", তাঁরা আমাদের উপদেশ দেন—

"মায়াময়মিদং অখিলং হিত্বা
প্রবিশাশু ব্রহ্মপদং বিদিত্বা।"

ওমরের মতে কিন্তু "মায়াময়মিদং অখিলং" হচ্ছে একমাত্র সত্য—অবশ্য সার সত্য নয়, অসার সত্য। তিনি তাই উপদেশ দিয়েছেন—

"এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর,
ভোগ-সাগরে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।"

বলা বাহুল্য ওমরের মুখে এ কথা হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। এ জীবনের যখন কোনও অর্থ নেই, তখন যা ইন্দ্রিয়গোচর আর যা অনিত্য তাকেই বুকে টেনে নিয়ে আসা যাক্, তাকেই উপভোগ করা যাক্। ওমরের পূর্ব্বেও অনেকে মানুষকে এই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কথার সঙ্গে ওমরের কথার অনেকটা প্রভেদ আছে। যাঁরা বলতেন "eat, drink and be merry, for to-morrow we die," তাঁরা বিশ্ব-সমস্যার দিকে

একেবারেই পিঠ ফিরিয়েছিলেন। আর প্রাচীন গ্রীসের Epicurean-রা যা-কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর তাকেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিয়ে ইন্দ্রিয়-সুখের চর্চ্চাটা একটি সুকুমার বিদ্যা করে' তুলেছিলেন; এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তাঁরা ইন্দ্রিয় অর্থে বহিরিন্দ্রিয় ও মানসেন্দ্রিয় দুই-ই বুঝতেন।—তাঁরা ছিলেন শান্তিতে, কিন্তু ওমরের হৃদয়মন চির অশান্ত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে ব্যর্থ—এ সত্য ওমর সন্তুষ্টমনে মেনে নিতে পারেন নি, এর বিরুদ্ধে তাঁর সকল মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিরুদ্ধে মানবাত্মার বিদ্রোহ, উপহাস ও বিদ্রূপের আকারে ফুটে বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর সকল হাসিঠাট্টার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন কাতরতা আছে,—এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ওমর-খৈয়ামের কবিতা যে আমাদের এতটা মুগ্ধ করে তার প্রধান কারণ, তিনি দার্শনিক হলেও কবি, এবং চমৎকার কবি। দর্শন তাঁর হাতে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করে নি, ফুলের মত ফুটে উঠেছে। এবং সে ফুল যেমন হাল্‌কা, যেমন ফুরফুরে, তেমনি সুন্দর, তেমনি রঙীণ। এর প্রতিটি হচ্ছে ইরাণদেশের গোলাপ,—এ গোলাপের রঙের সম্বন্ধে ওমর জিজ্ঞাসা করেছেন—

"কার্ দেওয়া সে লাল্‌চে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত-ছাপ"—

এর উত্তর অবশ্য—ওমর! তোমার। অথচ এই রক্তে-নাওয়া গোলাপগুলির মুখে একটি সহাস্য don't-care ভাব আছে। আর তাদের বুকে আছে একাধারে অমৃত ও হলাহলের মিশ্রগন্ধ—এক কথায় মদিরগন্ধ। ওমরের কবিতার রস ফুলের আসব, সে রস পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেশা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের

মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনাচিন্তা আপনা হতে ঝরে পড়ে।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ এই মন-মাতানো কাজ-ভোলানো কবিতাগুলি বাঙলা করে' বাঙালী পাঠক-সমাজের হাতে ধরে দিচ্ছেন; আশা করি সেগুলো সকলের আদরের ও আনন্দের সামগ্রী হবে, কেননা এ অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ওমর-খৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অনুবাদ আমি বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

উপকথা।

——:*:——

(ফরাসী হইতে অনুদিত)

ট্রাম।

একজন মজুর ছিল, খাটতে যার জুড়ি আর কেউ ছিল না। আর তার স্ত্রী ছিল যেমন ভাল, তার ছোট্ট মেয়েটি ছিল তেমনি সুশ্রী। তারা বাস করত একটা মস্ত সহরের একটুখানি জায়গায়।

একবার একটি পরবের দিনে, তারা একটি কবুতর কিনে নিয়ে এল, তার কাবাব করবার জন্যে—এবং সেই সঙ্গে অল্পসল্প ভাল ভাল শাক-সবজিও। সে রবিবারে তাদের ক'জনের আনন্দের আর সীমা ছিল না, এমন কি বাড়ীর বিড়ালটি পর্য্যন্ত আড়চোখে সেই কবুতরের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে বললে যে, "আজ এমন হাড় চুষতে পাব, যার ভিতর রস আছে"!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর বাপ বললে—

—"আজ যা'হোক কিছু পয়সা খরচ করে একটিবার আমরা ট্রামে চড়বই—এবং সহরের শেষ পর্য্যন্ত যাব।"

তারপর তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তারা চিরদিনই দেখে আসছে যে, ভাল ভাল পোষাক-পরা সাহেব মেমরা আঙুল তুলে ইসারা করবামাত্র কণ্ডাক্টর অমনি ঘোড়া রুখে ট্রাম থামায়—তাদের তুলে নেবার জন্য।

সেই বারোমাস খেটে-খাওয়া মজুরটি তার মেয়ের হাত ধরে আর তার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, একটি বড় রাস্তার একধারে গিয়ে দাঁড়ালে।

একটু পরেই তারা দেখতে পেলে যে একটি বার্নিসকরা চক্‌চকে ট্রামগাড়ি তাদের দিকে আসছে, তার ভিতর লোক প্রায় ছিল না বল্‌লেই হয়। তাই দেখে তাদের মহা আহ্লাদ হল—এই ভেবে যে, প্রতিজনে চার চার পয়সা খরচ করে' তারা আজ ট্রামে চড়ে সহর ঘুরে আসবে। অমনি তারা আঙুল তুলে ইসারা করলে—ট্রাম থামাবার জন্যে। কণ্ডাক্টর কিন্তু তাদের কাপড় চোপড় দেখে বুঝতে পারল যে তারা নেহাৎ গরীব, তাই সে অবজ্ঞাভরে তাদের দিকে চেয়ে ট্রাম আর বাঁধ্‌লে না, সটান চলে গেল।

মনীষা।

মানুষের মনের ঐশ্বর্য্য যে সব বইয়ে সঞ্চিত ছিল, সে-সব বই একদিন এক যাদুমন্ত্রে পৃথিবী থেকে উড়ে গেল।

তখন বিদ্বজ্জনের এক মহা সম্মিলনী হল। যাঁরা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁরা সকলে পরামর্শ করে একমত হয়ে বল্‌লেন—

মানব-প্রতিভার যা-কিছু শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি, সে-সকল আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে, আমরাই সে-সবের রক্ষক; অতএব আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সে-গুলো উদ্ধার করে, মার্বেল পাথরে খুদে রাখবো, যাতে করে সেগুলো আর লোপ না পায়:—অবশ্য মানব-প্রতিভার সেই সেই কীর্ত্তি, যার প্রতিটি হচ্ছে গগন-স্পর্শী। এ প্রস্তর-ফলকে জায়গা

হবে শুধু Pascal-এর একটি চিন্তার, Newton-এর একটি তারার, Darwin-এর একটি পতঙ্গের, Galileo-র একটি ধূলিকণার, Tolstoy-এর একটু করুণার, Henri Heine-র একটি শ্লোকের, Shakespeare-এর একটি মর্ম্মোচ্ছ্বাসের, Wagner-এর একটি সুরের।

অতঃপর তাঁরা যখন একাগ্রমনে তাঁদের স্মরণপথে আনবার চেষ্টা করলেন মানুষের মনের কেবল কোন্ কোন্ সৃষ্টি মানবজাতির মাহাত্ম্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তখন তাঁরা সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে, তাঁদের মাথার ভিতর কিছুই নেই,—সব খালি।

পশুর স্বর্গলোক।

একটা বন্ধ-গাড়ীতে যোতা বুড়ো-হাবড়া ঘোড়া, রাতদুপুরে একটি আমোদের আড্ডার দরজার সামনে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছিল আর ঝিমচ্ছিল। ভিতরে মেয়েপুরুষের হাসিতামাসা চল্‌ছিল।

সেই মড়া-খেকো হাড়-বের-করা কৃষ্ণের জীবটি, কতক্ষণে এদের আমোদ শেষ হবে, এবং সে আবার তার ভাঙাচোরা অতি নোংরা আস্তাবলে ঢুকতে পাবে, সেই অপেক্ষায় অতি ম্রিয়মান ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,—কেননা তার পা আর তার শরীরের ভার বইতে পারছিল না।

আজ তার মনে তার ছোটবেলার স্মৃতি সব অস্পষ্ট স্বপ্নের মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। তার মনে পড়ে গেল যে এক সময় সে ছিল লাল রঙের একটি বাচ্ছা, আর তখন সে সবুজ মাঠের উপর ছুটোছুটি

লাফালাফি করে বেড়াত, আর তার মা তার গা খালি ময়লা করে দিত, নিজের গায়ের ঘেঁস দিয়ে।

হঠাৎ সে সেই কাদায়-প্যাচ্‌পেচে রাস্তার উপর সটান শুয়ে পড়ে মরে গেল।

তারপর সে স্বর্গের দুয়োরে গিয়ে হাজির হল। একজন মস্ত পণ্ডিত, কতক্ষণে Saint Peter তাঁর জন্য দুয়োর খুলে দেন, তারি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেই ঘোড়া বেচারাকে বললেন—

"তুই বেটা এখানে কি করতে এসেছিস?—স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার তোর নেই—আছে আমার, কেননা আমি মানবীর গর্ভে জন্মেছি।

উত্তরে সেই হাড়-বের-করা ঘোড়া বেচারা বল্লে—

"আমার মা'র মন বড় নরম ছিল। সে পৃথিবীতে বুড়ী হয়ে যখন মারা গেল, তখন যত জোঁকে মিলে তার রক্ত শুষে খেলে। আমি ভগবানের কাছে শুধু জানতে এসেছি, সে এখানে আছে কি না"

তখন স্বর্গের দরজার দুই-পাল্লা একসঙ্গে খুলে গেল, এবং সুমুখে দেখা গেল রয়েছে পশুর স্বর্গলোক। ঘোড়াটি দেখলে যে তার মা সেখানে আছে। দেখবামাত্র তার মাও তাকে চিনতে পারলে, অমনি চিঁহি রবে দু'জনে দু'জনকে সাদর সম্ভাষণ করলে। তারপর তারা স্বর্গের প্রকাণ্ড ময়দানে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে এই দেখে তার মহা আহ্লাদ হ'ল যে, তার মর্ত্ত্যের কষ্ট-জীবনের পুরোনো সঙ্গীরা সবাই সেখানে মহাসুখে বাস করছে। পৃথিবীতে যারা সহরের সান-বাঁধানো রাস্তায় পাথর-বোঝাই গাড়ী টেনে বেড়াত, আর পা পিছ্‌লে ক্রমান্বয় হাঁটুর উপর বসে পড়ত, তারপর মারের চোটে আধমরা হয়ে গাড়ী ঘাড়ে

করে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ত ; আর যারা চোখে ঠুলি পরে' দিন দশঘণ্টা করে ঘানি ঘোরাত ; আর যে ঘোড়িগুলোর পিঠে চড়ে মানুষে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে যেত, আর ষাঁড়ের শিংয়ের ঘায়ে যাদের চেরাপেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আখ্‌ড়ার তপ্তবালি ঝেঁটিয়ে যেত, আর তাই দেখে ভদ্র-মহিলাদের মুখ আনন্দে রাঙা হয়ে উঠত,—সেই সব ঘোড়া সেখানে ছিল। স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড ময়দানে তারা চির শান্তির মধ্যে মনের সুখে চরে' বেড়াচ্ছিল।

তা ছাড়া সেখানে অপর সকল জন্তুরাও মহা স্ফূর্ত্তিতে ছিল। দিব্যি চিকন বেড়ালগুলো আপনভাবে বিভোর হয়ে খোসমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা ভগবানের কথাও মানছিল না, আর তিনি তাদের এই অবাধ্যতা দেখে শুধু হাসছিলেন। তারা কটায় মিলে এক টুক্‌রো দড়ি নিয়ে এমন ধীরভাবে লঘু পদাঘাতে সেটিকে ঠেলছিল, যেন সে কাজের ভিতর এমন একটা মহা অর্থ আছে, যা তারা খুলে বলতে চায় না।

আর কুকুরগুলো সব বড় ভাল মা। তাদের সময় ত বাচ্ছা-গুলোকে দুধ দিতে দিতেই কেটে যাচ্ছিল। মাছগুলো সব সাঁতরে বেড়াচ্ছিল—ছিপের ভয় ত আর তাদের নেই। পাখীরা যার যেদিকে মন চায় সে সেদিকে উড়ে যাচ্ছিল,—ব্যাধের ভাবনা ত আর তাদের ভাবতে হয় না।

এই স্বর্গলোকে কোন মানুষ ছিল না।

জীবনের পথ।

একজন কবি একদিন কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন একটি গল্প লেখবার জন্য। তাঁর মাথায় সেদিন কোন আইডিয়াই এল না।

সেদিন কিন্তু তাঁর মন খুব প্রফুল্ল ছিল, কেননা জানলার ধারে একরাশ লাল ফুলের উপর সূর্য্যের আলো পড়েছিল, আর সেই খোলা জানলার নীল ফাঁকের ভিতর একটি সোনালি মাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর সমগ্র জীবনের ছবিটে তাঁর চোখের সুমুখে এসে দাঁড়াল। তিনি দেখলেন যে, সে একটি লম্বা সাদা পথ। সে পথ সুরু হয়েছে একটি অন্ধকার বনের গা থেকে, যার পায়ের কাছে জল খল্‌খল্ করে হাসছে; আর শেষ হয়েছে, শান্তিতে ঘেরা একটি ছোট্ট কবরে, যে কবরকে কাঁটাগাছ আর গাছের শিকড়ে চারধার থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে, জড়িয়ে ধরেছে।—

এইখানে তিনি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পেলেন, জন্ম থেকে তাঁর জীবনের ভার যে দেবতার হাতে ছিল। সে দেবতার কাঁধে বোল্‌তার পাখার মত সোণালি রঙের একজোড়া পাখা ছিল। তাঁর মাথার চুল একেবারে সাদা, আর তাঁর মুখটি গ্রীষ্মকালের চৌবাচ্চার জলের মত স্বচ্ছ ও প্রশান্ত।

দেবতা কবিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—

"তুমি যখন ছোট ছিলে, তখনকার কথা কি তোমার মনে পড়ে?— তোমার বাবা নদীতে ছিপে মাছ ধরতে যেতেন, আর তোমার মা ও তুমি তাঁর সঙ্গে যেতে। আর এই জলের ধারে মাঠের উপর কত চমৎকার ফুল ফুটে থাক্‌ত, আর ফড়িঙরা সব লাফিয়ে বেড়াত, দেখে মনে হত যেন এখানে ওখানে ঘাসের ছেঁড়া পাতা সব চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।"

কবি উত্তর করলেন—"হাঁ, পড়ে"।

তারপর দুজনে একসঙ্গে গিয়ে সেই নীল নদীর ধারে দাঁড়ালেন। তার উপরে ছিল নীল আকাশ আর পাড়ে ঘোরনীল বাদামের গাছ।

—"তাকিয়ে দেখো, এই হচ্ছে তোমার শৈশব"।

কবি জলের দিকে চাইলেন আর অমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—"কৈ, আমি ত এ জলের ভিতর আমার বাপ-মার সস্নেহ মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি নে? তাঁরা দুজনে এইখানে বসে থাকতেন। তাঁদের মনে কোনও পাপ ছিল না, ছিল শুধু শান্তি আর সুখ। আমার পরনের ধোপ কাপড় আমি কেবলি ময়লা করতুম, আর আমার মা বারবার তাঁর রুমাল দিয়ে তা' পরিষ্কার করে দিতেন।

"হে দেব আমাকে বলো, এই জলের উপর আমার বাপ-মার মুখের যে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ত, সে প্রতিবিম্ব কোথায় গেল? আমি তা দেখতে পাচ্ছি নে, মোটেই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।"

এই সময় খাসা এক থোকা বাদাম পাড়ের একটা গাছ থেকে খসে' জলের উপরে পড়ে' স্রোতের মুখে ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

দেবতা তখন বল্‌লেন—

—"এই জলের উপরে-পড়া তোমার বাপ-মার মুখের ছবি, ঐ সুন্দর ফলগুলোর মতই স্রোতের মুখে ভেসে চলে গিয়েছে। কেননা সবই স্রোতে ভেসে চলে যায়, যার কায়া আছে তাও, আর যা ছায়ামাত্র তাও। তোমার বাপ-মার ছবি জলে মিশেছে, যা অবশিষ্ট আছে তার নাম স্মৃতি। তুমি ততটা অধীর হয়ো না, যাদের তুমি এত ভালবাস্‌তে তাদের স্মরণ-চিহ্ন সব আবার দেখতে পাবে।"

একটা নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে শরবনের উপর বস্‌ল। অমনি কবি বলে উঠ্‌লেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এই পাখা দুটির উপরে আমার মায়ের চোখের রঙ চারিয়ে গিয়েছে"।

দেবতা বল্‌লেন—"ঠিক কথা, আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখো।"

একটি গাছের আগ্‌ডালে একটি সাদা ঘুঘু তার বাসা বেঁধেছিল, সেখান থেকে সাদা রঙের একটি হালকা পালক উড়ে এসে জলের উপর পড়ে' পাক খেতে লাগ্‌ল।

কবি অমনি বলে উঠ্‌লেন—

—"এই পালকটির গায়ের এই শুভ্রতা, একি আমার মা'র অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা নয়?"

দেবতা বললেন—"ঠিক বলেছ।"

তারপর একটু হাওয়া উঠ্‌ল, তার স্পর্শে জলের গায়ে কাঁটা দিলে, পাতার মুখে মর্ম্মর-ধ্বনি ফুট্‌ল।

কবি অমনি জিজ্ঞাসা করলেন—

—"এই যে মধুর ও গম্ভীর শব্দ আমার কানে আসছে, এ কি আমার বাবার কণ্ঠস্বর নয়?"

দেবতা উত্তর করলেন—"ঠিক বলেছ"।

* * * *

বেলা দুপুর হলো। নদীর একধারে কতকগুলো সরল গাছ ধীরে ধীরে হেল্‌ছিল আর দুল্‌ছিল। তাদের মধ্যে যেটি মাঠের একটেরে একা দাঁড়িয়েছিল, সেটিকে দূর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে যুবতীর মত দেখাচ্ছিল। তখন আকাশের আলো এমন সুন্দর হয়ে উঠেছিল

যে, মনে হচ্ছিল সে আকাশ যেন যুবতীর গণ্ডস্থলের রঙে রাঙানো হয়েছে।

তখন জীবনে সবপ্রথম যে তরুণীকে তিনি ভালবাসেন তার কথা কবির মনে পড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বুকটি ব্যথায় ভরে' উঠ্‌ল।

দেবতা বল্‌লেন—

—"তোমার ঐ ভালবাসা ছিল এত নিরাবিল এবং এতে তুমি এত দুঃখ পেয়েছ যে, এর জন্য আমি তোমার উপর রাগ করি নি।"—

তাঁরা দু'জনে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হতে লাগলেন, ক্রমে বেলা পড়ে এল; আকাশের আলো এত নরম, এত কোমল হয়ে এল যে, মনে হল সে আলো যেন ছায়া হয়ে উঠেছে। কবির কাতরতা দেখে দেবতা ঈষৎ হাস্য করলেন, রুগ্ন মাতার মুখের হাসির মতই তা সকাতর ও করুণ।

একটু পরে চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভিতর তারাগুলো সব ফুটে উঠ্‌ল। আকাশ তখন সেই মৃত্যুশয্যার মত দেখাতে লাগল, যার চারদিকে বড় বড় মোমবাতি জ্বলেছে, আর যাকে ঘিরে রয়েছে শুধু শব্দহীন বুক-ভাঙা শোক। আর রাত্রি যেন শোকাভিভূতা বিধবার মত মাটিতে হাঁটুপেতে নতমুখে অবস্থিতি করছে।

দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন—

—"এ দৃশ্য চিনতে পারছ?"

কবি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মাটীতে হাঁটুপেতে নতমুখ হয়ে রইলেন।

অবশেষে তাঁরা যেখানে রাস্তার শেষ, সেই কবরটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, যে কবরটিকে কাঁটা গাছ চারধার থেকে ঘিরে ফেলেছে আর গাছের শিকড় চারধার থেকে জড়িয়ে ধরেছে।

দেবতা তখন বললেন—

"আমি এসেছিলুম তোমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিতে। এই খানে এই জলের ধারে তুমি চিরদিন ঘুমবে। আর এই জল প্রতিদিন তোমার কাছে বয়ে নিয়ে আসবে তোমার সব স্মৃতির ছবি—নীলকণ্ঠ-পাখীর সেই পাখা, যার রঙ তোমার মা'র চোখের মত; ঘুঘুর সেই সাদা পালক, যা তোমার মা'র অন্তঃকরণের মত নির্ম্মল; পাতার সেই মর্ম্মরধ্বনি, যা তোমার বাবার কণ্ঠস্বরের মত মধুর ও গম্ভীর; আর সেই সরল গাছ, যা তোমার প্রিয়ার মত লম্বা ও ছিপ্‌ছিপে।"

সর্ব্বশেষে আস্‌বে তারায় আলো-করা চিররাত্রি।

* * * *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অতীতের বোঝা।

পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইংরাজদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সং সেজে উলঙ্গ শরীরে বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়্‌লে তখনই কোন না কোন বিদ্যা-দিগ্‌গজ চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেন, "ও-সব আর বিলেত থেকে আমদানী কর্‌তে হবে না। ও-সব এবং আরও অনেক রকম জিনিস এ দেশে ছিল। পরের কাছে শোন্‌বার আর আমাদের কিছুই নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক-যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেচে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে। তাই বলি আমাদের নূতন কিছু কর্‌তে হবে না, পুরোণো জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার কর্‌লেই সব চুকে যাবে।" বক্তৃতার সাথে কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিস্‌মিস্‌ মিশিয়ে পণ্ডিত ম'শায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোতা সাদা-সিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ান, হাত পা নাড়া এবং মুখ ভেংচানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাক্‌লে পণ্ডিতপ্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আত্ম-তুষ্টি

কখনই দেখাতে পার্‌তেন না। শ্রোতার অত-শত ভাব্‌বার সময় নেই, পড়্‌বারও সময় নেই, আর আলোচনা কর্‌বার সময় তো নেই-ই। তা ছাড়া বেচারা সংসারি লোক, রুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতার অনুকূল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মত টপ করে সেটাকে গিলে ফেল্‌লে। ফলে পণ্ডিতের মর্য্যাদা বাড়্‌ল, নব্য-তান্ত্রিকদের যথেষ্ট নির্য্যাতন হল, এবং জন-সাধারণের পক্ষে নিরুদ্বেগে নিদ্রা দেবীর সুযোগ ঘটল।

(২)

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির একটা এই মহা দোষ যে, সে বক্তৃতা শোনে না। প্রকৃতি কোন দয়াময় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হয়েচে কি অণু-পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্য বিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটেচে, সে বিষয় দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের মতে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির যদি মাথামুণ্ডু থাকৃত তাহলে আমাদের এত বড় বড় বক্তৃতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এত দুরবস্থা হবে কেন ?

সত্য কথা এই যে, আমাদের এত জ্ঞান গরিমা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা কর্‌তে শিখেচি, বিকট মুখভঙ্গি করে' ইংরাজি শব্দরাজির অপূর্ব্ব সমাবেশ

করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান করতে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখি নি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাকত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীন-কাল হতে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব তথ্য আমাদের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করবার জন্যে বার করবার ভাণ করতাম না এবং সেই-গুলো নিয়েই অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে "তাইরে-নারে-না" গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরূপ ব্যবহার ব্যক্তি-গত কিম্বা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় ত' সে জাতীয় দুর্ব্বলতার ও নিস্তেজতার।

(৬)

শুনতে পাই, উঠ পাখি বিপদ দেখলে বালিতে মুখ লুকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে করে চোখে দেখতে না পেলেই, আপদ দূর হল। আমরাও মনে করি চোখ বুজে থাকলেই আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে বেঁচে যাব। প্রকৃতিকে কিন্তু অত সহজে বোকা বানান যায় না। ভগবানের যাঁতা আস্তে আস্তে ঘোরে বটে কিন্তু শেষে গুঁড়ো করেই ছাড়ে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গা হল? আমার উত্তর এই যে, প্রাচান কালের নজীরকে উপরোক্ত রূপ ভয় ভক্তি বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং তার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আত্ম-সমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, দুই মুহূর্ত্তের

অবস্থা কখনো এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটুচে তার সমষ্টি আজকে কাল হতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন করে' ফেলেচে ; তার দরুণই আজ হচ্চে আজ, আর কাল হচ্চে কাল। কোন পার্থক্য না থাক্‌লে আমরা আজ আর কালের মধ্যে কোন মতেই প্রভেদ করতে পার্‌তাম না। বৈজ্ঞানিকের নজরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা আর এক পলের অবস্থা হতে বিভিন্ন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের কিম্বা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোন সন্দেহই হতে পারে না। এ সব সূক্ষ্ম তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে' বিচার করা যায়, তাহলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, ভারতের দুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীন কালে (যথা—মনুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তখনকার নীতি-প্রবর্ত্তকদের কেবল এক হিন্দু-সমাজের কথা ভাব্‌তে হয়েচে। এখন কিন্তু দেশের অবস্থা একেবারে বদ্‌লে গেচে। এখন এদেশে হিন্দু ছাড়া মুসলমান পার্শী প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা বাস কর্‌চে। বিদেশীরা এখন এদেশের রাজা হয়েচেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন এদেশের লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেচে। এই সব নূতন ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন সমস্যা এসে জুটেচে। এ সব সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাঁহার সমসাময়িক লোকদের ভাব্‌বার সুযোগ হয় নি ; সুতরাং এ সব বিষয় তাঁরা কিছুই লিখে যান নি। এখন হিন্দুদের নিজের বুদ্ধির

সাহায্যেই এ সব সমস্থার মীমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন, তখন ইয়োরোপের democratic হাওয়া এদেশেও আসে নি, এখন কিন্তু এসেচে এবং তেড়েই এসেচে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে তাহলে তার ভারতবর্ষ থেকে লোপ পাবারই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ সকল সত্য হতে কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে, নূতন যুগের নূতন সমস্যার নূতন মীমাংসার দরকার।

(৩)

Experience একটি অমূল্য জিনিস। আমরা শিশু হতে বালককে, বালক হতে যুবককে এবং যুবক হতে বৃদ্ধকে অধিক জ্ঞানী এবং অধিক বিজ্ঞ বলে' মনে করি। এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, বালক অনেক জিনিস দেখেচে যা শিশু দেখে নি, যুবক অনেক জিনিস দেখেচে যা বালক দেখে নি এবং বৃদ্ধ অনেক জিনিস দেখেচে যা যুবক দেখে নি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বেড়ে যায়। এ হিসাবে প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বেশি, অন্তত হওয়া উচিত। বেকন বলেচেন যাদের আমরা প্রাচীন বলি তাঁরা প্রকৃত পক্ষে শিশু ছিলেন। যেটাকে আমরা প্রাচীনকাল বলি সেটাকে পৃথিবীর বাল্যকাল বলা উচিত এবং সেই হিসাবে যাদের আমরা নবীন বলি তাদের প্রবীন বলা উচিত এবং যে যুগকে আমরা নব্য-যুগ বলি সেটাকে প্রাচীন যুগ বলা উচিত। প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের

অন্যূন তিন হাজার বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতা আছে; সুতরাং আমাদের জ্ঞানও তাঁদের অপেক্ষা সেই হিসাবে বেশি হওয়া উচিত। অতীত হচ্চে মানব সভ্যতার শৈশব। শিশু স্নেহের পাত্র, ভক্তির পাত্র নয়। অতীতকে অবশ্য ভালবাসা উচিত, কিন্তু তাই বলে তার কাছে পদানত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৪)

শক্তির চর্চ্চার ফলেই শক্তি বাড়ে। প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী যখন কোন বিশেষ শক্তি বাড়াবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকে, তখন সেই শক্তিও তার আশ্চর্য্য রকমেই বেড়ে যায়। এই স্বাভাবিক নিয়মের বলেই হরিণ দৌড়তে শিখেছে, পাখী উড়্‌তে শিখেচে, আর মানুষ কথা কইতে শিখেচে। পক্ষান্তরে চর্চ্চা চলে' গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত শক্তিও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে যায়, এমন কি শেষে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েও যায়। এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাণী-জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সমুদ্রে অনেক প্রকার জন্তু বাস করে, যাদের চোখ আছে অথচ তারা দেখ্‌তে পায় না। এক সময় তারা স্থলচর জন্তু ছিল এবং স্থলচরের জীবনোপযোগী ইন্দ্রিয় সকল তাদের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তাদের বর্ত্তমান environment-য়ে ঐ সব পূর্ব্বার্জ্জিত শক্তি সমূহের ব্যবহার তাদের জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক হয় না, এর ফল এই হয়েচে যে, তাদের ঐ সকল অনাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয়ে হয়ে শেষে একেবারে বিকল হয়ে গেচে। এখন এ সবের দ্বারা কোন কাজ হয়

না, ও-গুলো যেন প্রাণীর পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস, আমাদের জানাবার জন্য এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যা বলা গেল তা মানসিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও সমান খাটে। মানুষের এই আত্ম-শক্তির চর্চ্চার পক্ষে তার অতীত হচ্চে একটা মস্ত বাধা। অতীতের প্রতি অতিভক্তি আর বর্ত্তমানের প্রতি অতি অভক্তি এদুই-ই হচ্চে একই মনোভাবের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যে-জাতির বর্ত্তমানের উপর কোন বিশ্বাস নেই তার ভবিষ্যতেরও কোনো আশা নেই। আর বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানের উপর বিশ্বাস আর নিজের উপর বিশ্বাস একই বস্তু। আমরাই ত বর্ত্তমান। যে জাতি আমাদের মত অতীতকে আঁকড়ে ধরে' পড়ে' থাকে এবং পৈতৃক প্রথা নামক ঠাকুরের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যে পূজো দেয়, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব সম্যক চর্চ্চার অভাবে নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা অবনতির নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে স্বাভাবিক নিয়মে নামতে থাকে। এই জন্য দেখা যায় উন্নতিশীল জাতিরা প্রাচীন প্রথার কিম্বা প্রাচীন authority-র বিশেষ সম্মান করে না, করলে তাদের উন্নতিশীলতাই চলে যেত। তারা নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করে', নিত্য নতুন নীতির প্রবর্ত্তন করে', নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করে', আর নিত্য নতুন experiment নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে দিন তারা এ সব ছেড়ে পুরাণ প্রথার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয় সেই সেই দিন থেকেই তাদের উন্নতিশীল জীবনের সমাপ্তি হয়।

(৫)

প্রাচীন গ্রীসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত সোলোণকে (Solon) বলেন "তোমাদের গ্রীকদের চরিত্র

বালকের মত। তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।" মিশরী যাকে নিন্দনীয় বলে' বিদ্রূপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তাদের বাল-সুলভ চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যেদিন তাদের এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে দিন তারা জাতীয় কৃতকার্য্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পূর্ব্ব-কীর্ত্তির চর্ব্বিত চর্ব্বনে প্রবৃত্ত হল সেই দিন থেকেই গ্রীসের অধঃপাতের সুরু হল।

যা গ্রীসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষ-পালক বর্ব্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে "আল্লাহো আকবর" রবে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে। মহাপুরুষের দত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্প-নির্ম্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল। আরব সভ্য-জগতে প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নব-জীবন দান করলে। দেশ বিদেশ দমন করে', পাহাড় পর্ব্বত লঙ্ঘন করে', সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে', আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব্ব। আরবের এই উন্নতি পৈত্রিক প্রথার অনুসরণে হয় নি। হজরৎ মোহম্মদের পূর্ব্বকালিন অবস্থাকে তারা "আইয়ামে জাহেলিয়াৎ" (অন্ধকার যুগ) বলত। হজরতের সময় থেকে আরম্ভ করে প্রায় চারশত বৎসর পর্য্যন্ত আরবেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিত্য-নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল এবং নানা দিকে নূতন নূতন Experiment করেছিল। তারপর প্রাচীনতার বাঁধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহার-

জীবী (ফকিহ) এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের (মোহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এই খানথেকেই আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

(৬)

সভ্যতা দেখ্‌তে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায় তার দোষে। আরবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর ন্যায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল। সে স্রোত এখনো থামে নি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মত authority-র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মত অটল ভক্তি ছিল। Aristotle-এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেচে। এখন জীবনের সঙ্গে অতীতের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না; তাঁরা এখন নিত্য নতুন সত্য আবিষ্কার কর্‌চেন, নিত্য নতুন জিনিসের নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে experiment কর্‌চেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধর্‌চেন, এইরূপে তাদের আশা ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্ছে। রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়চে বই কমচে না।

(৭)

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়। ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখনও তাদের মধ্যে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা আসে নি। যৌবন-সুলভ চঞ্চলতার প্রসাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্ত্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রমে তাদেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়্‌ল। ষোড়শোপচারে প্রাচীনতার পূজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজাতি নির্জ্জীবতার একটা মস্ত উদাহরণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের Nation—হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অনুকরণের বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করচে। এর ফল যে বিষময় হচ্চে, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কোনো কারণ নেই। চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন যে, এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে মানুষে, মানুষে পশুতে এবং পশুতে পশুতে জীবন-সংগ্রাম চলেচে। এই জীবন-সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্যেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাড়ে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমারা যে ভাবে চল্‌চি সে ভাবে আর ক'

দিন চল্‌বে ? অতীতের বোঝা, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের শরীরে কখনই জন্মাবে না ? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে' হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু মুসলমান দুজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েচে, দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দ্দশা।

ওয়াজেদ আলি।

নেশার জের।

তার নাম ছিল মিনা।

সে ছিল বিধবা; সে ছিল যুবতী; এবং সে ছিল সুন্দরী। তার গায়ে থাকত লেস বিরহিত সাদা ব্লাউজ ও পরণে থাকত পাড়-বিহীন সাদা রেশমের শাড়ী। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে তার ব্রহ্মচর্য্যের লেশমাত্র ছিল না—অর্থাৎ সে সাবান মাখত, পান খেত এবং বেশ প্রসন্ন মনেই বিকালে ছাদে বেড়াত।

তার উপর সে ছিল বড়লোকের মেয়ে।

অতএব পাশের বাড়ীর মেসের ছেলেরা যে তার বিষয়ে পাঁচরকম ভাবত, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু তাদের, অন্তত তাদের মধ্যে একজনের ভাবনাটা যদি ভাবনাতেই থেকে যেত এবং লোভটা যদি ছাদের উপরে মিনাকে দেখেই চরিতার্থ হত, তা'হলে আর কিছু হোক আর না হোক, আমার এ গল্পটার সৃষ্টি হত না।

চিন্তা এবং কাজ, এ দুটোর মধ্যে যে বেড়াটা আছে, সেটা মেসের এক যুবক হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে দিলে এবং তার ফলে মিনার হাতে একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠিটা পড়ে তার মুখে যে একটা লালিমার আভা দেখা গিছ্‌ল, সেটা রাগে কি অনুরাগে—তা' বলা

বড় কঠিন; কেননা নারীর মনের খবর তাঁরা নিজেরা না দিলে স্বর্গের রিপোর্টারদেরও তা জানবার সম্ভাবনা নেই। এটা শাস্ত্রের বচন, অতএব সত্য।

কিন্তু যখন রোজ একখানা করে চিঠি আসতে লাগল তখন মিনার গণ্ডে লালিমার সঙ্গে ভ্রুযুগলেও কুঞ্চিত-রেখা ফুটে উঠতে লাগল। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার মনে বিরক্তির ভাবটা ঘনীভূত হয়ে আসছিল, কেননা ভ্রুকুটি বিরক্তির লক্ষণ। এটাও অলঙ্কার শাস্ত্রের ন অতএব গ্রাহ্য।

স্ত্রীলোকের সংসার-জ্ঞান, বয়সের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তার উপর মিনা আজন্ম কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজেই বর্দ্ধিত। অতএব তার বাইশ বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে মেসে-পালিত পঁচিশ বছরের পাড়াগেঁয়ে যুবকের চেয়ে বেশি হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি। কল্পনা দেবীর অনুগ্রহটাও ও-পক্ষের চেয়ে এ-পক্ষে একটু বেশি পরিমাণে পড়েছিল। সেইজন্যই মিনার মনে বিরক্তির সঙ্গে ভয়ের মিশ্রন একটুও ছিল না এবং ঠিক সেই কারণেই মেসের যুবকটির অন্তরে ভয়ের ভাব যথেষ্ট থাকলেও মিনার নীরব প্রত্যাখ্যানে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।

এমন সময়ে এলাহাবাদ থেকে বৌদিদি চিঠি লিখলেন, "ঠাকুরঝি, তুমি যে ছোকরাটার কথা লিখেছ, তাকে আর প্রশ্রয় দিওনা। তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। বড় ঠাকুরকে বলে' তার একদিন চাবুকের ব্যবস্থা কোরো।" চিঠিটা পড়ে মিনার মুখে একটুও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল না। সে উত্তরে লিখলে, "তার দরকার হবে না, বৌদি। আমিই তাকে শিক্ষা দেবো।"

(২)

দু'দিন পরে মিনা বৌদিকে পুনরায় চিঠি লিখলে—

—"তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কাল বিকালে সে এসেছিল। দক্ষিণের পড়বার ঘরটাতে তার জন্যে সত্যিকারের জলখাবার সাজিয়ে রেখেছিলুম। সে তো ঘরে ঢুকে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেছ্‌ল—বসবে কি দাঁড়াবে, নমস্কার করবে কি, না করবে—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আমি খাবারের দিকে দেখিয়ে দিতেই সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে ভোজন সুরু করে দিলে। খাবার সময়ে তার হাতটা মুখে তোলবার ভঙ্গী এবং খাওয়ার ফাঁকে আমার দিকে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাইবার ধরণ—এর মধ্যে কোনটা যে বেশি বিশ্রী ঠেকছিল, তা' বলা বড় শক্ত। আমি তাকে একেবারেই "তুমি" বলে সম্বোধন করে বসলুম। এতে চমকে যেওনা। ও-সম্বোধনটা প্রেমাস্পদেরই একচেটে নয়—বাড়ীর সরকার, লোকজন এবং তাদেরই সমপদস্থ বাইরের লোকেরও ও-সম্বোধনটাতে একটা দাবী আছে। সে আমাকে কিন্তু "তুমি" বলতে সাহস করে নি এবং প্রতি কথার গোড়ায় "আজ্ঞে" বলে ভণিতা করেছিল। হ'রে চাকরের চেয়ে সভ্য বটে—যে "এজ্ঞে" বলে কথা আরম্ভ করে। যাই হোক, তার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলুম এবং তাকেও অনেক কথা জানিয়ে দিলুম। তার নাম গোবর্দ্ধন কি জনার্দ্দন, কি ওই রকম একটা কিছু। তবে যে চিঠিতে "দিব্যেন্দুসুন্দর" বলে' সই করা ছিল—তার কারণ আর কিছুই নয়—ক'লকাতার মেয়েরা সে-কেলে নামগুলো পছন্দ করে না বলে'।

আমার সম্বন্ধে তার ইচ্ছাটা ছিল শুভ ;—অর্থাৎ ডাক্তারি কলেজের ছেলে হলেও আমার উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করবার ইচ্ছা তার কোন কালেই ছিল না অথবা আমার গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে ডাক্তারখানা খোলবার মৎলবও তার মনে কখনো ওঠে নি। আমাকে তার বিয়ে করবারই অভিপ্রায় ছিল। ব্যাপারটা একবার কল্পনা কর দিকিন্। একটা এঁদো গলির ভিতর একখানা ভাঙ্গা বাড়ী—তার মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন-নামা স্বামী-দেবতার সঙ্গে আজীবন বাস। হাঁটুর উপর-ওঠা কাপড় পরে' প্রত্যহ তাঁর বাজারে গমন এবং বাজার থেকে ফিরে এসে মুটের সঙ্গে এক পয়সার হিসেব নিয়ে বাকযুদ্ধ!............ তাকে তার সদভিপ্রায়ের জন্য ধন্যবাদ দিলুম। তাকে বললুম বিয়ে হয় কি ক'রে ?—বিধবার বিয়ে হতে গেলেও জাতটা তো ভিন্ন হলে' চলবে না। সে বললে—কেন, আপনারা তো আমাদের পাল্‌টি ঘর। বললুম—তা' হ'তে পারে ; কিন্তু তবুও তো একজাত নয়। কেন যে নয়, সেটা তাকে বোঝাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। অবস্থার তফাৎটাই যে আসল জাতের তফাৎ—অন্তত আমার যে তাই ধারণা—তা' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকটির মস্তিষ্কে শেষ পর্য্যন্ত ঢোকাতে পেরেছিলুম কি না সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। সে তো এক মহা বক্তৃতা জুড়ে দিলে—খুব উচ্ছ্বাসময় এবং খুব সম্ভব আগে থাকতে মুখস্থ করা। তার মোদ্দাখানা এই যে, প্রেমেতে ও-সমস্ত বৈষম্য ঢাকা পড়ে' যায়। এ হচ্ছে আসলে যেটা প্রশ্ন, সেটাকে উত্তর বলে মেনে নেওয়া। তবে এ-ক্ষেত্রে ওটা জ্ঞানের অভাব কি প্রেমের স্বভাব—সেটা বুঝতে পারলুম না। বললুম—কাল্‌চারের বৈষম্যে প্রেম তো জন্মাতেই পারে না—অন্তত জন্মান উচিত

নয়। সে তখন একটু গরম হয়ে' বললে—"আপনারা আমাদের নিতান্তই অসভ্য বাঙাল, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে' মনে করেন—না? আমি বললুম—শুধু যে মনে করি তা' নয়, মুখেও বলি। তবে জ্যান্ত মানুষকে "ভূত" না ব'লে "অদ্ভুত" বলি।" সে তখন মহা রেগে উঠেছে। বললে—"আমায় এ-রকম অপমান করবার মানে কি? আমিও যদি জানিয়ে দি যে আপনি আজ আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছেন, তাহলে আপনার মুখ থাকে কোথায়?" এ-ধরণের লোকেদের ভদ্রতার মুখোসটা কত সহজে খসে' পড়ে দেখছ! তার যা' প্রতীকার আমার হাতে ছিল—সেইটে তাকে জানিয়ে দিয়ে বেশ শান্তভাবেই বললুম—"প্রাণী বিশেষকে মারা বড় শক্ত নয় তবে নিজের হাতে গন্ধটা থেকে যায় এবং ও-জাতের গন্ধের উপর আমার একটা চিরকেলে বিতৃষ্ণা আছে। অতএব—।" আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না রেখেই সে পলায়ন দিলে। ভাগ্যিস জলখাবারটা খেয়ে গিছ্‌ল—তা' নইলে বেচারার কি কষ্টই হত!"

(৩)

সেই দিনেই মেসে ফিরে এসে দিব্যেন্দুসুন্দর ওরফে গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন সকলকে জানিয়ে দিলে যে, সে তার পরদিনই দেশে ফিরে যাবে কারণ এখানে তার "নোনা" লেগেছে। কলকাতার জল খারাপ, হাওয়া খারাপ, ক'লকাতাটা নরকেরই প্রতিরূপ—ইত্যাদি।

পরদিনেই দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে জানালে যে, সে ক'লকাতা একেবারেই ত্যাগ করে এসেছে। এখানে মাইনর ইস্কুলের একটা মাষ্টারি করে খাবে তবু আর ক'লকাতায় ফিরবে না। সেখানে তার

একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি? সে একরকম জোর করেই পালিয়ে এসেছে। ক'লকাতার লোকেরা সব করতে পারে। আর তাদের মেয়েদের তো জান না। তারা সকলেই—ইত্যাদি।"

তার কিছুদিন পরেই ভাজ এসে ননদকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিস ভাই। লোকটার কি আস্পর্দ্ধা!" ননদ আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাসলে, আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল বোধ হয়।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-চর্চ্চা।*

(G. Lanson-র ফরাসী হইতে)।

সেকেলে ভূমিকার সরল পন্থানুসরণ করে' আমি এই বই* "যারা পড়ে"—অর্থাৎ যারা আমাদের ফরাসী লেখকদের লেখা পড়ে, তাদের হাতে দিলুম। অল্পবয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যারা সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে, আমাদের ইস্কুলকলেজের সেই ছাত্রছাত্রীদের, আশা করি, এই বইখানি কাজে লাগবে; বিশেষ করে' এই জন্যই আরও কাজে লাগবে যে, কেবলমাত্র তাদের কাজে লাগবার জন্য, তাদের পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মুখস্থ করবার জন্য, বা তাদের আমোদ দেবার জন্য এ বই লেখা হয় নি। যে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস সকল শিক্ষিত বা শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত, যার পাঠে তাদের বিদ্যানুশীলনকে নিঃস্বার্থতর উদারতর করে' তুলবে, এমন একটি বই আমাদের ছাত্রদের হাতে দেওয়ার চেয়ে কি বেশি মহৎ উপকার আমি তাদের করতে পারি তা' ত জানি নে। পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার সময় তারা যদি ভুলতে পারে যে তারা পরীক্ষার্থী, যদি কেবল সাহিত্য-চর্চ্চার উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-চর্চ্চা করতে পারে, তাহলে তারা পরীক্ষার অতিরিক্ত সাফল্য লাভ করবে।

* ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস।

আমি কি করতে সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার অন্যের হাতে, আমি শুধু কি করতে চেয়েছি, কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে' এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, তারই হিসাব দিতে পারি।

একালে সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা একটা মস্ত ভুল ধারণা অনুসারে করা হয়। ও বস্তুর যেন একটা বাঁধা তালিকা আছে, যেটা যেন-তেন-প্রকারেণ যত শীঘ্র সম্ভব আদ্যোপান্ত চোখ বুলিয়ে সাঙ্গ করে' গলাধঃকরণ করা চাই, যাতে "ফেল মারতে" না হয়; তারপরে জন্মের মত তার সঙ্গে এবং আর আর পড়াশুনার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে শোধবোধ হয়ে' যায়, চিরজীবন আর ভুলেও সেদিকে মন যায় না। এই রকম করে' সব শিখতে এবং সব শেখাতে গিয়ে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞতার ফাঁক না দিলে, ফলে আনুষ্ঠানিক জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু ছাত্রের মনে সাহিত্যের রসবোধ কিছুমাত্র জন্মায় না; সাহিত্য কতকগুলি শুষ্ক তথ্য ও সূত্রের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়, এবং যে সকল রচনার ব্যাখ্যা তা'তে করা হয়, সেগুলির প্রতি শিক্ষিতদের চিত্তে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা জন্মাবার কথা।

এই গুরুম'শায়ী ভ্রান্তিটি আর একটি গভীরতর, ব্যাপকতর ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অতীব সাংঘাতিক কুসংস্কারবশত সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা হয়েছে; সাহিত্যের বিশেষ জ্ঞানেরই একটা বিশেষ মর্য্যাদা দাঁড়িয়ে গেছে; এবং এজন্য স্বয়ং বিজ্ঞান কিংবা বৈজ্ঞানিকরাও দায়ী নন। দুঃখের সহিত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, Renan উক্ত ভুল ধারণার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর "বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ" নামক গ্রন্থে তিনি যে কথাটি লিখেছেন, সেটি তাঁর অল্পবয়সের উৎসাহের নিদর্শন বলে',

বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নূতন ব্রতীর অতিশয়োক্তি বলে' মেনে নেওয়াই ভাল। কথাটি এই,—"মানবের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহিত্য-চর্চ্চার স্থান ভবিষ্যতে অনেকপরিমাণে সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠের দ্বারা অধিকৃত হবে।" এই কথাটি একেবারে সাহিত্য-চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত করে। এতে কেবলমাত্র ইতিহাসের একটি শাখারূপে সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়,—তা নীতির ইতিহাসই হোক্, আর ভাবের ইতিহাসই হোক্।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাতানো যতটা আবশ্যক, তার ইতিহাস এবং সারমর্ম্মের সঙ্গে তার সিকির সিকিও নয়। চারুশিল্পের ইতিহাস পাঠ করলেই যে ছবি এবং মূর্ত্তি চোখ চেয়ে দেখার কাজ হয়ে যায়, এ কথা বোধ হয় কেউ মানবে না। শিল্পেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে বাদ দিলে চলে না; কারণ প্রতি রচয়িতার বিশেষত্ব সেই রচনার মধ্যে নিহিত থাকে, এবং তারই দ্বারা প্রকাশিত হয়। মূল বাক্যাবলীর পাঠে মানুষের মনে ঔৎসুক্য জন্মানো যদি সাহিত্যের ইতিহাসের চরম লক্ষ্য না হয়, তাহলে সে ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে জ্ঞান যেমন নীরস তেমনি অসার। উন্নতির নাম করে' আমাদের ভোগা দিয়ে মধ্যযুগের সেই জ্ঞানের কার্পণ্যের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে-সময় এক অঙ্ক এবং সব বিষয়ের সারতত্ত্ব বই লোকে আর কিছু জানত না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মূল গ্রন্থের অনুশীলন এবং টীকা-ভাষ্যের বর্জ্জন দ্বারাই ইতালীয় নবযুগ শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতীত্ব লাভ করেছিল।

অবশ্য আজকালকার দিনে সাহিত্য-চর্চ্চা করতে গেলে পাণ্ডিত্যের

সহায়তা চাই; আমাদের বিচারবুদ্ধির স্থাপনা ও চালনা করবার জন্য কতকপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট এবং নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর সে-সকল প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগপূর্ব্বক আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাবগুলিকে সুসম্বদ্ধ করা, এবং সাহিত্যের গতি, বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু দুটি জিনিস যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি—সাহিত্যের ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি-বিশেষত্বের বর্ণনা, এবং তার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভূতি। জীবজগতের কোন-একটি বিশেষ শ্রেণীর জ্ঞানলাভ করা তার লক্ষ্য নয়,—তার লক্ষ্য Corneille, তার লক্ষ্য Hugo এবং যে-সব অভিজ্ঞতা ও প্রণালী সকলেরই আয়ত্তাধীন, যার দ্বারা সকলেই সমান ফল পায়, তার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; সিদ্ধ হয় সেই সকল অনুভূতির দ্বারা, যা' মানুষে মানুষে বিভিন্ন, এবং যার ফল আপেক্ষিক ও অনিশ্চিত হওয়া অনিবার্য্য। হিসাবমত ধরতে গেলে, সাহিত্য-জ্ঞানের উদ্দেশ্যই বল, উপায়ই বল, কোনটিই পুরোদস্তুর বৈজ্ঞানিক নয়।

শিল্পে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে অগ্রাহ্য করলে চলে না; কারণ তার শক্তি ও সৌন্দর্য্য অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট, এবং কেউ বলতে পারবেন না যে তিনি নিঃশেষে তার সারসঙ্কলন করেছেন, কিংবা তাকে ধরবার সূত্র বানিয়েছেন।—অর্থাৎ সাহিত্য একমাত্র জ্ঞানের অধিগম্য নয়; সাহিত্য হচ্ছে চর্চ্চা করবার, উপভোগ করবার জিনিস। ও-বস্তু জানতে হয় না, শিখতে হয় না; তা' সাধনা করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়, ভালবাসতে হয়। Descartes সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেইটিই সব চেয়ে সত্য কথা;—ভাল

বই পড়া মানে হচ্ছে সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলা, এবং সে কথোপকথনে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের শ্রেষ্ঠ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

আমি কোন কোন অঙ্ক-শাস্ত্রীকে জানি, যাঁরা সাহিত্য-চর্চ্চায় আমোদ পান, যাঁরা চিত্তবিনোদনের জন্য নাট্যাভিনয় দেখতে যান, বা একটু ফাঁক পেলেই একখানি বই নিয়ে পড়তে বসেন; আবার এমন সাহিত্যিকও জানি, যাঁরা পড়েন না, কিন্তু সাহিত্যের খোসা ছাড়িয়ে নেন, এবং যা-কিছু ছাপানো জিনিস তাঁদের হস্তগত হয়, তাকে খেলার কড়িতে পরিণত করাই কর্ত্তব্য মনে করেন। এ দুই দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সত্যের পথে অধিক অগ্রসর হয়েছেন বলে ত আমার বিশ্বাস। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের আমোদ দেওয়া; কিন্তু সে আমোদ মানসিক, সে আমোদ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির খেলা হতে উৎপন্ন। এবং তার ফলে সে বৃত্তিগুলি অধিকতর সবল সচল ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। অর্থাৎ সাহিত্য অন্তরের উৎকর্ষসাধনের একটি উপায়,—এই হচ্ছে তার আসল কাজ।

সাহিত্যের একটি মহৎ গুণ এই যে, তার চর্চ্চায় মানুষ ভাব-রাজ্যের সুখাস্বাদনে অভ্যস্ত হয়। তার ফলে মানুষ নিজের বুদ্ধির চালনায় একাধারে সুখ, শান্তি ও সঞ্জীবনী-শক্তি লাভ করে। সাহিত্য সাংসারিক কাজকর্ম্মের অবকাশে মানুষের মনোরঞ্জন করে, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বার্থসিদ্ধি ও বৈষয়িক পক্ষপাতিতার উর্দ্ধে মানুষের চিত্তকে উত্তোলন করে;—বিশেষজ্ঞের মনের সংকীর্ণতা দূর করে। একালে উদার সত্যের আলোক বিশেষরূপে আমাদের মনের পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু দর্শনের মূল গ্রন্থের আলোচনা সকলের আয়ত্তাধীন

নয়। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে দর্শনকে ইতর না করে'ও লোকায়ত্ত করে; তাকে মধ্যস্থ করেই আমাদের লোক-সমাজের ভিতর দিয়ে সেই সকল বড় বড় দার্শনিক স্রোত বইতে থাকে, যার দ্বারা সমাজের উন্নতি, অন্তত পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারিত হয়। যে-সকল মানবাত্মা জীবনসংগ্রামে খিন্ন এবং বিষয়ব্যাপারে মগ্ন, সাহিত্যই তাদের অন্তরে সেই সকল উচ্চ সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগরূক রাখে, যেগুলি মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তার অর্থ ও লক্ষ্য নিরূপিত করে। আধুনিক কালে অনেকের মনেই ধর্ম্মভাব বিলুপ্তপ্রায় এবং বিজ্ঞান সুদূরবর্ত্তী; একমাত্র সাহিত্যই তাদের কাছে সেই সকল আবেদননিবেদন পৌঁছে দেয়, যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তারা সঙ্কীর্ণ অহমিকা এবং পাশব পেশাদারীর হাত হতে মুক্তিলাভ করে।

অতএব আমি যতদূর বুঝি, সাহিত্য-চর্চ্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের উৎকর্ষসাধন ও চিত্তবিনোদন। অবশ্য শুধু সৌখীন ও সহজভাবে সাহিত্য পাঠ না করে' যাঁরা শিক্ষা দেবার জন্য পাঠ করতে চান, তাঁদের নিজের জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করতে হবে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক বিদ্যানুশীলন করতে হবে, অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্ট, নির্ভুল, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যয়ন করতে হবে, তা' স্বীকার করি। কিন্তু দুটি জিনিসের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা চাই;—একটি হচ্ছে এই যে, তিনিই সাহিত্যের সদ্‌গুরু, যিনি শিষ্যের মনে প্রধানত সাহিত্যরস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উদ্যোগী হবেন, ও তাদের মনের গতি এমন দিকে ফেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন তারা সাহিত্যকে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন, অপরদিকে কর্ম্ম-জীবনের অবকাশের নর্ম্ম-সচিবস্বরূপ মনে করবে। এই

গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,—কেবল তাদের পরীক্ষার দিনের উপযোগী কাটাছাঁটা উত্তর যোগানো নয়। আর একটি স্মর্ত্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, কেউ তাঁর শিক্ষাকে এইপ্রকারে সফল করে' তুলতে সক্ষম হবেন না, যদি তিনি পণ্ডিত হবার আগে নিজেই সখের সাহিত্যিক না হ'য়ে থাকেন; আজ যে সাহিত্যকে অপরের উন্নতিসাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করছেন, এক সময়ে সেটিকে যদি তিনি নিজের উৎকর্ষসাধনের কাজে না লাগিয়ে থাকেন; সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যা-কিছু অনুসন্ধান, যা-কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন, সে সব যদি তিনি নিজেই আরও ভাল করে' বোঝবার উদ্দেশ্যে, বুঝে আরো বেশি উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে না করে' থাকেন। সুতরাং আমার এই গ্রন্থপাঠ সাহিত্যের মূল রচনাবলী পাঠকে অনাবশ্যক করে তুলবে না, বরঞ্চ সাহিত্যপাঠের নিমিত্তকারণ হবে; কৌতূহল নিবৃত্ত করবে না, বরঞ্চ উদ্রেক করবে,—এই আমার অভিপ্রায়; এবং এই উদ্দেশ্য অঙ্গীকার করেই আমি ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

*   *   *   *   *

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি নতুন কথা বলবার জন্য বা নতুন কিছু আবিষ্কার করবার জন্য ব্যস্ত হই নি; এবং আমার সমসাময়িক অধিকাংশ পাঠকের মনে যে লেখা পড়ে' যে ভাব উদয় হয়ে থাকে, মোটামুটি সেই সকল ধারণাই আমারও মনে জন্মেছে,—এই কথা জানতে পারলে আমি যেমন কৃতার্থ হব, এমন আর কিছুতে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

দ্বু-ইয়ারকি

— —:০:——

শ্রীমতী............দেবী

করকমলেষু—

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আসছি যে খবরের কাগজ তুমি নিত্য পড় আর সেই সঙ্গে নিত্য ভ্রূ-কুঞ্চিত কর। তোমার এহেন অপ্রসন্ন হবার কারণ আমি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ জানি যে কাগজ পড়াটা তুমি একটা দৈনিক কর্ত্তব্যের হিসেবে দেখো। আর দৈনিক কর্ত্তব্য মাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে যাওয়া।

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, তোমার ব্যাজার হবার এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে খবরের কাগজ নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার প্রায় একই ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি যত রোখারুখি কিছুদিন ধরে সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং সে কথাটা হচ্ছে diarchy; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক্ নামও তুমি ইতিপূর্ব্বে শোন নি, যদিচ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তোমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও-কথার অর্থ যে জানন। তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। দুদিন আগে আমরাও কেউ জানতুম না। কথাটা গ্রীক কিন্তু জন্মেছে ভারতবর্ষে। Monologue-এর

সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, মূলত monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ—অর্থাৎ একের সঙ্গে দুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত?

তুমি যদি মনে ভাব বুঝেছ, ত ঠকেছ। ঐ diarchy-র মূল অর্থ ভুল অর্থ। সে অর্থের সঙ্গে তার হাল অর্থের সম্পর্ক এক রকম নেই বললেই হয়। অভিধানের ভিতর থেকে ওর মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওর অর্থের খোঁজ নিতে হবে এক সঙ্গে হিষ্টরি এবং জিওগ্রাফির কাছে। ইউরোপের হিষ্টরি আর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি এই দুয়ের মিলনের ফলে এই diarchy জন্মলাভ করেছে। ঐ কথাটার জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তুমি ওর রূপগুণের পরিচয় পাবে।

(২)

এদেশে কিছুকাল থেকে একটা পলিটিক্যাল-মামলা উঠেছে যার নাম হচ্ছে Democracy *vs.* Bureaucracy, এ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রতিবাদী হচ্ছেন বিদেশী শাসক সম্প্রদায়। উভয় পক্ষের ভিতর অনেক তর্কাতর্কি চটাচটি এমন কি সময়ে সময়ে গুতোগুতি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, শেষটা এ মামলার বর্ত্তমানে যেটা সর্ব্ব-প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তারি নাম হচ্ছে diarchy. বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এখন এই মামলার শুনোনি হচ্ছে, তাতে দু-পক্ষই কসে' সওয়াল-জবাব করছেন। উভয় পক্ষই যে এক কথা একশ-বার বলছেন, তার কারণ আমরা যাকে ওকালতি বলি—সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবার বিদ্যে।

এই মামলাটার আসল হাল বুঝতে হলে' ইউরোপের ইতিহাসের অন্তত মোটামুটি জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। তাই আমি সে ইতিহাসের সারমর্ম্ম যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি যে দু'কথায় তা হবে না।

ইউরোপীয়দের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম কথাও যা আর তার শেষ কথাও তাই, সে কথা হচ্ছে democracy,—ও-শব্দ যে গ্রীক তার থেকেই অনুমান করা যায় যে, ঐ হচ্ছে ইউরোপের সভ্যতার গোড়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুমানের কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা এর প্রমাণ আছে। গ্রীসের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই যে গ্রীসের শাসনতন্ত্র সাধারণত লোকমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে শাসনতন্ত্রের নাম হচ্ছে democracy. Demos শব্দের মানে তুমি অবশ্য জানো, কেননা এদেশে democracy-র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও—দু'-চারজন demagague-এর সঙ্গে ত আছেই। তারপর রোমক সভ্যতাও ঐ democracy-র উপরেই দাঁড়িয়েছিল। রোম যে-দিন থেকে তার republic খুইয়ে সম্রাটের অধীন হন সেইদিন থেকেই তার অধঃ-পতনের সূত্রপাত হয়। রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাস যে, তার Decline এবং fall-এর ইতিহাস—এ সত্যের সাক্ষাৎ ত আমরা Gibbon-এর বইয়ের মলাটেই পাই।

(৩)

"ডিমোক্রাসি" ইউরোপের ইতিহাসের প্রথম কথা আর শেষ কথা হলেও এর মধ্যের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যযুগ একালের

ইউরোপীয়দের মতে উক্ত মহাদেশের সভ্যতার নয়—অসভ্যতার যুগ। রোমক-সাম্রাজ্য যতই জরাজীর্ণ হোক্ না কেন,—আরও বহুকাল টিঁকে থাকত, বাইরে থেকে বর্ব্বররা এসে যদি না তা সমূলে ধ্বংস করত। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ত বড় জিনিস, এই বর্ব্বরেরা কোনরকম সভ্যতারই ধার ধারত না, সুতরাং তারা ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা একঘায়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে এবং রোম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে নিজেরা ভোগ দখল করতে লাগল। ফলে যে নূতন তন্ত্র সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করে বসলে, তার নাম হচ্ছে Feudalism. এই Feudalism ব্যাপারটা যে কি তা একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ-কথা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, এক সময়ে বাঙলা দেশে বারোজন ভুঁইএঞা ছিলেন। এই দ্বাদশ ভূম্যধিকারী যে এ-দেশের শুধু জমিদার ছিলেন তাই নয়—তাঁরা এক একজন ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। আমরা জমিদারদের চিঠি লিখতে হলে আজও শিরোনামায় লিখি "প্রবল প্রতাপেষু"। মধ্যযুগে ইউরোপ ঐ শ্রেণীর এক ডজন নয়, শতশত ভূম্যধিকারীর অধীন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের এ যুগের ইতিহাস হচ্ছে এদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ইতিহাস। এই কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ফলে, ইউরোপে শেষটা কতগুলি বড়বড় রাজ্য দাঁড়িয়ে গেল। সে রাজ্যগুলি আজ প্রায় সবই বজায় আছে।

ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিও যেমন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংলণ্ডের হিষ্টরিও তেমনি বিভিন্ন। প্রথমত দ্বিপা হবার দরুণ ইউরোপের কোন দেশের সঙ্গে তার কস্মিনকালেও সীমানাঘটিত বিবাদ ঘটে নি। আর মধ্যযুগের যত ভূম্যধিকারী-রাজাদের পরস্পরের যত মারামারি

হত তা ঐ চৌহদ্দি নিয়ে। প্রকৃতি যেমন ইংলণ্ডকে একদেশ করে গড়ে দিলেন, William the Conqueror-ও তেমনি একদিনে এ দেশকে এক রাজ্য করে তুল্‌লেন। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুগযুগ ধরে কাটাকাটি করে' ইংলণ্ডের রাজাকে একরাট হতে হয় নি। এই কারণে ইংলণ্ডের ইতিহাসের ধারাও একটু স্বতন্ত্র। রাজায় সামন্তে জমি নিয়ে লড়ালড়ি নয়, রাজায় প্রজায় রাজশক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির ইতিহাসই হচ্ছে ইংলণ্ডের আসল ইতিহাস।

মধ্যযুগের অবসানে যখন আমরা বর্ত্তমান যুগের মুখে এসে পৌঁছই তখন দেখতে পাই যে ইউরোপ কতগুলি ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত, এবং প্রতিদেশের মাথার উপর বসে আছেন এক এক জন সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা,—যিনি হচ্ছেন সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সর্ব্ব রাজশক্তির একমাত্র আধার। এ রাজশক্তি সংযত করবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, কেননা এ শক্তি সেকালের মতে ছিল—ভগবদ্দত্ত, সুতরাং তার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার মানুষের ছিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল জাতিই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিল, এবং সেই ধর্ম্মের প্রসাদে তারা বিশ্বরাজ্যে যে একেশ্বরের সন্ধান পেয়েছিল, প্রতি রাজা নিজ নিজ রাজ্যে তদনুরূপ একেশ্বরের পদ লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁরা প্রতিজন হয়ে উঠলেন, স্বরাজ্যের অদ্বিতীয় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। Monarchy, অবশ্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল, কিন্তু ইউরোপের এই নব monarchy-র তুলনায় সে হচ্ছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তার পিছনে না ছিল এতাদৃশ ধর্ম্মবল, না ছিল এতাদৃশ বাহুবল।

(৪)

যে ডিমোক্রাসি মধ্যযুগে একদম ছাই চাপা পড়ে গিয়েছিল, বর্ত্তমানে তা আবার ইউরোপে সদর্পে জ্বলে উঠেছে। এ যুগের ইউরোপীয়রা এ ছাড়া যে অপর কোনও শাসনতন্ত্র সভ্যজগতে গ্রাহ্য হতে পারে এ কথা মুখে আনলেও কানে তোলে না। এ বিষয়ে পরস্পরে যে মতভেদ আছে সে শুধু তার বাহ্য আকার নিয়ে। শাসন যন্ত্রটা কি ভাবে গড়লে ডিমোক্রাসি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে, এমন কি জাতিতে জাতিতে মতান্তর হয়। এক কথায় ডিমোক্রাসির ধর্ম্ম সবাই মানেন, যা কিছু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে সে শুধু তার Church নিয়ে, সে Church-এর মাথায় জনৈক ধর্ম্মরাজ, কিম্বা পঞ্চায়েৎ থাকা শ্রেয়; এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। এ তর্কের শেষ কস্মিনকালে যে হবে তারও আশা করা যায় না, কেননা মানুষের রুচিও ভিন্ন আর তর্ক করবার প্রবৃত্তিও অদম্য।

সে যাই হোক্ ইউরোপের এই নব-ডিমোক্রাসি ও তার প্রাচীন ডিমোক্রাসি এক বস্তু নয়, এদের পরস্পরের আত্মাও বিভিন্ন;—এ দুয়ের ভিতর যে আশমান জমিন ফারাক্ এমন কথা বললেত অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে সে দেশের সভ্যতা হচ্ছে Antico-modern, অর্থাৎ—ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের পাতা ক'টা প্রক্ষিপ্ত, আর সেই প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে ফেললেই তার অতীত তার বর্ত্তমানের সঙ্গে জুড়ে যায়, আর তখন দেখা যায় যে ইউরোপ আসলে গ্রীকো-রোমান সভ্যতারই জের টেনে আসছে।

এ মতটা অবশ্য সত্য নয়। দু'হাজার পাতার ইতিহাসের মধ্যে থেকে যদি হাজার পাতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে তার যে অঙ্গহানী হয় এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের যোগ আছে শুধু বইয়ের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ সে যোগ হচ্ছে বিদ্যাবুদ্ধির যোগ; কিন্তু তার নাড়ীর যোগ আছে শুধু মধ্যযুগের সঙ্গে।

জের, ইউরোপ আজও মধ্যযুগেরই টানছে। বকেয়ার মায়া কেউ বা বেশি কাটিয়েছে কেউ বা কম, সে দেশে এ যুগে জাতিতে জাতিতে মনের তফাৎ এই মাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষের যে আত্মা গড়ে উঠেছে, সেই আত্মা হচ্ছে এই নব-ডিমোক্রাসির আত্মা। আর ঐ মধ্যযুগে ও-দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেই রাষ্ট্রই এই নব ডিমোক্রাসির দেহ।

এই নব-মানবধর্ম্মের বীজ-মন্ত্র যে liberty, equality এবং fraternity—এ কথা ত এ দেশের স্কুলবয়রাও জানে। Liberty শব্দ যে-অর্থে আমরা বুঝি সে-অর্থে প্রাচীন ইউরোপ বুঝত না, liberty শব্দের এ-কেলে অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সে-কালে State-এর বহির্ভূত ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তারপর দাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সভ্যতার ধর্ম্মই ছিল অধিকারী ভেদ আর এ অধিকারী ভেদ ছিল জাতিভেদেরই একটি অঙ্গ। যারা জাতিতে গ্রীক কিম্বা রোমান নয় তারা সকল রাজনৈতিক অধিকারে সমান বঞ্চিত ছিল। রোম শেষটা অবশ্য—রোমক-সাম্রাজ্যের অধিবাসী মাত্রকেই রোমের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে হয়েছিল তখন যখন সে সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা

উপস্থিত। এবং তার কারণ সে অবস্থায় রোমান নামক একটা বিশেষ জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোম সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করেছিল, তার ফলে সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীরাও রোমানদের গ্রাস করে ফেলে। সুতরাং equality বলতে এ-কালের লোক যা বোঝে সে-কালের লোক তা বুঝত না। এসিয়ার ধর্ম্ম যদি ইউরোপের মনে বসে না যেত তাহলে liberty, equality প্রভৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান ইউরোপ পেত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে হচ্ছে এই যে, ইউরোপ যুগ যুগ ধরে খৃষ্টধর্ম্মের বশীভূত না হলে তার মুখ দিয়ে Fraternity শব্দ কখনই বার হত না। নব-ডিমোক্রাসির মুখে এ কথাগুলি শুধু শাসন-তন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সাধন-মন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্বুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি-জ্ঞানে রূপান্তরিত হল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গরাজ্য জয় করবার দুরাশা ত্যাগ করে, পৃথিবী জয় করতে উদ্যত হল। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যার আসন নবযুগের বিজ্ঞান অধিকার করে বসলে।

(৫)

ডিমোক্রাসির আত্মাকে অব্যাহতি দিয়ে এখন তার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রাচীন ইউরোপের ডিমোক্রাসি সব এক একটি ছোট সহরকে অবলম্বন করে' তার গণ্ডীর মধ্যেই কায়েম ছিল। এবং সে সকল সহরের, আদ্-বাসিন্দারা নিজেদের সব এক বংশের লোক মনে করত।

তারা সকলে পরস্পর যে পরস্পরের, জ্ঞাতি না হোক্ অন্তত যে স্বগোত্র সে বিষয়ে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম কুলাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সহরের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকল নাগরিকদের মতই নেওয়া হত। নাগরিক মাত্রেরই ভোট ছিল, কিন্তু অ-নাগরিকের এ-বিষয়ে কথা কইবার কোন অধিকারই ছিল না। নাগরিকরা মাথা-গুণতিতে অতি স্বল্পসংখ্যক ছিল বলে' সকলে একত্র হয়ে তাদের পুরী-রাজ্যের ছোট বড় রাজকার্য্য সব চালাতে পারত। অর্থাৎ সে-কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম পারিবারিক-পঞ্চায়েৎ।

এ-কালের রাজ্য কিন্তু একটা সহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এক একটা প্রকাণ্ড দেশ জুড়ে' তা বসে আছে। আর এই সব দেশে এক কুলের ত দূরে থাক্, একজাতির লোকও বাস করে না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে এক-দেশীমাত্রেই পলিটিক্যাল হিসাবে একজাতি। এক কথায় এ যুগে স্বদেশীতে আর স্বজাতিতে কোনই তফাৎ নেই। সে-কালের রাজারা ছিলেন নৃপতি আর এ-কালের রাজারা হচ্ছেন ভূপতি। এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। মনে রেখো, মধ্যযুগের সামন্তরাজারা ছিলেন সব ভূম্যধিকারী, সাদা কথায় জমিদার। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই ইউরোপের প্রতি রাজা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূত সমগ্র দেশটাকে নিজের জমিদারী মনে করতেন। এরই ইংরাজি নাম হচ্ছে territorial sovereignty, আর রাজত্বের এই নূতন আইডিয়া থেকে একালের ডিমোক্রাসিতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে প্রজামাত্রকেই ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধি-কারভেদ একালে কে কত খাজনা দেয় তার উপর নির্ভর করে, কে

কোন্ দেবতা মানে তার উপর করে না। এ কালের রাজশক্তি আকাশ থেকে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়েছে। ফলে একালে এত অসংখ্য লোকের ভোট আছে যে, সকলে একত্র হয়ে, দেশের রাজ-কার্য্য চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং একালে দেশের লোক তাদের শুধু জনকতক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। সেই প্রতিনিধি-সভাই রাজকার্য্য চালায়। এরি নাম representative গভর্ণমেণ্ট। ইউরোপের সেকেলে আর একেলে ডিমোক্রাসির প্রভেদটা এত লম্বা করে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য, এই কথাটা পরিষ্কার করা যে নব ডিমোক্রাসির গোড়া-পত্তন যেমন এদেশের অতীতেও হয় নি তেমনি সে দেশের অতীতেও হয় নি। এ-বস্তু আমাদেরও অন্বয়া-গতসম্পত্তি নয়, তাদেরও নয়। প্রাচীন আথেন্স রোমের মত স্বরাট সহর প্রাচীন ভারতবর্ষেও একটি আধটি নয়, একশ' দুশ' ছিল। নব ডিমোক্রাসির সূত্রপাত সব প্রথম ইংলণ্ডেই হয়, একমাত্র ইংরাজ জাতিরই এ বিষয়ে একটা পাঁচ ছশ' বছরের tradition আছে, কিন্তু সে tradition আজ দেড়শ' বছর আগে ইউরোপ মহাদেশের কোন জাতেরই ছিল না। এই কারণে ফরাসী-বিপ্লবের নেতারা যখন Constitution গড়তে বসেন তখন Arthur Young নামক জনৈক ইংরেজ বলেন এ হচ্ছে পাগলামি, কেন না ফরাসী জাতের ভিতর এ বিষয়ে পাঁচশ' বছরের পুরোনো কোনো tradition ছিল না। এর উত্তরে ফরাসীরা যে বলেন তবে কি আমাদের আর পাঁচশ' বছর হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে? Arthur Young-এর সেই পুরোনো কথা আজ সহস্র ইংরাজ-কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের জবাবও ফরাসীদের সেই পুরানো জবাব। খাঁটি ইংরাজের মনোভাব এই

যে পৃথিবীর অপর সকল জাতি যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির হিষ্টরির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ কথা বলাও যা আর এ কথা বলাও তাই যে, পৃথিবীর অপর সকল দেশ যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের দেশের জিওগ্রাফিকেও ইংলণ্ডের জিওগ্রাফির অনুরূপ করতে হবে। ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিই যে ইংলণ্ডের হিষ্টরি গড়েছে এ ত ইংলণ্ডের পণ্ডিতদের মত।

(৬)

এই নব-ডিমোক্রাসির জন্মদাতা যে ফরাসী-বিপ্লব, এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

এস্থলে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে ইংলণ্ডের ইতিহাস এর স্রষ্টা নয় কেন? যে পার্লিয়ামেণ্টরি গভর্ণমেণ্ট ডিমোক্রাসির দেহ তা ত ফরাসী-বিপ্লবের বহুপূর্ব্বে গড়ে' উঠেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডিমোক্রাসির দেহ ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে দেশের লোক তার আত্মার সঠিক সন্ধান পায় নি। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা এ বিষয়ে সব দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে উক্ত দেহের অতিরিক্ত কোনও আত্মা নেই। গভর্ণমেণ্ট ভাবের জিনিস নয় কাজের জিনিস। আর যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে সে ব্যবস্থার সার্থকতা শুধু ইংলণ্ডেই আছে অপর কোথায়ও নেই। এক কথায় লোকায়ত্ত শাসন-প্রণালী ইংরাজ জাতির একায়ত্ত।

অপর পক্ষে ফ্রান্স স্বদেশে ডিমোক্রাসির যন্ত্র গড়বার পূর্ব্বেই তার মন্ত্রের সৃষ্টি করলে, যে-মন্ত্র আজ পৃথিবী শুদ্ধ লোক আওড়াচ্ছে।

ফ্রান্সের কথা এই যে, মানুষ মাত্রেরই কতকগুলো জন্মসুলভ অধিকার আছে এবং সেই সব অধিকার বজায় রাখাই হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। নব-ডিমোক্রাসির মূল সূত্রগুলি এই —

1. Men are born and remain free and equal in their rights.

2. The rights are liberty, ownership of property, security, and resistance to oppression. Liberty consists in being able to do anything which is not injurious to others.

3. The principle of all sovereignty rests in the nation.

4. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to co-operate personally or through their representatives in its formation. The law should be the same for all."

এই কথাগুলি পৃথিবী শুদ্ধ লোকের মনে বসে গেল, বিশেষত তাদের মনে, যারা উক্ত সকল অধিকারে বঞ্চিত। এ সব কথায় বিশ্বমানবের মন যে, এক সঙ্গে সাড়া দিলে ও সায় দিলে, তার কারণ, ফরাসি জাতি এ সব অধিকার শুধু নিজেদের জন্য নয়, জাতি দেশ বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে মানুষ মাত্রেরই জন্য দাবী করেছিল। এক কথায় ফ্রান্স পৃথিবীতে এক নতুন ধর্ম্ম মত প্রচার করলে। এ ধর্ম্মের মুক্তি পারত্রিক নয়, ঐহিক সমগ্র ইউরোপের জনগণ এই মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত এবং সেই সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। অপর

সকল ধর্ম্মের মত এই ধর্ম্মের dogma-গুলির উপরে লজিকের ছুরি অবশ্য চালানো যায়, এবং সে ছুরি চালাতে ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলী, বিশেষত জর্ম্মানরা মোটেই কসুর করেন নি। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছে, তা একত্র করলে বোধ হয় একটা নতুন আলেকজাণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরি তৈরি করা যায়—যা ভস্মসাৎ করলে মানুষের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতের তর্ক পণ্ডিতে করে' চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষে এই ধর্ম্মমত অনুসরণ করে এক নব-সভ্যতা গড়ে চলেছে—যার নাম হচ্ছে ডিমোক্রাসি। লজিকের ছুরি এ dogma-গুলোকে যখম করলেও তার প্রাণবধ করতে পারে নি, তার কারণ এর একটিও axiom নয়; সব postulate. এ যুগের ফ্রান্সের একটি বড় দার্শনিক, কিছুদিন হল আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের অন্তরে একরকম অশরীরি শক্তি আছে, যার নাম idea-force, যার বলে, মানুষে তার সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে। Liberty, equality ও fraternity-র তুল্য প্রবল idea-force যে এ যুগে আর কিছু নেই, তার প্রমাণ গত দেড়শ' বৎসরের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। এই সব আইডিয়া যখন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একজোট হয় তখন তার শক্তি যে কি রকম অদম্য হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ত গত যুদ্ধেই পাওয়া গেছে।

(৭)

অশরীরি আত্মা যতক্ষণ না একটা দেহের ভিতর প্রবেশ করতে পারে ততক্ষণ তার একটা স্থিতভিতও হয় না, আর তা পৃথিবীর কোন কাজেও লাগে না। সুতরাং নব-ডিমোক্রাসির আত্মা ফ্রান্সে

জন্মগ্রহণ করে' ইংলণ্ডের তৈরি দেহকে আশ্রয় করলে। এক কথায় ইংলণ্ডের শাসন-যন্ত্রের অনুকরণে তারা তাদের দেশের শাসনযন্ত্র গড়লে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে, রাজ-বিদ্রোহী ফ্রান্স যে, Constitution তৈরি করলে তার আদর্শ হল ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট। এ নকল করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমত সে সময় লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র এক ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোথায়ও ছিল না। দ্বিতীয়ত—যে সব আইডিয়ার উপর ফ্রান্সে তার নবমানব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করলে সে সব আইডিয়ারও সূত্রপাত হয়েছিল ঐ ইংলণ্ডেই। ইংলণ্ড আগে আইডিয়া গড়ে' তারপর সেই আইডিয়া অনুসারে তার গভর্ণমেণ্ট গড়ে নি। কিন্তু সেই গভর্ণমেণ্টের অন্তরে যে সব আইডিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করছিল, যে সব পলিটিক্যাল-আইডিয়া ইংলণ্ডের মগ্নচৈতন্যের ভিতর লুকিয়ে ছিল, ফ্রান্সের দার্শনিকরা সেইগুলি টেনে বার করে, জাগ্রতচৈতন্যের দেশে তাদের খাড়া করলেন। সত্য কথা বলতে গেলে Hobbes, Lock প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকরাই এ সব আইডিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন, Montesquie, Rousseu—প্রভৃতি সেইগুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলেন এবং তাদের একটা নতুন দিক্ আর নতুন গতি দেন। ইংলণ্ড যা তার খানদানি জিনিস মনে করত, ফ্রান্স তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি বলে প্রচার করলে। এই যা তফাৎ, কিন্তু এ তফাৎ মস্ত তফাৎ। ইংলণ্ডের হাতে যা কর্ম্মমাত্র ছিল, ফ্রান্সের হাতে পড়ে' তা ধর্ম্ম হয়ে উঠল।

(৮)

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, Rights of Man-এর যে চারটি

মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছি, তার প্রথম দুটির বিষয়ের সঙ্গে শেষ দুটির বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম দুটির সার কথা হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট মাত্রেরই পক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য আর শেষ দুটির সার কথা হচ্ছে, সর্ব্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথা, আর একটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের সার্থকতার কথা। যে diarchy-র নাম শুনে শুনে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে তার মানে বুঝতে হলে, গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথাটাই মোটামুটি বুঝতে হবে, কেননা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-কল্পিত Reform Bill-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের শাসন-যন্ত্রটা নতুন করে গড়া। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের কথাটা এখন মুলতুবি রাখা যাক্, কেননা তা হলে Reform *Bill-এর নয় Rowlat Act-এর আলোচনা করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয়। নব ডিমোক্রাসির উক্ত সূত্রগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যে যোগ নেই, তা নয়।* তবে ইউরোপের লোকের বিশ্বাস যে শাসনযন্ত্রটা লোকায়ত্ত না হলে লোক সমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং ডিমোক্রাসির প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ডিমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্টের স্থাপনা করা। এ মতে Reform Bill পাশ হলে আর Rowlat Bill পাস হতে পারে না। সর্ব্বলোকের সম্মতিক্রমে যদি আইন গড়তে হয়, তাহলে সর্ব্বলোকের অসম্মতি-ক্রমে কোনও আইন তৈরি হতে পারে না। আর সামাজিক জীব যাকে স্বাধীনতা বলে, তা একমাত্র আইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের দ্বারাই রক্ষিত, অতএব স্বেচ্ছায় আইন গড়বার অধিকার হচ্ছে সমাজের সব অধিকারের মূল।

(৯)

এই খানে বলে' রাখি যে Representative Government হচ্ছে ডিমোক্রাসির প্রথম কথা, আর responsible Government তার শেষ কথা। এই কথা দু'টোর মোটামুটি অর্থ এখন তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষত তোমাদের পক্ষে, কারণ আসলে ও হচ্ছে সামাজিক ঘরকন্নার কথা। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উদাহরণ নেওয়াই সঙ্গত, কেননা ফ্রান্স তার নব-শাসনতন্ত্র কতকগুলো স্পষ্ট principle-এর উপরে একদিনে খাড়া করেছে; সুতরাং সে শাসনতন্ত্রের মূল উপাদানগুলি ধরা সহজ। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুকাল ধরে ধীরে-সুস্থে হাত-আন্দাজে গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তার প্রজাতন্ত্র একদম নতুন করে গড়েছে, ইংলণ্ড তার সেকেলে রাজতন্ত্র ক্রমান্বয় এখানে ওখানে মেরামত করে' করে' তার হাল শাসনযন্ত্র লাভ করেছে। অবশ্য এই মেরামতের প্রসাদে তার সেকেলে গভর্ণমেণ্টের খোল এবং নইচে দুই-ই বদল হয়ে গেছে।

তা ছাড়া ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টের লিখিত আইন আছে, ইংলণ্ডের নেই। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূল, আইন নয়—আচার; সুতরাং তার ভিতর আগাগোড়া মিল পাবে না। ইংলণ্ডের পলিটিক্যাল ধর্ম্মও হচ্ছে একরকম protestantism—অর্থাৎ মধ্যযুগের রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ করে' সে শক্তিকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে' হরণ করে' অহরণ করে' ইংরাজেরা তাদের Constitutional monarchy দাঁড় করিয়েছে। রাজা কি কি করতে পারবেন না,

সেই বিষয়েই তারা রাজার কাছে সব লেখা পড়া করে নিয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং মানুষের সহজ অধিকার সম্বন্ধে তাদের Constitution নীরব। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নব-ডিমোক্রাসির ভিত্তি, ইংলণ্ডের আইন-কানুনে তার নাম পর্য্যন্ত নেই। অথচ ও-স্বাধীনতা ইংরাজের মত আর কোনও জাতের নেই। রাজশক্তিকে আইনে বেঁধে এ স্বাধীনতা তারা পরোক্ষ ভাবে লাভ করবে।

"No man can be accused, arrested or detained in prison except in cases determined by law, and according to the forms prescribed by law"—

Declaration if Rights of Man-এর এই সূত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন কথা, এর সাক্ষাৎ Magna charta-তেই পাবে। ইংলণ্ড তার সকল মন ব্যক্তিগত সত্বস্বামিত্ব রক্ষার উপরেই নিয়োগ করাতে, সে দেশের Constitution ইংরাজেরা অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবে গড়ে' তুলেছিল। ফলে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট, গড়নে কতকটা English Church-এর অনুরূপ—অর্থাৎ নূতনে পুরাতনে যোড়া-তাড়া দিয়ে তা খাড়া করা হয়েছে। এক কথায় Reason এবং authority,—এই দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুর এক রকম কাজ চালানো-গোচ সমন্বয়ের উপর ইংলণ্ডের মন ও জীবন দুই-ই সমান প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স যখন তার নব Constitution গড়তে বসল, তখন তার চোখের সুমুখে ঐ ইংলণ্ডের Constitution ছাড়া ডিমোক্রাসির আর কোনও জ্যান্ত নমুনা ছিল

না। ফ্রান্স অবশ্য তার নূতন গভর্ণমেণ্ট, একমাত্র Reason-এর উপরেই খাড়া করতে চেয়েছিল, তা সত্ত্বেও যে ইংলণ্ডের মডেল গ্রাহ্য করতে তার আপত্তি হল না, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে জনৈক ফরাসি দার্শনিক, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত reason আবিষ্কার করেছিলেন। Montesquie-র মতে রাজশক্তি সর্ব্বত্র ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই আবির্ভূত হয়। এর একটির কাজ হচ্ছে—বিচার (Judicial), আর দ্বিতীয়টির আইন গড়া (Legislative), আর তৃতীয়টির শাসন সংরক্ষণ (Executive).

Montesquie-এই মত প্রচার করেন যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে বিচারের ক্ষমতা রাজার নিয়োজিত জজের হস্তে ন্যস্ত, আইন গড়বার ক্ষমতা সে দেশে আছে শুধু পার্লিয়ামেণ্ট অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রতিনিধির হাতে, আর শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা চিরদিনই রাজার হাতে রয়ে গিয়েছে। Montesquie-র এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজশক্তির কোন্ অংশ যে কার হাতে ছিল তা বলা অসম্ভব, কেননা এ বিষয়ে তখন কোন একটা লিখিত-পড়িত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় নি। আসল কথা এই যে রাজা ও প্রজার অধিকারের পাকা-পোক্ত সীমানা তখনও ঠিক হয়ে যায় নি, এমন কি আজও হয় নি। এর ভিতর যে-শক্তি যখন প্রবল হ'ত তখনই সে শক্তি তার অধিকারের সীমাংসা বাড়িয়ে নিত। সে যাই হোক, বিদ্রোহী ফ্রান্স Montesquie-র মত গ্রাহ্য করে' নিয়েই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাহার আদ্ Constitution গড়ে। এ তন্ত্রে শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা রাজার হাতেই রয়ে গেল, প্রজার হাতে পড়ল শুধু—আইন তৈরি করবার ক্ষমতা। এই প্রতিনিধি সভা

আসলে ব্যবস্থাপক সভা হলেও, ইংলণ্ডের নজির দৃষ্টে প্রজার উপর টেক্স ধার্য্য করবার এবং বাৎসরিক বজেট পাশ করবার ক্ষমতাও এই সভা আত্মসাৎ করে নিলে। ইংলণ্ডের মতে এ ক্ষমতার অভাবে প্রজার কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমরা মজা করে' টাকাকে রুধির বলি, কিন্তু উপমাটা নেহাৎ বাজে নয়। প্রজার হাতে টাকার থলি এসে পড়ায় রাজত্বের রক্ত-চলাচল বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়। এই নমুনার গভর্ণমেণ্টর নামই হচ্ছে representative Government সে দিন পর্য্যন্তও জার্ম্মাণীতে এই ধরণের গভর্ণমেণ্টই ছিল।

(১০)

যে-দেশে representative Government আছে, এখন দেখা যাক্ সে-দেশে রাজার হাতে কি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। শাসন-সংরক্ষণের একাধিক বিভাগ আছে, যথা,—administration, justice, finances, foreign affairs, army, navy, commerce, agriculture, education and public works ইত্যাদি ইত্যাদি। এর প্রতি বিভাগটি এক একটি রাজমন্ত্রীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, এবং সেই রাজমন্ত্রী ক'টিকে নিয়ে যে মন্ত্রী-সমিতি গঠিত হয়, তারই নাম হচ্ছে—Executive Council. বলা বাহুল্য যে, সমগ্র দেশের শাসনভার এই মন্ত্রী-সমিতির হাতেই পুরোপুরি থাকে। ফলে যে দেশে Legislative-শক্তি থাকে প্রজার প্রতিনিধির হাতে আর Executive ক্ষমতা রাজমন্ত্রীর হাতে, সে দেশে এ দুয়ের ভিতর বিরোধ অনিবার্য্য। প্রতিনিধি সভা ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রীদের সকল কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে, আর

রাজমন্ত্রীরা নিত্য প্রতিনিধি সভার দল ভাঙিয়ে সে সভাকে কাহিল করে ফেলবার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সের ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে এই বিরোধের ইতিহাস। সে দেশে যে আশি বৎসরের মধ্যে তিনবার রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়েছে এবং ছ'বার গভর্ণমেণ্টের বদল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ—Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর এই চিরদ্বন্দ্ব। এ বিরোধ দূর হল তখনই, যখন Executive রাজার অধীন না হয়ে Legislative Council-এর অধীন হল। এর চলতি উপায় হচ্ছে প্রতিনিধি সভার সভ্যদের মধ্যে থেকে জনকতককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা, যাদের উক্ত সভার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এবং যাদের বরখাস্ত করবার ক্ষমতা উক্ত সভারে হাতেই থাকবে। Absolute monarchy-র দিনে—যেমন legislative এবং executive, উভয় ক্ষমতাই একমাত্র রাজার হাতে ছিল, পূর্ণাঙ্গ ডিমোক্রাসির দিনে, তেমনি ঐ দুই ক্ষমতাই একমাত্র প্রজার হাতে আসে। এই তন্ত্রের নামই হচ্ছে responsible Government, আর এই হচ্ছে ডিমোক্রাসির শেষ কথা।

(১১)

এতক্ষণ যদি পেরে থাকো ত আর একটু ধৈর্য্য ধরে আমার ব্যাখ্যান শুনলে, আমাদের পলিটিক্যাল মামলার মোদ্দা কথাটা জলের মত বুঝে যাবে। কারণ এ পত্রে আমি ইউরোপের পলিটিক্সের শুধু ক খ-র পরিচয় দিচ্ছি। প্রস্তাবনাটি যত লম্বা হয়েছে, উপসংহার তার সিকি'ও হবে না।

আমাদের গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থা এই। বিচার করবার আইন তৈরি করবার ও শাসন সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা সবই আজ Bureaucracy-র হাতে। এদেশে অবশ্য Legislative Council আছে, এবং তাতে জনকতক প্রজার প্রতিনিধিও আছেন, কিন্তু আসলে এ Legislative Council, গভর্ণমেণ্টের Executive Council-এর সদর মহল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার মুখপাত্রেরা তর্ক করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, কিন্তু কোন আইনের জন্মও দিতে পারে না, কোন আইনের ভুমিষ্ট হওয়াও বন্ধ করতে পারে না, এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদের মুখ আছে কিন্তু হাত নেই। প্রমাণ—দেশী সভ্যদের সে ক্ষমতা থাকলে Rowlat Bill আর Rowlat Act হত না।

এই যুদ্ধের তাড়নায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি, ডিমোক্রাসির মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সুযোগে Congress এবং Moslem League, দু-জনে দু-হাত মিলিয়ে জোড়করে বিলেতের কাছে Representative Government ভিক্ষা করে। আর প্রায় ঠিক সেই সময়ে ইংরাজরাজ ভারতবর্ষকে চোখের এক নতুন কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে-কোণকে দক্ষিণ কোণ আর ইংরাজিতে right angle বলা যেতে পারে, এবং সেই কারণে বিলাতের মন্ত্রীসভা এর উত্তরে বলেন যে—

The policy of His Majesty's Government is. ... the gradual development of self-govering institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of

the British Empire. They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible."

আমরা ভিক্ষে চেয়েছিলুম reprsentative Government বিলেত দিতে চাইলেন, তার উপরে ফাউ হিসেবে কিঞ্চিৎ responsible Government। যত গোল বেধেছে ঐ একটা নিয়ে।

ফলে দাঁড়িছে এই যে, মণ্টেগু এবং চেম্‌সফোর্ড সাহেব উভয়ে মিলে reform bill-এর একটি খসড়া তৈরি করেছেন। যে শাসনযন্ত্র এঁরা গড়তে চাচ্ছেন সে এত জটিল যে, তার কলকব্জা সব তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ যন্ত্রের গড়নটা এত জটিল হবার কারণ, তার break-এর আধিক্য। মোটার গাড়ীতে সবে দুটি ব্রেক আছে, এক হাত-ব্রেক আর এক পা-ব্রেক। কিন্তু এ যন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে ব্রেক আছে। মনে রেখো পার্লেমেণ্টের অভিপ্রায় হচ্ছে gradual development, সুতরাং ডিমোক্রাসির গতি এদেশে যাতে অতি ধীর-ললিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ যন্ত্র গড়া হয়েছে। অনেকের মতে, এ যন্ত্রের গতিরোধ করবার যত রকম কায়দা-কানুন বানানো হয়েছে তাতে ওটা চলবেই না। সে যাই হোক্ এই বিলের সর্ত্ত অনুসারে আমরা যে পুরো Represetative Government পাব না, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

গভর্ণমেণ্ট যেখানে পুরোপুরি representative নয়, সেখানে তা যে কি করে' responsible হতে পারে তা বোঝাই কঠিন। অথচ এ মীমাংসা করাই চাই, নচেৎ পার্লেমেণ্টের কথার খেলাপ হয়। এ মীমাংসা অন্য কোনও জাত করতে পারত কি না সন্দেহ, ইংরাজ-

রাজমন্ত্রীরা যে পারছেন, তার কারণ ইংরাজের রাজনীতি লজিকের তোয়াক্কা রাখে না।

অতঃপর মীমাংসাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, আধা representative Government-এর সঙ্গে আধা responsible Government জুড়ে দেও—এ দুটি যমজ ভ্রাতার মত এক সঙ্গে বাড়বে এবং কালক্রমে দুই যখন সাবালক হবে তখন ভারতবর্ষ Canada প্রভৃতির মত "an integral part of the British Empire" হয়ে উঠবে।

আপাতত কোথায় এবং কতটুকু responsible Government দেবার প্রস্তাব হচ্ছে জানো?—বড়লাটের বড় খাসদরবারে নয়—প্রাদেশিক ছোটলাটদের যত ছোট ছোট খাসদরবারে। এই ছোটলাটদের দরবারে নানারূপ শাসন-বিভাগ আছে, তারই দুটো একটা নিরীহ-বিভাগ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার দুটি একটি সরকারের মনোনীত সভ্যকে দেওয়া হবে। যে-সব বিভাগের কাজ হচ্ছে রাজ্য-শাসন ও সংরক্ষণ করা সে সব বিভাগ নয় কিন্তু যে সব বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের উন্নতি সাধন করা সেই সব বিভাগ, যথা—শিক্ষা-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজ্য-চালনার ভার থাকল রাজপুরুষদের হাতে আর প্রজার উন্নতি করবার ভারপড়ল প্রজার প্রতিনিধির হাতে। ভাষান্তরে প্রজাকে শাসন করবার ক্ষমতা রয়ে গেল তাঁদেরই হাতে, এখন তা আছে যাদের হাতে। এবং প্রজাকে লালন করবার দায় পড়ল তাঁদের ঘাড়ে যাঁরা কস্মিনকালেও কোন রাজকার্য্য চালান নি। এরই নাম diarchy.

অতএব দাঁড়াল এই যে, দেশের ঘরকন্না চালাবার সেই বন্দোবস্ত করা হল যে-বন্দোবস্তে আমাদের পারিবারিক ঘরকন্না চালান হয়। পারিবারিক-গভর্ণমেণ্টের যেমন কতক বিভাগ থাকে

আমাদের হাতে আর কতক বিভাগ তোমাদের হাতে, এই নব-শাসন-তন্ত্রেরও তেমনি বড় বিভাগগুলো থাকবে ওঁনাদের হাতে আর ছোটগুলো আমাদের হাতে।

পৃথিবীতে আর কোথাও যে এ বন্দোবস্ত নেই তার কারণ পৃথিবীর আর কোনও জাতের অবস্থাও আমাদের মত নয়। ভারত-বাসীরা আবহমান কাল দোটানার মধ্যেই পড়ে আছে। এ দেশের যে-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখতে পাবে একদিকে রয়েছে রাজভাষা আর একদিকে রয়েছে লোকভাষা, একদিকে রয়েছে পোষাক অর্থাৎ রাজবেশ আর একদিকে রয়েছে আটপৌরে কাপড় অর্থাৎ লোকবেশ। আর আমরা ভদ্রলোকেরা—এক সঙ্গে এ দুই-ই অঙ্গীকার করে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে আসছি; সুতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রে এই diarchy আমাদের দেশেরই উপযুক্ত হয়েছে।

যদি বলো এ ঘরকন্না চলবে কি রকম? তার উত্তর, সে নির্ভর করবে কাকে রাজন্ত্রী আর কাকে লোকমন্ত্রী করা হয় তার উপর। যদি স্ত্রী পুরুষে মনের মিল থাকে তাহলে চলবে নিখিরখিচে আর তা যদি না থাকে ত দিনরাত খিটিমিটি হবে। এই দু-ইয়ারকি duet ও হতে পারে dud ও হতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ বন্দোবস্তে Bureaucracy-র তরফ থেকে এত আপত্তি উঠছে কেন? আপত্তি উঠছে এই ভয়ে যে, প্রজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রী-সভায় ছুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরুবে। আর এ পক্ষ যে এই বন্দোবস্ত বজায় রাখবার জন্য এতটা জেদ করছেন, তার কারণ অপর পক্ষের যেটা আশঙ্কা এ পক্ষের সেইটেই আশা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৎ - চিদ্‌---আনন্দ।

"আমি আছি!"
— কে শুনাল হেন অমিয় কথা!
আছ তুমি রোমে রোমে,
আছ তুমি ব্যোমে ব্যোমে,
অভয় প্রতিষ্ঠা তব
সর্ব্বকালে সর্ব্বগতা।
তুমি সৎ—মধুময় এ বারতা।

"আমি জ্ঞান!"
—কি সুধা সম্বাদ হল রটনা!
জ্ঞানে কর সুখ সৃষ্টি,
দুঃখে রাখ জ্ঞান দৃষ্টি,
জ্ঞানমনন্তং জ্ঞান
পূর্ব্ব জগত-ঘটনা।
তুমি চিদ্‌—ধন্য হল এ চেতনা।

"আমি রস।"
—কি অমৃত-ভাষে ভরিল এ কান!
ওহে প্রেম, হে আনন্দ!
ঘুচিল সকল দ্বন্দ্ব।
সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম,
অপ্রিয় প্রিয় সমান।
তুমি আনন্দ,—নন্দিত এ-পরাণ!

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।*

কলিকাতা, ৯ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষত ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলার দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি ঝরছে, কোথাও কোনখানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে সুস্থ সবল মানুষের জীবনও দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে স্যাঁত স্যাঁত করছে—আকাশে মেঘের ভার যে কখন হাল্কা হয়ে যাবে, তার কোন সুদূর লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে কত দিনের কত পুরাণ সুখের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু "পুরাণো সে দিনের কথা" ভোলা হয়ে ওঠে না! ছ'বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শীকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া-ব্রতে দীক্ষিত করব, কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বার বার তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দাও। যখন আমার বয়স নাবালকের গণ্ডী পেরোয় নি, সবে সতের কি আঠার, সেই সময়, আমি আমার প্রথম চিতাবাঘ শীকার করি! "চিতা"

* শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত "Sport in Jheel and Jungle" নামক ইংরাজী শীকার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

বলে মনে কোরনা সেটি ছোট্ট—তার রাক্ষসপ্রমাণ শরীর। রামায়ণে দুন্দুভি রাক্ষসের হাড়ের বর্ণনা পড়েছ ত? এই বাঘের চামড়া না নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ, দুন্দুভির হাড়কেও হার মানাত। একরাশ কটাশে রোঁয়া, জন্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে, অতটা সান্নিধ্য কখনই নিরাপদ নয়! কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক ভয়ানক জিনিসও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে, তাক্ ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা,—তারপর তার পিছন পিছন দৌড় দিলাম! আহত বন্য জন্তুকে এমন ভাবে তাড়া করে যাওয়া শীকারের সব আইনের বিরুদ্ধ; বিশেষত এদের চালচলন সবই যখন আমার অজানা। তবে "সব ভাল যার শেষ ভাল",—জয়ী আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে ঘরে বসে বসে সে দিনের পাগলামির কথা নতুন করে মনে পড়ছে। সে দিনের সেই অপূর্ব্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আসে নি, অনেক সাথীও সঙ্গে এনেছে। নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড় বড় জানোয়ার যা-কিছু শীকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে বিপদের খুবই সম্ভাবনা, তবু আমি জোর করে বলতে পারি এই পন্থাই সব চেয়ে নিরাপদ। যদি এদের ধরণ-ধারণ, মেজাজ ও খেয়াল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু খুঁজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিম্বা কষ্ট স্বীকার করে এ বিদ্যা আয়ত্ত না করে থাক, তাহলে সুবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে এ বিদ্যা বই পড়ে পাওয়া যায় না, হাতে-বন্দুকে-বল্লমে শিখতে হয়। তা যদি

শিখতে পার, আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তাহলে দেখবে, মৃগয়া তোমার ব্যসন না হয়ে আনন্দের উপকরণ হবে, শীকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে দুঃখে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কল-কৌশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চ্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে তাতে আর সন্দেহ কি? আজকালকার দিনে ছেলেদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতি হয়। এই কথা মনে করেই, সর্ব্বদা যে-সব জীবজন্তু পাখী দেখতে পাও, তোমার মনে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে আমি বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট্ট অলকা, (যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নেই) অনেকবার হাতির উপর চড়ে স্নাইপ (Snipe) শীকার দেখেছ। যখনি ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পাখীটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলেবয়সের অদম্য উৎসাহে চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ! তোমরা এখন জান, স্নাইপ কত অল্প সময়ের জন্যে বাঙলা দেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, (চোখের পাশে নয়) কান যেখানটিতে থাকে, সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বার বার তার পরখ করে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো মোরগ হচ্ছে আর একমাত্র পাখী, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের

এখনও জানতে বাকী আছে। কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত এদের বেশী পছন্দ। তাই বোধহয় শীগ্‌গিরই পৌঁছবে, তোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে কার ছুঁচের মত লেজ আর কার পাখার মত লেজ, সে প্রভেদ চিনতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে, এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা পড়বে। একটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সে প্রভেদটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু তাও কি কখনো হয়? আর এক কথা, এই পাখীর বরক'নের মধ্যে এমনি ভাব যে, একেবারে মাণিক-জোড়। পুরুষ ধরা পড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়; কাজেই আমি যখন শীকারে যাব, তখন তোমরা দুই ভাই বোনে দুটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়, আর আমার বংশবৃদ্ধির অনুপাতে, তাদের নম্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে আনবার সাধ্য হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে, সেটি আমাদের বাড়ীর ছোট-লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে হবে, তা নাহলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারাণীর দরবারে নালিশ রুজু করবেন, তখন আমার অবস্থা যে কি হবে, তা তোমরা বেশ আন্দাজ করতে পারছ।

স্নাইপ, আর স্নাইপ শীকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমাদের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙিনা হতে, অনেক সন্ধ্যায় তোমরা চিতাবাঘের করাত-চলার মত আওয়াজ শুনেছ—আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয় নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শীকার করতে যাই, তখন আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা

আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিম্বা মজবুত নয়, তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা মোহনলাল হাতিতে চড়ে বাঘের যাওয়া-আসার গলিপথ আবিষ্কার করে ফিরবার আগেই কতবার হয়ত বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখেছ মস্ত একটা চিতাবাঘ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে শীকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অন্য কথা, তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল, আর যম-রাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। জানত যমের বাহন মহিষ, জীয়ন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছ-পা হত না বোধ হয়। যাই হোক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মত লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার সুবিধা হয়ে গেল, তা নাহলে বাহনটি মারা গেলে ভদ্রলোকের চলা-ফেরার মুস্কিল হ'ত!

হরিপুরের চারদিকেই বুনো-শূয়োরের বসতি, পাবনার বুনো-শূয়োর তার বিপুল বপুর জন্যে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে লোভে চারিদিকে ফেরে, আর সুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা করে উদর পূরিয়ে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। বনের ভিতরে যে সব গলিপথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়; তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা বলে দেব, তাতে কাল তোমার জ্ঞানলাভের সুযোগ হতে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্ব্বিঘ্নে তুমি বেশ শীকার করতে

পারবে। আমরা যে শুনতে পাই, শীকার করতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিম্বা ঘায়েল হয়েছে, এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ তো নয়ই! মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিম্বা দুঃসাহসিকতা,—চল্‌তি কথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ারতমি!

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক, তাই সাহস আর বুদ্ধি দু'য়েরি বিশেষ দরকার। তা না হলে, এ খেলায় কোন আমোদই থাকত না!

"No game was ever yet worth a rap
For a rational man to play,
Into which no accident, no mishap
Could possibly find its way."

আমি তোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তা হতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শীকারক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিস তোমার জানা থাকবে, অন্তত থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুসিয়ার শীকারী হতে না পার, তার জন্যে আমি দায়ী হব না। শুধু পশুপাখীর প্রাণহানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শীকারীর পরিচয় নয়। ইংরাজীতে যাকে gentleman বলে, তার ঠিক প্রতিশব্দটি আমাদের বাঙলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না বলতে পারলেও ভাবটি যে কি তা আমরা সবাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ gentleman, সেই ঠিক চৌকোষ শীকারী (sportsman). জীবনটা ত সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ

করে আমাদের ভারতবাসীদের জীবনের আশেপাশে চারিদিকেই কত বাধাবিপত্তি। শীকার করতে গিয়েও দেখবে সেখানে কত ঈর্ষা বিদ্বেষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতাবিরোধী কত হীন ব্যবহার, এক কথায় বলতে গেলে কত অভদ্রতা বিরাজ করছে।

তোমার বয়সী ছেলেদের মধ্যে, বোধহয় তোমার মত মহাভারতের কথা আর কেউ অত ভাল করে জানে না, তাই তুমি জীবনে কি ভাবে চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধাই নেই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই,—সে হচ্ছে "you must play the game"—অর্থাৎ খেলার নিয়ম মেনে খেলা চাই। চেনা ব্রাহ্মণের যেমন পৈতার দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলওয়াড়, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। এই যে জর্ম্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভালো sportsman-রাই সব চেয়ে ভাল যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার অনেক গুণই তারা মৃগয়া-ক্ষেত্রে অর্জ্জন করেছিল। এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দী মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলের হুড়োহুড়িতেও তুমি খুব মজবুত, তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতর্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাখবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অস্থি মজ্জা পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ, তারি সূচনা হয়। ইংরাজের বাচ্চার মধ্যে, এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আর একাগ্রতা আছে, ইহাই পরে তাকে জীবনের ঝড়ঝাপটায় ভরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছে।

এই নৈপুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের প্রাণান্ত পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কত বড় আর কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব ? বৃহত্তর জীবনসংগ্রামেও এই সুকৃতির ফলে, তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যেই আমি তোমাকে আর তোমার ছোট ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে, রাজার আর স্বদেশের সম্মানরক্ষার জন্যে যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সে মহৎ কর্ত্তব্যের আরম্ভ করতে হবে এই খেলার আখড়ায়, শৈশবের এই খেলাঘরে। একদিন আমার জীবনেও এই আকাঙ্খা জাগ্রত ছিল ; বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, কামনা আর কর্ম্মে পরিণত হল না। এখন সে স্বপ্ন আর আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেছ, তাই আশা আবার দেখা দিয়েছে, আমাকে দিয়ে যা হয়নি, তোমরা তা করবে। যতক্ষণ না অনুভব কর যে তোমারি দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তুমি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এই বিশাল রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি ও সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্বদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তোমাদের এই শক্তিতে প্রাণবান আর এই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকাঙ্খা, তাই আমি চাই, সংসারের এই রঙ্গভূমিতে সব রকমে তোমরা হুসিয়ার খেলোয়াড় আর মজবুত পালোয়ান হবে।

এ চিঠি শেষ করবার আগে, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বসুন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সুমুখে

দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না, পড়ে শেষও করা যায় না। রোজই নতুন কথা লিখছেন, একঘেয়ে হয় না বলেই বুঝি এমন ভাল লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘুপ্‌সি হয়ে বসে আপন খেয়ালমত চলেন,—অনেক সময় ভুল করে' চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান, তাই যা সত্যি, তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঠে বনে যাঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তাঁরাই ঠিক খবরটি পান। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখো, আর যা দেখলে তা মনে রেখো। যে সব জন্তু শীকার করা হয়, শুধু তাদের রীত-চরিত নয়, সব জন্তুরি অভ্যাস ব্যবহার ভারী আশ্চর্য্য। পাখীদের সম্বন্ধে একই কথা খাটে।—যখন শীকারের খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, বসে বসে দিন আর কাটে না, তখন যদি চারদিকের অপরাপর জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস তোমার থাকে, তাহলে থিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল তা বুঝতেও পারবে না।

কৃষিকাজ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গল যত কাটা পড়ে যাচ্ছে, শীকারও তেমনি অল্প হয়ে আসছে। যে সব সুবিধা আমরা পেয়েছি, সে সুযোগ তোমরা খুব সম্ভবত পাবে না। খাল বিল শুকিয়ে আসছে—নদীর ধারার সে প্রবল স্রোত আর নেই; এর প্রধান কারণ দেশের বড় বড় বন কাটা পড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয় বেশী জোর করে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, তবে শীকার

যে কমে আসছে, সেটা এমন প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। যে সব দেশে আগে বুনো-মোষ আর হরিণ দলে দলে চরে বেড়াত, এখন আর তাদের সেখানে দেখা যায় না, তারা অন্যত্র চলে গেছে, তাদের খুঁজে খুঁজে বাঘ ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেই জন্যে তোমাকেও হয়ত অনেক দূর দেশে যাত্রা করতে হলে, তবে যাত্রা যে নিষ্ফল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা' চাও তা' পাবার জন্যে বহু ধৈর্য্যের আবশ্যক। জীবজন্তুর জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় করে নিয়ো। খাল, বিল, নদী, নালা, মাঠ, বন, পাহাড় পর্ব্বত মানুষের মন ভোলাবার অনেক ফন্দী জানে, এত আনন্দ দিতে পারে যা জীবনেও ফুরোয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে: এই যে পশু পাখীর গায়ের রং, এ যে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ করবার আগে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়, অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক। শুনতে পাই সূর্য্যের আলো বনের রাশি রাশি পাতার মধ্যে দিয়ে গোল হয়ে আসে, আর যেখানে গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতার মধ্যে অনেক খানি করে ফাঁক সেখানে লম্বা হয়ে পড়ে। এই জন্যে চিতার গায়ে গুল বসান, আর বাঘের গায়ে ডোরা কাটা। একজন থাকেন গভীর বনে, আর একজন বনের ধারে; এমনি পোষাক পরেন বলেই অলক্ষ্যে শীকারের উপর গিয়ে পড়তে পারেন। তৃণজীবি জন্তুদের গায়ের রং তাদের বাসস্থানের সঙ্গে এমনি মিশ খায় এবং পর্দ্দার মত আড়াল করে ঢেকে রাখে যে, শত্রুর চোখ সহসা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এটা কি একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর আর নড়চড় হয় না?—হয় বৈকি, বহুশত্রুবেষ্টিত একই জায়গায় হয়ত ঝলমলে পোষাকপরা অনেক পশুপাখী দেখা যায়—যাদের রং দূর হতেই

চোখে পড়ে। ঋতুপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখীর গায়ের স্বাভাবিক রং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে দেশে শত্রুর সংখ্যা কম, সেখানে তাদের সাজপোষাকের জাঁক-জমক বেড়ে ওঠে। যেমন আজকাল যুদ্ধের দিনে খাকি পরা হয়েছে, শান্তির দিনে সেপাইরা রক্তের মত রাঙা পোষাক পরে' বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের মতলবেও পশুপাখীরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো-বর গোঁপে চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি! আমি তোমাকে গোড়ার কথা দু' একটা বলে দিতে পারি, কিন্তু এগোতে হলে সাবধান হয়ে দেখতে হবে, সতর্ক হয়ে বিচার করা চাই, তবে ত প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারবে।

(২)

কলিকাতা, ১২ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা,

প্রথম চিঠিখানিতে উঁকি দিয়েই বুঝেছ সেখানি তোমার ভাই কল্যাণকে লেখা হয়েছে, এই দেখেই তোমার পুটপুটে রাঙা ঠোঁট দু'খানি একটু ফুলে উঠল, তার অর্থ—এ চিঠি ত দু'জনকেই লেখা যেতে পারত। কল্যাণকে আরণ্যবিদ্যা শেখান আর তোমাকে আমার শীকারের গল্প শোনান, এক ঢিলে দুই পাখীই শীকার করা চলত। কয়েক বৎসর পরেই তোমাকে আমাদের হিন্দুজীবনের যোগ্য গৃহ-লক্ষ্মীর কাজ করতে হবে। এ সাধ তোমার মনে হয়ত একটু আধটু আছে, আর তা ছাড়া, আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের সাহায্যে এই সহজ সরল ইচ্ছাটি বিকৃত না হয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। আজ-কালকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এড়ান বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু সুদূর ইউরোপে তোমার বিদেশিনী বোনেদের জীবন যে বড় সুখে কাটে তা নয়, বরং অনেকেরি জীবন বৃথা কাজে ব্যর্থ হয়ে যায়। অনেককেই আবার নতুন করে শেখাতে হয় যে, স্ত্রী হওয়া, ছেলের মা হওয়াই সচরাচর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ আর পূর্ণতা। আগে যে-পথে শুধু পুরুষরাই যাত্রা করতেন, এখন কালের গতিকে সেখান-কার মেয়েদের জন্যেও সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভাবে, যে সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা এই নতুন পথের যাত্রী হয়েছেন, বিপদের মুখে তাঁরা যে নির্ভিকতা অথচ নারী-সুলভ সৌকুমার্য্য

ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আশ্চর্য্য না হয়ে, তাঁদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু তবুও সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করে' সুখী হলেও, স্ত্রীলোকের সবখানি মন যে এতে ভরে না, সে কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। পুরুষের যদি জীবনসঙ্গীর আবশ্যক থাকে, স্ত্রীলোকের আবশ্যক যে তার চেয়েও অধিক, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের অঙ্গ, সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এককই সমাজের অংশ। আমাদের দেশে ইতিহাসের সুদূর অতীত আবার এতই সুদূর যে, তার অনেকখানি আমাদের চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, পরিবারই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তার ধ্রুব পদ। স্ত্রীলোকেরা শুধু যে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছেন তা নয়, তাঁদেরি যত্নে, তাঁদেরি প্রভাবে, আমরা কখনো বর্ব্বরতার ক্ষেত্রে পা বাড়াতে পারি নি। গৃহখানিকে সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, জীবনের আদর্শ উন্নত পবিত্র রাখা, গৃহ বলতে যে আনন্দধাম আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাকে চিরস্থায়ী করা,—এই কর্ত্তব্যই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্ত্তব্য; এর কাছে বিদেশী অনুকরণে "ফ্যাসানেবল" (fashionable) রমণীর জীবন কত তুচ্ছ, কি পর্য্যন্ত শ্রীহীন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই নতুন জীবনের স্রোত ক্ষীণ-ধারায় এ দেশেও এসে পৌঁছেছে— তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না সত্যি, তবু সাবধান করে দেওয়ায় দোষ কি? কেননা অনেক পরিবারেই বিদেশী আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, অনেকে বিনা বিচারে এই স্রোতে গা ঢেলে দিচ্ছেন। আসল কথায় ফেরা ভাল;—এখন হতে সব চিঠিই তোমার আর কল্যাণের দু'জনের নামেই লেখা হবে। তুমি শীকারের জীবনের

আনন্দ ও বিপদ দুই-ই বোঝ, কেন যে তোমাকে তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তা তোমাকে বলবার বেশী দরকার নেই। তোমার সব চেয়ে অনুরক্ত বৃদ্ধ ভক্তটিও এ দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হবার সম্মতি দেবেন না। যে দিন আলোয় আকাশ উজ্জ্বল, বাগানে কত রং-এরি ফুলের বাহার, নীল আকাশের গায়ে কত টিয়ে চন্দনা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার শীকারের গল্প শুনবার জন্যে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন সে গল্প করতে আমার মনে যে গৌরব অনুভব করি, তা আর কারো কাছে হয়ত ছেলেমানষি বলে বোধ হতে পারে—তা হ'ক। সেই পুরাণ গল্পই আমি আজ আবার তোমাদের নতুন করে বলছি।

(ক্রমশ)

আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা।*

—— –ঃ০ঃ——

এ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধে আজ এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—সে বিষয়ের আমি ব্যবসায়ী নই। ছেলে-পড়ানো এবং স্কুল-চালানো সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমত আমি কখনও স্কুলমাষ্টারি করি নি; তার পর আমি নিজে নিঃসন্তান, সুতরাং ঘরেও কোন ছেলের শিক্ষার ভার আমাকে নিজের হাতে নিতে হয় নি; এবং অবস্থার গুণে পরের ছেলেরও প্রাইভেট-টিউটরি আমাকে কস্মিনকালে করতে হয় নি। এ সব কারণে যদি কেউ বলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কথা কওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা, তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে দর্শকের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে, যা যাঁরা কোনও বিশেষ কর্ম্মে একান্ত ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ সত্যের পরিচয় দাবা খেলায় নিত্যই পাওয়া যায়। পাকা খেলোয়াড়েরাও আনাড়ির উপরচাল অনেক সময়ে গ্রাহ্য করেন। আমি শিক্ষা বিষয়ে পরের ছেলের উপর কখনো কোনও experiment করি নি—কিন্তু বহুকাল থেকে মনোযোগ সহকারে

* বালিগঞ্জ জগবন্ধু বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

সঃ সঃ।

সে experiment-এর পদ্ধতি এবং ফলাফল observe করে আসছি। সেই নির্লিপ্ত observation-এর ফলে আমার মনে শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং কতকটা সেই বিশ্বাসের বলে এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি।

এ সাহসের অন্য কারণও আছে। আমি একটি বিশেষ ছাত্রকে খুব ভালরকমই জানি, এবং সে ছাত্র হচ্ছেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আমি বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছি, কিন্তু অদ্যাবধি বিদ্যার্থীই রয়ে গিয়েছি। এই বিদ্যার্থীটির শিক্ষার ভার আমি পঠদ্দশাতেই অনেকপরিমাণে নিজের হাতে নিই,—তার পর থেকে যিনি ছাত্র তিনিই তার গুরু হয়েছেন। এ সূত্রেও গুরুগিরির সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার কতকটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। তাই বলে অবশ্য এ ভুল আমি কখনও করে বসি নি যে, শিক্ষার যে পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উপযোগী, সেই পদ্ধতি সকলের পক্ষে সমান উপযোগী। জ্ঞানের ক্ষুধাও সকলের মনে সমান নয়, তারপর এ বিষয়ে মানুষের রুচিও বিভিন্ন, অধীত-বিদ্যা জীর্ণ করবার শক্তিও কমবেশ। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে কতদূর সঙ্কীর্ণ ও অশাস্ত্রীয়,—সেই জ্ঞান আমার ছিল বলে, আমি ইউরোপের নব-শিক্ষা-শাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করেছি।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সকল দেশেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানারূপ মতভেদ আছে। মানুষের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে

সকলের পক্ষে একমত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব; তা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষাচার্য্য ও দার্শনিকদের বহুদিনের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষারও একটি Science এবং Art ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এ শাস্ত্রকে Science নামে অভিহিত করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কেননা ছেলেদের মন ও দেহ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এমন কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করেছেন যা, দেশকালনির্ব্বিচারে বালকমাত্রেরই সম্বন্ধে সমান সত্য। এবং এই সত্যের উপরেই শিক্ষার নব-পদ্ধতি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষার এই নব আর্টের সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এ আর্টের জ্ঞান থাকলে শিক্ষকেরা ভুল পথে যান না। অর্থাৎ তাঁরা এর সাহায্যে ছেলেদের সুশিক্ষা দিতে পারুন আর নাই পারুন—কুশিক্ষা দেন না। এও একটা কম লাভের কথা নয়। সুচিকিৎসার গুণে রোগী রক্ষা পাক্ আর না পাক্, কুচিকিৎসার ফলে সে বেচারা মারা যায়। এই শিক্ষা-শাস্ত্রের চর্চ্চা করলে স্কুলমাষ্টারেরা আর হাতুড়ে থাকেন না।

আমি আজকের সভায় এই Science এবং আর্টের আংশিক পরিচয় দেব স্থির করেছিলুম;—এই মনে করে যে, সে পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ব না, অর্থাৎ বিবাদের সৃষ্টি করব না। ইংরাজি ও ফরাসী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি, সে তথ্য বাঙলা করে আপনাদের কাছে নিবেদন করলে, আমি প্রথমত আত্মমত প্রকাশের দোষে দোষী হতুম না, দ্বিতীয়ত Professor James, Professor Findlay, Professor Dewey, Alfred Fouille প্রভৃতি বড় বড় মণীষীদের বাক্যাবলীতে আমার প্রবন্ধ অলঙ্কৃত করতে পারতুম; তাতে আমার প্রবন্ধের যে গৌরব বৃদ্ধি হত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, যে-কোন বিষয়েরই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে, সে আলোচনায় আমাদের রাগদ্বেষ প্রকাশ করবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং তার ফলে শ্রোতাদের অন্তরেও তাদৃশ রাগদ্বেষ আমরা উদ্রেক করি নে। আর ধর্ম্ম এবং পলিটিক্সের মত, শিক্ষাও যে এ যুগে মানুষে মানুষে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ইউরোপের আজ একশ বৎসরের ইতিহাস পাতায় পাতায় এই অপ্রিয় সত্যের পরিচয় দেয়। বিশেষত শিক্ষার সমস্যা যখন হয় ধর্ম্ম নয় পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন সেই সমস্যা নিয়ে লোক-সমাজকে যে কি পরিমাণ উত্তেজিত করা যায়, তার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স জর্ম্মানী বেলজিয়াম ইতালি প্রভৃতি দেশে, মধ্যে মধ্যে গুলিগোলার সাহায্যে সে সমস্যার আশু মীমাংসা করা হয়েছে। আর এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষা জিনিষটে অতি সহজেই ধর্ম্ম পলিটিক্স ইকনমিক্স প্রভৃতি জাতীয় আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাওয়া গেছে। তখন পলিটিক্সকে মুখ্য করেই আমরা শিক্ষা-সমস্যার একটা নূতন মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা গড়তে চেয়েছিলুম একটি নব-নালন্দ— আমাদের হাতে কিন্তু সেটি হয়ে উঠেছে একটি workshop, এ ব্যর্থতার কারণ কি?—এর কারণ, আমরা শিক্ষাকে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-স্বরূপ গণ্য করায়, যথার্থ শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা করতে পারি নি। উত্তেজনার মুখে কোনও কাজ করতে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট

হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়, বিশেষত সেই সকল ব্যাপারে, যে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির সহায়তা দরকার। বলা বাহুল্য লৌকিক আন্দোলনের প্রসাদে লোকের দৃষ্টি একমাত্র বর্ত্তমানের উপরেই আবদ্ধ থাকে, এবং সে অবস্থায় লোকের অন্তরে হৃদয়াবেগ, বিচারবুদ্ধির স্থান অধিকার করে।

(৩)

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-তর্ক আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম—আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে পরোক্ষ-ভাবে সেই তর্কে যোগদান করতেই আহ্বান করেছেন। আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা নিয়ে দেশে একটা মহা আন্দোলন চলেছে। ফলে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবারও উপক্রম হয়েছে। এ আন্দোলনে লিপ্ত হতে হলে, এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, নচেৎ কোন পক্ষই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, দু'পক্ষই সমান নারাজ হবেন। তার ফলে কোন পক্ষই আমার কথার কিছুমাত্র দাম দিতে রাজি হবেন না। অথচ এ ক্ষেত্রে কোন একটা দিক নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের খবর জানি নে,—না তার আয়ব্যয়ের হিসাব, না তার অধ্যাপক-মণ্ডলীর গুণাগুণ। বিশ্বসরস্বতীর মন্দিরে তাঁর পূজো অথবা শ্রাদ্ধে দেশের টাকা পণ্ডিতবিদায় কিম্বা কাঙালীবিদায়ে বরবাদ হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে জজ হয়ে বসবার পক্ষে আমার একটু বিশেষ বাধা আছে। আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঠিকে অধ্যাপক। এ অবস্থায় আমার রায়ের নিরপেক্ষতায়

কেউ বিশ্বাস করবেন না। সে রায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটুও স্বপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি ইউনিভারসিটির নুন খাই বলে তার গুণ গাচ্ছি; আর সে রায় যদি উক্ত বিদ্যালয়ের একটুও বিপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি নিমক-হারাম। এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে না-ছুঁয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে দু'-চারটি সাধারণ কথা বলতে চাই।

এ কালে একটি ইউনিভারসিটি চালানো বহু ব্যয়সাধ্য—এবং ইউরোপ আমেরিকার সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে দিনের পর দিন সে ব্যয় বেড়েই যাবে। এক উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ করা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে ব্যয়ভার লাঘব করার উপায়ান্তর নেই। ইউনিভারসিটি কমিসনের রিপোর্ট অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি, সুতরাং তার ভিতর সাপ ব্যাঙ কি আছে, আমি কিছুই বল্‌তে পারি নে। কিন্তু আমি ভরসা করে বলতে পারি যে, কমিসনের মতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে যথার্থ বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে নি,তার অন্তত একটি কারণ—তার দারিদ্র্য। দরিদ্র বিদ্যালয় যে কি করে বিদ্যার খয়রাত করবে, তার হিসেব পাওয়া কঠিন।

এর উত্তরে অনেকে বলেন যে সু-গৃহিণীর কাজ হচ্ছে আয় বুঝে ব্যয় করা। আয় বাড়াবার চেষ্টা না করে ব্যয় কমাবার দিকে যত্ন করা যাঁরা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। Post-graduate শিক্ষা ছেঁটে দেবার প্রস্তাব চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। এরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার ফলে ইউনিভারসিটির দেহভার অবশ্য অনেকটা লাঘব হয়ে আসবে, তবে তাতে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়বে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ প্রস্তাবের

অর্থ কি জানেন?—বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তমাঙ্গ ছেদন করা। উচ্চ-শিক্ষার উচ্চতা নষ্ট করা যে সে শিক্ষার উন্নতির সদুপায়, এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না; আমার চিরকেলে বিশ্বাস এই যে, উচ্চ শিক্ষার সার্থকতা উচ্চ থেকে উত্তরোত্তর উচ্চতর হওয়ায়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই যথার্থ সুব্যবস্থা, যার ফলে সমাজের অবস্থান্তর ঘটে, যার সহায়তায় মানুষ জীবনের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। উচ্চশিক্ষা জিনিসটিকে আমরা যে এতদূর বহুমূল্য মনে করি, তার এক মাত্র কারণ—আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার প্রসাদে মানুষ উচ্চতর জীব হয়।

আমার এ কথার উত্তরে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা ব্যয়-কুণ্ঠ নন তাঁরা বলবেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগটি আগাগোড়া ফাঁকি ও ভুয়ো। এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, অথচ কাজে কিছু হয় না। এ বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অধ্যাপক আছে কিন্তু ছাত্র নেই; এবং যে সকল ক্ষেত্রে ছাত্র আছে, সে সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপকেরা নাকি একেবারেই অকর্ম্মণ্য।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারি নে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাববশত। তবে বিনা প্রমাণে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ গ্রাহ্য করে নিতে আমার মন সরে না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা শতকরা নিরনব্বই জন হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। তাঁদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার একদম চূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ যদি শিক্ষকদের দূরছাই করে, তাহলে শিক্ষার কি সদগতি হয়? এই অধ্যাপকদের মধ্যে অন্তত এমন জনকতক যদি থাকেন, যাঁরা অধ্যাপনার কাজটি ব্রত

হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাহলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বাইবেলের সেই পাকা কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, many are called but few are chosen, এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে chosen few আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

তারপর উচ্চশিক্ষার কোন কোন বিভাগে যে ছাত্র জোটে না, সে দোষ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের না সমাজের? B. L. পড়বার জন্য হাজার হাজার ছেলে জোটে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শেখবার জন্য যে দুই চারটির বেশি অগ্রসর হয় না, তার কারণ আমাদের মতে আইন অর্থকরী বিদ্যা; কাজেই সে বিদ্যা এতটা অনর্থকরী হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় নয়।

আসল কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার উচ্চতার উপর। এস্থলে আমি আমার দার্শনিক গুরু Professor William James-এর গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। তিনি আমেরিকার শিক্ষকমণ্ডলীকে এই সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে বলেন যে—

"The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the State, and spreads slowly outward and downward."

ইউনিভারসিটি মাত্রেরই উদ্দেশ্য জনকতক reflective members of the State তৈরি করা, এবং তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও রাখা চাই।

(৪)

আমরা যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছি, সেটির আসল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত লর্ড কার্জনের University Act-এর ঠেলায় বহুদিন যাবৎ এই পথেই চলেছে। এতদিন ত কৈ আমরা এর হালচালের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করি নি। আজ কেন হঠাৎ আমরা এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম ?—

এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জনকতক ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ পাছে বন্ধ হয়, এই ভয়ে আমরা বিচলিত হয়ে উঠেছি। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উচ্চ-শিক্ষা জিনিসটেই হচ্ছে আক্রা। ধরুন যদি বিশ্ববিদ্যালয় একদম অবৈতনিক হয়ে যায়, তাহলেও দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে সেখানে শিক্ষালাভ করা একেবারে আনায়াসসাধ্য হবে না। কেননা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পরও আরও অন্তত চার-বৎসরের জন্য তার ভরণ-পোষণের ভার তার পরিবারকেই নিতে হবে। ষোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেই উপার্জ্জনক্ষম হয়,—সে বয়সে তাকে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই যদি নিজ নিজ ছেলেদের কর্ম্ম হতে লম্বা অবসর দেন, তাহলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এ সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই উঠেছে, এবং সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে প্রতি জাতিকেই এ বিষয়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

সমস্যা নয়। এ হচ্ছে Secondary education-এর সমস্যা। ইউ-রোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং এই বয়সে তাদের কতদূর সুশিক্ষিত করা যায়, এই হচ্ছে সে দেশের শিক্ষার প্রধান সমস্যা। Secondary education-এর সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং এ শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থা বুঝেই করতে হয়। উচ্চশিক্ষার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশ্য যোগ আছে, কেননা স্কুলের চৌকাট ডিঙ্গিয়েই কলেজে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাহলেও এ দুই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপায়ও স্বতন্ত্র। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, উত্তেজনার মুখে বাণ নিক্ষেপ করলে সে বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে যা দাবী করছি, আসলে তা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিকট প্রাপ্য। আমার এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা post-graduate শিক্ষা বন্ধ করতে চাচ্ছি। ধরুন তা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে যাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলি, তা একটি দু-ভাগে বিভক্ত Secondary School-য়ে পরিণত হবে। আমাদের দেশের B. A. এবং B. Sc. দু'জনে পৃথকভাবে যে শিক্ষা অর্জ্জন করেন, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যারা School-leaving certificate নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তারা প্রতিজনে ঐ উপরোক্ত দু'জনের শিক্ষার সম্বল নিয়ে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত, উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট করবার জন্য নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে খাড়া করে তোলবার জন্য। আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেকপরিমাণে নিষ্ফল হয়, তার মূল কারণ এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঁচা ভিতের উপর উচ্চ শিক্ষার পাকা এমারত গড়া যায় না।

(৫)

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এ প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন এবং সেইসঙ্গে নামকরণও করে দিয়েছেন। সে বিষয়ের নাম হচ্ছে আমাদের "শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা"। আমার মতে নামটা উল্টে দেওয়াই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টি যদি "জীবন ও বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা" হত, তাহলে তার আলোচনা কতকটা আমার আয়ত্তের মধ্যে আসত। জীবন জিনিষটি চিরকালই একটা সমস্যা; আর একমাত্র বিদ্যালয় কোন দেশে কস্মিনকালে সে সমস্যার মীমাংসা করতে পারে নি; কেননা শিক্ষা জিনিষটে হচ্ছে জীবনেরই একটা বিশেষ অঙ্গ, এবং শিক্ষা-সমস্যাটা জীবন-সমস্যারই অন্তর্ভূত। শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর অবশ্যই আছে, অন্তত থাকা উচিত,—কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব প্রচ্ছন্ন হলেও প্রচণ্ড। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যালয় জাতীয়-জীবন হতেই তার রস রক্ত সংগ্রহ করে, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শিক্ষার সার্থকতা কিম্বা ব্যর্থতা অনেকপরিমাণে জাতীয় জীবন ও জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্য কিম্বা দৈন্যের উপর নির্ভর করে। স্কুলমাষ্টারের হাতে এমন কোনও পরশপাথর নেই, যার স্পর্শে ছেলেমাত্রেই সোনা হয়ে ওঠে। কি ভৌতিক জগৎ কি মানসিক জগৎ, উভয় ক্ষেত্রেই

আলকেমিতে বিশ্বাস আমরা হারিয়ে বসে আছি। এ বিষয়ে মনে দুরাশা পোষণ করলে, অবশেষে আমাদের হতাশ হতেই হবে। প্রচলিত শিক্ষার দৌড় কতটা, সে বিচার না করেই দেশসুদ্ধ লোক তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার সেই চলতি পথটা ধরিয়ে দেন, তারপর যখন দেখেন যে সে পথ ধরে তারা কোন একটা সিদ্ধি কিম্বা ঋদ্ধির রাজ্যে পৌঁছতে পারলে না, তখন তাঁরা স্কুল কলেজের উপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। এক কথায়, তাঁদের মনে স্কুলকলেজের উপর এক সময়ের অগাধ এবং অযথা ভক্তি আর এক কালে সমান অগাধ ও অযথা রোষে পরিণত হয়। ছেলে পাস না করতে পারলে স্কুলকলেজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এমন বাপ-মা এদেশে দুর্লভ নয়। বলা বাহুল্য এরূপ মনোভাবের মূলে যতটা পুত্রবাৎসল্য আছে, ততটা বিচারবুদ্ধি নেই। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, একমাত্র হৃদয়াবেগের বলে পৃথিবীটিকে জয় করা যায় না। কামনা সুধু আমাদের সাধনার পথ নির্দ্দেশ করে দিতে পারে, তার বেশি কিছু পারে না। সুতরাং শিক্ষার কাছ থেকে কি ফল আমরা কামনা করি, প্রথমেই সেটি জানা দরকার।

(৬)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রশ্ন সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সাদা বাঙলা হচ্ছে—"আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের পেটের সম্বন্ধ কি"? এ প্রশ্নটা অবশ্য মানুষে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না, কেন না পেটের ভাবনা আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে, তারপর আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত

ভদ্রলোকের পক্ষে এ ভাবনা সব চাইতে বড় ভাবনা এবং তাঁদের আশা যে স্কুল কলেজের শিক্ষার কৃপায় তাঁদের ছেলেরা হয় রসনা, নয় লেখনীর সাহায্যে, সুধু যে দুধেভাতে থাকবে তাই নয়, গাড়ি-ঘোড়াও চড়বে। আর যদি তা না হয় ত সে স্কুল কলেজের দোষ। বলা বাহুল্য যে, এ ইকনমিক-সমস্যার পূরণ, বিদ্যালয় একাহাতে করতে একেবারে অসমর্থ।

আমাদের জাতীয় দৈন্যের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে স্কুল কলেজের বাইরে বহুদূরে যেতে হবে, এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নজর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশশুদ্ধ স্কুল কলেজকে রাতারাতি Technical School-য়ে পরিণত করলে আমরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এক লম্ফে যে আরোহণ করব না সে কথা বলাই বৃথা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প-বাণিজ্যে চোখের পলক না ফেলতেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সম্ভাবনা নেই। একমাত্র Technical School-এর শিক্ষাও যে বিশেষ কোনও কাজের হয় না, এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে সুধু টেকনিকাল স্কুলের মাষ্টারি করতেই শেখে! হাতে কলমে শিল্প শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণে যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সেই কাজের Science শেখবার জন্য কোন কোনও ইউনিভারসিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা

হয়েছে। কেননা একদিকে যেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না, অন্য দিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্বন্ধটা কি?— ইহলোকে মস্তিষ্কই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, হস্তপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র।

(৭)

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনও একটি সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা হয় নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনও একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনও উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেষ্টার ফলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ স্থলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গে নি, সেখানে যারা তাতে ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মানুষ না হয়ে জড়পদার্থ হয়েছে, এবং তাদের নিয়ে সমাজকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মানুষ ধাতু নয়, কিন্তু দেহমনে একটি organism, এবং এই organism-এর স্ফূর্ত্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। মনে রাখবেন যে, আমরা যাকে জাতি বলি সে হচ্ছে আসলে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে

যখন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তারতম্য আছে তখন শিক্ষারও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভারসিটির ক্ষুরে মোড়াতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেশসুদ্ধ লোকের মানুষ হওয়া চাই, কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবাব দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এদেশে আজও সকলে মানুষকে জীব হিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তারপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মানুষের একটি প্রকাণ্ড তফাৎ আছে। মানুষের অন্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অপর কোনও প্রাণীর ভিতর যা নেই। পশু পক্ষীরা আজ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে যেখানে ছিল, সে আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানব-সমাজ এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় অন্নে বস্ত্রে ধনে রত্নে যে এতটা ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছে, মানুষ যে আজ এ পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তার মানস-বল। মানুষের উন্নতির কারণ এই যে তার মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ তার আত্মশক্তিকে ফোটানোও যায় বাড়ানোও যায়। আমরাই হচ্ছি একমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাণী যারা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে পারে, এবং তা পরস্পরকে আদান প্রদান করতে পারে। আমরাই সুধু মনের কারবার করতে পারি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের মূলধনও বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ যারা ছেলে আর কাল যারা মানুষ হবে, পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাদের উত্তরাধিকারী করা, এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা ও নূতন কর্ম্ম-কৌশল লাভ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির উদ্বোধন করা। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পরে, এবং যতটা কর্ম্ম-শক্তি লাভ করতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুই-ই হচ্ছে আসলে মনের জিনিষ এবং এ-দু'য়ের ভিতর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। একটা ইংরাজি বচন আমাদের মনের উপর এ যুগে অযথা রকম অধিপত্য লাভ করেছে, সে হচ্ছে struggle for existence. এ কথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা আমাদের struggle for existence-এর সহায়। ঐ মস্ত কথাটার সাদা অর্থ হচ্ছে "আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা"। এ প্রচেষ্টা জীব-মাত্রেরই অস্থি মজ্জাগত, এবং যেহেতু আমরাও জীব সে কারণ ও-প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষেও নৈসর্গিক। কিন্তু পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে আমাদের ভিতর উপরন্তু আর একটি প্রবৃত্তি আছে, যার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমার সুধু আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকিনে, মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে ওঠবার প্রচেষ্টাও আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। যদি কেউ বলেন যে তা বটে, তবে আগে আত্মরক্ষা পরে আত্মোন্নতি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য ও দুয়ের ভিতর ওরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, এর প্রমাণ মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেয়।

(৮)

মানবজাতির যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানে মানুষ মাত্রেরই যে অধিকার আছে এবং সে অধিকারে অধিকারী হলে, মনুষ্যত্ব যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ষ্টেটের খরচায় প্রতি বালককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুধু তাই নয়, প্রতি বালক শিক্ষিত হতে বাধ্য। এরই নাম Compulsory primary education.

তারপর বার চৌদ্দবৎসরে এদের মধ্যে অধিকাংশকে জ্ঞানার্জ্জনের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ economic,— দরিদ্রের সন্তানের এই বয়সেই জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়োজন হয়, কেননা তাদের বেশি দিন নিষ্কর্ম্মা রাখায় তাদের এবং সমাজের সমান ক্ষতি হয়। আরও একটি কারণ আছে। যাঁরা ছেলের মনের খোঁজ রাখেন তাঁদের মতে কৈশোরে পদার্পণ করবামাত্র অনেক ছেলের মনে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান-চর্চ্চার অপ্রবৃত্তি জন্মায়,—অর্থাৎ তারা বাঁধা না খেয়ে সংসারে চরে খেতে চায়। সুতরাং ও বয়সে তাদের জোর করে কর্ম্মক্ষেত্র হতে দূরে রাখার কোনই সার্থকতা নেই। নিষ্ক্রিয় হলে যে জ্ঞানী হতেই হবে এমন কোনও নৈসর্গিক নিয়ম নেই। আমাদের যত ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তার ভিতর অনেকে যে যুগপৎ অশিক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য হয়ে বেরোয় তার অন্যতম কারণ এই যে চৌদ্দ পোনেরো বৎসর বয়সে তাদের মনোমত কাজে তাদের লাগতে দেওয়া হয় নি।

তারপর চৌদ্দ থেকে আঠারো বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত

অল্পসংখ্যক ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তার নাম secondary education. ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্র তারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে এই Secondary education-ই সব চাইতে মূল্যবান, কারণ এই শিক্ষাই আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যালয় থেকে নানা বিষয়ে সেই শিক্ষালাভ করে বহির্গত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়, যে শিক্ষার ফলে জীবনের যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কৃতিত্ব লাভ করতে পারব। আমাদের economic অবস্থার সঙ্গে এই শিক্ষাই যথার্থ থাপ খায়। সুতরাং এ শিক্ষার যাতে সুব্যবস্থা হয় সেই বিষয়েই আমাদের একান্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর এই বয়েসের মধ্যেই যে যথেষ্ট সুশিক্ষিত হওয়া যায় তার প্রমাণ ইউরোপের সকল দেশেই পাওয়া যাবে।

তারপর যে ক'টি বাকী থাকে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে চেষ্টা করে। এও কতকটা অবস্থার গুণে। উচ্চ-শিক্ষা ইউরোপের অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটে বললেও হয়। বাইশ তেইশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত এক পয়সা রোজগার না করে পরিবারের অন্নে প্রতিপালিত এবং পরিবারের অর্থে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে এমন যুবকের দল সকল দেশেই দুর্লভ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি দরিদ্রসন্তান উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুফলে বঞ্চিত থাকবে? তার উত্তর—অবশ্য হবে যদি না তাদের নিজগুণে Scholarship নেবার ক্ষমতা থাকে। দরিদ্র সমাজও যদি পৃথিবীর সকল ভাল জিনিষে ধনীর সঙ্গে সমান অধিকারী হত তাহলে দারিদ্র্য ত আর

কষ্টের কারণ হত না। এরূপ হওয়া উচিত কি না, সে হচ্ছে শিক্ষার নয় সমাজের সমস্যা। ইউরোপের বহুলোকের মতে কোনও সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের এতটা অর্থগত পার্থক্য থাকাটা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এঁদের চেষ্টায় যদি Socialistic State গড়ে ওঠে তাহলে হয়ত mass education এবং high education একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন সমাজে বড় ছোটর প্রভেদ থাকবে ততদিন শিক্ষারও উচ্চ নীচ প্রভেদ থাকবে। তবে এ সব প্রশ্ন আমাদের মুখে শোভা পায় না। এই জাতিভেদের দেশে আমরা সমাজে ছোট বড়র প্রভেদ মোটেই দূর করতে চাই নে, তার উপর এদেশে ধনীর অপেক্ষা দরিদ্রেরাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বেশি লালায়িত, তার কারণ অধিকাংশ ছেলের বাপ ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষিত করতে চান না, সুধু ধনী করতে চান। এবং সেই কারণ উচ্চ-শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সস্তা করবার জন্য সকলে ব্যগ্র। এ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও প্রশ্রয় পাবার উপযুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ পারিবারিক মনোভাব দিয়ে জাতীয় শিক্ষার-সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঘরের প্রদীপ ঘরই আলো করতে পারে কিন্তু বাইরের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না ; তার জন্য চাই বাইরের আলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা যে কতটা অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞান. তবে আমার দুঃখের কারণ এই যে,, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটেই সুশিক্ষিত সম্প্রদায় নয়। যদি তাঁরা সত্যই সুশিক্ষিত হতেন তাহলে কোন আপশোষের কারণ থাকত না, কেননা আমার দৃঢ় ধারণা যে যে-জাতির অনেকে সুশিক্ষিত সে জাতির কি আর্থিক কি আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি অনিবার্য্য।

(৯)

এ সত্য নিঃসন্দেহ সর্ব্ববাদী সম্মত যে, যে-শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্তি দেয় না শক্তি দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আর যে মনের জীবনের উপর কোন স্ব-প্রভাব নেই সে মন মুক্তও নয়, শক্তিশালীও নয়, এক কথায় শিক্ষিতই নয়।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে জীবনকে চেপে ধরতে পারেন নি, এবং নিজ শক্তিতে তা যে মনোমত করে গড়ে তুলতে পারছেন না,—তার প্রমাণ আজকের দিনের এই অন্ন-সমস্যা। এই ব্যর্থতার পরিচয় একমাত্র economic ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমান পাওয়া যাবে। এই নব-শিক্ষার প্রভাব যে আমাদের সামাজিক জীবনের উপর এক রকম নগণ্য—তা কে অস্বীকার করবে? আর এ কথাও নিঃসংশয় যে আমরা যাকে ইকনমিক-সমস্যা বলি সেটি আমাদের সামাজিক মনোভাব, সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের, এক কথায় সামাজিক জীবনের বিশেষরূপে অধীন। যদি কোন সমাজের প্রিয় প্রথা ও চিরাগত সংস্কার সকল বর্ত্তমান যুগে Struggle for existence-এর অনুকূল হওয়া দূরে থাক প্রতিকূল হয় তাহলে সে প্রথা ও সে সংস্কার বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে কি করে জয়ী হওয়া যেতে পারে? একমাত্র রসনা ও লেখনীর বলে? লেখনি ও রসনার শক্তিতে আমি অবিশ্বাসী নয়—কিন্তু সে শক্তি সত্যের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ এ উভয় রাজ্যের যথার্থ জ্ঞানের উপরই মানুষের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত। রসনা ও লেখনি দুইই অবশ্য মিথ্যাকে জন্ম দিতে পারে এবং তাকে প্রশ্রয়ও দিতে পারে,

কিন্তু তার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা জাতি বিশেষকে সুস্থ করতে পারে না, সজ্ঞান করতে পারে না, সক্রিয় করতে পারে না। আর সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সত্যপ্রিয় হওয়া চাই, সত্যসন্ধিৎসু হওয়া চাই, সত্যসন্ধ হওয়া চাই।

বিদ্যালয় ছেলেদের কাছে যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেয়, সে জ্ঞান আত্মসাৎ করা আর না করা সম্পূর্ণ ছেলের এক্তিয়ার। উচ্চ-শিক্ষা যুবকদের সঙ্গে মনুষ্যত্বের উচ্চ মনোভাব উচ্চ আইডিয়ালের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে—কিন্তু সে ভাব সে আইডিয়াল, যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ বসিয়ে দিতে পারে না; যদি বাপ মা শিক্ষকের এবং সমাজ বিদ্যালয়ের সহায়তা না করে। ভুলে যাবেন না যে বিদ্যালয় একমাত্র শিক্ষালয় নয়—প্রতি পরিবার এক একটি শিক্ষালয় আর সমাজ হচ্ছে একটি মহাবিদ্যালয়। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উল্টো টান টানে তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি হবে? স্কুল কলেজে অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের মনের উপর একটা বোঝামাত্র হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে সংগৃহিত আইডিয়াল শুধু বক্তৃ গত হয়ে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজ কি সত্যই চায় যে স্কুল কলেজের শিক্ষা সত্য সত্যই দেশের ছেলের মনে বসে যাক এবং তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে শিখুক? অপর পক্ষে এই কথাটাই কি সত্য নয় যে, সমাজ চায় এই নব-শিক্ষা যেন ছেলেদের মন স্পর্শ না করে; এবং যে মন দিয়ে স্কুল কলেজের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর যে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে—এ দুই মন সমান্তরল রেখায় ইংরাজিতে যাকে বলে

parallel lines-য়ে চলুক। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা স্কুলে সলবে পৃথিবী গোল, আর ঘরে এসে মানবে যে পৃথিবী ত্রিকোণ। কেননা একবার যদি তারা তাদের শিক্ষার দ্বারা আমাদের সামাজিক সংস্কার গুলোকে যাচাই করতে সুরু করে তাহলে তারা হয়ত দেখতে পাবে যে অনেক জিনিস যা আমরা চৌকোশ বলে ধরে নিয়েছি তা সুধু গোল নয়, মহাগোল। এরূপ মনোভাবের মূল কি তা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমাদের শিক্ষা একে বিদেশী, তায় আবার নূতন—আর আমাদের সমাজ একে স্বদেশী তায় আবার প্রাচীন, সুতরাং এর একটিকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে অপরটিকে হীনবীর্য্য করে দিতেই হবে। তাই অন্ধ সংস্কারের সাহায্যে আমরা শিক্ষাকে পঙ্গু করে ফেলতে সদাই যত্নবান!

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যে শিক্ষায় মানুষের মনকে যুগপৎ মুক্তি ও শক্তি না দেয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কেননা তাতে মানুষকে person করে তোলে না। বহুকাল পূর্ব্বে জগৎ-পূজ্য জর্ম্মান দার্শনিক এই মহা-সত্যের আবিষ্কার করেন যে, person শব্দের অর্থ হচ্ছে Self conscious self-determining individual. মানুষে পশুতে এই খানে তফাৎ যে, পশু মাত্রেই কতকগুলি নৈসর্গিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত, তাদের ভিতর personality বলে কোনও জিনিস নেই। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মনে এবং চরিত্রে Self consciousness and self-determination-এর শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাকে চিন্তা করবার ও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত দরকার। তারপর আর একটি কথা;—আমরা যাকে শক্তি বলি তার অর্থ হচ্ছে reality-র উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা—বলা বাহুল্য

reality-র জ্ঞান না জন্মালে কেউ আর তার উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। আমাদের নব-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের reality-র জ্ঞান বাড়া দূরে থাক ক্রমে কমে যে আসছে তার কারণ আমাদের নব-শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা জিনিসটি সব দেশেই একটি সমস্যা কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি যে এত ভীষণ সমস্যা হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ সে শিক্ষা আমাদের জীবনের পক্ষে অস্পৃশ্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, ইকনমিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা সবই এমন, যে আমাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার আমরা সুযোগ পাই নে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা খাটাবার আমাদের অধিকার পর্য্যন্ত নেই।—

এ অবস্থায় মনের সুখে থাকতে পারেন শুধু তাঁরা যাঁরা নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে গেলেই পরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, এবং পরের দুরবস্থা যদি কালেভদ্রে চোখে পড়ে ত এই বলে মনকে আশ্বস্ত করেন যে, সে দুরবস্থা তাদের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু এদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এই অতিনিন্দিত নব-শিক্ষার প্রসাদে স্বজাতির এই বর্ত্তমান দুর্গতি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারেন না, কিম্বা মোটার গাড়ীতে চড়ে কলেজষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় ইউনিভারসিটি Buildings নামক বুরোক্রাট এবং পেট্রিয়টের সমান চক্ষুঃশূল সরস্বতীর মন্দিরটিকে অম্লান বদনে ভূমিসাৎ করে দেবারও প্রস্তাব করতে পারেন না। দেশ উদ্ধারের অত সহজ মীমাংসা করবার পক্ষে তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়েই প্রতিবাদী হয়। ভবিষ্যতে বাঙালী জাতি, আমাদেরই অনুরূপ হবে, আমাদেরই মত তারাও নির্জ্জীব, নিরানন্দ এবং

পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকবে, আমাদেরই মত তারা স্থধু ধনে নয় মন ও চরিত্রেও মধ্যবিত্ত হবে, আমাদেরই মত তারা জীবনের উৎসবের দর্শক মাত্র থাকবে, কিন্তু তাতে যোগদান করবার অধিকার লাভ করবে না ; এ কথা মনে হলে এ শ্রেণীর লোকদের মন নৈরাশ্যে পরিপুর্ণ হয়ে ওঠে এবং তখন জীবনের সাধ তাদের মুখে তিতো লাগে। কিন্তু এ নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দিতে আমরা মোটেই চাই নে। একটি ইংরেজ লেখকের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, খানায় পড়ে থাকলেও আকাশের তারা দেখবার অধিকারে মানুষ বঞ্চিত হয় না। আমাদের ভবিষ্যতের গগনে সেই তারা দেখতে পাই বলে আমরা শিক্ষার উন্নতির জন্য এত লালায়িত। যদি কেউ বলেন যে আমরা যা দেখছি সে তারা নয়—আকাশকুসুম, তার উত্তর তথাস্তু—কিন্তু তাই বলে খানায় পড়ে থাকাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। ওঠবার চেষ্টা আমাদেরই করতেই হবে, ফলাফল অদৃষ্টের হাতে।

(১০)

আমি বরাবর শিক্ষার উন্নতি; সমাজের উন্নতি, জাতির উন্নতি প্রভৃতি নানারূপ উন্নতির কথা বলে আসছি কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা বলি নি। বর্ত্তমান শিক্ষার সর্ব্বাগ্রে কোন্ সংস্কার করা প্রয়োজন, সংক্ষেপে সেই কথাটা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। কারণ আমার ধারণা যে, সে সংস্কার না করে অপর সংস্কার করতে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষার গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

উন্নতি অবশ্য পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। জড়পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তার নিজের ভিতর থেকে কোনও পরিবর্ত্তনের তাগিদ আসে না। লোষ্ট্রকাষ্ঠ অনন্তকাল পর্য্যন্ত এক অবস্থাতেই থাকতে পারে, যদি বাহ্যশক্তি তার পরিবর্ত্তন না ঘটায়।

জীবের ইতিহাস হচ্ছে নিত্য তার অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী। প্রথমত বৃদ্ধির তারপর হ্রাসের। বীজ হতে বৃক্ষ জন্মায়, বড় হয়, একটা সীমা পর্য্যন্ত বাড়ে তারপর উত্তরোত্তর তার জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়ে এসে শেষে তার মরণ দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নৈসর্গিক কারণে, এ অবস্থান্তর ঘটার ভিতর তার মনের কিম্বা ইচ্ছার কোন কার্য্য নেই। তার জীবন-মরণ দুই-ই দৈবাধীন, সে বেচারা অপমৃত্যুকেও এড়াতে পারে না, আত্মহত্যাও করতে পারে না।

মানুষের ধর্ম্ম কিন্তু স্বতন্ত্র। আমাদের দেহের হ্রাসবৃদ্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোনও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলে পর্ব্বত প্রমাণ উঁচুও হতে পারি নে, চিরদিন দেহে ছোট-ছেলেও থেকে যেতে পারি নে। কিন্তু মনের হ্রাসবৃদ্ধি অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছা করলে মনে ছোট ছেলেও থেকে যেতে পারি, জ্ঞানী গুণীও হয়ে উঠতে পারি। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি জিনিস মানুষ তার মনোমত করে গড়তে পারে এবং সে গড়ার ভিতর মানুষের ইচ্ছা-শক্তিই আসল শক্তি। সংক্ষেপে মানুষে আত্ম-চেষ্টায়—তার অবস্থার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, এবং মানব-সমাজের উন্নতি তার অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে—সে উন্নতি অদৃষ্ট নয়, পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে বলে সে বদল উন্নতির সহায়ও হতে পারে অবনতির সহায়ও হতে পারে। প্রতি বদলের মুখে এ উভয় সঙ্কটে মানুষকে যে পড়তে হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে অবনতির ভয়ে যদি মানুষের আত্ম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বন্ধ করো তাহলে সেই সঙ্গে তার উন্নতির পথও রোধ করা হবে। সুতরাং এ বিষয়ে মানব-সমাজকে experiment করতে দিতেই হবে, ফলে উন্নতি কি অবনতি হবে তার প্রমাণ ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

মন ও জীবনের এই লড়ালড়ি পৃথিবীর সকল দেশে চিরদিনই চলে আসছে, কারণ মন চিরকালই জীবনকে নূতন পথ দেখাতে চায়, আর জীবন চিরকালেই তার অভ্যস্ত পথ ত্যাগ কয়তে আপত্তি করে। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে, জীবনের পক্ষে এক জায়গায় জমে গিয়ে জড়-পদার্থে পরিণত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে সেই জন্য মনের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে ক্রমান্বয়ে টেনে তোলা, নূতন নূতন পথে তাকে চালিত করা।

নব শিক্ষার সহিত প্রাচীন সমাজের এই লড়াই সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যে হচ্ছে তার ভিতর কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। এমন কি দু-পক্ষ সকল দেশে একই বুলি আওড়ান। নূতন জ্ঞান এবং, তৎপ্রসূত নূতন আইডিয়াল জীবনকে ডেকে বলে আমাকে অনুসরণ কর, তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব, আর প্রথা-গ্রস্ত জীবন বলে যে-পথে বহুদিন চলে আসছি সে পথ ত্যাগ করলে সর্ব্বনাশ হবে, কেননা তোমার ঐ নূতন পথ ত্রিদিবের নয়, রসাতলের পথ।

তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে অপর দেশে নবশিক্ষা সামাজিক জীবনকে খাড়া করে তোলে আর আমাদের দেশে সামাজিক জীবন নবশিক্ষার কোমর ভেঙ্গে দেয়। এর কারণ কি? সহজ উত্তর আমাদের নবশিক্ষা বিদেশী শিক্ষা বলেই, জীবনের উপর তার প্রভাব কম। কিন্তু এ উত্তর, সহজ হলেও সত্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে, এই সত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে যে, এক জাতির মন অপর আর এক জাতির মনের স্পর্শে জেগে ওঠে, সংঘর্ষে সজ্ঞান হয়। কালক্রমে জাতীয় মন যখন নিবে আসবার উপক্রম হয়, তখন বাইরে থেকে তাকে উস্‌কে দেওয়া দরকার। সত্য তা সে দেশীই হোক বিদেশীই হোক সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশে শিক্ষার এ-দুর্গতির কারণ যে সে শিক্ষা বিদেশী ভাষাতে দেওয়া হয়।

আমরা এই বলে জাঁক করি যে ইংরাজি আমরা যেমন শিখি পৃথিবীর অপর কোনও জাত তেমন শিখতে পারে না। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। অপর জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে, যদি নিজেদের বিদ্যের বহরটা মেপে দেখি ত, দেখতে পাই যে আমাদের অধিকাংশ লোকের ইংরাজি জ্ঞান যেমন মুষ্টিমেয় তেমনি খেলো। অধ্যাপকেরা বই না পড়িয়ে নোট দেন বলে তাঁদের উপর চারধার থেকে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এ নোট-দানের কারণ কি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার্থীদের অধিকাংশের ইংরাজিভাষার দখল এত কম যে তাঁরা Text-book পড়ে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারেন না,—নিজের ইংরাজিতে সে মর্ম্ম প্রকাশ করা ত তাঁদের একেবারে সাধ্যের অতীত। এ অবস্থায় অধ্যাপকদের দায়ে পড়ে, বিশ্ববিদ্যার সার সংগ্রহ করে তার এমন সব নিরেট বড়ি পাকিয়ে দিতে হয়, ছেলেরা

যা কলেজে গিলে সেনেট হলে উগলে দিতে পারে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, যে যত বেশি বড়ি গিলিয়ে দিতে পারে সে—তত ভাল অধ্যাপক, আর যে যত বেশি বড়ি ওগলাতে পারে সে তত ভাল ছেলে। তারপর আর একটি কথা, হাজার অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য। অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে অনেকের ইংরাজি-জ্ঞান ছাত্র-বাবুদের জ্ঞানের চাইতে বড় বেশি প্রবৃদ্ধ নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কাল যাঁরা শিষ্য ছিলেন আজ তাঁরা গুরু। হতে পারে যে জর্ম্মান ফরাসী ইতালীয়দের চাইতে আমাদের ইংরাজি জ্ঞান বেশি। তার কারণ এ শিক্ষার আমরা যে দাম দিই সে দাম তারা দেয় না। সে দাম হচ্ছে স্বভাষাকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারানো। বিদেশী ভাষার মারফৎ পাওয়া শিক্ষা আমাদের মনে বসে না, কথার কথা থেকে যায়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত বক্তৃতা করেছি যে এস্থলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের স্কুলে ছেলের মন এবং বস্তুজগতের মধ্যে, ইংরাজি ভাষা একটি পুরু পর্দ্দার মত ঝুলে থাকে, ফলে তাদের মনে reality-র জ্ঞান এক প্রকার নষ্ট হয়েই যায়। বস্তুর সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ যে বাচ্য বাচকের সম্বন্ধ, বালককালে বিদেশী ভাষা শিখতে গেলে সে জ্ঞান হারানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ, বিদেশী ভাষার শব্দের সঙ্গে বস্তুর কোনও সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, আছে সুধু স্বদেশী শব্দের সঙ্গে। Translation এবং re-translation-এর প্রসাদে সুধু এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। ভাষার সঙ্গে reality-র যোগাযোগের জ্ঞান জন্মে না।

স্কুলে এ জ্ঞান একবার হারালে কলেজে এসে আর তার পুনরুদ্ধার করা যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি এ বৎসরের প্রাথমিক B L-এর কাগজ পরীক্ষা করছি, শ'খানেক কাগজ দেখা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচখানিতে moveable এবং immoveable property-র কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জানেন?—দু'দিন পরে যাঁরা উকিল হবেন তাঁদের ধারণা যে-সম্পত্তি অচল, তাই immoveable property, যথা—পর্ব্বত এবং যে-সম্পত্তি সচল তাই হচ্ছে moveable property, যথা—নদী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা যে কি তা বাড়ীর চাকর দাসীরাও জানে, কিন্তু স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার কৃপায় B. A. B. Sc রাও জানেন না। একজন লিখেছেন যে, incorporeal property হচ্ছে সেই সম্পত্তি which has no physical existence। জবাব ঠিক হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উদাহরণ দিতে গিয়ে, copyright ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে, উল্লেখ করছেন "air." কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। যিনি লিখেছেন air হচ্ছে সেই বস্তু যার কোনও physical existence নেই শুনতে পাই তিনি হচ্ছেন B. Sc. পাশ! এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, স্কুলে সকল শিক্ষা ইংরাজি ভাষার মারফৎ হওয়াতেই আমাদের শিক্ষা এতটা নিস্ফল হচ্ছে? আপনারা যদি Secondary School-য়ে ইংরাজিকে Second language করতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস দশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতির মনের চেহারা ফিরে যাবে, এবং তখন দেখা যাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ পাতাল প্রভেদ নেই।

আমি এই বলে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি যে, আমি একজন ষ্টুডেণ্ট এবং সেই ষ্টুডেণ্ট হিসেবেই আমি বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যার আলোচনা করেছি, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করেছি, তার কোনও কাটা-ছাঁটা মীমাংসা করে দিতে সাহসী হই নি। আমি মানি যে পেটের ভাবনা অবশ্য আমাদের সর্ব্ব-প্রধান না হলেও সর্ব্বপ্রথম ভাবনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে পেট যদি মস্তিষ্কের চালক হয়, তাতে পেটের কিছু লাভ হয় না, কিন্তু মস্তিষ্কের অশেষ ক্ষতি হয়। বাঙালী যে মারোয়াড়ি নয় এ দুঃখ আমরা আগেও করেছি। রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির সর্ব্বনাশ যে literary education-এর ফলে হয়েছে, এই বিশ্বাসের বলে আমরা তথাকথিত Scientific education-এর জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিলুম। ফলে কলেজে একদল ছেলেদের গোড়াথেকেই একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হল। সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা কি লাভ করেছি? আমাদের আশা ছিল, যে ছেলেরা কাব্য দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ত্যাগ করে বিজ্ঞান ধরলেই, এক কথায় লাইব্রেরী ছেড়ে লাবরেটরিতে ঢুকলেই বঙ্গমাতা অন্নপূর্ণা হয়ে উঠবেন, অন্ততঃ B. Sc.-দের ঘরে টাকা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি? দেশ 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়ে ওঠা দূরে থাক, B. Sc.-র অন্নচিন্তা B. A-র চাইতে একচুলও কম নয়, এবং উভয়ের বাজার-দর এক, বড় বাজারেও, বৌ-বাজারেও।

আপনারা এই কথাটা স্মরণ রেখে শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা করবেন যে বাঙালী আসলে সরস্বতীভক্ত জাত এবং তারা যেদিন ভাবের চর্চ্চা

থেকে বিরত হবে, সেদিন তারা তাদের স্বধর্ম্ম হারাবে। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি কলকারখানা গড়তে না পারুক, তার চাইতে একটা ঢের বড় জিনিস গড়েছে এবং তার নাম হচ্ছে নব-ভারত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কণিকা।

বনের ছায়াতে যে, পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জ্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠ্‌ল, "আমাকে চিন্‌তে পার না" ?

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম, বল্‌লেম, "মনে পড়চে বটে কিন্তু ঠিক নাম করতে পারচিনে"।

সে বল্‌লে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক"।

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা, দিলে যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বল্‌লেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মত কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেচ" ?

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাস্‌লে। আমি বুঝলেম সবটুকু রয়ে গেচে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েচে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেখে দিয়েচ" ?

সে বল্‌লে, “এই দেখনা আমার গলার হার”।

দেখ্‌লেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপ্‌ড়িও খসে নি।

আমি বল্‌লেম, “আমার আর ত সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও ত ম্লান হয়নি”।

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্‌লে, “মনে আছে, সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাওনা, তুমি শোককেই চাও”!

লজ্জিত হয়ে বল্‌লেম, “বলেছিলেম বটে, কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন্‌ ভুলে গেলেম”।

সে বল্‌লে, “যে অন্তর্যামীর বর, তিনি ত ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও”।

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লেম, “একি তোমার অপরূপ মূর্ত্তি”!

সে বল্‌লে, “যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েচে শান্তি”।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একখানি পত্র।*

জেমো, কান্দি।

১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে ঐ সকল দুরূহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানব-জাতির অগ্রনীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্ব্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন, আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন সে আমার প্রতি আপনার নিরতিশয় শ্রদ্ধার ফল।

* আজ ক'দিন হল—৺ত্রিবেদী মহাশয়ের একখানি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে—যেখানি প্রকাশ করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। কেননা এই চিঠিখানিতে লেখক তার মনের কথা আশ্চর্য্য রকম সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ চিঠি প্রকাশ করবার কোন বাধাও নেই, ব্যক্তি বিশেষকে লেখা হলেও এ পত্র প্রাইভেট নয়, কেননা যাঁকে এ পত্র লেখা হয়েছিল সে ব্যক্তি ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ, তিনি একটি ষোলো বৎসরের যুবককে পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু বলে সম্বোধন করেছেন। সম্পাদক,

খুব সম্ভব আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দূর হইতে কাগজ পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জীবন সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয় সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার দশাও ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি তাহা নহে। মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব?

আমি যতদূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, ততদিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—ততদিন religiousness-ই একমাত্র উপায়;—এই religiousness-এর মোটামোটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.

—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে? এইরূপ attitude কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে সেই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্যের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার

কি হইবে—হয়ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আনে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খৃষ্টানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অনুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণ স্বরূপের সহিত বিরহ সম্ভাবনায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে পথিক তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলা-

ভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্কদ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, "জিজ্ঞাসা"র ও "কর্ম্মকথা"র শেষ দিকে—এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমার মত কীট কতদূর করিবে!

যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে দু'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন, পড়িতে পারেন। বাংলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অভয়ের কথা" গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর Varieties of religious Experience (Clifford Lectures) খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা আপনি ঐ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু ক্ষুদ্রপত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল—এখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন সমস্যার সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যে কাতর—সকল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্রদ্বারা এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার শারীরিক অবস্থা মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত দুই বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে, উহার শেষভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার নমস্কার লইবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মুক্তি।

—:০:—

যে সময়ের কথা ব'লছি তখন দার্জ্জিলিং-এ মানুষের অভাব না থাকলেও দেবতার প্রভাব একেবারে হ্রাস হয় নি; এবং বার্চ্‌হিলে একালের শিশু-মানবের দোলনার পরিবর্ত্তে সে কালের শিশু-দেবতার পুষ্পধনুটাই ছিল একমাত্র খেল্‌বার জিনিস—যদিও দেখ্‌বার নয়।

এ কহিনীটি আর কিছুই নয়—সেই আদিযুগের বার্চ্‌হিল-ইতিহাসের একটা অধ্যায় মাত্র; এবং এটা রচিত হ'য়েছিল শুদ্ধ তিনটি প্রাণীকে নিয়ে—একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি গাধা।

পুরুষটি থাকত চৌরাস্তার কাছে একটা হোটেলে—নিতান্ত অনাত্মীয়দের মধ্যে; নারীটি থাকত জলাপাহাড়ের একটা বাড়ীতে—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; এবং গাধাটি থাকত ভুটিয়া-বস্তির একটা আস্তাবলে—আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়বিধ চতুষ্পদেরই মধ্যে।

নিয়তির বিধানে এই তিনটি প্রাণী একদিন বার্চ্‌হিলে একত্রিত হ'য়েছিল—এবং তারই ফলস্বরূপ এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি।

(২)

সে দিন শরতের অপরাহ্ন। বার্চ্‌হিলের সর্ব্বোচ্চ চূড়োটার পশ্চিমে খানিকটা নীচের দিকে একখানা নাকবারকরা পাথরের

উপর নারী ব'সেছিল এবং পুরুষ তার পায়ের তলায় আর একখানা পাথরে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নারীর পরিধেয়ের আগুন-রংটা তাকে মানিয়ে ছিল ভাল। এই থেকে তার রূপের এবং বয়সের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পুরুষের রূপের পরিচয় অনাবশ্যক এবং তার গুণের পরিচয় দেবার মতন বয়স তখনও হয় নি।

পুরুষ ব'লছিল—"সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করে ফেলেছি। রাত্তির দেড়টার সময় ডাণ্ডি অপেক্ষা ক'রবে—তোমাদের বাড়ীর সেই উপরকার রাস্তাটায়। রাত্তির থাকতেই ঘুম্ ছাড়িয়ে যাবো এবং কাল এমন সময় আমরা কালিম্পং-এ"।

পুরুষের স্বর স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যঞ্জক। নারী কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বরেই একটু অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন ক'রলে—"এর মধ্যেই"? তারপর কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে ব'ললে—"কিন্তু তোমার দিক থেকেও তো কথাটা একবার ভেবে দেখতে হয়। সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রবে একটা চা-বাগানে কাটিয়ে"?

পুরুষ যা' উত্তর ক'রলে তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, সে যদি তার প্রেমের সৌরভে নারীর নষ্ট গৌরবটা ঢেকে দিতে পারে—তাতেই তার জীবনটা সার্থক হ'য়ে উঠবে।

"এর বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই"।

উত্তেজনা সত্ত্বেও পুরুষের স্বরে এমন-কিছু ছিল যা' নারীকে একেবারে স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সেটা পরিপূর্ণ প্রেমের আবেগ, গভীর সমবেদনার প্রকাশ, তীব্র কামনার প্রেরণা—অথবা এই তিনের মিশ্রন-সঞ্জাত একটা কিছুও হ'তে পারে।

নারী কিন্তু ঠিক পুরুষের কথাই ভাবছিল না। তার নিজের ব্যথাটা যে কোথায় সেইটেই বারবার মনে প'ড়ছিল। সংসারের অপমান-অত্যাচার সে বরণ ক'রে নিতে পারত; কিন্তু অভিমানের দাবীটা যেখানে বড্ড বেশি, অবহেলাটা যে সেখানে তেমনিই অসহ্য !……… বর্ত্তমানটা যাই হোক না কেন—ভবিষ্যৎটাই কি খুব আশাপ্রদ? সমাজ-সৌরচক্র থেকে গতিভ্রষ্ট হ'য়ে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে বাকী জীবনটা কাটাবে সে? প্রেম তো একটা নেশা মাত্র। যদি নেশা কেটে যায়, তা'হলে………?

মুখ ফুটে ব'ললে—"এ-রকম ভাবেই যদি চলে তো চলুক না কেন"?

"না—তা' আর চলতে পারে না"।

কেন চ'লতে পারে না পুরুষ সেটা বুঝিয়ে ব'ললে না। কিন্তু তার স্বরে পৌরুষ-অভিমানের একটা আভাষ ছিল।

নারীর তখন মনে প'ড়ল—গৃহত্যাগ-কল্পনাটা তো প্রথম তারই মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। পুরুষ সেটাকে নিজের উৎসাহে সম্ভব ক'রে তুলেছে বৈত নয়।

তাই লজ্জিত-কাতর স্বরে ব'ললে—"যেতেই হবে আমাকে। তবে আর একটু সময় চাই। আজ রাত্তির ন'টার সময় তোমায় শেষ জানাব"।

নারীর এই দ্বিধাভাবে পুরুষের দায়িত্বভারটা বাড়্ল বৈ ক'ম্ল না।

নারী তারপর বাড়ী ফেরবার প্রস্তাব ক'রলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। "কাল কোথায় বা বাড়ী আর কোথায় বা

কি” ? পুরুষ এই পরিহাসভাবটা আর নিবতে দিলে না এবং নারীর কলহাস্যে ফের্‌বার পথটা মুখরিত হ’য়ে উঠতে লাগল।

(৩)

সেই ফেরবার পথেই গাধার সঙ্গে দেখা।

যেখানে জিম্‌-নামক কুকুরটার গোর আছে সেইখানে গাধাটা দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে ছিল এক গোছা ঘাস এবং পিঠে ছিল একটি ছেলে। নারীর হাস্যরবে সে কান খাড়া ক’রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণেই নারীকে দূরে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুট্‌ল। সইস-বালকটা তার পিছনে ধাওয়া ক’রলে এবং পিঠের ছেলেটি প’ড়ে যাবার ভয়ে চর্ম্ম-বেষ্টনীটা দু’হাতে আঁকড়ে ধ’রলে।

পুরুষ নারীকে আগলাবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার কিছুই দরকার ছিল না। গাধাটা নারীর কাছে এসে শান্তভাবে মাথা বাড়িয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালে—যেমন করে’ গাধারা দাঁড়ায়।

নারী ছেলেটিকে আশ্বস্ত করে’ গাধার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হ’য়ে গেল। ব’ললে—“এ যে সেই পেম্বা” !

এ যে তার মৃত সন্তানের চড়বার ডঙ্কি এবং খেলবার সঙ্গী ছিল। গেল বৎসর এমনি সময় রোজ দুবেলা সে পেম্বার পিঠে চ’ড়ে বেড়াত। তার সঙ্গে কথা কইত, ঝগড়া করত। কখন মারত, কখন গলা জড়িয়ে আদর করত। এই মূক প্রাণীটি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করত এবং তার পুরস্কার স্বরূপ নারীর কাছ থেকে কখন কখন মিষ্টান্ন উপহার পেত।

এখনও তো এক বৎসর হয় নি !

নারীর চোখ জলে ভরে এল।

পুরুষ ব'ললে—"গাধারাও মনে করে রাখে" ?

নারী ব'ললে—"গাধারাই বোধ হয় মনে করে রাখে"।

পুরুষ ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দোবার জন্যে বলতে যাচ্ছিল—"অর্থাৎ যারা মনে করে রাখে তারাই বোধ হয় গাধা"। কিন্তু সামলে গেল। নারীর চোখে তখনও জল ছিল।

তারপর সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

(৪)

চৌরাস্তার কাছে এসে গাধা নীরবে বিদায় নিলে। পুরুষও বিদায় চাওয়াতে নারীর চমক ভাঙল। ব'ললে—"অন্তত আজকের দিনটা ক্ষমা করো।"

পুরুষের মনের হাওয়াটাও ভিন্নদিকে বইতে আরম্ভ ক'রেছিল। তাই বোধ হয় ব'ললে—"একদিন নয়, চিরদিনের জন্যই ক্ষমা ক'রলুম"।

তাদের আর কালিম্পং যাওয়া হ'লনা।

বেশ বোঝা গেল পুরুষ ও নারী উভয়ের-ই মনে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রাণীটির কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সে যে-গাধা সেই-গাধাই র'য়ে গেল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

কথিকা।

——ঃ০ঃ——

সাম্‌নের বাড়ি তিনতলা। তার জানালার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবেশীর জীবনযাত্রার একটা জালিকাজকরা ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

একদিন কলেজের পড়া ছেড়ে সেই ছবির দিকে বনমালীর চোখ পড়ল। বিশেষ করে চোখ পড়ল তার কারণ, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দু'জন নতুন লোকের ছবি ফুটে উঠেচে। তাদের একজন বিধবা প্রবীণা, আরেকটি মেয়ের বয়স ষোল হবে, কি সতেরো।

সেদিন দেখা গেল সেই প্রবীণা জানালার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্চে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়চে।

আরেকদিন দেখা গেল চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি একলা বসে দিনান্তের শেষ আলোতে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের পিতলের ফ্রেম যত্ন করে আঁচল দিয়ে মাজ্‌চে।

তারপর দেখা যায় জানালার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা। কখনো বা কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছে; কখনো বা জাঁতি হাতে সুপুরি কাটে; কখনো বা স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোয়; কখনো বা বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেয়।

দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্‌ বিমর্ষ হয়ে আসে। সেই সময়ে ঐ মেয়েটি ছাতের চীলে-কোঠায় একলা পা-মেলে কোনো দিন কোলে বই রেখে পড়ে, কোনো দিন বা বইয়ের উপর চিঠির কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থম্‌কে থাকে, আর তার আঙুল যেন চল্‌তে চল্‌তে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা চিঠি লিখছিল, খানিকটা কলম নিয়ে খেলা করছিল, আর আল্‌সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছিল।

এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার মোটা মোটা হাতে মোটা মোটা কাঁকন। তার সাম্‌নের চুল বিরল, সেখানে সিঁথির জায়গাটাতে মোটা সিঁদূর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচম্‌কা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখী হঠাৎ যেন পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কখনো বা গভীর রাত্রে কখনো বা সকালে বিকালে ঐ বাড়ি থেকে এমন সব আভাস আসে, যার থেকে বোঝা যায় ঐ সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুক্‌চে।

অথচ জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তেমনিই চল্‌চে ডাল বাছা, আর পান সাজা,—মাঝে মাঝে দেখা যায় দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেচে উঠোনে কলতলায়।

এম্‌নি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের

উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলেচে, আস্তাবলের ধোঁয়া যেন অজগর সাপের মত পাক দিয়ে আকাশের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্চে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি তার ঘরের জানালা খুল্‌ল, অমনি তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের বাড়ি ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌চে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠেকে ঠেকে বারবার সে প্রণাম করলে; তারপরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখ্‌লে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্‌সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগ্‌ল সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল, কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কালেজ খোল্‌বার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সাম্‌নের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব কোথায় চলে গেছে।

বনমালী বলে উঠল, "যাক্‌, ভালই হয়েচে! স্বপ্নের বোঝার মত এমন বোঝা আর নেই!"

ঘরে গিয়ে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোষ্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুল্‌লে না। একবার কেবল সেটা কেরোসিনের আলোর সাম্‌নে তুলে ধরে দেখ্‌লে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে এও তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুল্‌তে গেল, তারপরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে নিজের মায়ের নামে শপথ করে বল্‌লে—"এ চিঠি কোনো দিন খুল্‌ব না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

——:০:——

কলিকাতা, ২০শে অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শীকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদবী দেওয়া উচিত, তিনিই এ-রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ-রাজকীয় জাতির সংখ্যা ততো অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্যপ্রদেশ সকলে, তাদের নির্ব্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকে মনে করেন শ্বাপদজাতির বংশক্ষয়ের জন্যে শীকারীরাই বিশেষরূপে দায়ী; একথা আফ্রিকা আর আমেরিকার সম্বন্ধে হয়ত বা সত্য। চতুষ্পাদ রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গের, যেমন হরিণমহিষের সংখ্যা, আমাদের দেশে এতই হ্রাস হয়ে গিয়েছে যে, সেটা একটা ভাবনারি বিষয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুরাগ আছে, সে কখনো নির্ব্বিচারে জীবহত্যা করে না; যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই প্রলয় জোয়ান, আর যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শীকার যাদের ব্যবসায় আর জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়, তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করেনা, জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা নিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদৌ নাই। এই অত্যাচার রহিত

করবার জন্যে অনেক বিধিবিধান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যক, তা নাহ'লে আমরা যে-সকল দৃশ্য আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘটবে না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে কটক জিলায়, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি, একএকটা শীকারযাত্রায় প্রায় তিনশত অনুচর সহযাত্রী হত—এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে-ধরণের বন্দুক ঘাড়ে করে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাম্বুতে ফিরতাম, তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে, আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক এক জন, ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে, বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হয়ে যেত; যে হতভাগারা উত্তরাধিকারী সত্ত্বে কিম্বা পয়সার জোরে এমন সব দানব-অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে নি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চড়ত, আর সেখান হতে মহাদেবের ভূত-প্রেতের মত অমানুষিক চীৎকার করে, ঢিল পাট্‌কেল, বড় বড় পাথরের চাঙড়, ছুঁড়ে, গড়িয়ে, শীকার খেদিয়ে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিছুই হ'ত না। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকর ছানা, সজারু—যাই পাশ দিয়ে যাক না কেন, অমনি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়্‌ত। যদিও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এপর্য্যন্ত দেখিনি, সে কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোরে; মরতে মরতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এই সব বুনোলোক যারা জঙ্গলের

অন্ধিসন্ধি খুব ভাল করেই জানে, তারা যে সময়ে-অসময়ে নির্ব্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজন্তুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শীকারী আমার মৃগয়া-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারল না; যে দিন আমি পৌঁছেছি, সেইদিন সকালেই সে এ মৃগয়া-রীতিবিরুদ্ধ কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়েছিল; কথা ছিল খোঁজখবর করে, ব্যাঘ্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন, তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে, শীকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামোছা, রক্তের জুলি, আর তার থেঁত্‌লান অর্দ্ধেক-খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল। পরে আমরা জানলাম, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষখাওয়া বাঘিনী আর তার তরুণ বংশধরেরা করেছে।

খুব সম্ভবতঃ শীকারী একটি চিত্তল অর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের আশায় আশায়, সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল,—মৎলব, যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আনবে—ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শীকার করে ফেল্‌লে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী, মৃগমাংসেও তাদের অরুচি ছিলনা, কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শীকারীরা যেমন নির্ব্বিচারে বনরাজ্যে জীবহিংসা করে বেড়ায়, মনে হল বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা এর প্রাণ নিয়ে তেমনি তারি প্রতিশোধ তুল্‌লেন। নর-মাংস আর

মৃগমাংসলোভী বাঘেদের কথা বলতে গেলে, বলা উচিত, তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও, একজাতীয়।

তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্য দশফুটের কিছু উপর (রোলণ্ড সাহেবের পরিমাপরীতি অনুসারে); শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, "বাঙ্গলার ব্যাঘ্ররাজ"। বঙ্গভূমির জলবাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়, তাই তারা দেখতে সহরের কাঙাল কেরাণীদের মত নয়, মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজারাজড়ার মত মেদমাংসবহুল, চালচলনও বিশেষ গম্ভীররকমের। কিন্তু যে সব বাঘ শীকারের সন্ধানে শুধু মাঠে-বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়তলীতে চলাফেরা করে, তাদের দেহগুলি, ক্ষিপ্রগতি রাজপুত বীরের মত দীর্ঘকায়, বসা মাংস-বর্জ্জিত, অস্থিমজ্জার সাম্যে দেখতে সুঠাম সুন্দর। তারা চতুর, সতর্ক, দ্রুতগতি, সহসা তাদের শীকার করা কঠিন; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ফাল্গুন চৈত্রে কিম্বা তার কিছু পূর্ব্বেই, যখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশ্যামলতৃণে সুসজ্জিত হয়, বাথানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহারবিহার করে' দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তাদের শীকার করে' করে,' ব্যাঘ্রবীরেরাও শীঘ্রই বৃঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ হয়ে ওঠে; তখন তাদের দিগ্বিজয়ী, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রঘুরাজ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যাঘ্রের ভাগ্যে পশুলাভ সহজ ব্যাপার নয়, অনেক পরিশ্রমই করতে হয়; হরিণ শূকর ভারি চতুর, পারতপক্ষে ধরা দেয়না, দিন গুজরান করতে অনেক মেহনত দরকার। তাই প্রাণধারণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গড়ে তোলা আর হয়ে ওঠে না, কাজেই নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে নিতে

হয়। এঁদের সম্বন্ধে যা ব'ল্লাম, চিতা ও নেকড়েদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্র-রাজদম্পতি যেখানে রাজত্ব করে, সেখানে অন্য কেউ আর অনধিকার চর্চ্চা করতে আসে না, তারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারচেষ্টায় দূরে যায়। এছাড়া আরও এক কারণ আছে, যে রাজ্য কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার করে থাকে, সেখানকার পশুপ্রজা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার সুবিধা বড় একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থসাধন করবার জন্যে স্বতন্ত্রদেশই শ্রেয়। এ ছাড়া, দেশবিশেষে এই সব জন্তু বাস করতে একটু বেশী ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে, তিন তিনটা চিতা, তিন মাসের মধ্যে, উপরি উপরি, আমার গুলিতে মারা পড়েছিল।

এদের স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ, আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশি, এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়। তা নইলে পুরুষদের কাছে স্ত্রীজাতিকে খাটো করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলকমণি, তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই, নাহয় তোমার পতি-দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তাহলেই কোন গোল হবে না! সন্তান পালন আর রক্ষণের জন্যেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশি সতর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধিখরচ, অনেক ফন্দীআঁটা দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণপোষণের ভার নিজেকে

না নিলে চলে না। যিনি জন্মদাতা তিনি কিছুই করেন না, উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন, সেই মৎলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড়সড় হয়ে যখন আত্মরক্ষা করতে পারে, তখনি তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জান বোধ হয়, বেড়ালের মত বাঘেরাও সুবিধা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মা তাদের অনাহারে, অনিদ্রায়, রাতদিন প্রাণপণ করে পাহারা দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম, কিছুতেই আর নাগাল পাই নে, তারপর সাবালক পুত্র-হত্যা-পাপের বমালসাক্ষীতেই সে বাঁধা পড়ল। গ্রামের কোন লোক একদিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ীর কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়ীখানি গ্রামের এক টেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতের উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে, সে দেখলে দুটি মস্ত চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জ্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি, দুয়ের মধ্যে যে বয়েসে বড়, আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ, অন্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরে যেমন ইঁদুরকে নাক্‌ড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল, করুণাময় পিতা আর তার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল। এ খবর ভোর-রাতে আমার কাছে পৌঁছল, কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না—এই ক'দিন ধরে ব্যাঘ্রবীরের তল্লাসে আমাকে ভারী হয়রান হতে হয়েছিল কিন্তু। বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় গিয়েছিল, বাবামশায়ের বুকে আর সে-টুকু সইল না—পুরুষব্যাঘ্র

ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না—এমন কি নিজের পুত্রেরও নয়!

তোমরা মনে কোরনা বাঘ কিম্বা চিতা, জলের ঘেঁষ নিতে চায় না; সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্যি, তবে দরকার হলে স্রোতে গা ভাসাতে আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধুবর্গ—যাঁদের সকলেরই সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত—আমায় বলেছেন আসামে, শ্রীহট্টে বাঘশীকারের সময় তাঁরা দেখেছেন—এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হয়ে যায়। একবার একটা বাঘ দেখে, তার অনুসরণ করে যেতে হঠাৎ দেখলেন, সে যেন ধোঁয়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেল, তার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে ঘাসেঢাকা মাঠ, তার চারদিকে হাতীর উপর শীকারী, এর মধ্যে কোন্ যাদুতে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বোধগম্যই হ'ল না। ক্রমে আবিষ্কার হল মাঠের একধারে একটি খাল—বাঘটি টুপ্ করে তারি জলে নেমে, শুধু মাথাটি জলের উপর জাগিয়ে রেখে, কিনারার একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে—সেই অবস্থাতেই সে মহারাজার—গুলিতে মারা পড়ল।

একবার একটা বাঘ, কিম্বা চিতা, যাই বল, (এদের মধ্যে আমিত কিছু প্রভেদ দেখি নে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন) মস্ত একটা বেতবনে ঘনঝোপে কোণ-ঠাসা হয়ে আট্কা পড়েছিল, পালাবার পথ তার একটিমাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো-ধূতির মত কম-চওড়া একটা খুস্কি পথ, আমি তারি পাশে টুল নিয়ে লুকিয়ে, তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম। শীকারীরা চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে' পিটতে পিটতে আসছিল, আমি

একান্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম—তখন আমার অবস্থা "পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং"!—কিন্তু কৈ, কারো দেখা নেই—আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে, তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয়েছিল, কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে, তাতে করে অমন প্রকাণ্ড জানোয়ার যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, একথা মনে করবার কোন কারণ ঘটে নি; আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে, কিছুতেই ভাবতে পারি নি যে অরণ্য-সম্রাট শার্দ্দূল প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে জীবননদীতে শেষ সন্তরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্য আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার করলে।—হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার করে উঠল, অন্য শীকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখি, সন্তর্পণে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে, সে চুপি চুপি পলায়নের চেষ্টায় আছে,—শীকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে, সবে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে!

এমনও দেখা যায়, বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে, নদীর কিনারা পর্য্যন্ত তার পায়ের দাগ ছিল, তারপর ধারে ধারে অনেকদূর সাবধানে হেঁটে গেছে, নিরাপদ পারঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁতরে অন্য পারে গিয়ে, যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় ওঠা যে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, তা সে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভীষ্ট সাধন করে নিয়েছিল।

এই সব নদীকে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা বিশ্বাস করা চলে না, তবুও হিতোপদেশের ঐতিহাসিক বাঘের চেয়ে, আমি যার কথা বলছি, তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল,—তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয় নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে, জেলের জালে আট্‌কা পড়ে বেঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃত দেহটা জেলেরা আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই মাগুর ধরবে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শীকার পেয়ে তারা ভারী খুসি হয়, লাভও করেনি মন্দ! তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে হাঁস চখাচখি, আর স্নাইপের মস্ত মেলা বসে যায়। কথায় বলে "গাঁ দেখ্‌বিত কলম, আর বিল দেখ্‌বিত চলন";—এ-বিল সেই বিখ্যাত চলন-বিলের শাখা, এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো মোষের দল চরে বেড়াত। একবার দুর্গা পূজার সময়, তখন আমরা ছেলেমানুষ, নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ ভোজনের দই ক্ষীর আর এসে পৌঁছয় না, ফলারেবামন পাত পেতে বসে গেছেন; কর্ত্তারা ঘর-বার করছেন, এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গোয়ালারা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে—একপাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক করে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িমাঝির সাধ্য কি যে নৌকা বেয়ে আসে। এ মোষের পাল তো সুবোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু সুবিধা হবে! তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনা হতে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমর্দ্দিনীকে ভোগের জন্যে মুখটি বুঁজে প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই, বিলগুলি মাঠ হয়ে

চাষবাস চলছে, মহিষাসুরও তার মোসাহেবের দল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

পাহাড়তলীর বনজঙ্গলে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মে, বাঘরা প্রায়ই নালায় গিয়ে পড়ে থাকে, তবে ভিন্ন কারণে, (মানুষে যে কারণে নালার আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয় !) ; আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নেমে আর উঠ্‌তে চাইনে, এও তেমনি আর কি।

(ক্রমশ)

পত্র।

—:*:—

শ্রীযুক্ত সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবুজ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে দু'একটি কথা, পাঠকদের তরফ হতে নিবেদন করছি। অবশ্য পাঠকমাত্রেই যে আমার মতের সঙ্গে সায় দিবেন, এমনতর প্রত্যাশা করি নে।

সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হল, তখন প্রবীণদের নিকট হতে যে ও পত্রিকা আশীর্ব্বাদ ও সমাদর লাভ করবে, সে দুরাশা অবশ্যই কেউ করেন নি; কিন্তু নবীনরা যে ওকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করবেন, সে আশাটা করা গিয়েছিল। ভরসা হয়েছিল আমাদের সামাজিক দুর্গতির দিনে এ পত্রিকাখানার পশ্চাতে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ সবুজ মনগুলি rally করে, মুক্তির গগনচুম্বী ধ্বজা এম্‌নি শক্ত করে তুলে ধরবে যে, নবারব্ধ crusade-এ জয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে পতাকা কখনো নামানো হবে না;—মুক্ত হাওয়ায় কম্পিত পতাকার তালে তালে স্বাধীন বক্ষের ভিতর সতেজ প্রাণগুলিও স্পন্দিত হতে থাকবে। সে আশা অনেকাংশেই ফলবতী হয় নি, কেননা তাহলে যাঁরা সবুজ পত্রের মতে subscribe করেন তাঁরা, একেবারে অক্ষম না হলে, পত্রিকাখানাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্ম তাঁতে

subscribe করতেন। গ্রাহকদের নিকট হতে একটু বেশি মূল্য পেলে, ও পত্রের পেট ভরলেও প্রাণ ভরবে না। অতএব পাঠকদের দিক থেকে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করছি।

বাংলা দেশের প্রায় কোনো পত্রিকারই একটা বিশেষ ভঙ্গী নেই। একখানা পত্রিকাকেই হরেকরকম মনের খোরাক জুগিয়ে চলতে হয় ;—যে ভাবতে চায় তাকে ভাবাতে হয়, যে কাঁদতে চায় তাকে কাঁদাতে হয়, যে হাসতে চায় তাকে হাসাতে হয়, তদুপরি আর্টগ্যালারি খুলতে হয়, এবং স্বরলিপি সরবরাহ করতে হয়। সাতমিশালি রং সাদা হতে বাধ্য, কাজেই আমাদের দেশের অনেক পত্রিকারই, ওজন কিংবা পরিমাণ যতই থাকুক, রঙের অভাব বড় বেশী। অবশ্যই এ অবস্থার জন্য আমাদের যে দারিদ্র্যই অংশতঃ দায়ী তা অস্বীকার কচ্ছি নে, কেননা একাধিক পত্রিকা নেবার মতো সঙ্গতি আমাদের দেশের বেশি লোকের নেই ; কিন্তু এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কোথায় আমাদের মনের সেই দুর্নিবার পিপাসা, যার দুরন্ত তাগিদে নব নব বার্ত্তা নিয়ে নব নব পত্রিকার অভ্যুদয় হবে ? কোথায় সে চিন্তার বিশিষ্ট ধারা, যার সাহায্যে আমাদের মনের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ? আমাদের মনের বিশিষ্টতা থাকলে, পত্রিকারও থাকত। পাশ্চাত্যে যে তা আছে তার প্রমাণস্বরূপ, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, এমন অনেক কাগজের নাম করা যেতে পারে, যা বহুকালাবধি কোন বিশেষ শ্রেণীর চিন্তা-ধারা বিতরণ করে জন সাধারণকে পরিপুষ্ট করছে, এবং নিজেও পরিপুষ্ট হচ্ছে।

সাতমিশালি সাদা রং থেকে—সৌর-কিরণ যে সাতমিশালি তা

সকলেই জানেন—সবুজ রংটা বের করে চোখে পড়িয়ে দেবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, তার কারণ আমি যা বুঝতে পারছি তা এই যে, সাদা আলোয় গন্তব্যস্থানটা সুস্পষ্ট করে, আর সবুজ আলোয় তা ঝাপসা হয়; আবার সবুজ আলোয় নৃত্য করবার যদি একটু প্রবৃত্তি হয়, সাদা আলোয় তা নিবে যায়। নৃত্যশিল্প আমাদের নয়,—পাশ্চাত্যের; আর বাঙালী যুবক বায়োস্কোপে Shackelton Expedition-এর ছবি দেখতে যতই ভালোবাসুক, একটি স্থান ব্যতীত অপর কোন ঝাপসা জায়গায় লাফিয়ে পড়তে সে একান্তই নারাজ। সে স্থানটি হচ্ছে বিবাহ-বাসর। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তুটি আহার ও পানীয় সরবরাহ করবার উপযুক্ত হলে, সে আর কিছুর জন্যই কেয়ার করে না। এরূপ ঝাপসার প্রতি সংস্কারগত অনুরাগ সম্ভবতঃ আমাদের জাতির কবিত্বের প্রমাণ। এ অবস্থায় যাঁরা পাটেল বিল সমর্থন করছেন তাঁরা যে পাট্‌কেল পাচ্ছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সরকার বাহাদুর যদি পাটেল বিল তুলে না নেন, তবে পাটেল বিলের বিরোধীরা যে পটল তোলবার কাছাকাছি যাবেন তা অসম্ভব নয়। কেননা উক্ত বিল যে শুধু অসবর্ণ বিবাহ আইন সিদ্ধ করবে তা নয়, নরনারীর পূর্ব্বরাগকেও প্রশ্রয় দেবে এরূপ আশা করা যেতে পারে; কারণ যাঁরা বিবাহ করবেন তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিলের স্মরণ গ্রহণ করবেন,—যাঁরা বিবাহ করাবেন তাঁরা নয়; এবং যাঁরা এরূপ বিবাহ করবেন, তাঁরা পরস্পরকে দেখেশুনেই বিবাহ করবেন।

যাঁরা বিবাহ নামক এত বড় ঝাপসা জিনিসটিকে এক মুহূর্ত্তে আয়ত্ত করে ফেলবার অমানুষী শক্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই আবার অপর কোন ঝাপসা জিনিস দেখলে যে একদম পিছ-পা হয়ে পড়েন কেন, তা

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন। সবুজ পত্র যে পথ দেখাচ্ছে সে, পথে অগ্রসর হলে কোথায় গিয়ে পড়ব তার ধারণা আমার নেই, অথচ দশের পথে চললে কোথায় গিয়ে পৌঁছব তা বিলক্ষণ জানা আছে ;—সে হচ্ছে যেখানে রয়েছি, সেখানেই। ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পানে ছোটবার পরিণাম হিতোপদেশে দেখেছি। অতএব সবুজ পত্রের আহ্বানে কর্ণপাত করবার যুক্তি-যুক্ততা প্রমাণিত না হলে, যুবকবৃন্দ যে অমনি অমনিই অকূলের পানে ছুটে চলবে, এমনতর প্রত্যাশা আমাদের দেশে করা চলে না।

মানবজীবনের লক্ষ্য কি?—এর জবাব নিঃসঙ্কোচে দিতে পারেন, এমন স্পর্দ্ধা যে কেউ রাখেন না, তা জোর করে বলা যেতে পারে। অবশ্যই "ধরি মাছ, না ছুঁই পানী" নীতির অনুসরণ করে "যা ভালো তা-ই লক্ষ্য" জবাবটা দেওয়া চলে। দার্শনিকেরাও দেখতে পাচ্ছি হোঁচোট খেতে খেতে সৃষ্টির লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐ নিরাপদ উত্তরটিই দিয়েছেন। ইতিমধ্যে দার্শনিকদিগের মুখব্যাদান দেখে, এর পরে পাঠকেরাও "ভালো"র মানে সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করবার ভরসা পাচ্ছেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রশ্নটি দুরূহ হলেও, মীমাংসা করবার চেষ্টা অবিশ্রাম চলেছে; কেননা মীমাংসাটা এতই জরুরী যে, এর একটা কিনারা না হলে জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপ অর্থহীন বলে মনে হয়। এথিক্সের স্তূপাকার পর্ব্বত ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে, এবং মানবের এ চেষ্টারও যে কোনকালে অবসান হবে, এমন লক্ষণ মোটেই দেখা যাচ্ছে না;—কেননা দিনের পর দিন মানুষের "angle of vision" বদলে যাচ্ছে।

এই ভাঙাগড়ার ভিতর বাঙালী জাতির আদর্শটি চিরস্থির রয়েছে বলে যে গর্ব্ব করা হয়ে থাকে, বিশ্বের মাপকাঠিতে সে গর্ব্বের মূল্য নিরূপণ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—যেটা এতদিন আবশ্যক হয় নি, আজ হঠাৎ আবশ্যক হয়ে পড়ল কেন? উত্তর নিতান্ত সোজা। ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম—এ গুলির প্রায় সব ক'টিকেই জয় করে মানবজাতি দেশ দেশান্তরে অবাধে যাতায়াতের পথ একেবারে উন্মুখ করেছে। পূর্ব্বের ন্যায় জীবনসংগ্রাম আর দেশখণ্ডে আবদ্ধ নয়,—একেবারে বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে।

জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করতে হলে আমাদের কয়েকটি রত্নকে যে সযত্নে রক্ষা করতে হবে, এমন কোনো যথার্থ হিতকামী সমাজ সংস্কারক নেই, যিনি তা অস্বীকার করেন। তবে এখন কেন নূতনের আবশ্যকতা বেশি, যাঁরা "অরণ্যের বাণী" পড়েছেন তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, এবং ওর চেয়ে সুন্দর করে বোঝানো সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে, সকল চিরাগত সংস্কারের স্তূপীকৃত জালজঞ্জাল আমাদের একেবারে চেপে রেখে এক পা'ও অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সে গুলোকে আর কতকাল এমনি করে পোষণ করে রাখব?

একটা প্রচণ্ড জবাব প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, মনু পরাশর যে-সকল ধারা গভীর চিন্তার ফলে প্রণয়ণ করলেন, কার এরূপ স্পর্দ্ধা যে স্বীয় সীমাবদ্ধ তর্ক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে-সকল ধারার সমীচীনতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে?—যুক্তিটি যে প্রবল তা মানতেই হবে! বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মানুষের ব্যক্তিত্বকে অপমান করে যিনি ভাববার ও চিন্তবার দায় হতে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তাঁকে

তর্ক করে বোঝাবার দুঃসাহস সম্ভবতঃ কেউ রাখেন না; তবে তাঁর পক্ষে একথাটি মাঝে মাঝে স্মরণ করা সম্ভবতঃ শক্ত হবে না যে, যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের জাতীয় জীবনকে কিছুমাত্র সত্য ও সৌন্দর্য্য দান করেছেন, তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন—

"যাঁরা সবল, স্বাধীন,
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্য জ্যোতিষ্মান,
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ,

* * * *

কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করিছেন ভেদ।"

যাঁদের চোখে সত্যের শুভ্র আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নি, যাঁরা সুমুখ হতে বিচারপ্রবৃত্তিকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে জীবনযাত্রাকে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট করেন নি, অথচ সমস্ত হৃদয় দিয়ে সত্যকে আহ্বান করবার শক্তি হতে বঞ্চিত; আশা করা যেতে পারে তাঁদের sophistry-র মৃদু-গুঞ্জন সবুজ পত্রের মর্ম্মর কলতানের নীচে চাপা পড়ে যাবে।

যে sophistry-র বিষয় উল্লেখ করা গেল তা যে মনঃকল্পিত নয়, তা দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে। কোন এক স্থলে সামাজিক কুসংস্কারকে প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, তাতে অস্ত্রপ্রয়োগ করলে যেমন প্রাণীর

মৃত্যু ঘটতে পারে, তেমনি আবহমান যে সকল কুসংস্কার চলে আসছে, অর্থহীন হলেও তাদের উপর হঠাৎ হস্তক্ষেপ করলে সমাজ-শরীর একেবারে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। অতএব কি জীবদেহের Vestigal organ, কি সমাজিক কুপ্রথা—উভয়ের তিরোধানের জন্য নীরবে অপেক্ষা করাই বিজ্ঞজনোচিত। আর এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, evolution একটি একটানা উর্দ্ধগামী ব্যাপার নয়;—মোটের উপর তার গতি উন্নতির দিকে হলেও তাকে উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে, ঢেউয়ের মতো, অগ্রসর হতে হয়। অতএব সমাজ-শরীরের কোন সাময়িক দুর্গতি দেখে ভয় পাওয়া অনুচিত, কেননা তা evolution-নিয়মের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কালের উপর বরাত দিয়ে সহিষ্ণুতার দাবী করা অবশ্যই সে জাতির পক্ষে শোভনীয়, যে জাতির অপরিসীম ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় বালবিধবার দুঃসহ নির্জ্জলা উপবাসে ও লাঞ্ছিত পত্নীর নীরব অশ্রুপাতে।

জীবদেহের সহিত সামাজের সাদৃশ্য যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাতে দু'একটি কলমের খোঁচায় তাকে টলানো সম্ভব নয়। আমাদের সামাজিক জীবনে এ সাদৃশ্যের শাখা-প্রশাখার ঘননিবিড় ছায়াকে আশ্রয় করে কোন কোন অর্থহীন সংস্কার নির্ব্বিবাদে বসবাস করছে। উদার আকাশের শুভ্রআলোক তাদের উপর পড়লে তারা পালাবার জন্য ছুটোছুটি করে মরতো। প্রাচীন সংস্কারের সে কালিমা সামাজিক বন্ধুরতার উপর ছায়া ফেলে জীবনযাত্রার পথ অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব রকম ঋজু করে ফেলেছে।

উপমা জিনিসটি কাজ করে চমৎকার ততক্ষণ, যতক্ষণ ওকে ওর

সীমানার মধ্যে আটকে রাখা যায়। উপমার কাজ হচ্ছে জটিল বিষয়কে বুঝিয়ে সহজ করা ;— যুক্তির point বের করা নয়। ভূমণ্ডল কমলালেবুর মতো দু'দিক চাপা বলে, উক্ত ফলের ন্যায় টক বা মিষ্টি নয়। মনুষ্যদেহকে ব্যঙ্গ করে forked radish বলা হয়েছে বলে, উক্ত দেহ মূলোর মত মাটি ফুঁড়ে নির্গত হয় না।

সমাজমন বলে যে বস্তুতঃ কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই, তা আপনি পূর্ব্বে এই পত্রিকাতেই বলেছেন। Social organism জিনিষটিও যে আকাশকুসুমের চেয়ে খুব বেশী সত্য নয়, তা বুঝতেও বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। সুলেখক Sir Leslie Stephen বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের ভিতর যে যোগ (abiding unity) থাকে, সমাজের ভিতর সেরূপ কোন যোগ নেই, যার জন্য তাকে social organism বলা চলে ; তিনি তৎপরিবর্ত্তে social tissue শব্দটি প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে আমাদের সামাজিক দুর্গতিকে যে উক্তপ্রকারে সমর্থন করা চলেনা, তা বলা বাহুল্য।

আসল কথা হচ্ছে যে, মানসিক জড়তার পরিমাণটা যখন বেশি হয়ে ওঠে, তখন যুক্তিধারার গতিটাও স্বচ্ছন্দ থাকে না ;—ব্যাধিভারে ঋজু হয়ে চলতে না পেরে তাকে বেঁকে চলতে হয়।

সত্য হচ্ছে আলোক—মনের searchlight। সে আলোক এত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ যে, যার উপর সে আলোক পড়ে তা একমুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর মতো উন্মুক্ত, নির্ভীক, সরল দৃষ্টিতে তাকানো চাই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সেই সহজ দৃষ্টির অভাবে সোজা জিনিষও বাঁকা হয়ে যায়। বিখ্যাত "সহজ"

পন্থী Charles Wagner সহজের গুনকীর্ত্তন করতে করতে বলেছেন—

Too many hampering futilities separate us from that ideal of the true, the just and the good, that should warm and animate our hearts. All this brushwood, under pretext of sheltering us and our happiness, has ended by shutting out our sun. When shall we have the courage to meet the delusive temptations of our complex and unprofitable life with the sage's challenge: "Out of my light"?

চির অভ্যস্ত পথে বাঁধি-বোল আউড়ে চলা সোজা হলেও, সেটা সহজ অবস্থা নয়। "সোজা" আর "সহজ"—এ দুয়ের পার্থক্য বোঝানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। তপঃপরায়ণ ঊর্দ্ধবাহুর অভ্যস্ত অবস্থাটি যতই সোজা হোক্, ওটি যে তার সহজ অবস্থা নয়, তা বলা বাহুল্য।

সেই সহজ পথ আবিষ্কারের নিমন্ত্রণ নিয়ে সবুজ পত্র আবির্ভূত হয়েছে। Brushwoodগুলি কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে, ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়ে সত্যশিবসুন্দরের আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে এবং চিরকাল চলবে;—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। হঠাৎ চলা থেমে গেলে কি দুর্গতি হয়, আমরা সবুজ পত্রের পাতাতেই অনেকবার তা জানতে পেরেছি। তাইতো লেখা হয়েছে—

"যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ
বস্তুর পর্ব্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।”

মানবসভ্যতার এমন একটি স্তর নেই যেখানে পৌঁছলে বলতে পারা যায় “Thus far and no further।” কি মনোজগতের, কি জড়জগতের, সব চেয়ে যে ধর্ম্মটি সত্য, তা হচ্ছে চলার ধর্ম্ম। সৃষ্টি লীলার গোড়ার কথাটিই গতির কথা, তাই বলা হয়েছে “Action was the beginning of everything,” এবং এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেই দার্শনিকরা causality-কে category-র অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন, কেন না কার্য্যকারণসম্বন্ধ-বোধটি পরিবর্ত্তন-বোধ অর্থাৎ গতি-বোধ হতেই উদ্ভূত।

অতএব সবুজ পত্রের কাছথেকে যে চলবার আহ্বান আসছে, তাতে কর্ণপাত না করে যিনি আভিজাত্যগর্ব্বে চণ্ডী-মণ্ডপের স্তম্ভটাকে আশ্রয় করে স্থাণু হয়ে বসে থাকবার প্রত্যাশা করেছেন, তাঁর প্রতি নিবেদন এই যে, একদিন প্রত্যুষে যখন তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন যে স্তম্ভটা অন্তস্তলে কীটদষ্ট হয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, এবং সে স্থানের মাটি ফুঁড়ে এক লক্ষ্মীছাড়া আগাছা অলক্ষিতে নির্গত

হয়ে তার কণ্টকাকীর্ণ দেহখানি সঞ্চালিত করে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে,—তখন যেন তিনি অদৃষ্টকে ধিক্কার না দেন।

সংস্কার-কার্য্য নানা প্রকারে চলতে পারে,—ধর্ম্ম প্রচার করে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করে, মিশন স্থাপন করে, ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল সংস্কার সে-পরিমাণে সার্থক হবে, যে-পরিমাণে তাদের গ্রহণ ও প্রচার করবার পক্ষে জনসাধারণের মন অনুকূল হবে। অতএব গোড়ার কথাটা হচ্ছে মনের সংস্কার। সেই সকলের-সেরা সংস্কার অর্থাৎ একেবারে vital point-এ হস্তক্ষেপ করেছে বলে সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা উচিত। ইতি।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

ইঙ্গ সবুজপত্র।

—*—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

আজ তোমাকে একটি সুখবর দিচ্ছি।

সবুজপত্র এতদিনে বাতিল হবার উপক্রম হল। সম্প্রতি এই কলিকাতা সহরে, ইঙ্গ-বঙ্গ দল থেকে আর একটি তরুণ সবুজপত্র বেরিয়েছে, যার তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র যেমন আধ-পাকা, তেমনি আধ-মরা। এই নবপত্র প্রথমত আকারে ছোট, দ্বিতীয়ত ইংরাজিতে লেখা। তালপত্রের চাইতে তেজপত্র যেমন ঝাঁঝালো, বাঁশের চাইতে কঞ্চি যেমন দড়,—বাঙলা সবুজপত্রের চাইতে ইংরেজি সবুজপত্র তেমনি বেশি ঝাঁঝালো, তেমনি বেশি দড়।

তা ত হবারই কথা। কে না জানে বাঙলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সেই তফাৎ, দেশী ওষুধের সঙ্গে বিলেতি ওষুধের যে তফাৎ। লোকে বলে আলোপ্যাথি হচ্ছে ফৌজদারী চিকিৎসা, ও কবিরাজি— দেওয়ানি। অর্থাৎ কবিরাজের তর সয়, ডাক্তারের সয় না। কবিরাজ রোগ জিনিসটিকে মুলতবি রাখতে জানে, তারপর তার চিকিৎসার আপিল আছে, খাস আপিলও আছে, এমন কি শেষকাণ্ডে হোমিওপ্যাথি নামক বিলেত আপিলও আছে।

ডাক্তারের কিন্তু সব তড়িঘড়ির ব্যাপার। আলোপ্যাথি যেমন-তেমন

ফৌজদারী আদালত নয়, একেবারে Martial Law Tribunal,—সেখানে মানুষ পায় হয় বেকসুর খালাস, নয় প্রাণদণ্ড—যার উপর আর আপিল নেই। এ ছাড়া আরও মিল আছে। ইংরেজি ওষুধ সব কটু কষায়, তারপর যেমনি স্বাদ তেমনি গন্ধ। কুইনিন আর কেষ্টরঅইল হচ্ছে ডাক্তারখানার সেরা ওষুধ। আর তার গন্ধ স্পর্শ রসের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ইউরোপের ধারণা—যে-বস্তু ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে, সে-বস্তু শরীরকে অনুগ্রহ করতে বাধ্য। আমাদের ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার করলে আত্মার উপকার হয়, কিন্তু দেহের হয় অপকার। আমাদের ওষুধের নাম শুনলেই কান জুড়িয়ে যায়—যথা রসসিন্দুর, স্বর্ণপট্পটি, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজ ইত্যাদি। তারপর এদের যেমন নাম তেমনি চেহারা,—কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি শুকশ্যাম, কোনটি হিঙ্গুলপারা; সব চিক্‌চিক্ করছে, চক্‌চক্ করছে, দেখবামাত্র মন নেচে ওঠে। ইংরাজিতে যাকে বলে love at first sight—কবিরাজি ওষুধের উপর চোখ পড়ামাত্র সকলেরই সেই মনোভাব হতেই হবে। তারপর দেশী ওষুধের অনুপান আছে, বিলেতি ওষুধের নেই। আর সে অনুপানের বালাই নিয়ে রোগীর মরতে ইচ্ছে যায়। স-মধু মরিচের গুঁড়া, মিছ্‌রির সরবৎ ও জামিরের রস, পানের রস প্রভৃতির সংযোগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু না পান করা যায়, লেহন করা যায়, চিবোনো যায়, চোষা যায়। সমাজদেহকে রোগমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বাঙলা সবুজপত্র কবিরাজীর আশ্রয় নিয়েছেন—আর ইংরেজি সবুজপত্র মায় সার্জ্জারি অ্যালোপ্যাথির। মহাকবি রাজশেখর সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন, ইংরেজির সঙ্গে বাঙলার প্রভেদও তাই। সুতরাং তাঁর

ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে, ইঙ্গ সবুজপত্র হচ্ছে "পুরুষ-পরুষ", আর বঙ্গ সবুজপত্র "মহিলা-সুকুমার"।

এরূপ হবার কারণও আছে। বল্‌তে ভুলে গিয়েছি যে, এই নবপত্রের নাম হচ্ছে Bulletin of the Indian Rationalistic Society। এই নামই প্রমাণ যে, এ পত্র বৈজ্ঞানিক সত্য ছাড়া আর কিছুই মানে না। যেমন আলোপ্যাথির, তেমনি এ সাহিত্যের ভিত্তিই হচ্ছে Biology, Physiology, Botany, Chemistry প্রভৃতি। যে কোন সামাজিক সমস্যা উঠুক না কেন, এ পত্র এর একটি না একটির সাহায্যে তার হাত হাত মীমাংসা করে দেবে। অপর পক্ষে বাঙলা সবুজপত্র নিঙড়ে কি বেরবে?—কিঞ্চিৎ কাব্যরস। আর হামান-দিস্তেয় কুটলে?—কিঞ্চিৎ দর্শন-চূর্ণ। এবং এ দুয়েরই অনুপান হচ্ছে—হাস্যরস। খোঁজ নিয়ে দেখ বাঙলা সবুজপত্রের লেখকমাত্রেই সেই শিক্ষায়, শিক্ষিত ইংরেজিতে যাকে বলে literary education; আর ইংরেজি সবুজপত্রের লেখকেরা সব বিজ্ঞানবিৎ। শুনতে পাই যে, ইউরোপের জনৈক মহা-দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন—পৃথিবীতে আগে আসে কাব্য, তারপরে দর্শন, আর সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ইংরেজি সবুজপত্রের আবির্ভাবের পর বাঙলা সবুজপত্র যে পিছনে পড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে পত্র মহিরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই লড়াই সুরু করে দিয়েছে, সে পত্রের আর মার নেই,—অবশ্য যদি বেঁচে থাকে। আমি এই নবোদ্গত পত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি শতায়ুঃ হও, আর তোমার ইস্পাতের দোয়াত কলম হোক।

(২)

এখন এ পত্রের মতামতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মনে আছে যে পাটেল-বিল নিয়ে দেশে যখন একটা পণ্ডিতের তর্কের সুরু হয়, তখন সনাতনপন্থীর দল অসবর্ণ বিবাহের বিপক্ষে eugenics নামক একটি নেহাৎ কচি ও কাঁচা বিজ্ঞানের দোহাই দেন। সে দোহাই আমরা অমান্য করতে পারি নি,—কেননা বিজ্ঞানকে আমরা রাজার মত মান্য করি এবং রাজার মতই ডরাই। তারপর এই নব সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে eugenics-এর ব্যাখ্যান পড়ে আমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল,—পণ্ডিত ম'শায়েরা পড়লে তাঁদের মস্তকের শিখা যে যথার্থই অর্কফলা হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। Eugenics-এর বাঙলা জানিনে, কিন্তু তার একেলে সংস্কৃত হচ্ছে সু-জনন বিদ্যা। এ বিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্রমতের অর্দ্ধেক মিল আছে—কিন্তু বাকী অর্দ্ধেকের ফারাক আশমান-জমিন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এ সত্য সুজনন-শাস্ত্রীরাও মানেন; কিন্তু "পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্", এ বচন শোনামাত্র এ শাস্ত্রের সিংহব্যাঘ্রেরা মহা গর্জ্জন করে উঠবেন, এবং এ কথা যারা মুখে আনে, তাদের পিণ্ডি চটকাতে প্রস্তুত হবেন।

এঁদের মত হচ্ছে "পুত্রষণ্ড প্রয়োজনম্"—কেননা তার কৃপায় জাত আপনাহতেই বড় হয়ে উঠবে, উঁচু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের ছেলেমেয়েরা সব সুজন ও সুজাতা হয়েই ভূমিষ্ঠ হবে। এ বিজ্ঞান নরনারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখে না, দেখে শুধু জনক জননী হিসেবে; সুতরাং আমরা যাকে বিবাহ বলি, এ মতে সে হচ্ছে

শুধু জোড়কলম বাঁধবার হিসেব। যে শাস্ত্রমতে গৌরীদানের মাহাত্ম্য গরুদানের চাইতেও বেশি, সেই পুরোনো শাস্ত্রের হিসেবের সঙ্গে এই নতুন শাস্ত্রের হিসেবের যে কোনও মিল নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এদেশে কোন কথাই বলা বাহুল্য নয়। অতএব উক্ত পত্র হতে শ্রীযুক্ত আর, সি, মৌলিক মহাশয় কর্তৃক রচিত আর একটি প্রবন্ধ হতে ক'ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Putrarthhé kriatê varjya"

(One marries a woman for begetting sons). Poor little thing ! She is forced into the bed of a hulking youth, and he inculcates on his "phantom of delight" on the propedeutics of the metaphysics of love, inside a comfortable curtain. Before reason and judgment gather strength, before any principles are formulated, the epitheumetic impulses are precociously provoked, by the presence of an object calculated to inflame them, and the shameful connivance of an agent interested in their premature development".*

এর চাইতে পরিষ্কার কথা আর কি হতে পারে?—এর লক্ষ্য এত সিধে আর এর বেগ এত বেশি যে, এ কাগজের নাম Bulletin না হয়ে Bullet হওয়াই উচিত ছিল!

* (Bulletin of the Indian Rationalistic Society. Vol I. No 3. p. 43).

(৩)

এই বিজ্ঞান-তান্ত্রিক বীরাচারীদের শাস্ত্রের কারবার যে শুধু রক্তমাংস নিয়ে তা নয়—তাঁরা মাদক দ্রব্যেরও সন্ধানে ফেরেন। এঁরা চতুর্ব্বেদ ঘেঁটে সোম যে কি পদার্থ, তার পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছেন। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের" পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা এক সঙ্গে সুরা ও সোম পান করতেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই স্বস্তি বচন পাঠ করতেন—

"ওহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক
পৃথকরূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন।

তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা
আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

সেই অবধি সুরা ও সোম যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান আমারও ছিল; কিন্তু সোম জিনিষটি কি, তার সঠিক খবর আমি ইতিপূর্ব্বে পাই নি। এই নবপত্রের একটি অশেষ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে আবিষ্কার করলুম যে, সোম রসায়নের অধিকারভুক্ত নয়—ও পদার্থ হচ্ছে আসলে ভেষজ, যাকে আমরা হরিতানন্দ বলে থাকি। কিন্তু এতে আমার মনে একটু খটকা লগল। আফিং ও মদ যে জুড়িতে চালানো যায়, সে ত সকলেরি দেখা-সত্য। এবং এ জুড়ি কদম কদম চলেও ভাল,

যেহেতু এর একটি আর একটিকে রোখে, ছারতকে উঠতে দেয় না। তবে গঞ্জিকা ও সুরার ত এরকম জুড়ি মেলানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একসঙ্গে এ দুয়ের এস্তমাল করলে মানুষে যে "বুঁদ হয়ে যাবে, বোঁ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, তারপর না হয়ে যাবে"! রস-তত্ত্বের পারদর্শী আমার অনৈক ধ্যাসনালিষ্ট্ বন্ধু কিন্তু আমার এ সন্দেহের নিরাস করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মত মানুষ হলে, সে নিজ মস্তিষ্কে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় কর্‌তে পারে, আর আমাদের বৈদিক পিতামহেরা, অর্থাৎ সত্যযুগের তাঁরা ত মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সব demi-god, সুতরাং তাঁদের পক্ষে উক্ত উভয় রস যুগপৎ অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করাটা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, দেবতারা যে নন্দন কাননে চির-আনন্দে বাস করেন, সে একমাত্র কল্পতরুর প্রসাদে; কেননা কল্পতরু হচ্ছে সেই গাছ —যার পাতা সিদ্ধি, ফুল গাঁজা, ফল ধুতুরা, আঠা আফিম, ছাল চরস, রস মদ, আর শিকড় কোকেন। একথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বল্‌লেন—"তুমি ভাবছ যে এমন গাছ থাকতে পারে না, যাতে এই সকল তেজস্কর দিব্য পদার্থ একাধারে পাওয়া যায়? অমরাপুরীর কথা ছেড়ে দাও, যদি Botany জানতে তাহলে এ সত্যও জানতে যে, এই ভারতবর্ষেই এক গাছ আছে, যার পাতা হচ্ছে পান, ফুল জয়িত্রী, ফুলের বোঁটা লবঙ্গ, কুঁড়ি এলাচ, ফল জায়ফল, ছাল দারচিনি, আঠা খয়ের, আর শিকড়চূর্ণ চূন"। আমি বিজ্ঞানকে রাজার মত মান্য করি ও রাজার মত ডরাই, সুতরাং ঐ botany-র দোহাই দেবামাত্র আমি বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিলুম যে, সোম হচ্ছে ত্বরিতানন্দ।

তবে ও বস্তু সিদ্ধি কি গাঁজা, সে বিষয়ে আমার মনে এখনও ধোঁকা রয়েছে—কেননা গঞ্জিকা মানুষে গুলে খায় না, টানে। অতএব আমি ধরে নিচ্ছি যে, সোম হচ্ছে সিদ্ধি। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে সকলকেই মানতে হবে যে বঙ্গ সবুজপত্রের রস হচ্ছে সোমরস। সিদ্ধির পাতার সঙ্গে উক্ত পত্রের দুটি জবর মিল আছে। প্রথমত ও দুয়েরি রঙ সবুজ, দ্বিতীয়ত ও দুয়েরই রস পান করলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। অপরপক্ষে ইঙ্গ সবুজপত্রের রস যে সুরা, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই—কেননা ও হচ্ছে একদম বিলেতি মাল। অতএব আমাদের যুবকসম্প্রদায় যদি এই উভয় সবুজপত্রের রস একাধারে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে পান করতে ব্রতী হন, তাহলে প্রমাণ হবে যে তাঁরা সব সত্যযুগের লোক; এবং তাও আবার যে-সে লোক নয়—একদম ক্ষত্রিয়।

এ ক্ষেত্রে আমার প্রার্থনা শুধু এই যে—

"ওহে সুরা ও সোম! তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

এ প্রার্থনা যে কতদূর সঙ্গত, দুকথায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুরা যে তেজস্বিনী, এ কথা জগৎবিখ্যাত, আর ত্বরিতানন্দ রাজার নেশা না হলেও নেশার রাজা। তারপর দেবগণ সত্যসত্যই এ দুয়ের জন্য পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করেছেন। সিদ্ধির গন্তব্য স্থান হচ্ছে cerebrum এবং সুরার cerebellum—অর্থাৎ এর একটি হচ্ছে জ্ঞানমার্গের, আর একটি কর্ম্মমার্গের নেশা।

এরা যদি পথ ভুলে এ ওর আর ও এর ঘরে গিয়ে ঢোকে, তাহলে মনোরাজ্যে যে কি উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তা সকলেই আন্দাজ করতে পারেন। আর এ দুটি যদি মিলে মিশে এক হয়ে যায়, তাহলে এর রসে আর ওর রসে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শূন্য।

বীরবল।

২৪শে অগষ্ট, ১৯১৯।

ঝুপ্ ঝুপ্-চুপ্।

(ঢাকা—মাণিক গঞ্জের মৌখিক-ভাষায় লিখিত)

আষাঢ় পার হৈয়া শাওন মাস পৈরচে, ঝিনই বিলের মাঠখান জলে নৈদাকার। আগৈর খ্যাতের আউসধান পরায়ই কাটা হৈচে, নামী খ্যাতের পাকা ধানের কালা কালা বাইল(১) গুলা তল হৈতে হৈতে কোন মতে জলের উপর জাইগা রৈচে মাত্র। তামান দুফুর গুরানি বিষ্টির পরে শেষ বেলার নিভাজ(২) আকাশে রুগীর মুখে হাসির সলকের(৩) রকম একটুখানি রৈদের জিল(৪) দেখা দিচে; তাতে আশার থিকা আশঙ্কাই হৈতাচে বেশি। তির্‌তিরা হাওয়ায় জলের ধলি চাক্‌লা(৫) জুইরা চেলা-ঢেউ(৬) উঠ্‌চে। মাঠের ইখানে-ওখানে গিরস্তগোরে পারা-গাড়া(৭) ডিঙ্গি নাও। কোন কোন নায়ের লগির মাথায় চাষালোকের শুকাব্যার-দেওয়া খাট-বহরের কাপর নিশানের রকম বান্ধা। বেবাক নাও খালি। চাষারা সকলেই জলে খারায়্যা ধান কাটত্যাচে; আইজ কেউর মুখ দিয়াই ভাইটাল গানের সুর বাইরয় নাই। সগলেই বাড়ন্ত জলের জোয়ারের মুখে থিকা

(১) শীস্। (২) পরিষ্কার। (৩) আলোর রেখা। (৪) রশ্মি। (৫) সীমা। (৬) ক্ষুদ্র। (৭) বাঁধা (anchored)।

আপন আপন বছরকার মিহানতের ধন—পাকা আউস, ছিনায়্যা রাখনে ব্যস্ত।

চাইরদিগের থৈ থৈ জলের পূবপারে সেওরাতলি গাও। মাঠের মধ্যিখান থিকা দেইখ্‌লে মনে হয় য্যান গাওখান জলের উপর ভাস্‌ত্যাচে। ধনুকের মতন গাছের একটানা ব্যাকা(১) একটা সাইর(২), তারি আবডালের নীল ফাসা(৩) দিয়া খানকয়েক কুড়া ঘরের খোলা দুয়ার, চাষার মনের মমতা-মাখা চইখের(৪) মতন মাঠের দিগে একদিষ্টে তাকায়্যা রৈচে।—আর, গেরাম-লক্ষ্মীর সবুজ গাছের সোয়াগ-আচল ছিরা্যা দিয়া গায়ের বুকের উপর চাষাগোরে কলিজার রক্তে লাল হৈয়া-ওঠা মহাজনের দোতালা দালানটারে ঠিক একটা দেমাকি দৈত্যের মতন দেখা যাত্যাচে। তার খোলা দরজার মস্ত হা'র মধ্যে সে য্যান সারাটা মাঠের বেবাক ফসল ভর্‌ব্যার চায়!

মাঠের ফস্‌লি খ্যাতগুলারে দো-আধ্‌লা(৫) কৈরা দিয়া নিলখের(৬) দিগে চৈলা-যাওয়া হালটের ধলিখান ঘুমের আলসের মতন নিভাজ হৈয়া পর‍্যা রৈচে। তারি এক কিনারে পারা-গাড়া ডিঙ্গি নাও-খানের ধারে বুক-সমান জলে খারায়্যা ফজু সেক জলে তল্‌তল্‌-হওয়া আউস ধান কাটব্যার লাইগ্‌চে। তামাদ্দিন না-নাওয়া-খাওয়ার আগুনের জ্বালা তার দেহের মধ্যে ধপ্‌ধপায়্যা জ্বৈলা উঠ্যা আপ্‌নেই নিব্যা গেচে,—কেবল মাথার আতেল্যা(৭) ভুল্‌কা(৮) চুল আর গাথায়(৯) পড়া-চইখে তার না-নাওয়া-খাওয়ার সকল তাপ মাখা। তার মন আর দেহে নাই, ধানের ঐ বাইলগুলার মধ্যে আইজ তার বাসা,

(১) বাঁকা। (২) সারি (Line)। (৩) ফাঁক। (৪) চক্ষু। (৫) দ্বিধা-বিভক্ত। (৬) দিক চক্রবাল। (৭) তৈলহীন। (৮) সাঁকড়া। (৯) কোটরগত।

তার চইখের সবখানি নজর খালি ঐ খ্যাতের ব্যার টুকের মধ্যেই লাইগা রৈচে। গায়ের বেবাক জোর সে আইজ তার হাত দুইটির রগে রগে চালায়্যা দিচে। নাকের নিয়াস'ও(১) বিরাম মাইনা চলে, তার হাতে কামের আইজ আর থামন নাই। হায়রে—তার যদি আর দুইটা হাত থাইক্ত!

দুই রোজ একজায় ডাওয়রের(২) পর আইজকার বিষ্টি-থামা বিকালে বাবুগোরে ছোট্ট পান্‌সীখান মাঠে বাইর'চে। এতক্ষণ চকের(৩) দক্ষিণে বিলের আন্দাজলে(৪) বাইচ্-খেলা হালটের ধলি দিয়া বাড়ী ফিরনের মুখে নাওখান ফজুর খ্যাতের কিনারে আইসা পৈল। মাঝি-গোরে খালি হাতে বসায়্যা থুয়্যা মাইজা বাবুর ছাওয়াল পাছা-নায় হাইল ধৈর্‌চেন, আর বড় তরপের চশমা-আলা বাবুর লগে সেনেগো বাড়ীর আর মিত্তির বাড়ীর দুই ছাওয়াল আগা-নায়(৫) বৈঠা হাতে বসা।

মাজাজলে(৬) খারায়্যা উপুর হৈয়া ধান কাটনে লাগা ফজু সেকেরে দেইখা মাইজা বাবুর ছাওয়াল তার নাম ধৈরা ডাইক্‌লেন। আইজ পাচ দিনও পারয় নাই ফজুর ম্যায়া(৭) তিনির কাছে থিকা বাপের লাইগা জ্বর ছাড়নের ওষুদ নিয়া গেচে!

ইদিগে—শেষ বেলার রৈদের জিল্‌টুক ঢাইকা কাজ্‌লা(৮) মেঘের মস্ত একটা খাণ্ডারা(৯) তামান্ আকাশ ছায়্যা ফেলাল্য। তার কালা-রং-এর ছাপে সারা পির্থিমি মসিমাখা(১০)। খেইতারা(১১) সগলে

(১) নিশ্বাস। (২) শ্রাবণ-বর্ষা, ঘন-বর্ষা। (৩) মাঠ। (৪) স্রোতহীন (stagnant)। (৫) নৌকার সম্মুখ দিক। (৬) কোমর জল। (৭) মেয়ে। (৮) কাজল বর্ণ। (৯) খণ্ড। (১০) কালো রং। (১১) কৃষক ভৃত্য, যারা কৃষকদের মাঠে সহায়তা করে।

সার্ সার্(১) কৈরা কাটা-ধান নায় ভরব্যার লাইগ্‌ল,. কেউ ধান-বোঝাই নাও তরাতরি বায়্যা বাড়ী ফিঁর্‌য়া চৈল্ল। ফজুর আইজ আর কিছুতেই ভুর্‌খেপ্ নাই। সে ক্যাবল জলের উপর জাগা অন্ধকারে পরায় মিলায়্যা-যাওয়া কালা কালা ধানের বাইলগুলারে হাত্‌রায়্যা হাত্‌রায়্যা কাট্‌ত্যাচে,—এখনো যে তার অদ্ধেক খ্যাত বাকী।

মাইজা বাবুর ছাওয়ালের ডাকে সে তিনির দিগে মুখ ফিরায়্যা তাকাল্য, ঠিক সেই লগে হাতের বৈঠা নামায়্যা রাখনের অব্‌সরে-ভরা ছয় ছয়খান হাতের উপরে তার চইখের বেবাক নজর অনার(২) হৈয়া লুটায়্যা পৈল। বাবুগোরে দেখন মাত্রেই তার হাতে রোজকার মতন সেলামটাও যে আইজ উঠ্‌ল না। মাইজা বাবুর ছাওয়াল যে তারে এম্নিভাবে জলে ভিজনের নিষেধ কৈর্‌লেন, নিয়ম মতন ওষুদ খায়্যা বেরাম ভাল করণের উপদেশ দিলেন, ই-সগলের কিছুই তার কানে ঢুক্‌ল না। জল দেইখ্যা তিষ্ণায়-ফাটা পরাণের মতন তার মন যে রৈচে—ক্যাবল ঐ নায়ের উপকার হাত ছয় খানির দিগে হাপুস্ হৈয়া তাকায়্যা!

ঝর্ ঝর্ কৈর্‌য়া বিষ্টি পরায় নামে নামে, বাবুগোরে বাইচের নাও ফজুর খ্যাত ছারায়্যা খানিক তফাতে গেচে। আকাশ-জোরা নিশুতি(৩) আন্ধার আর বিষ্টির আঝইর(৪) ঝরায় দিগ্‌দিশা বেবাক বুজায়্যা(৫) দিল,—ক্যাবল, ফজুর খ্যাতের কালা কালা ধানের বাইলগুলা আন্ধারের

(১) অতিক্রমে। (২) অনড়। (৩) নিস্তব্ধ। (৪) অনবরত। (৫) ঢাকিয়া, আবৃত করিয়া।

সেই কষ্ঠি কাজলের মধ্যে থিকাও তার জলে-ভরা চইখের দিগে একদিস্টে চায়্যা রৈচে!

*   *   *   *   *

খেইতারা সব চৈলা যাওয়নে সারা মাঠ নিটাল(১)—নিভাজ, জন-প্রাণীর কাসির আওয়াজটাও নাই, ক্যাবল দূরে শুনা যায় ছয় খান হাতের বৈঠায় জলের বুক আগ্‌লায়্যা-যাওয়া—ঝুপ্ ঝুপ্—চুপ!

(১) নিস্তব্ধ, জন মানব শূন্য।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মানুষ ও সমাজ।

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান—আর সমাজকে গড়ে' তুলেছে মানুষ। সুতরাং মানুষের জীবন সমাজের দাবী চাইতে চিরকাল মহত্তর বৃহত্তর, ও শক্তিশালী হয়ে থাকবেই। কেননা মানুষ সর্ব্ব কালের কিন্তু সমাজের কোন একটা বিশিষ্ট দাবী কেবল একটা বিশেষ কালের—যা-গড়ে' উঠেছে বিশেষ একটা প্রয়োজনের তাগিদে—কিম্বা বিশিষ্ট একটা মনের ভঙ্গীতে।

কি আগে? মানুষ না সমাজ?—মানুষই আগে—মানুষই সমাজ গড়ে' তুলেছে—মানুষেরই প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ দানা বেঁধে উঠেছে। আজ আমরা সেই মানুষকেই খাটো করে' সমাজের বিধি নিষেধকেই বড় করে' তুলেছি—অর্থাৎ সমাজের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মন নিয়ে যে প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের যেমন ভঙ্গিমা গড়ে' তুলেছিলেন, সেই ভঙ্গিমাটাকেই আজ আমরা বড় করে' দেখছি—কারণ সেইটেই যে আমরা চর্ম্মচোখে দেখতে পাই—সেই বিশেষ ভঙ্গিমার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মন ছিল তা আমাদের আলোচনার মধ্যেই আসে না—তাই সেই বিশেষ ভঙ্গিমাটা দিয়েই আজ আমাদের প্রয়োজনকে আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে যাচ্ছি। যাত্রা সুরু করবার সময়ে আমরা গরু দিয়েই গাড়ী টানিয়াছি, মাঝ পথে এসে

আজ আমরা গাড়ী দিয়ে গরু টানাবার পরামর্শ সভা বসালেম। এই পরামর্শ সভায় মন্ত্রনাদাতা তাঁরাই যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সারূপ্য লাভ করবার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছেন, যাঁদের প্রাণ নির্ব্বাণের রাস্তা ধর-ধর। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন হলুদ বরণ প্রৌঢ় বটপাতাটা তার বোঁটা থেকে খসে পড়তে পড়তে, তার পাশেই নতুন বেরিয়ে-আসা সবুজবরণ কিশলয়টাকে চোখ উল্‌টে উপদেশ দিচ্ছে—দেখ্, তোর ঐ সবুজ রঙের কোনই মানে নেই—ঐ আকাশের পানে চাওয়া আর ঐ বাতাসের সুরে গাওয়া সে কেবল চোখের ও গলার ক্লান্তি—আর ঐ সবগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে মনের একটা বিরাট ভ্রান্তি।

কিন্তু প্রাণ যে জান্‌বেই—সে ত "মোহমুদ্গারের" সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শঙ্করভাষ্য পড়ে নি। সে ত যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের পাতা উল্‌টোয় না। কোন দিক থেকে একদিন সে মরা গাঙের-ডাকা বানের মতো হুড়মুড় করে' এসে পড়ে—তার সে উচ্ছল চলচঞ্চল নৃত্যশীল স্রোতের বেগ হাস্‌তে হাস্‌তে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সে স্রোতের বেগে তার দু'পারে যেখানে যত আল্‌গা মাটির চাপ সব ঝুপ্ ঝাপ্ করে' জলে পড়ে' কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। মানুষের প্রাণ যেদিন জাগে, সেদিন পুঁথির পৃষ্ঠার সঙ্গে সে প্রাণকে মিলিয়ে নেবার জন্যে সে মোটেই ব্যাকুল হয় না—কারণ সে জানে যে তার নিজের মধ্যেই প্রাণকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবার দেবতা জাগ্রত হ'য়ে আছেন—সে সেদিন এক শাস্ত্রের শ্লোককে খণ্ডন করবার জন্যে আর এক শাস্ত্রের শ্লোক খুঁজে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে না—তার যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই—কারণ তখন যে তার সত্য আছে—তাই সে

আপনার মুখের ভাষায় সোজা কথায়, সহস্র বিপদ যুক্তি থাকলেও তার মাঝে নির্ভয়েই বলে' ওঠে—

"মনের পথে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তিও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধু মাঝে মুক্তাভরা শুক্তি ও।"

ডেকে যখন বান আসে তখন ত নদীর সেই সংকীর্ণ পুরোনো খাতেই আর চলে না। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তার সে দু'পাশেও পাড়ির পাড় ভেঙ্গে কতদিনকার জানাশুনো নিবিড় ঝাউয়ের তিমির বন উপড়ে ফেলে, কত শতাব্দী পরিমিত মাথায় জটা বটগাছটার গহন ছায়া মুছে নিয়ে, তখন নদীকে একটা বৃহত্তর খাত করে' দিতেই হয়। একটা জাতির অন্তরে যখন তেমনি প্রাণের বান ডেকে আসে তখন ত তার সেই পুরোনো মনের খাতেই আর চলে না—তখন সেই জমাট বাঁধা মনের খাতের আশেপাশের হাজার পরিচিত সামগ্রীর মায়া ছেড়ে, সে মনের খাতকে বড় করতেই হয়—সে মনের খাতকে বড় হতেই হবে—আর তবে হবে জাতির পক্ষে মঙ্গল। কেননা পুরোনো মনের খাতকে বড় করলে তার আশেপাশেরই কিঞ্চিৎ ভাঙাগড়া করতে হবে—কিন্তু সেই মনের খাতকে কিছুমাত্র বড় না করলে প্রাণের বান উপ্‌চে উঠে এমনি একটা লণ্ডভণ্ড করবে যে তাতে সে পুরোণো মনের খাতকে ত চেনাই যাবে না, অথচ তার জায়গায় আর কোন নতুন শৃঙ্খলাকেও আমরা পাব না। প্রাণ যেখানে জেগেছে সেখানে সংকীর্ণতাকে মাথা নত করতেই হবে, সঙ্কোচকে কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতেই হবে। প্রাণের এই সনাতন ধর্ম্মকে মেনে যে সমাজ এই প্রাণকে অভিনন্দিত করে' তাকে প্রশস্ত কর্ম্ম-

পাইয়ে দেবে, সেই সমাজই মঙ্গলকে পাবে—নইলে ঐ প্রাণের স্রোতের ছলছল হাস্য কলকল অট্টহাস্যে পরিণত হ'য়ে মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও, অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকেও, অধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকেও ভাসিয়ে নেবে—তখন আর কালিয়-নাগকে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশীল চরণের তলে ফণা-বিস্তার করে' থাকতে দেখব না—দেখব তখন তা রুদ্রের মস্তকে আসন নিয়েছে।

ভগীরথের শঙ্খরবে যেমন ভাগীরথী নেমে এসেছিলেন, তেম্‌নি করে শঙ্খরবে যে বাঙলার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণের স্রোত চারিয়ে গেল—এটা ত আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। অসংখ্য শুষ্ক পত্র, শুভ্র পত্র, পীত পত্রের ভিতর থেকে যে "সবুজ পত্র" জেগে উঠল, আকাশের ভরা আলোর দিকে চোখ মেলে দিল, বাতাসের খোলা সুরের পানে কান খুলে দিল—সেই জেগে-ওঠার পিছনে যে কার্য্য কারণ দুই-ই রয়েছে—বাঙালীর কবি যে জমাট-বাঁধা বিজ্ঞতার বয়েসে শরৎ-উষার মতো তাজা ঠোঁট নিয়ে "ফাল্গুনী"র বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বসন্ত-উষার মতো তরুণ সুরে গাইলেন—

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবে ছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।

এত কবির একলার কথা নয়—এর পিছনে যে সমস্ত দেশের নব-জন্মের বেদনার আনন্দ রয়েছে—লক্ষ তরুণ তরুণীর মূক মুখের নীরব

ভাষা কবি-হৃদয়ের শৃঙ্খল-হীন বিরোধ-হীন সহানুভূতির ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরে জমা হয়ে উঠে তাঁর বাঁশীর গানে মূর্ত্ত হল—তাই না ও-গানকে আজ আমরা সত্য করে' পাচ্ছি, অমৃত বলে মানছি। ঐ নবীন কিশলয়গুলোকে যে আজ বাড়তেই হবে। জমাট-বাঁধা পাকা পাতার রাশের ভিতরে যেখান দিয়ে একটুকু আলোর রেখা আসছে, একটুকু বাতাসের আভাস ভাস্‌ছে সেই দিক দিয়ে যে তাদের কচি কচি মাথা ঠেলে তুলতেই হবে। কিন্তু মানুষ ত উদ্ভিদ নয়। গাছের পাতাকে যেখানে একটুকু আলো একটুকু বাতাসের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে—মানুষ সেখানে সেই আলো বাতাসের জন্যে আকুল হয়ে উঠলে তখনই তার চারিদিকের দেয়ালের গা ভেঙ্গে মস্ত মস্ত জানালা বসিয়ে দেবে। এই জানালা বসাবার কথা মুখে আনতেই ত বিজ্ঞ মহলে মহা মাথা নাড়ানাড়ি পড়ে গেল। তাঁরা অবস্থা সঙ্কীর্ণ বুঝে দু' আঙুলের বদলে চার আঙুলের ফাঁকে প্রকাণ্ড এক টিপ নস্যি নিয়ে বলতে সুরু করলেন—না, না, জানালা?—তা হতেই পারে না—এমনি নিরেট দেয়ালের মাঝে আমরা পাঁচ শ' সাত শ' হাজার বছর কাটিয়েছি, আর আজ কিনা সেখানে ম্লেচ্ছের অনুকরণে একটা বিশ্রী হাঁ-করা জানালা বসিয়ে দেবে—এ হতেই পারে না। আর ঐ জানালা দিয়ে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই কখন কি যে ঢুকবে তার ঠিক কি? আলো বাতাসের জন্যে ব্যাকুল যাঁরা তাঁরা বিজ্ঞ মহলের ও-কথা মোটেই কানে তুলছেন না - ও-কথা মান্‌বার তাঁদের উপায়ই নেই। তখন বিজ্ঞ-মহল সেই দেয়ালের ধারে ধারে হাজার হাজার শাস্ত্র-পুলিশকে মোতায়েন করে' দিলেন—বুক ফুলিয়ে বললেন এখন এসো দেখ দিখি কে এই সনাতন দেয়াল ভাঙ্গে। সেই

শাস্ত্র-পুলিশরা দাঁড়িয়েই রইল—ভারী ভারী মোটা মোটা জাদ্‌রেলি চেহারা—তাদের কাঁধে অনুস্বারের সঙ্গীন—পিঠে ঝুলোনো ব্যাগে বিসর্গের "গ্রেনাদ্"—দু'-গালে লক্ষ্য বছরের বর্দ্ধিত মিশমিশে কালো গালপাট্টা—গালপাট্টা দাড়ি গোঁফে তাদের চেহারা যে কেমন তা দেখাই যায় না—তারা দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করছে না অভয় দিচ্ছে তা বোঝবারই উপায় নেই—সে চেহারা দেখে বিজ্ঞ-মহলের সাহস বেড়ে গেল—বড় আর এক টিপ নস্যি নিয়ে মাথাটা তেজালো করে' জোরালো গলায় হাঁক্‌লেন—এইবার এসো দেখি কে এ দেয়াল ভাঙ্গবে—এ আমার বাড়ী আমার ঘর—আমি এ কাউকে ভাঙ্গতে দেব না। সবুজ পাতারা বসন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে অতি অপ্রতিভ ভাবে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—মহাশয়রা গোড়াতেই একটা বড় ভুল করে' বসবেন না—এ আমাদেরও বাড়ী বটে।

যুদ্ধ বাধল—অর্থাৎ বাকের। চক্রব্যূহ রচিত হল—অর্থাৎ তর্কের। প্রবীন দল নবীন দলকে চোখ রাঙিয়ে বললেন—তোমাদের প্রাণের স্রোত না অশ্বডিম্ব—আসল কথাটা হচ্ছে ছেলেমানুষী, উত্তরে নবীন দল প্রবীন দলকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—আপনাদের বিজ্ঞতা না হাতি—আসল রোগটা হচ্ছে আরামী মেজাজ। প্রবীণরা গেলেন চটে। তাঁদের মুখ দিয়ে তখন গাদা গাদা অনুস্বার বিসর্গ ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল। নবীন তা মহা কৌতূহলী হয়ে এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিতে লাগল। মনে মনে প্রবীণদের উদ্দেশ্য করে' বল্‌লে—আপনারা অনুস্বার-বিসর্গেরই চর্চ্চা করুন, আমরা এদিকে জানালা বসাই।

কিন্তু নবীনরা যে শুধু গায়ের জোরেই জানালা বসাবে, এই এত

বড় অভদ্র কথাটা ত আজ কিছুতেই চোখ খুলে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—বাড়ীর রঙ্ ঢঙ্ কার ব্যবস্থানুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে? ঐ আরামী মেজাজের মতলবে? না—ছেলে-মানুষের খোস খেয়ালে? এর বিচার কেবলমাত্র একই উপায়ে হতে পারে। সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ দু'দলকেই আলোচনার বাইরে রেখে ঐ বাড়ীর চিরন্তন মঙ্গলের পথ কি, নির্দ্ধারণ করা—ঐ বাড়ীর এক যুগের লোকের আরামের ব্যবস্থা নয়—কিম্বা এক দল লোকের খেয়ালের সার্থকতা নয়—সেটা হচ্ছে সকল যুগের লোকের কল্যাণের পথ। সুতরাং আমাদের সত্য দেখতে হবে কেননা একমাত্র সত্যেই কল্যান রয়েছে। দেখতে হবে আমাদের মানুষের সত্য, সমাজের সত্য—ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যেকার যে যোগ সেই যোগের সত্য-সম্বন্ধ।

(২)

মানুষের অন্তরে সবার চাইতে আদিম সম্পদ হচ্ছে তার স্বাধীনতা। একদিন মানুষ ছিল বাতাসের মতোই স্বাধীন—কিন্তু না—বাতাসের চাইতেও বেশি। কেননা বাতাসের মন বলে' কোন জিনিস নেই—কিন্তু মানুষের ছিল। বাতাসের চলা-ফেরা নির্ভর করে অনৈসর্গিক কারণের ওপরে—কিন্তু মানুষের চলাফেরা নির্ভর করে তার নিজের উপরেই—তার ইচ্ছা, তার will-এর উপরে। সেই আদিম-কালে মানুষের যে কেমন জীবন ছিল তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগ্‌ল, ততই দেখা গেল যে মানুষের অন্তরে এই স্বাধীনতার পাশে পাশে আর একটা নতুন জিনিস গড়ে'

উঠছে—সেটা হচ্ছে অপর মানুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা। নিতান্ত একা থাকাটা তার কাছে ধীরে ধীরে রসহীন হ'য়ে উঠল। এমন কি তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতাও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারলে না। নিজেকে সে অন্যের ভিতরে দেখতে চায়—নিজের মনের ভাব সে অন্যকে জানাতে চায়। তার সুখে দুঃখে আমোদে আহ্লাদে একজন অংশীদার না হ'লে আর তার চলে না। যেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হ'ল সেই দিন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হল। সেদিন নিশ্চয় দেবলোকে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল—স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। কেননা সেই যে কোন্ আদিম কালে কোন্ গহন ঘন অরণ্যের অন্তরালে দুটি মানুষের মিলন, সে হচ্ছে মানব-সভ্যতা-সৌধের প্রথম প্রস্তর-স্থাপনা। ঐ দুটি মানুষের একদিন মিলন হয়েছিল বলে' জঙ্গল কেটে পল্লী বসল, পল্লী ক্রমে নগর হল, নগর নগরী ক্রমে রাজ্য হল, রাজ্য ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হ'য়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিচিত্রতম বিলাসের পথ করে' দিলে—বিচিত্রতম বিকাশে সার্থক করে তুল্‌লে।

কিন্তু ঐ যে অসীম স্বাধীনতার অধিকারী দুটি মানুষ—যে মুহূর্ত্ত থেকে সেই দুটি মানুষ একত্র বসবাস করতে আরম্ভ করল—সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাদের সেই অসীম স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হল। কেননা তখন তাদের ঐ একত্র বসবাস চিরকাল সম্ভব করে' তুলতে চাইলে তাদের দুজনকেই পরস্পরের মন রেখে চলতে হবে—পরস্পরের সুখ সুবিধা দেখতে হবে—পরস্পরের রুচি বিশ্বাস ভাব সমস্তকে সম্মান করে' চলতে হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে যদি তাদের পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে' চলতে হয়, তবে তাদের একত্র

বসবাস যে রাত্তিরও পোয়াবে না এটা নিশ্চয় করে' ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আঘাতের উপরে কিছুই গড়ে ওঠে না, তার নীচে যা কিছু সবই ভেঙ্গে যায়। সুতরাং ঐ দুটি মানুষ যদি বাস্তবিকই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গলাভের একান্ত অভিলাষী হন তবে তাদের মনের ভাব প্রাণের বেগ ইত্যাদিকে একটা সংযমের মধ্যে আবদ্ধ করতেই হয়—এক কথায় তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হয়। অপরের সঙ্গলাভের ইচ্ছা সার্থক করতে চাইলে মানুষকে ঐ মূল্যই দিতে হয়। এই হচ্ছে সমাজ সম্বন্ধে ভিতরের আসল কথাটা।

সুতরাং আমরা যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনটাকে একটা সংযমের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাই—আমাদের মনকে প্রাণকে বাক্‌কে কার্য্যকে একটা সংযমের বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করি, সে-সবের আদিম সত্যটা—অর্থাৎ যে-সত্য থেকে তা উদ্ভূত হয়েছিল - সেটা নৈতিক শিক্ষাও নয় বা আধ্যাত্মিক দীক্ষাও নয়—সেটা হচ্ছে কেবল মানুষের একটা ইচ্ছার সার্থকতা সাধন করবার জন্যে, আর একটি ইচ্ছার সঙ্কোচ। রামের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব করবার নিতান্তই গরজ হয়ে থাকে তবে অবশ্য রামের পাকা-ধানে মই দেওয়াটা তার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়—এটা বোঝবার জন্যে পদ্মাসন করে' ধ্যানে বসে যেতে হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম যেদিন দুটি মানুষের মিলন হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ কত লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে গিয়েছে—আজ মানুষের সমাজ দুটি মানুষের নয়—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের। এতদিন বেঁচে এসে আজ আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অনেক পরিমাণেই জানি—তার মনের ভাব, প্রাণের ভঙ্গী, বুদ্ধির গতি ইত্যাদি অনেক রহস্যই

আজ আমাদের চোখের সাম্‌নে খুলে গেছে। আজ আমরা জানি তার দুঃখ কিসে, সুখ কোথায়। এই মানুষকে আজ আমরা জানি বলে' আজ আমার প্রতিবেশী কিসে আমার প্রতি বিরূপ না হয় তার জন্যে প্রতি পদে পদে আমাকে আর চিন্তা করে' করে' পা ফেলতে হয় না—তার সম্বন্ধে আমার একটা ব্যবহার জমাট বেঁধে উঠেছে। কিন্তু আমাদেরই এই জমাট-বাঁধা ব্যবহারের পিছনকার আসল সত্যটা সবাই ভুলে গিয়েছি—আজ আমরা ঐ ব্যবহারের পিছনকার একটা মানসী মূর্ত্তিকে সত্য-দেবতা রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি—এই দেবতারই নাম হচ্ছে নীতি। কিন্তু ঐ যে বলেছি আমাদের জমাট-বাঁধা ব্যবহার, এ আমাদের এমনি অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—এমনি second nature হ'য়ে উঠেছে যে, ঐ ব্যবহারের অন্তরালে যে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্কোচ রয়েছে তা আমরা কেউ মনেও করতে পারি নে—কেননা সেই আদিম মানুষের মতো সেই উদ্দাম স্বাধীনতা আজ আমরা কেউ অনুভব করতে পারি নে—অশিষ্ট মনের চাঞ্চল্যও আজ আর আমাদের জীবনে নেই। এ-সব অত্যন্তই ভাল কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু—

এই "কিন্তু"টাকে নিয়ে যত মুস্কিল। কেননা সমাজের উপরে যেমন ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার আছে তেমনি ব্যক্তি বিশেষের উপরেও সমাজের অত্যাচার বলে' একটি পদার্থ আছে। আর এ দুই অত্যা-চারের দ্বিতীয় আত্যাচারটিই ভীষণ। কেননা একটা মানুষ যখন সমাজের উপরে অত্যাচার করে' তখন তাকে শাস্তি দেবার জন্যে ত লক্ষ লোকের মন বুদ্ধি হাত পা রয়েছেই—যার শক্তি অব্যর্থ। কিন্তু যখন লক্ষ লোকে মিলে একটা ব্যক্তির উপরে অত্যাচার করে'

তখন আর তার কোন আপিল নেই। এই ব্যষ্টির উপরে সমষ্টির অত্যাচারের সম্ভাবনা ও সুবিধা বর্ত্তমান হিন্দুর সমাজে অনেক। হিন্দুর সমাজে মানুষের মনে নীতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিও এসে যোগ দিয়েছে—এই রীতিনীতিই বর্ত্তমানে ধর্ম্ম নাম নিয়ে হিন্দু সমাজে একাধিপত্য রাজত্ব বিস্তার করেছে—এই ধর্ম্ম যেমন তেমন ধর্ম্ম নয় একেবারে সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মের দু'পাশে দুই অসুর দাঁড়িয়ে মোটা মোটা দু'জোড়া গোঁফ পাকিয়ে চোখ লাল করে মানুষের আত্মা নামক জিনিসটিকে একেবারে চেপ্টা করে' ছেড়ে দিচ্ছে—এই দু'-অসুর হচ্ছে সমাজ-চ্যুতি ও স্বর্গচ্যুতির ভয়।

(৩)

এখন পূর্ব্বে যা বলে' আসা গেল সেই কথাগুলো যদি স্বীকার করি তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও মানতে হয় যে, আমাদের যে প্রতি-দিনকার আচার ব্যবহার—তা সে আচার ব্যবহার আমাদের মনে অধিষ্ঠিত নীতি-গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়েই সোজা চলুক, বা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি-দেবতার মুরুব্বিয়ানার আদরেই "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলে' মাটি গেড়ে বসুক —সে রীতিনীতির একটা মুসাবিদা মনুই লিখুন বা রঘুনন্দনই করুন—সে সবের একটা কোন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মূল্য বা অর্থ নেই—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে spiritual significance ও intrinsive value, তা নেই। আর এ কথাটা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, সকল জিনিসেরই আধ্যাত্মিতার দিকটাই হচ্ছে মানুষের দিক থেকে সবার চাইতে বড় দিক।

উপরের ঐ কথা শুনে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই বলে' উঠবেন, ওটা হচ্ছে একটা অতি সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত—ও সিদ্ধান্ত সত্যিও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যা যদি হয় তবে ত ও-কথা বলাই পাপ, আর যদি সত্যি হয় তবে অমন সব সাংঘাতিক সত্য দশজনের সমুখে প্রকাশ করার মতো অবিবেচনার কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। কেননা আমরা যদি রীতির পিছন থেকে নীতি ও নীতির পিছন থেকে নরক-ভয়কে খারিজ করে' দেই, তবে সমাজের রামশ্যামহরি অমনি সবাই উশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে—কাউকেই আর ঠেকান যাবে না। কিন্তু আসলে কোন ভয় পাবার দরকার নেই। কেন?—তা বলছি।

প্রথমত, এ-কথা সত্য নয় যে রামশ্যামহরি আজ সবাই উশৃঙ্খল হবার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে—এবং তারা তাদের সে রোখকে সংযম করে' রেখেছে কেবল পরলোকের ভয়ে। সামাজে উশৃঙ্খল হবার অর্থ—অন্তত যে উশৃঙ্খলতায় সমাজের আর দশজনের প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু আসে যায়—সেটা হচ্ছে সমাজের অপর সভ্যদের আঘাত করা—দেহে বা মনে। কিন্তু অপর মানুষকে আঘাত করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। যদি বল যে সমাজে কেউ কাউকে কি আঘাত করে না?—অবশ্য করে। কিন্তু সেইটেই হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সমাজের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে যারা আঘাত করে তাদের সংখ্যা যারা আঘাত করে না তাদের চাইতে অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, মানুষ সাধারণত শান্তিপ্রিয়—অ-সাধারণত সংগ্রাম-প্রিয়। যে উশৃঙ্খল সে সমাজে অশান্তি আনবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারও অশান্তি ঘটায়—সুতরাং আপন গরজেই তাকে সংযমী হতে হয়।

তৃতীয়ত, মানুষের অপর মানুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা এমনি একটা প্রবল ইচ্ছা, এমনি একটা সত্য ইচ্ছা যে, কেবল ওর তাগিদেই তাকে অন্য দশজনের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হবে। মানুষের পক্ষে অপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি ইত্যাদি আকর্ষণ করবার ইচ্ছাও একটা অতি স্বাভাবিক ইচ্ছা—এই ইচ্ছাই মানুষকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রীতিমান হ'তে শেখায়, কেননা এক প্রীতিই প্রীতিদান করতে পারে। অবশ্য এমন লোকও দেখা গেছে যারা প্রীতিরও ধার ধারে না বা শান্তি-শোয়াস্তিরও তোয়াক্কা রাখে না—কিন্তু দেখা গেছে এমন লোকদের রীতির পিছনে নীতি ও নীতির পিছনে আধ্যাত্মিকতার লম্বা বক্তৃতা জুড়ে দিয়েও তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। সুতরাং নতুন কোন একটা সামাজিক প্রলয়ের কারণ সৃষ্টি করা হবে না, যদি একথা বলা যায় যে আমাদের আচার ব্যবহারের পিছনকার অর্থটা আধ্যাত্মিক নয়, সেটা হচ্ছে নিছক সামাজিক—অর্থাৎ ওর Significance spiritual নয়—Sociological.

আসলে মানুষ দেবতা না হলেও দানব নয়—মানুষের মধ্যে ভাল হবার ইচ্ছা নিজ গুণেই বর্ত্তমান। নিট্‌স্‌শ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি ইত্যাদি চিরকাল বর্ত্তমান হ'য়ে রয়েছে এবং আশা করা যায় চিরকাল থাকবেও। মানুষের মধ্যে যদি এই নিজে ভাল হবার ইচ্ছা, পরের ভাল করবার ইচ্ছা না থাকত তবে এতদিনে মানুষের হাতে পায়ে বড় বড় ধারাল নখ দেখতে পাওয়া যেত। মানুষ এঞ্জিন নয় যে তাকে "রিলিজনের হাপরে পুড়িয়ে নীতির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে গড়ে তোলা যাবে। মানুষের অন্তরে এমন একজন কেউ আছেন যিনি আপন আনন্দেই মানুষকে

চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। মানুষকে অতিরিক্ত objective করে দেখাই ভুল দেখা। মানুষের আসল সত্যই হচ্ছে যে, সে Subjective—কারণ সে চৈতন্যময় পুরুষ। মানুষের অন্তরের ঐ পুরুষকে অস্বীকার করে যখন আমরা বাইরের নিয়ম কানুনকেই চরম করে তুলি, তখন আমাদের ব্যবহারটাও সঙ্গে সঙ্গে হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর মতো হ'য়ে পড়ে। রাজা হবচন্দ্র একদিন ফাল্গুনের শেষে প্রচণ্ড বিরক্ত ও বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন। মন্ত্রী গবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দশহাজার লোক লাগিয়ে দিলেন রাজবাগানের হাজার আম গাছে উঠে তাদের ডালপালা ভীষণ ভাবে ঝাঁকাঝাঁকি করতে। বলা বাহুল্য উক্ত উপায়ে কোন বাতাস সৃষ্ট হয়ে গ্রীষ্মকে শীতল করেনি—লাভের মধ্যে সেবার রাজার আমবাগানে একটি আমগাছেও আম ফলল না।

কেউ কেউ এইখানে বলে' উঠতে পারেন যে মন্ত্রী গবচন্দ্র যাই করুন না কেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক যেমন সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করে' তাকে "ইলেকট্রণ"-এ পরিণত করেন, তেমনি নীতি জিনিসটাকে অমন করে' বিশ্লেষণ করে' আকাশে উড়িয়ে দেবার প্রয়োজনটা কি? রীতির পিছনে নীতি, নীতির পিছনে স্বর্গলাভের লোভ থাকলই বা—ওই ভয়ে আর ওই লোভেই যদি সমাজে দু' একজনাও শিষ্ট হয়ে ওঠে তবে ক্ষতিই বা কি আর মন্দই বা কি? অবশ্য কথাটা অত্যন্ত সমীচীন।

কিন্তু আমাদের সমাজমনকে চারিদিক থেকে যে বহুদিন হ'ল নানা ব্যাধি আক্রমণ করেছে এটা আজ আমরা আমাদের শরীর একটুখানি নাড়াচাড়া করতেই টের পেয়েছি। আজ আমরা বিশ্ব মহারাজের

রাজপথে একটুকু সজোরে পদক্ষেপ করে' দু' এক পা যেতেই আমাদের মনের নানা দিক থেকে মুমুর্ষূর যন্ত্রনার "উহু উহু" শব্দ শুনতে পেয়েছি। ঐ "উহু উহু"-তে আমরা আজ সন্তুষ্ট। কারণ ওটা হচ্ছে এরি প্রমাণ যে আমাদের মন একেবারে অসাড় হয় নি—অর্থাৎ মরে নি—তবে ব্যাধি-আক্রান্ত। কিন্তু রোগমুক্ত হবার ইচ্ছা মানুষের একটা স্বভাবিক ইচ্ছা। আমাদের সমাজ মনকে আমরা সকল প্রকার ব্যাধি হ'তে মুক্ত করতে চাই-ই। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কথাটা আজ সবাই জানেন যে রোগীকে ভাল করতে হ'লে সর্ব্ব-প্রথমে দরকার তার সর্ব্ব-প্রকার ভয় ভাঙ্গান। আমাদের সমাজ-মন থেকে সর্ব্ব-প্রথমে দরকার সকল প্রকারের ভয় তাড়ান। নীতির পিছনের যে সত্যটা সেটা যে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহলোক বা পরলোকের ভীতির উপরে নয়—একথাটা তাই আজ আমাদের পরিষ্কার করে দেখতেই হবে। যে ছেলেটা অতিরিক্ত রকমের দুর্দ্দান্ত সে-ছেলেটার পক্ষে দু' একটু জুজু-বুড়ির ভয় থাকাটা হয়ত মন্দ নয়—কিন্তু যে পিলেপেটা রোগা ছেলেটি বাতাস একটু জোরে বইলেই ভয়ে কেঁকিয়ে ওঠে তার মনের পিঠে আরও দু'-একটা ভুতের ভয়ের পুলটিস্ লাগিয়ে দিলে সে যে অতি শীঘ্রই পঞ্চভূতের সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে তার কোন সন্দেহ নেই। সকল রোগীরই যে এক পথ্য নয় এটা কি আয়ুর্ব্বেদ কি হোমিওপ্যাথি কি এলোপ্যাথি সকল শাস্ত্রেই বলে। আর আমাদের সমাজের, দুর্দ্দান্ত ছেলেটার চাইতে পিলে-পেটা ছেলেটার সঙ্গেই যে বেশি সাদৃশ্য আছে তা নেহাৎ অপ্রত্যক্ষ নয়।

এখন উপরে যে সব কথা বলা গেল সেই সব কথার সিদ্ধান্ত

স্বরূপে এই কথাটা নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে মনে করি যে, যিনি সমুদ্রযাত্রা করেন আর যিনি করেন না, তাঁদের দু'জনের মধ্যে স্বর্গলাভের সম্ভাবনার কোনই তারতম্য নেই। যে-কোন সমাজের যে-কোন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সুতরাং হিন্দুর সামাজিক আইন কানুনের, মানুষকে বিশেষ করে' ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে দেবার, কোন ভগবানদত্ত ক্ষমতা নেই।

সুতরাং এই কথাটা আজ আমরা নির্ভয়েই মনে করব যে আমাদের বাপ দাদারা টিকটিকিটাকে যতখানি সম্মান করে' চলতেন, আমরা যদি ততখানি সম্মান করে' না চলি, তবে আমাদের আত্মার অধোগতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যে টিকটিকিটাকে সম্মান না-করবার স্বাধীনতা এই-ই হচ্ছে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা ;—প্রাচীনের কবল থেকে, গতানুগতিকের শৃঙ্খল থেকে, অর্থাৎ অপর মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তা হোক্ সে "অপর মানুষ" নিজেরই বাপ-দাদা। এই স্বাধীনতা যেখানে অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে মানুষের প্রাণের গতি মরে' এসেছে, মন জমাট বেঁধে উঠেছে, বুদ্ধি অল্প হ'য়ে গিয়েছে—মানুষ ধীরে ধীরে সেখানে হয়ে ওঠে মেষ। ঐ অবস্থায় তারপর একদিন যখন এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে আমাদের মনুষ্যত্বের ডাক পড়ে তখন অন্তরের চারদিকে হাত্ড়ে হাত্ড়ে দেখি সেখানে কোন খানেই এক ছটাক মনুষ্যত্বও আর অবশিষ্ট নেই।

এই মনুষ্যত্বের ডাক পড়েও—কেন পড়ে? তা বুঝলেই ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসবে।

(৪)

যে-মানুষ বলে জগতে যা-কিছু জানবার আছে তা তার জানা হ'য়ে গেছে—এবং সে যা জানে তাই হচ্ছে সকল জানার সেরা জানা—এ-জগতের একেবারে শেষ খবরটা পিতামহ ব্রহ্মা তার কাছে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে তারহীন টেলিগ্রাফের কোডের সাহায্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন —তার আর কিছু জানবারও নেই বোঝবারও নেই, শোনবারও নেই শোনাবারও নেই—সেই মানুষটাকে আজ আমরা এই 'হাজার প্রশ্ন হাজার সমস্যার মাঝে অবশ্য কৃপার চক্ষেই দেখি এবং তার তুল্য হাস্যাস্পদ জীব আর আমরা খুঁজে পাই নে। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যা হাস্যাস্পদ মাত্র একটা সমাজের পক্ষে ঠিক সেইটেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

মানুষের উপরোক্ত মনোভাব, দুটি কারণে ঘটতে পারে। একটি হচ্ছে তার মস্তিষ্ক নামক স্থানটিতে বুদ্ধি নামক পদার্থটির কিঞ্চিৎ অভাব—দ্বিতীয়টি তার হৃদয় নামক জায়গাটিতে আত্মম্ভরিতা নামক জিনিসটির প্রচুর সদ্ভাব। ঐ দুয়ের পরিণাম ফলই হচ্ছে মানুষের পতন। সমাজ ও জাতির দিক থেকে ফল একই।

সেই প্রথম যেদিন দুটি মানুষের প্রথম মিলন হয়েছিল—সেদিন থেকে লক্ষ বৎসর কেটে গেছে—আজ মানুষের সমাজ যে কেবলই লক্ষ লক্ষ মানুষের, শুধু তাই নয়—আবার লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সমাজও বটে —যা গড়ে' উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভেদে জাতিভেদে বা দেশভেদে। এই সব বিভিন্ন সমাজের মধ্যেও আদান প্রদান চলেছে। মানুষের ও মানুষের মধ্যে যে আদান প্রদানের ইচ্ছার সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে

মিলন হয়—ব্যষ্টির বৃহত্তর রূপ সমষ্টিগত সমাজেও সেই সত্যই ফুটে উঠছে। ব্যষ্টিতে যা আছে সমষ্টিতেও সেই ধর্ম্মই ফুটে ওঠে। ব্যষ্টিগত ভাবে সবাই সামাজিক জীব—আর সমষ্টিগত অবস্থানে সবাই মৌনী-বাবা হন না। আবার অপর পক্ষে ব্যষ্টিতে যা মোটেই নেই সমষ্টিতে হলেই তা গজিয়ে ওঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই উড়ে-মালি—আর তারা সমষ্টিগত হলেই নেপোলিয়ান বা চেঙ্গিস্‌খাঁর মত পৃথিবী জয় করে' নিয়ে এলো—এমনটা হয় না।

সে যা হোক্, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে এই যে আদান প্রদান তা হতে পারে—এবং চিরকাল যা হ'য়ে আসছে—দুটি রকমে। হয় প্রীতির ভিতর দিয়ে মিলনে, নয় দ্বন্দের ভিতর দিয়ে সংঘর্ষে। এই দ্বন্দের পিছনে আছে সমাজবিশেষের স্বার্থ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বেষ। এই সংঘর্ষ যে কেন হয়, মানুষের স্বার্থ যে কত রকমের সে আর এক লম্বা ইতিহাস। বলা বাহুল্য তার জায়গা এখানে নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সংঘর্ষ হয়ই—এটা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য।

এই দু'-রকমের আদান প্রদানে মানুষের দু'-রকম মনের ভাব হতে বাধ্য। যখন কেউ প্রীতি সঙ্গে নিয়ে মিলন প্রত্যাশী হ'য়ে আমাদের দ্বারে আসে তখন আর তাকে আমরা ফেরাতে পারি নে—মানুষের সে স্বভাব নয়। কিন্তু যখন কেউ স্বার্থ বা দ্বেষ সঙ্গে নিয়ে আমাদের আঘাত করতে আসে, তখন আমরা সে আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণ কবুল করি—মানুষের এও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই দ্বেষের সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে আমাদের বাধ্য হ'য়ে দেশের কথা কইতে হয়।

একটা দেশে জাতি বা সমাজের প্রতি আর একটি দেশ জাতি বা সমাজের যে আঘাত—এ আঘাতের দুটো দিক আছে—একটা অন্নের দিক আর একটা আত্মার দিক—হয় দেহ দিয়ে দেহকে আঘাত, নয় মন দিয়ে মনকে আঘাত। আমরা হিন্দুরা দেহের চাইতে আত্মাকে বড় বলে' মানি—সুতরাং সমাজে সমাজে এই দ্বন্দে মনের পরাজয়ই বড় পরাজয়।

এই পরাজয় থেকে বাঁচবারও আবার দুটী উপায়। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে দশদিকের দিকপালগণকে সাক্ষী রেখে আততায়ীর কাছে হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়া যে, আমার দেহ তার দেহের চাইতে দৃঢ়; আমার মন তার মনের চাইতে বলিষ্ঠ—দেহের ধ্বংস ঘট্‌তে পারে কিন্তু আমার আত্মার স্বাতন্ত্র্য তার আত্মার নিকট মাথা নত কর্‌বে না—কর্‌বে না। আর ঐ করতে গেলেই তখন ডাক পড়ে মানুষের মনুষ্যত্বের। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এই মনুষ্যত্বই বজায় থাকে না, যদি না মানুষের মনের দিকটা মুক্ত থাকে।

আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে সমাজের চারিদিকে প্রকাণ্ড "অচলায়তনের" দেয়াল তুলে দিয়ে অবরুদ্ধ দুর্গবাসীর মতো বাস করা। হিন্দু এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছিল।

কিন্তু ঐ দ্বিতীয় উপায়টি একটা উপায় হলেও, ওই উপায়ের ভিতরে একটা মস্ত বিপদ আছে—যদি না সব সময়ে সজাগ থাকা যায় তবে সেই বিপদ মানুষকে জড়িয়ে ধরেই। কারণ "অচলায়তনের" ঐ দুর্গের মাঝে মানুষকে বাস করতে হয় সমস্ত বিশ্বকে বাইরে রেখে—তাকে চলতে হয় সমস্ত বিশ্বমানবের সংস্পর্শ থেকে

আপনাকে বাঁচিয়ে। তার সাম্‌নে আর তখন কোন নতুন সমস্যা নেই, নতুন চিন্তা নেই, নতুন প্রশ্ন নেই—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই "থোর বড়ি খাড়া" আর "খাড়া বড়ি থোর"—ঐ অবস্থায় সব কিছুই পুরাতন হয়ে আসে—সেই পুরাতনে সব একঘেয়ে হয়ে ওঠে—তখন আর মানুষের নতুন উৎসাহ নতুন উদ্যম থাকে না—ঐ অবস্থায় মানুষের প্রাণ নিস্তেজ হয়ে আসে, বুদ্ধি জমাট-বাঁধা পাথরের মতো হয়ে যায়—চারিদিকে তার আরামের আবেশ ঘিরে আসে—তখন সে চৈতন্যময় শক্তিময় আনন্দময় পুরুষ নয়--সে হচ্ছে তখন অভ্যাসের চাবি দিয়ে দম-দেওয়া কলের এঞ্জিন—মানুষের ঐ খানে জীবন্ত সমাধি—ঐ খানে মানুষের আত্মা আপনাকে প্রকাশ করবার কোন পথই পায় না।

এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে চাই বিশ্বের সঙ্গে সমাজের সংযোগ—সমাজের মাঝ দিয়ে বিশ্বের আলোকের মুক্ত ধারা বিশ্বের বাতাসের মুক্ত প্রবাহ—যে আলোক যে বাতাস সমাজমনকে নিত্য নব নব স্বপ্ন দিয়ে নিত্য নব নব কর্ম্মে নিয়োগ করে, নব নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে' রখবে; সুতরাং চাই চারিদিকে মুক্ত বায়ু মুক্ত আলোক, কাজেই চাই সনাতন দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওম্‌নি সনাতন জানালা।

আর যদি জানালা না বসাই তবে মানুষ ঐ নিরেট দেয়ালের মাঝে একদিন চোখ কচ্‌লিয়ে জেগে উঠবে, জেগে উঠে শিউরে উঠ্‌বে, বল্‌বে—এ কি করেছি—এ কি কর্‌ছি—কোন্ মৃত্যু থেকে বাঁচতে গিয়ে আবার কোন্ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি। সেদিন জাগবে মানুষের আত্মার বিদ্রোহ। না না, চাই নে এই মৃত্যু—পলে পলে

তিলে তিলে এই মৃত্যু। সেদিন মানুষকে হাজার দেয়ালও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না—সেদিন সমাজের পাথর-বাঁধা শক্ত উঠানের বুক চিরেই "সবুজপত্র" গজিয়ে উঠবে—"ফাল্গুনী"র বাঁশী বেজে উঠবে—"পঙ্কের" গলা কেঁপে উঠবে। সেদিন মানুষ দুর্ব্বার ভরসা নিয়ে বলে উঠবে—আমার যদি বাস্তবিকই কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে বিশ্বের হাজার বিরোধের মধ্যে তা আপনাকে স্পষ্টই করে' তুল্‌বে উজ্জ্বলই করে' তুল্‌বে—আমি ভয় কর্‌ব না—ভয় করে' আমার সেই স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার কর্‌ব না—আমি ভয় কর্‌ব না—কারণ আমি জানি যে আমার মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি মাটি নন পাথর নন—তিনি শাশ্বত তিনি অমৃত। —

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভাইবোন।

—:*:—

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর-বেলা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছিলাম। কানের কাছে চেচামেচিতে ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল—বুঝলাম পাড়ার ছেলেরা জাম কুড়ুতে এসেচে। গাছে উঠতে পারে না অথচ জাম খাবার লোভ আছে, ছোট ছোট এমন পাঁচ সাত দশ জন ছেলে মেয়ে মিলে একটু বড় একজন কাকেও মুরুব্বি ধ'রে সময় নেই অসময় নেই এই জামতলায় জমায়েৎ হয়। গাছে উঠে মুরুব্বি বাছা বাছা জাম দিয়ে নিজের থলি ভর্ত্তি করে এবং কখনো বা দয়া কখনো বা রাগ করে পায়ের নীচের বা হাতের নাগালের একটা ডাল নেড়ে দেয়। তাতে কাঁচা পাকা যে সব জাম তলায় পড়ে ধুলো মেখে অখাদ্য হয়ে যায়, তাই কুড়োবার জন্য এই নিস্তব্ধ নিদাঘমধ্যাহ্ন নিত্য তারা কোলাহলে মুখরিত ক'রে তোলে। বারণ করলে তারা শোনে না—ধমক দিলে তখই চলে যায় বটে কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে আবার ফিরে আসে ও নিঃশব্দে ইঙ্গিতে ইসারায় কাজ আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে চাপা গলায় আওয়াজ ও সতর্ক চাপা গলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় ও শেষে জামতলা আবার তেমনি গুলজার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তখন আবার ধমক দিতে মমতা হয়।

প্রতিবারই এই রকম হ'য়ে আসচে। এবার জাম নাবি, এখনো তাতে ভাল পাক ধরেনি। এখন থেকে গাছের ওপর নিত্য এই উপদ্রব চললে পাকবার আগেই জাম নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তাই একবার মনে করলাম উঠে একটা তাড়া দিই কিন্তু আবার ভাবলাম তাতেই বা লাভ কি? জামতলায় ত পাহারা বসাতে পারব না।

শেষে পাশফিরে শুয়ে আবার ঘুমের সাধনা করাই সমধিক লোভনীয় মনে হল, কিন্তু গোলমালে ভাল ঘুম হল না যদিও সে আশা একেবারে ছাড়তেও পারা গেল না। সেই আধঘুম আধজাগার অবস্থায় বেকার মন যে কখন জামতলার বিচিত্র কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে পড়েচে বুঝতে পারি নি—আড়ি, ভাব, আবদার অভিমানের আভাষ কানে আসছিল এবং এবং বোধ হয় ভোলা যায় না এমন সব দিনের কথা মনে জাগিয়ে তুলছিল ব'লে ভালও লাগছিল।

শেষে হঠাৎ কান্নার শব্দে চমক ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তম্ভিত ভাব ও পরক্ষণেই ঘোরতর কোলাহল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলাম—তিনচার বছরের মণ্টু মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাঁদচে এবং পাশে দাঁড়িয়ে তার দিদি খেঁদী অন্য সকলের সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া করচে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েচে রে?

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ছেলে মেয়ের দল একবাক্যে নালিশ করলে—খেঁদী মিছিমিছি মণ্টুর গালে চড় মেরেচে—মা'র সামান্য হলেও মনে হল মারামারিটা ভাল নয় তাই ভাবলাম একটু শাসন করে দেওয়া দরকার। অতঃপর গম্ভীরভাবে খেঁদীর দিকে চেয়ে বললাম—

"ওকে মেরেচিস কেন" ? থেঁদী কোন উত্তর করল না বরং যেন কেশ করেচে এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে আমি চেঁচিয়ে আবার বললাম —"তুই ও'কে মারলি কেন"— বল শিগ্‌গীর—

এবার থেঁদী কথা কইল কিন্তু সে প্রায় নিজের সঙ্গে। শুধু আমার ধমক শুনে অন্য সকলে একেবারে চুপ করেছিল বলেই আমি শুনতে পেলাম থঁদী বলচে—কেন ও কাঁচা জাম খা'বে কেন ?

কাঁচা জাম খেয়েচে ? তা তোর ভাইকে তুই কোন দুটো ভাল জাম কুড়িয়ে দিলি ? "ছেলেমানুষ কি হুটোপুটির মধ্যে—ওরে দেবার জন্যেই ত আমি কুড়োচ্ছি নয়"—

ছেলেরা কেউ কেউ ব'লে উঠল—না অনিল দাদা, ভাল ভাল জাম ও নিজেই কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

শুনে যুদ্ধং দেহির ভাবে তাদের দিকে ফিরে থেঁদী ব'লে উঠল—বেশ্ করেচি খেয়েচি—তোদের কি ? আমার জাম আমি খেয়েচি—আমার ভাইকে আমি মেরেচি। বেশ করেচি—

আবার ঝগড়া করতে' বসল—আরে মোল যা ! যা সব তোরা এখান থেকে চ'লে যা। ফের যদি আজ জামতলায় আসবি ত দেখবি মজা—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সকলে আস্তে আস্তে চলে যাচ্চে আর শুনলাম গালদুটো ফুলিয়ে মণ্টু দিদিকে শাসাচ্চে—মা'কে আমি ব'লে দেব কিন্তু। তার কান্না ইতিমধ্যে থেমে গিইছিল।

শুয়ে শুয়ে বিচারকের বিড়ম্বনার কথা ভাবতে ভাবতে বেলা প'ড়ে এল। মুখহাত ধোবার জন্য উঠে অন্যমনস্ক ভাবে পেছনের দিকের জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম জামতলা নিস্তব্ধ শুধ

মণ্টু মাটিতে পড়ে ঘুমুচ্চে আর ঘুমন্ত ভাইটার মুখের ওপর থেকে পড়ন্ত-রোদ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে থেঁদী নিজ আঁচল বীজনে মাছি তাড়াচ্চে।

আমার তখন মনে পড়ে গেল এরা ভাইবোন—এতক্ষণ যে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রবোধ ঘোষ।

কথিকা।

——:*:——

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে,—মাটির কাছে ধরা দেবে বলে'। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

*　　*　　*　　*

কিন্তু কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মত অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোট মেয়েটির জন্ম? মা তা'কে রেগে বলে "দস্যি," বাপ তাকে হেসে বলে "পাগ্‌লী"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলি ঝির্ ঝির্ করে কাঁপচে।

আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে—বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বল্লেই হয়। তার বড় বড় দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখীর মত।

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের হতাশ্বাস পাতাগুলো শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ কাল আলুথালু পাগ্‌লা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেল্‌লে। সূর্য্যাস্তের একটা রক্ত-রশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মত বেরিয়ে এল।

অর্দ্ধেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্‌খড়্‌ শব্দে কাঁপ্‌চে। সমস্ত সহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। আর গির্জ্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালে জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল—রৌদ্র আর উঠ্‌ল না।

* * * *

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বল্লে, 'মা ডাক্‌চে'। সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী দুলে উঠ্‌ল। কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টান্‌লে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্তে টানাটানি করতে লাগ্‌ল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

* * * *

বৃষ্টি পড়চে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদি যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণ বিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড় কাল, কত বড় জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীব-লীলা। সেই সুদূর সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল, মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড় বড় চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল,—যেন অনন্ত-কালেরই প্রতিমা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন রহস্য।

শ্রীযুক্ত সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

এই আজ দু'তিন দিন হল একখানি স্বদেশী ইংরাজি-মাসিকপত্রে পড়লুম যে, আপনি পথ-চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শুনে খুসি হবেন যে, উক্ত পত্রের লেখক-সম্পাদক উভয়েরি মতে আপনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। চল্‌তি ভাষার চল নাকি এখন সকল কাগজেই হয়েছে—শুধু তাই নয়, যে সকল কাগজ মুখে চল্‌তি ভাষার অতি বিরোধী, তারাও নাকি এমন সব লেখা প্রকাশ করে, যা আসলে গলিঘুঁজিতে চল্‌তি হলেও রাজপথে অচল। এ কথা সম্ভবত সত্য, কেননা ইংরাজিতে বলে extremes meet,—অর্থাৎ দু-মুড়োতে ঠেকাঠেকি হয়।

কিন্তু এর থেকে মনে করবেন না যে, সাধুভাষার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। ভাল কথা, ভাষা সম্বন্ধে সাধু বিশেষণটা কি শুদ্ধ? আমার মতে ওটি সাধু না হয়ে সাধ্বী হওয়া উচিত। তাতে কেতাবী-ভাষার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলের—অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষারই মর্য্যাদা সমান রক্ষিত হয়। সেদিন অনেক

বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনলুম যে, আপনার ভাষায় রূপলাবণ্য, বেশভূষা, হাস্যলাস্য সবই থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান দোষ এই যে, তা chaste নয়।

সে যাই হোক্, আমি ঐ সাধু বিশেষণটিকে একেবারে বাদ দিতে চাই নে, কেননা আমি সাহিত্য থেকে কোনও চলতি কথাকে বহিষ্কৃত করবার পক্ষপাতী নই। তবে সেই সঙ্গে "সাধ্বী" বিশেষণটিও স্থলবিশেষে ব্যবহার করব।

বাজে বকুনি ছেড়ে, এখন কাজের কথায় ফিরে আসা যাক্। সাধুভাষা এখন মাসিক পত্রের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পৃষ্ঠে ভর করেছে। এক কথায়, সাধুভাষা এখন সাহিত্যকে ত্যাগ করে বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের ভাষারই উচিত নাম হচ্ছে সাধ্বী। "আশ্রয় নিয়েছে" বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না, কেননা বিজ্ঞাপনের দেশে এই সাধ্বীভাষা এখন রাণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে দেশের লোকের মনোরঞ্জন করছে। সাধুভাষাকে লোকে কেন সাহিত্যের ভাষা বলে?—এই কারণে যে, লোকের বিশ্বাস সাহিত্যের যা আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ পাঠককে কাঁদানো হাসানো ইত্যাদি—তা একমাত্র উক্ত ভাষার দ্বারাই সাধ্য হয়। আপনি যদি একসঙ্গে কাঁদ্‌তে ও হাস্‌তে চান, তাহলে এই পূজোর বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করুন, তাহলেই সাধ্বীভাষার শ্রী হ্রী ধী সম্বন্ধে আপনার সম্যক জ্ঞানলাভ হবে। আর এ ভাষার জ্যোতি! সূর্য্যের পাশে দীপ যেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, বিদ্যুতের পাশে খদ্যোত যেমন মিট্‌মিট্ করে, এই বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষার পাশে সাহিত্যের সাধুভাষার অবস্থাও তদ্রূপ হয়। এমন কি টাকা

জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, সাধুভাষার অদ্বিতীয় লেখক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত চিন্তা' ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে, 'সন্ধ্যা চিন্তা' মিট্‌মিট্‌ করে।

যদি বলেন যে আপনি ওসব পড়তে চান না, তার উত্তর এই,—

"উপেক্ষার উপায় নাই, অবজ্ঞার সুযোগ নাই। জানিতেই হইবে, পড়িতেই হইবে, বুঝিতেই হইবে, অশ্রুবর্ষণ অনিবার্য্য! কে আছ ব্যথিতের বন্ধু, আর্ত্তের অবলম্বন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,—এসো, তোলো, জাগো, এ ক্রন্দন, এ নিবেদন, এ হা-হুতাশ শুনিতেই হইবে"—

উপরোক্ত বাক্যাবলী "পতিতা" নামক সামাজিক উপন্যাসের বিজ্ঞাপন হতে উদ্ধৃত। এ উদ্ধারের কারণ—"পতিতা" সম্বন্ধে যা সত্য, বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষা সম্বন্ধেও ঠিক তাই সত্য। আমি এ স্থলে উক্ত ভাষার কোনও বিশেষ নমুনা তুলে দিতে পারছি নে, কেননা আগাগোড়া বিজ্ঞাপন ঐ একই ভাষায় লিখিত,—পড়া শেষ করবার আগে বিজ্ঞাপিত বস্তু ওষুধ কি জুতো, শাড়ী কি সাহিত্য, কিছুতেই ধরা যায় না। আমি দুটি একটি উদাহরণ দিচ্ছি:—

"রৌপ্যমণ্ডিত রেশ্‌মী কিংখাপে মোড়া হইয়া অতুলন স্বর্ণ সংস্করণ।"

এই বস্তুটি কি জানেন?—শাড়ী নয়, উপন্যাস। তারপর বলুন ত বক্ষ্যমান পদার্থটি কি?

"অতি মোলায়েম রঙিন রেশমের ক্রেপ পোতের ভুরেদার চাকচিক্যমান।"

এ জিনিষটি কিন্তু অপূর্ব্ব উপন্যাস নয়, "আহামরি শাড়ী"; তাহলেও জিনিষটি পাওয়া যাবে কিন্তু বীণাপাণি দেবীর কাছে। সাহিত্যের

গৌরব অবশ্য নির্ভর করে তার অলঙ্কারের উপর, আর অলঙ্কারের সেরা হচ্ছে উপমা আর অনুপ্রাস। এ দুই বিষয়েও বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব অপূর্ব্ব। প্রথমে অনুপ্রাসের একটি নমুনা দিই:—

"মৃত্যুযবনিকা, পরিণয় প্রহেলিকা, ভ্রান্তি কুহেলিকা, হত্যা বিভীষিকা, লুব্ধমরীচিকা, রহস্য কণিকা।"—উক্ত সাহিত্যের রচয়িতা কে জানেন?—মল্লিদার! মল্লিদার কে জানেন?—"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নক্সা"-লেখক। আপনি মল্লিদারের "আপন পর"খানি কিনে এনে নয়ন মন সার্থক করুন, কেননা বইখানি "উপহারের রাজা" কিন্তু "না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই"। দামও সস্তা—মূল্য এক টাকা মাত্র। এ ক্ষেত্রে "আপন পর" কি সূত্রে আবদ্ধ জানেন?—"বিলাত হইতে কেবলমাত্র আমাদের জন্য আনীত অপূর্ব্ব রেশমী ফিতায়"। উক্ত নমুনার অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখতে পাবেন। এখন উপমার গুটি দুই তিন উদাহরণ দিই:—

(১) মল্লিদারের "বিভ্রাট," পাকা হাতের পাকা লেখা—ঠিক যেন রসের ফোয়ারা।

(২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "পতিতা", নারীর ত্যাগের নায়েগ্রা প্রপাত"।

(৩) "বঙ্গীয় উপন্যাসলেখকশিরোমণি প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, রেশমী কিংখাপে মোড়া "পাষাণী", বিরহের বিসুবিয়াস অথচ প্রেম প্রতিদানের এমন গোলকুণ্ডার মতির মালা,"—অথচ দাম একটাকা। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে উপমা হচ্ছে অলঙ্কারের শিরোমণি, যেমন গহনার ভিতর মালা আর কুসুমের

মধ্যে শালা। এ মত যে সত্য, উক্ত উপমাগুলির সাক্ষাৎ লাভ করে সে কথা কি আর কেউ সন্দেহ করতে পারেন? উপরোক্ত কবি-প্রতিভার চরম সৃষ্টিগুলি সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সাবধান!—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "পোকা মাকড়" যেন সেই সঙ্গে কিনবেন না, তাহলে দুদিনেই ও সব রেশমী বই কেটে রেশমী মিঠাই বানিয়ে দেবে।

(২)

আমি বিশেষ করে এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্যে যে, আপনি গত পাঁচ বৎসর এ সাহিত্যকে সবুজপত্রে স্থান দেন নি। আপনি বলতেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রচার করা। অতএব উভয়ের স্থান এক পত্রে হতে পারে না। আপনার কথা ছিল এই যে, বিজ্ঞাপনমাত্রেই মিথ্যাবাদী,—যেখানে তা স্পষ্ট মিথ্যে কথা বলতে সঙ্কুচিত হয়, সেখানে তা suggestio falsii-র আশ্রয় গ্রহণ করে। ঔষধ সম্বন্ধে যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে আপনি যে উক্তিকে suggestio falsii-র দোষে দোষী করতেন, সেটি যে একটি আলঙ্কারিক গুণ, অর্থাৎ তা যে অতিশয়োক্তি, এ জ্ঞান আপনার ছিল না। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি", সে রচনা যে গৌড়ী রীতিতেই রচিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সে রীতির একটি উদাহরণ দিচ্ছি:—

"অন্নং নির্ম্মিতমাকাশম্ নালোচ্যৈব বেধসা
ইদং এবংবিধং ভাবি ভবত্যা স্তনজৃম্ভনম্" ॥ (কাব্যাদর্শ)

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এবম্বিধ মহাকবিত্ব করে গেছেন, তখন আমরাই বা কেন না বিরহের Vesuvius এবং ত্যাগের Niagara Falls-এর সৃষ্টি কর্‌ব ? শাস্ত্রেই আছে :—

"বাপ্ কো বেটা সিপাহি কো ঘোড়া
কুছ্ নহি ত থোড়া থোড়া।"

এতদিনে আপনার ভুল আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, সে কথা মুখে স্বীকার না কর্‌লেও কার্য্যত আপনি তার প্রমাণ দিচ্ছেন। 'সবুজপত্র' এখন বুকে পিঠে বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরচ্ছে। তবে বইয়ের বিজ্ঞাপনের পাঁচরঙা ছাপ আপনার কাগজ আজও অঙ্গে ধারণ করে নি,—অবশ্য আপনার স্বরচিত পুস্তকের ছাড়া। এই সম্বন্ধেই আমি আপনার কাছে একটি কথা নিবেদন কর্‌তে চাই। ঘুরিয়ে মিথ্যে কথা দু'রকম করে বলা যায়,—এক suggestio falsii-র সাহায্যে, আর এক suppressio verii-র সাহায্যে। 'সবুজপত্র' জন্মাবধি বাঙলা সাহিত্যের বিজ্ঞাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, সত্যগোপনের দোষে দোষী হয়ে রয়েছে। এ যে কত বড় দোষ তার প্রমাণ, আমার মত মাত্র-সবুজপত্রের পাঠকেরা বাঙলা সাহিত্যে যে কত অমূল্য রত্ন আছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপরাপর মাসিক পত্রের কৃপায় জানতে পেলুম যে, বাঙলা ভাষায় এমন অসংখ্য কাব্য আছে, যার প্রতিখানি একসঙ্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়। আমি এর মধ্যে খানকতকের পরিচয় দিচ্ছি :—

(১) নিরুপমা পুরস্কার—"সরস ভাবোজ্জ্বল ভাষাসম্পদে অতুলনীয়, বাজারের কেনা গল্পপুস্তকে একত্র এমন সৌন্দর্য্যসমাবেশ কোথায়ও পাইবেন না।"—

(২) মঞ্জুরী—"সুরেন বাবুর ছোট গল্প না পড়িলে ছোট গল্প পড়া অসম্পূর্ণ থাকে। প্রত্যেকটি গল্প যেন রাফেলের জীবন্ত চিত্র"।—

(৩) পল্লী-সংসার—"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ভাবে ভাষায় চরিত্র-চিত্রণে ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে সর্ব্বাংশে অতুলনীয়।"

(৪) বন্দিনী—"ভাষায় ভাবে চরিত্রচিত্রে অতুলনীয়।"

(৫) দগ্ধকচু—"এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে আর কখন হয় নাই।"—

(৬) গৃহলক্ষ্মী—"বাঙলা উপন্যাসে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

(৭) অভিসার—"এমন বিয়োগান্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বহুকাল বাহির হয় নাই।"

আর কত নাম করব?—"মাতৃদেবী", "সহধর্ম্মিণী", "নববধূ" প্রভৃতি সবই অপূর্ব্ব, সবই অতুলনীয়, সবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বাস না করেন, এর মধ্যে অন্তত দুটি জাঁকড়ে কিনতে পারেন, যাচিয়ে নেবার জন্যে। বিজ্ঞাপনদাতা কথা দিয়েছেন যে "নববধূ মনোনীত না হইলে ফিরাইয়া আনিবেন, মূল্য ফেরত দিব"। "বন্দিনী" সম্বন্ধেও ঐ একই করার—"কিনুন, ভাল না হয় মূল্য ফেরত দিব"। এর চাইতে সাধু প্রস্তাব আর কি হতে পারে? অপরখানি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতা আদেশ করেছেন—"সহধর্ম্মিণী ক্রয় করিতে ভুলিবেন না",—তবে ক্রেতায় তা অপছন্দ হলে ফেরত নেবার কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

বাঙলা ভাষার ঐশ্বর্য্য কিরকম বেড়ে গেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ত নানা সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী। কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কি ইতালি, ইউরোপের কোন দেশ দেখাকৃত এত অসংখ্য উপন্যাস, যা যুগপৎ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এবং 'অতুলনীয়'। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাইলে তারা এক এক যুগের বড় জোর এক একখানি গ্রন্থ বার করতে পারবে।

এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়—

"একি স্বপ্ন! একি মায়া! একি বাস্তব! একি বাস্তবের ছায়া?" কেননা, এই সব অপূর্ব্ব উপন্যাসের লেখকেরা কে?—এ প্রশ্নের উত্তর "উপন্যাস সিরিজ" দিয়েছেন। সিরিজের বক্তব্য এই ঃ—

"বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারীগণের বঙ্গবিশ্রুত সেই সকল সাহিত্যরথীবৃন্দের নামের একত্রীভূত তালিকা দৃষ্টে যুগপৎ বিস্ময়ে সকলকেই বলিতে হইবে—ইহারা করিয়াছে কি? ধন্য!"

"ইহারা করিয়াছে কি"? এ প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয়েছিল—এবং উত্তর পেয়ে আমিও বলছি—ধন্য। উত্তরটি তবে শ্রবণ করুন—

"বিশ্রামের অবসর নাই—কেবল কার্য্য,—সারাটি বৎসর ধরিয়া নিত্য-নব পূজার উদ্বোধন"।—এর পর আপনি আমি সকলেই বল্‌তে বাধ্য—ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গ-সরস্বতী।

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন এই মনে আসে যে, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?—বিজ্ঞাপনের কথা বিশ্বাস করতে হলে—অতি নীচে, প্রায় লাষ্ট কেলাসে। তাঁর "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের মন্তব্য এই—"প্রকৃতপক্ষে ইহা বাঙ্গালীর রহস্যমুকুর, এরূপ উপন্যাস আর কখনও বাহির হয় নাই"।—মল্লিদারের "আপন-পরের" বিজ্ঞাপিত

গুণাগুণের সঙ্গে তুলনা করলেই আপনার বুঝতে বাকী থাক্‌বে না যে "ঘরে বাইরের" স্থান কোথায়। এখন দেখছি ও উপন্যাসের বাইরে না বেরিয়ে ঘরে থাকাই উচিত ছিল। সে যাই হোক্, এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নেই যে "বঙ্গ-বিশ্রুত সাহিত্যরথীবৃন্দের" পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেজায় অপ্রতিভ দেখাচ্ছে। এ স্থলে আমি একটা কথা না বলে থাক্‌তে পারছি নে। সবাই জানে যে, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই, অপরপক্ষে রাঁধুনে বামুনদের যে ও সার্টিফিকেটের দরকার আছে শুধু তাই নয়, সে সার্টিফিকেট তারা দেখাতে বাধ্য— নইলে কেউ তাদের পাক-স্পর্শ কর্‌বে না। এখন বিজ্ঞাপন দাতা-মহাশয়দের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই বৃদ্ধবয়সে নূতন করে পৈতা দেবার কি আর কোনও দরকার ছিল?

এ ক্ষেত্রে, আমার নিজের একটা জবাবদিহি আছে। আজ থেকে ঠিক সাত বৎসর আগে, পূজোর বিজ্ঞাপন পাঠে উত্তেজিত হয়ে আমি "মলাট সমালোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ হাতঝেড়ে লিখি। সে প্রবন্ধ পড়ে পুস্তক-ক্রেতার দল শুন্‌তে পাই খুসি হয়েছিলেন, কিন্তু বিক্রেতার দল বিরক্ত হয়েছিলেন।

আজ আমি বাঙলার লেখক পাঠক উভয় দলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, সেকালে আমি বিজ্ঞাপনসাহিত্যের মাহাত্ম্য মোটেই বুঝতে পারি নি; কিন্তু এ বিষয়ে আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে!

দার্শনিকেরা বলেন যে বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, অতএব সাহিত্যের যুগ নয়। আমি এর প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ মানি—কিন্তু শেষ কথাটি ষোল-আনা মানি নে। যদি কেউ বলেন যে বিজ্ঞানের

যুগে সেকেলে সাহিত্য চল্‌বে না, চলবে শুধু বিজ্ঞানজড়িত সাহিত্য, তাহলে আর কোনও আপত্তি থাকে না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশেষ করে জানা, কিন্তু কোনকিছু বিশেষ করে জেনে কোনই ফল নেই, যদি না সেই সঙ্গে তা' অপরকে বিশেষ করে জানানো যায়। এই উদ্দেশ্য সাধন করে বিজ্ঞাপন, কেননা ও শব্দের অর্থই হচ্ছে, বিশেষ করে জানানো। আমার এ যুক্তি যদি অকাট্য হয়, তাহলে সকলকে মানতেই হবে যে, এ যুগের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে বিজ্ঞাপনসাহিত্য। যাঁরা অন্যপ্রকার সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, অতএব তাঁদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

তারপর সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলেও দেখা যাবে যে, এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের স্থান কত উপরে। আজ শ'-খানেক বছর ধরে ইউরোপের সাহিত্যজগতে Classic আর Romantic দলের ভিতর একটা মহা লড়াই চলেছে। Classic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে বাইরের সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে চোখে-দেখা ভাষা; আর Romantic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে ভিতরকার সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে কানে-শোনা ভাষা। সংক্ষেপে Classic দল গ্রাহ্য করেন শুধু মাথার ভাব আর বইয়ের ভাষা; আর Romantic-দের কাছে গ্রাহ্য শুধু বুকের ব্যথা আর মুখের কথা। ইউরোপে এ দুয়ের আজও মিল হয় নি। কিন্তু বাঙলার বিজ্ঞাপনসাহিত্য এই দু-পক্ষের মিলনরূপ অসাধ্য সাধন করেছে। এ সাহিত্যের ভাষা যেমন খাঁটি সংস্কৃত—অর্থাৎ Classic, এর ভাবও তেমনি খাঁটি বাঙালী—অর্থাৎ Romantic। ব্রাহ্মণের ভাষায় এমন "রসের ফোয়ারা"

বাঙালী লেখক ছাড়া আর কে তুলতে পারে? খাঁটি বাঙালী মনোভাবটি কি জানেন?—সহৃদয়তা। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের হৃদয়ে যে কতটা রসভার হয়েছে, তা কে না জানে? এই ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি মাতৃভক্তি যে কি পর্য্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, তার জোর প্রমাণ ত আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রের সাবেগ ও সকাতর অম্বারব। সেই সঙ্গে দেবীর প্রতিও আমাদের মাতৃভক্তি যে সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে মাটিতে দেশ তৈরি, সেই মাটিতেই ত আমাদের দেবীও তৈরি। আমাদের দেবীভক্তি যে কতটা বেড়ে গেছে, তার প্রমাণ—সেকালে আমরা বিজয়ার দিন শুধু ভাঙ খেতেম, আর একালে আমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশসুদ্ধ লোক যে ঘটস্থাপনার দিন থেকে শুধু ভাঙ নয়, গাঁজাও খেতে সুরু করি—তার পরিচয় এই পূজোর বিজ্ঞাপন। ইতি—১লা আশ্বিন।

বীরবল।

পুঃ—এ পত্র আপনাকে ভয়ে ভয়ে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমার উপর এ সন্দেহ করবেন না যে, আমি পুস্তকবিক্রেতাদের কাছে ঘুষ খেয়ে এই প্রবন্ধের ছলে বিনা পয়সায় তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপন সবুজপত্রে প্রকাশ করবার ফন্দি করেছি। আমার উদ্দেশ্য আপনার মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের এই সুসংবাদটি জানানো, যে text-book লেখবার উপযুক্ত ভাষা বিজ্ঞাপনদাতারা ইতিমধ্যে নির্ম্মাণ করে বসে আছেন কেননা—এ কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, এর চাইতে একাধারে chaste এবং elegant ভাষা বঙ্গসাহিত্যে আর কোথায়ও খুঁজে পাবেন না

ভারতের নারী।

——:*:——

কয়েক দিন হলো বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী 'ভারতের নারী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সে-সভায় লর্ড সিংহ বলেছিলেন—যতদিন রমণীদের প্রতি ভারতের পুরুষদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন না হবে, ততদিন তার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। যদিচ মন্তব্যটি আমাদের আত্মসম্মানের গায়ে আঘাত করে—তথাপি সেটি যে সত্য, সারবান এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লর্ড সিংহ যে সাহস করে আমাদের জাতির একটা মহা কলঙ্কের দিকে সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তজ্জন্য মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদও দিয়েছিলাম। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, যিনি যে-ভাবে যে-ক্ষেত্রে যতই কেন চেষ্টা না করুন এবং আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম যাই কেন না বকুন—জাতিভেদ ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা—এ দুটি মহাব্যাধি যতদিন না আমাদের সমাজদেহ থেকে বিতাড়িত হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে জাতির বা জাতীয় উন্নতির কথা মুখে আনা বাচালতা মাত্র।

(২)

এখন দেখছি—মুর্খ আমরা, সব ভুল বুঝেছি। স্বদেশী-মন্ত্র প্রচারের আদি-গুরু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সেদিন বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে তারস্বরে বক্তৃতা করে বলে গেছেন যে, লর্ড সিংহের উক্তির দ্বারা ভারতের নরনারীর প্রতি অযথা অবমাননা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং যার কিছুমাত্র আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আছে, তার পক্ষে এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান উচিত। তিনি আরও বলেছেন, ইংরাজদের রমণীসম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা, তা sex-ভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর আমাদের সকল ধারণা মাতৃত্বের মহান্ ও পবিত্র কেন্দ্র হতে বিকশিত। তাঁর মতে ১৮৮২ সনে Married Woman's Act প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে ইংরাজ-নারী নাকি chattel-এর সামিল ছিল; এবং লর্ড সিংহের এসব বিষয়ে, অর্থাৎ বিলাতের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য তিনি তাঁর প্রতি দয়া প্রকাশ না করেও থাকতে পারেন নি। দয়ারই পাত্র বটে, কারণ দুর্ভাগ্য তাঁর—ঈদৃশ দেশ-হিতৈষীগণের তিনি স্বদেশবাসী!

(৩)

পোড়ো বাড়ীতে একটি শৃগাল ডেকে উঠলে, রাজ্যের যত শেয়ালের হুকাহুয়াস্বরে কণ্ঠকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করার আকাঙ্ক্ষা যেমন অকস্মাৎ জেগে উঠতে দেখা যায়—সেইপ্রকার পাল মহাশয়ের বক্তৃতার কম্পন থামতে না থামতেই 'অমৃতবাজার' প্রমুখ তাঁর শিষ্য ও

ভক্তবৃন্দের চীৎকারে আকাশ বাতাস পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। এবং পাল মহাশয় যেমন আশা দিয়ে গেছেন—তাতে বিলাত-বাসীদের কর্ণকুহরও যে শীঘ্রই তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, তারও সন্দেহ নেই।

এখন কথা হচ্ছে আমরা জনসাধারণ—অর্থাৎ যারা রাজনীতি বা সমাজসংস্কার দুটির কোনটিকেই জীবনযাপনের ব্যবসা করে তুলতে পারি নি, সুতরাং এসব বিষয়কে তেমন অনাবশ্যক জটিলতার জালে আবৃত করে দেখবার অভ্যাস করি নি—আমরা কোন্ পথে যাব? নারী সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ মহান্ ও সর্ব্বোচ্চ; তাদের অবস্থার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই; কোন পাশ্চাত্য ভাবের সংযোগে তাদের জীবনকে উদ্বেলিত করার দরকার নেই; এবং পূর্ব্বাপর যেমন পুরুষের সঙ্গিনী অপেক্ষা তাদের দাসীস্বরূপেই তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে অশিক্ষিতা বন্দিনী অবস্থায় তারা জীবন যাপন করে আসছে, সেইভাবেই তাদের রাখবার চেষ্টা করা উচিত—পাল মশায়ের সাথে একযোগ হয়ে কি আমরা এইকথা প্রচার করে বেড়াব? না, লর্ড সিংহের মতে মত দিয়ে বলব—রমণীও পুরুষেরই ন্যায় স্বাধীন জীব; স্বাধীনভাবে তাকে বাড়তে দাও, শিক্ষা দাও; পুরুষ তার যে-সকল অধিকার জোর করে করতলগত করে রেখেছে, তা তাকে ছেড়ে দাও; অন্যত্র সুসভ্য দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও মানুষ হয়ে, জীবনযাত্রায় পুরুষের প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াক। এ স্থলে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লর্ড সিংহের উক্তির সরল অর্থ এই যে, এ-দেশের পুরুষ, নারীর উন্নতি সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা, এবং অন্যান্য

দেশের স্ত্রীলোকেরা যে-ভাবে চলে' উন্নত হয়েছে, নিজ স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা তাদের সে পথে চলতে দিতে অনিচ্ছুক।

(৪)

পুরাকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল—সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার কি প্রয়োজন আছে? বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা প্রভৃতি ত আমরা উত্তরাধিকারীসত্ত্বে অতীতের কাছথেকেই পেয়েছি। এ-ছাড়া সেকালে নিয়োগ প্রথা, রাক্ষস বিবাহ (কন্যাহরণ), আসুর বিবাহ (কন্যাক্রয়) প্রভৃতি ত শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার ছিল। একালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ত আসুর বিবাহ আজও বজায় রয়েছে। আর সতীদাহ যে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, সে ত ইংরাজের আইনের তাড়নায়। আজ একশ' বৎসর পূর্ব্বে এ-হেন প্রথাকেও সমর্থন করবার জন্য কখনো লোকের অভাব হয় নি, এবং বর্ত্তমান কালেও অশিক্ষিতা সহায়শূন্য বালবিধবা স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় বা মৃত্যুর পর উদ্বন্ধনে বা বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের দ্বারা প্রাণত্যাগ করলে স্বামীর প্রতি হিন্দুনারীর জন্মগত প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে সাময়িক সংবাদপত্রে যে প্রশংসা উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, তাতে মনে হয় যদি ইংরাজরাজ ধর্ম্মের অঙ্গ বলে সতীদাহের প্রতি নিরপেক্ষতার ভাব অবলম্বন করে বসে থাকতেন—তাহলে এখনো এ প্রথা সজোরে প্রচলিত থাকত, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী বক্তাদের বিলেত গিয়ে এরও মাহাত্ম্য প্রচারের কোন বাধা থাকত না।

(৫)

বাবু বিপিনচন্দ্র ১৮৮২ সালের পূর্ব্বে ইংরাজ রমণীগণের দুরবস্থার বিষয় বলেছেন; কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি অর্জ্জন ও দান করবার অধিকার সম্বন্ধে যাঁরা একটু বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করেছেন—তাঁরা জানেন, কি দুরবস্থা তাদের। প্রথমত, অশিক্ষিত অবস্থায় আজীবন গৃহে আবদ্ধ থাকার দরুণ, কোনও প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বাল্যকাল হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তারা পরমুখাপেক্ষী। এক সামান্য স্ত্রীধন লক্ষে একজনের কপালে জুটে ওঠে কিনা সন্দেহ, এবং তাও যদি যৌতুকস্বরূপ বিবাহকালীন দানে পাওয়া গিয়ে থাকে—তাতেই কেবল আছে তাদের দান বিক্রয়ের অধিকার। তা ব্যতীত প্রায় কোনও সম্পত্তিতেই তাদের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে বলা যেতে পারে না। যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী; তার অবর্ত্তমানে সে দুর্ম্মুখ আত্মীয় বা পুত্রের মুখাপেক্ষী—আপন বলতে তার কোনও সম্পত্তিই নেই। একেও কি আদর্শ সুখের অবস্থা বলতে হবে?

পূর্ব্ববর্ণিত বিধিব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে—নিতান্ত সার্থান্ধ এবং 'শুধু পুরুষের সুখের জন্যই জগৎ সৃষ্ট' এই মন্ত্রের উপাসক ব্যতীত কেউ কি বলতে সাহসী হবে যে, ভারতে রমণীর প্রতি পূর্ব্বাপর সদ্ব্যবহার হয়ে আসছে?—মাতৃত্বের মহান ভাবকে কেন্দ্র করে যে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকারের ভাব সকল সমাজে বিকশিত হয়েছে—তারই বা প্রমাণ কোথায়? মোট কথা, নারীর অধিকার বলে একটা জিনিস আমাদের সমাজে স্থান পায় নি বল্লেও অত্যুক্তি হবে না।

অন্যত্রও যেমন, ভারতেও তেমন—মানুষ নিজের স্বার্থের দিক থেকেই

রমণীকে দেখেছে। রমণী যে chattel সদৃশ ক্রয় বিক্রয় ও অর্জ্জন করবার জিনিস—এ ভাব কি ভারতে, কি রোমে, কি গ্রীসে, কি অন্যত্র প্রত্যেক সমাজেরই আদিম অবস্থায় যে বিরাজ করত,—ইতিহাসে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। মানুষ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট (Vertebrate) প্রাণীশ্রেণীর অন্তর্গত—পশুপক্ষী যে-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা এসব বিষয়ে পর্য্যালোচনা করেছেন, তাঁরা একমত যে, আদিম অবস্থায় পুরুষ ও রমণীর মিলন-বিষয়ে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তবে সমাজের উন্নতির সঙ্গে এবং প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ভাবের ক্রম-স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গে মানব ও ইতর প্রাণী সমাজের ভিতর নানা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সমাজসকলের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, কি ভারতে, কি অন্যত্র, বিপিন বাবু যাকে Sex ভাব বলেন—অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীর মিলনের ভাব, তা হতেই কালক্রমে পরিবার পরিজন সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভাবসমূহ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এক-স্ত্রীগ্রহণ সভ্য সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রথা কিন্তু এ প্রথা যে আমাদের দেশে এখনও তেমন বদ্ধমূল হতে পারে নি,—বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং কৌলিন্য প্রথার অস্তিত্বই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বের ভাবটি যেমন ফুটে উঠেছে—এমন বোধহয় কোনও সমাজেই হয় নি। সর্ব্বত্রই মা ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু ভারতে তিনি শুধু তা নন,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবী, ভগবতী; তিনি এবং পিতৃদেব প্রীত হলেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। এই মাতৃত্বের ভাবটি কালে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে এখন নারীমাত্রেই ভারত-বাসীর চক্ষে মাতাবিশেষ। স্ত্রী আমাদের ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মকার্য্যে

সঙ্গিনী। মনুতে লিখিত আছে, যে-গৃহে স্ত্রী যথোপযুক্তরূপে পূজিত না হয়ে থাকে, সেখান হতে লক্ষ্মী পলায়ন করেন—স্ত্রী শ্রীরই রূপান্তর। এইসবের দিকে দৃষ্টি করেই মনকে আমরা বোঝাচ্ছি যে, নারীর প্রতি ব্যবহারে আমরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হৃদয়ের উদারতা দেখিয়ে আসছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? মাকে আমরা বিশেষ একটু ভক্তি করি বলেই, এবং 'পর-স্ত্রীষু মাতৃবৎ' ইত্যাদি শ্লোক নীতি-শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে বলেই যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আমরা উদারমনা—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ও দেশহিতৈষী কে সে কথা বলবে? মাকে ইউরোপীয়গণও কি ভক্তি করে না?—ইংরাজরা সাধারণত রমণীদের প্রতি গৃহে ও রাস্তাঘাটে যাদৃশ সম্মান দেখিয়ে থাকে, তার দিকে দৃষ্টি করে অনেকসময়ই কি আমাদের নিজ বিপরীত ব্যবহারের দিকে চেয়ে হেঁট-মুখ হয়ে থাকতে হয় না?

শাস্ত্রলিখিত শিক্ষা বিনাযুক্তি ও বিনা আপত্তিতে গ্রহণের ফলে এ দেশের রমণীদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে! নেই বলতে কিছুই নেই তাদের। অর্থোপার্জ্জনের কোন স্থযোগ নেই স্বাধীনতা নেই; এবং আজীবন রুদ্ধবায়ু-গৃহে বাসহেতু স্বাস্থ্য সামর্থ্যেরও অভাব। এক সতীত্বরূপ ডেমক্লেসের তরোয়াল সব সময়েই মাথার উপর ঝুলছে, যার দিকে চেয়ে চলতে ফিরতে তারা সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।

যা প্রাচীন তাকে প্রশংসা করাই এখনও সর্ব্বত্রই স্বদেশহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয়, এবং যশোলাভের সহজ উপায়। তার উপর দুই এক জন ইংরাজ পুরুষ বা রমণী আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করে বাহবা বলে' মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়িয়ে দিচ্ছেন, আর আমরা

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মনে করছি—আমাদের যা ছিল বা যা আছে, এমন কারো ছিল না বা হবে না। পতিত বা পতনোন্মুখ জাতির সর্ব্বত্রই এ অবস্থা—অতীতের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি। আমরা কিন্তু লর্ড সিংহের সঙ্গে এক মত হয়ে বলবো—যতদিন না রমণীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে, ততদিন ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, লম্ফঝম্ফ সবই নিষ্ফল। মা'র চরণে প্রণত হলেই তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা হল, তা' আমরা মনে করি নে। পরিচ্ছদ ও গহনায় ভূষিত করলেই স্ত্রীর প্রতি সম্যক আদর দেখানো হয় না। এ সব হচ্ছে পুতুল-খেলা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা। তাদের প্রকৃত মানুষ হবার জন্য আমরা কি করছি? লজ্জার ক্ষোভের বিষয় নয় কি—আমাদের স্বার্থ-যজ্ঞে তাদের শক্তি, বুদ্ধি, সুখ, মনুষ্যত্ব, আগাগোড়া ভস্মীভূত হয়ে আসছে? বনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা এবং মানুষের ভিতর পুরুষ—স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে সকলেরই জীবন পূর্ণশ্রী লাভ করে, শুধু ভারতের নারীই নাকি শ্রীভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। ভারতের পুরুষ! দেশ-শাসন ব্যাপারে সামান্য স্বাধীনতাটুকু লাভ করবার জন্য মাথা কুটে তুমি মরছ, ছটফট করে সাগরের ও-পারে যাচ্ছ আসছ;—কিন্তু নিজের ঘরের ভিতর তোমার আর এক মূর্ত্তি। সেখানে পূর্ণ আঁধারের ভিতর, অজ্ঞানতার ভিতর, তোমার মা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নাকে আবদ্ধ রেখে স্বদেশ-সেবার তুমি প্রকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছ! স্বদেশ তোমারই কেবল, তাদের কিছু নয়? প্রকৃতিদত্ত গুণে যারা তোমার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাদের স্বাধীনতা না দিয়ে মানুষ হবে—বৃথা এ জল্পনা কল্পনা তোমার। অশিক্ষিত মা'র পুত্র তুমি—অশিক্ষিত স্ত্রীর স্বামী—ঘর তোমার অজ্ঞানতার আঁধার,—

কুসংস্কারের স্তূপ। এবং সেই কারণে তুমি নিজেও যে কুসংস্কারের জড়পিণ্ড। অতীতের দিক হতে মুখ ফেরাও; মনু যাজ্ঞবল্ক্য ভুলে জগতের সঙ্গে চল; তবেই তুমি বড় হবে—নচেৎ নয়। সকল সুসভ্য দেশেই, নানাবিধ কুসংস্কার জয় করে রমণীর অধিকার বিস্তার লাভ করছে—শুধু ভারতেই কি তারা চিরকালের জন্য পতিত হয়ে থেকে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রাখবে?

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

২৫।৮।১৯

মেয়ের বাপ।

——:০:——

রাত প্রায় ১০টার সময় ট্রামে শ্যামবাজার থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় লোকচলাচল কমে এসেছিল—গাড়ীতেও ভিড় ছিল না। যত জোরে গাড়ী চলছিল তত জোরেই দখিণ হাওয়া মুখের উপর এসে লাগছিল। আরামে চোখ বুজে আসছিল।

হাতিবাগানের মোড়ে একটি ভদ্রলোক উঠে আমারই পাশে তাঁর পরিচিত একজনকে দেখে আলাপ আরম্ভ করে দিলেন।

—এই যে কিরণ বাবু! নমস্কার মশাই, কেমন আছেন?

—নমস্কার নবীন বাবু! তারপর আপনাদের খবর সব—

—ভাল আর কই? মেয়ের বিয়ের ঠিক আজও কোথাও করে উঠতে পারি নি, সেই ধান্ধায়ই ঘুরচি। আপনি ত কাজ জিতে নিয়েছেন মশাই।

—আপনাদের কল্যাণে কোনরকমে দু'হাত এক হয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

—তা খরচপত্র কত হ'ল?

—সব সুদ্ধ আড়াই হাজারের উপরে বই নীচে নয়। মেয়ে জামাইকেই ত দু'হাজার দিতে হয়েছে।

—আঃ, তার কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয় এখনকার দিনে? সে যাহোক, নির্ভাবনা হয়েছেন আপনি, বেঁচেছেন, বুকের পাথর নেবে গিয়েছে।

বিমর্ষভাবে কিরণ বাবু বল্লেন—তা আর না হ'ল কই মশাই—

নবীনবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন —মেয়ে জামাই ভাল আছে ত?

—বেঁচে আছে বটে, কিন্তু ভাল নেই। পয়সাকড়ির যেখানে অনটন, সেখানে ভাল থাকা যায় কি?

—কেন আপনার জামাই ত B.A., আর শুনেছি চাকরি-বাকরিও করেন।

—তা করেন, কিন্তু—

—এত কিন্তু করলে চলবে কেন ভাই, চাকরি ছাড়া জমিদারী আর ক'জনের থাকে?

—কিন্তু বাড়ীটা ঘরটা ত থাকে।

—তা নেই না কি?

—সে না থাকারই মধ্যে। পুরোণো সরিকি বাড়ী একটু আছে, তাও দেনায় ডোবানো।

—বেহাই দেনা করে রেখে গিয়েছেন বুঝি?

—সে অনেক কথা ভাই, আর সে সব কথা আলোচনা করলে ত এখন কোন লাভ নেই।

—তা সত্যি। কিন্তু বিয়ের আগে এই দেনার বিষয় কিছু জানতে পারেন নি?

—তা পারলে কি আর এমন কাজ করি? দেখলাম ছেলেটি ভাল। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করেই বিয়েটা দিয়ে ফেল্লাম। কে জানে তার ফলে এই হবে?

—না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ের বিয়ে ভালই হয়েছে। ছেলে ভাল দেখে দিয়েছেন ত—ব্যস্ আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মেয়ের বরাৎ।

—কিন্তু তা বলে ত মন বোঝে না।

—কিন্তু এ রকম ভাবাও ঠিক নয়। আর তাও বলি, বিয়ে ত দিয়েছেন এই সে দিন, এরই মধ্যে জামাই কি মাতব্বর হয়ে উঠবে? এখন তার বয়সই বা কি?

—বয়স কম হয়নি—চুল-টুল পেকেছে দু'একটা।

—চুল পাকার কথা আর বলবেন না। আমার সম্বন্ধীর ছোট ছেলে—তার বয়স এই ১৫ কি বড়জোর ১৬ হবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মাথার অর্দ্ধেক চুল পেকে গিয়েছে।

তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য্য হই কি না দেখবার জন্যই বোধ হয় নবীন বাবু গল্প শেষ করে' একবার চকিতের মত আমার দিকে চাইলেন, এবং তখনই মুখ ফিরিয়ে একটু মুরুব্বিয়ানা করে কিরণ বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনার জামাইয়ের বয়স ২৫।২৬ হবে, কেমন?

—তার বেশি হবে। দ্বিতীয় পক্ষ কি না, বয়স একটু বেশিই হয়েছে, বোধ হয় বছর ত্রিশেক হবে।

—আঃ, ত্রিশ বছর আবার বয়স! কত লোকের যে ও বয়সে প্রথম বিয়েই হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ যা বলচেন তা—

—সে ত আমি জেনেই দিইচি।

—ছেলে পিলে আছে কি সে পক্ষের?

—একটি মেয়ে আছে।

—তা সে জন্যই বা ভাবনা কি? মেয়ে—বিয়ে হলেই পরের ঘরে যাবে। ভাবনা হ'ত যদি একটা ছেলে থাকত।

—সে জন্যও আমি ভাবছি নে নবীন বাবু। আমি ভাবছি এই দিনকাল, তাতে সামান্য চাকরি করে' সে সংসারধর্ম্ম করবে কি করে? তার উপর দেনা যা আছে সে ত গোকুলে বাড়ছে।

—আপনি মিছিমিছি ভাবছেন এই দেনার জন্য। এ ত আপনার ভাববারই নয়, তার উপর দেখুন, দেনা নেই কার? রাজা মহারাজারা পর্য্যন্ত দেনদার। শরীরটা ঈশ্বর ইচ্ছায় ভাল থাকলে, ছেলেমানুষ ও-দেনা শোধ দিতে ওর ক'দিন লাগবে?

—তাই শরীরটাই কি ছাই ভাল? অম্বলের অসুখ ত লেগেই—

—অম্বল ত আমরা অসুখের মধ্যেই ধরি নে, মশাই। অম্বল নেই কার? ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে—কি বলেন মশাই আপনি?—বলিয়া মধ্যস্থ মানার ভাবে ভদ্রলোক আমার দিকে চাইলেন। কোন উত্তর না করে আমি শুধু বিজ্ঞের মত হাসতে লাগলাম। সেই হাসির ইঙ্গিত অনুমান করে প্রসন্নমনে ভদ্রলোক তখনই কিরণ বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জামাইরা আপনার ক' ভাই?

—ভাই-টাই আর কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে এক মামা, কিন্তু তার সঙ্গেও বনিবনাও নেই।

—আজকালকার ধরণই হয়েছে ঐ, নিজে নিজে থাকতে চায়, মামা কি বাবাকে পর্য্যন্ত কেয়ার করে না।

কিরণ বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন—সেই সব দেখেশুনেই ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তাই ত এখন ভাবি, সেই অত দেরীই

যখন হয়েছিল, আরও না হয় দু'মাস দেরী হত। মনের মত একটি ছেলেও পাওয়া গিয়েছিল—আজও তার বিয়ে হয় নি।

—আচ্ছা দেখুন কিরণ বাবু, সে সম্বন্ধটা আমায় করে দিতে পারেন ?

—আপত্তি কি, সে ছেলে পছন্দ করবেন ?

—কি যে বলেন আপনি ? কানা খোঁড়া না হয়, এমন একটি পেলেই বাঁচি আমি, আর আপনি বলচেন কি না অমন ছেলে পছন্দ করব কি না ?

—তা ছেলেটি ভাল, পছন্দ হওয়ার মত বটে। এদিকে পয়সা কড়িও চায় না তারা।

—দেখো ভাই কোন দোষ টোষ নেই ত লুকোন ? এখনকার দিনে যে—

—দোষ থাকবে কোথায় ? ছেলে দেখতে শুনতে ভাল—অবস্থার ত কথাই নেই—

—স্বভাব চরিত্র ?

—বলছি যে তেমন ছেলে শতকরা একটা পাওয়া যায়। তামাকটি পর্য্যন্ত ছোঁয় না সে—

—চাকরি বাকরি করে ত ?

—চাকরি করতে যাবে কেন ? বাপ তার যা রেখে গিয়েছে, বুঝে চলতে পারলে তিন পুরুষ চাকরি করতে হবে না।

—বুঝে চল্‌তে পারবে ত ?

—পারবে না ? এই ত দু'বছর বাপ মরে গিয়েছে, এরই মধ্যে কত আয় বাড়িয়েছে জানেন ?

—আচ্ছা লেখাপড়া কতদূর করেছে?

—তা পাশ টাশ কিছু করে নি, তবে লেখাপড়া জানে। এখনো পড়াশুনো করে শুনেছি।

—বাঙলা নভেল নাটক পড়ে বোধ হয়।

—তা জানি নে, কিন্তু শুনেছি সেই উদ্যোগ করে একটা নূতন ইংরাজি স্কুল করিয়েছে দেশে।

—দেশে?—কোথায় সে?

—এই হুগলী জেলায়—

—ও হরি! কলকাতায় নয়?

—না, কলকাতায় নয়।

—ওঃ, সেই পাড়াগাঁয় ম্যালেরিয়ার মধ্যে—বাপ রে!—বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে ট্রাম থামাবার জন্য শিকল টানতে টানতে বললেন—মাপ করবেন কিরণ বাবু, কথায় কথায় বাড়ীর রাস্তা অনেক দূর ফেলে এসেছি দেখছি। অনুমতি হয়ত এইবার নামি—নমস্কার কিরণ বাবু, নমস্কার মশাই!—ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। কিরণ বাবু অবাক হয়ে তাঁর পথের দিকে চেয়ে রইলেন—এতক্ষণের মুলতুবি হাসিটাও আমার মনের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

মিলনাকাঙ্ক্ষা।

—:*:—

তোমারে বেসেছি ভাল—এই কথাটুক
ধ্বনিয়া উঠিছে মোর সুখে, বেদনায় ;
জন্মান্তের বাসনাটী প্রেম-সাধনায়
স্মৃতি রূপে জাগি' মোর দলি' উঠে বুক।

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই চাহি আজ
স্বপ্ন সাথে বাস্তবের নিবিড় মিলন,
অশরীরি শরীরির গাঢ় আলিঙ্গন—
মগ্নতার আবরণে ঢাকি দিয়া লাজ।

রূপেতে অরূপ পূজা—মিলন-দুয়ারে,
নব সৃষ্টি তরে দিব বলি আপনারে।

খোল দ্বার—আজি মোর সাধনার শেষ,
পূর্ণাহুতি দিব আজি সর্ব্ব ভয় লাজ।
দেবতা—পরাব তারে কামনার বেশ,
সৃজন-রহস্যে ঘেরা মন্দিরের মাঝ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

বিরহাকাঙ্ক্ষা।

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই জাগে ভয়,
মিলনের রজনীতে যদি বাহু ডোর
শ্লথ হ'য়ে খ'সে পড়ে কণ্ঠ হ'তে মোর,
অবসাদ-খিন্ন প্রেম পায় যদি লয়—

প্রণয়েতে করি তাই বিরহ আরোপ,
তৃপ্তি কেবা খুঁজি ফিরে অতৃপ্তির পুরে ?
মিলনের মূর্চ্ছনাতে কোন্ নব সুরে
আসন্ন বিরহভয় করি দিবে লোপ!

বিরহ-সাধনে চাহি করিবারে জয়
মিলনের অবসাদ, বিরহের ভয়।

তবে আসিও না আজ কমমূর্ত্তি ধরি',
দূরে রহি' বাঞ্ছিতেরে শুধু ভালবেসো ;
মিলনে ক্ষণিক তৃপ্তি,—দিবা বিভাবরী
অমূর্ত্ত রূপেতে তুমি কল্পনাতে এসো।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সোহাগ।

—:০:—

কুরূপ কেন বলিস্ তোরা আমার খোকায় বল্?
রূপ ত তোরা চিনিস্ নারে নিন্দুকেরি দল।
রঙটি কালো, বয়েই গেল, ওই ত ভাল ঠিক,
কালো তোদের কৃষ্ণ কালী, ভ্রমর এবং পিক।
নাক্‌টি চাপা, শোন্‌রে ক্ষেপা, দেখেই দিগম্বর,
গরুড় পাখা আস্‌তে নারে, পলায় পেয়ে ডর।
শুন্‌বি তোরা, নাইক কেন, ইহার চোখে টান?—
টান কে দেবে, ধনুক ফেলে মদন পেলে প্রাণ।
কানটি নহে গৃধ্রসম, তাতেই যত দোষ,—
অমঙ্গল যে দেখলে পরে বাড়বে শিবের রোষ।
দন্ত নহে মুক্তাপাঁতি, তাতেই যত দায়,—
কুবেরকে দেয় মাণিক ফেলে, মুক্তা সে কি চায়?
নয়কো কটি সিংহসম, তাই কি কভু হয়?—
সিংহ তাহার চিরদিবস পায়ের তলে রয়।
সদাই কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে, করে নূতন ছল,—
জটায় শুধু ধর্‌বে কেন মন্দাকিনীর জল!
বলচি আমি—যতই পারিস নিন্দা তোরা কর,
কর্‌ছে [illegible] যোর, কিন্‌তে এমন বর!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কবি

—:✱:—

কিশোর-কবির তন্দ্রালস চোখের সামনে স্বপ্নদেবী তার প্রিয়ার রূপটীকে একটু একটু ক'রে ফুটিয়ে তুললে। তারপর পাপড়ি-খসা ফুলের মতো রূপটী শূন্যে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটী মাধুর্য্যের স্মৃতি—ঝরা ফুলের গন্ধটুকুরই মতো।

কবি জেগে উঠল। কল্পনাদেবী তখন তার কানে কানে ব'ললে—কবির তৃষিত হৃদয় সে স্নিগ্ধ করে দেবে—তার প্রেমে; কবির দৈন্য, লজ্জা, ভয় সে দূর ক'রে দেবে—তার ত্যাগে; কবির জীবন পূর্ণ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে—একমাত্র তারই সঙ্গে মিলনে।

কবি সেই স্বপ্নলক্ষ্মীর সন্ধানে বেরুল—অরণ্যে নয়, পর্ব্বতে নয়, স্রোতস্বিনীর তীরেও নয়, নির্ঝরিণীর ধারেও নয়—তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল—পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে, সমাজের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে, শ্মশানের শোক-নীরবতার মধ্যে।

কিন্তু কোথাও তার দেখা মিল্‌ল না।

* * * *

এমনি ক'রে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। কবি কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে প'ড়ল।

তার খোঁজার বিরাম ছিল না।

কত বরাননী কবির পথে এসে দাঁড়াত। ব'লত—আমিই তোমার সেই প্রিয়া।

সন্ধান-ক্লান্ত কবি মনে ভাবত—হয়ত বা এ-সেই। মুখে ব'লত—দেবি! আমার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

দিনের পর দিন—হয়ত বা মাসের পর মাস কেটে যেত।

নারী একদিন ব'ল্‌ত—তৃষ্ণা মিটেছে কি?

কবি ব'ল্‌ত—না।

নারী ব'ল্‌ত—আমার মিটে গেছে। তুমি এইবার যাও।

কবি চ'লে যেত। তার ভাঙ্গা বুকের চোয়ানো রক্তে গোলাপ লাল হয়ে উঠ্‌ত; তার বিষণ্ণ মুখের করুণ হাসিতে জ্যোৎস্না ম্লান হ'য়ে আস্‌ত।

সমাজ গলা উঁচু ক'রে ব'ল্‌ত—ছিঃ ছিঃ!

কবি মাথা নীচু ক'রে ভাবত—তাইত!

* * * *

কবির যৌবনও ফুরোল, কবিও শয্যা গ্রহণ ক'রলে।

মৃত্যুদেবী শিয়রে এসে ব'স্‌ল।

কবি জিজ্ঞাসা ক'রলে—এইবার তাকে পাব ত?

মৃত্যুদেবী ব'ললে—এখনও নয়।

কবি ক্লান্তস্বরে ব'ললে—আর কতদিন তাকে খুঁজে ফিরতে হবে?

মৃত্যুদেবী শান্তস্বরে উত্তর ক'রলে—সৃষ্টি যতদিন।

কবির চোখ বুজে এল। তার শেষ নিঃশ্বাসটা সৃষ্টিরই মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

উন্মাদয়ন্তী জাতক।

(জাতকমালা হইতে অনূদিত)

—:*:—

"তীব্র দুঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপনার অটুট ধৈর্য্যবলে নীচমার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন"—লোকমুখে এইরূপ শোনা যায়। যথা :—

একসময় বোধিসত্ত্ব শিবিদের রাজা ছিলেন। তাঁর মধ্যে সত্য, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের আতিশয্য থাকায়, তিনি লোকহিত সাধনে চির উদ্যোগী ছিলেন। মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও বিনয়রূপী সেই রাজা সর্ব্বদা প্রজাবর্গের উপকারে প্রবৃত্ত থাকতেন।

প্রকৃতিপুঞ্জের চিতে দুষ্টভাব না আসিতে দিয়া,
গুণের গরিমাবশে হৃদয় তাদের বিকাশিয়া,
পিতা যথা তনয়েরে উভলোকে আনন্দিত করে,
সেইমত ক্ষিতিপতি পালিতেন প্রকৃতিনিকরে।

দণ্ডনীতি ছিল তাঁর চিরকাল ধর্ম্ম-অনুগামী,
পরিজন পরজন দুয়েরি সমান শুভকামী।
অধর্ম্মের পথ সদা আবরিয়া সকল প্রজার,
হইয়াছিলেন তিনি স্বর্গের সোপান সবাকার।

ধর্ম্মপালনেতে মাত্র লোকহিত ঘটে জানি মনে,
অনুরক্ত ছিলা তাই চিরকাল ধর্ম্ম-আচরণে।
সকলপ্রকারে সদা ধর্ম্মপথে করি বিচরণ—
অপরে লঙ্ঘিলে ইহা, কভু নাহি সহিত রাজন ॥

সেই রাজার একজন পৌরজনের পরম রূপলাবণ্যবতী একটি কন্যা ছিল। তাকে দেখলে শ্রী, রতি, অথবা অপ্সরাগণের একজন বলে মনে হত। সবার মতেই, সে ছিল পরম দর্শনীয়া স্ত্রীরত্ন।

বীতরাগ জন ছাড়া, আঁখিপথে আর সবাকার,
অনুপম তনু সেই চকিতে পড়িলে একবার,
নয়ন অমনি সেই রূপের রসিতে বাঁধা পড়ে—
নড়িবে কি, শক্তি নাই তারাটি যে এক তিল নড়ে!

সেইজন্যে বান্ধবেরা তার নাম রাখলে উন্মাদয়ন্তী। তার বাপ একদিন রাজাকে গিয়ে জানালেন—"দেব! আপনার রাজ্যে একটি স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূতা হয়েছে, আপনি ইচ্ছামাত্রেই তাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করতে পারেন"।

রাজা স্ত্রী-লক্ষণবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আদেশ করলেন—"আপনারা গিয়ে দেখে আসুন মেয়েটি আমার গ্রহণযোগ্যা কি না"। মেয়ের বাপ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি উন্মাদয়ন্তীকে বল্লেন—"ভদ্রে, তুমি নিজ হাতে এঁদের পরিবেশন কর"। বাপের আদেশমত সে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করতে প্রবৃত্ত হল। তখন সেই ব্রাহ্মণদের—

চাহিয়া সেই বয়ান পানে নয়ান নিশ্চল !
মদনহত ধৈর্য্য সবে অবশ বিহ্বল।
মাতাল সম সংজ্ঞাহারা হইল একেবারে,
আপন আঁখি মনেরে তারা সম্বরিতে নারে !

খাওয়া ত দূরের কথা—ধীরস্থিরভাবে বসে থাকতে পর্য্যন্ত তাঁরা পারলেন না। তখন গৃহস্বামী মেয়েকে তাঁদের সুমুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে; স্বহস্তে পরিবেশন করে তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন।

পথে এসে ব্রাহ্মণেরা বিচার করতে লাগলেন—মেয়েটির রূপ ঠিক যেন প্রতিমার মতন, দেখ্‌বামাত্রই মোহিত হতে হয়। এক্ষেত্রে, পত্নীরূপে গ্রহণ করা ত দূরের কথা—একে দেখাও রাজার উচিত নয়। এর এই রূপচাতুর্য্য রাজার হৃদয় উন্মত্ত করে তুল্‌বে, আর তিনি সেই রূপশোভায় মত্ত থেকে ধর্ম্মকার্য্য ও রাজকার্য্য সম্পাদনে শিথিলপ্রযত্ন হয়ে পড়বেন ; এইরূপে রাজকার্য্যসাধনে কালাতিক্রম হওয়ায়, প্রজার সুখোদয় ও হিতসাধনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইহারে দরশ করিবামাত্র মুনিরও সাধনে বিঘ্ন হয়,
রাজা ত যুবক, সুখেরি সেবক, আগে হতে ভাবে মজিয়া রয়।

এইরূপ মনে মনে স্থির করে তাঁরা উপযুক্ত সময়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বল্‌লেন—"মহারাজ ! মেয়ে ত দেখে এসেছি। মেয়েটির রূপচাতুর্য্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু তার অপলক্ষণও আছে ;—এবং সে লক্ষণের ফল হচ্চে, অপঘাত। সেইজন্যে মহারাজের তাকে চোখে দেখাও অবিধি—পত্নীত্বে গ্রহণ করা ত দূরের কথা।

যেমন করিয়া সমেঘা যামিনী চাঁদেরে লুকায়ে রেখে,
ধরা আকাশের শোভা শৃঙ্খলা একেবারে দেয় ঢেকে,
ঠিক সেইমত নিন্দিতা হয় রমণী যে দেয় নাশি
স্বামী ও শ্বশুর উভয় কুলেরি যশ ও বিভূতিরাশি।

এইসব শোনবার পর, "এই অলক্ষণে নারী আমার কুলের অনুরূপ হবে না" ভেবে রাজা তার প্রতি নিরভিলাষ হলেন।

এদিকে সেই গৃহস্থ, রাজা তাঁর মেয়ের প্রার্থী নন জেনে, অভি-পারগ নামক রাজারই একজন অমাত্যকে কন্যাসম্প্রদান করলেন। তারপর একদিন কৌমুদী-উৎসবের কাল আগত হলে, নিজ রাজ-ধানীতে উৎসবশোভা দেখবার জন্য রাজার মন উৎসুক হল,—চমৎকার একটী রথে আরোহণ করে তিনি নগরভ্রমণে বেরলেন। বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন—রাজপথসকল জলসেচনে সিক্ত ও সুমার্জ্জিত হয়েছে, চারপাশের দোকানগুলি ধ্বজপতাকায় সুসজ্জিত হয়েছে, নিক্ষিপ্ত ফুলে পথের মাটি সাদা হয়ে গিয়েছে; ফুলের মালা, মদিরা, ধূপ ও স্নানীয় অনুলেপনের (প্রভৃতির) গন্ধে বাতাস সুরভিত, হাস্যে লাস্যে ও বাদিত্রের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত, বিবিধ পণ্যরাশিতে ভরা প্রসারিত রাজপথ উজ্জ্বলবেশধারী পুষ্টদেহ তুষ্ট নাগরিকগণে আকীর্ণ হয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে রাজা সেই অমাত্যের বাড়ীর সুমুখে এসে পড়লেন।

এদিকে অলক্ষণে বলে রাজা তাকে ত্যাগ করায়, উম্মাদয়ন্তীর মনে বেশ একটু রাগ ছিল। রাজদর্শনেই যেন একান্ত কুতূহলী—এই ভাব দেখিয়ে, আপনার রূপশোভা যাতে রাজার চোখে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে,

মেঘের শিখরে বিদ্যুতের মত হর্ম্ম্যতল উদ্ভাসিত করে সে দাঁড়িয়ে ছিল,—আর মনে মনে ভাবছিল, আচ্ছা দেখি একবার এই অলক্ষণে-কে দেখে ইনি স্মৃতি ও ধৃতি অবিচলিত রেখে নিজেকে ধারণ করতে পারেন কি না। রাজা সেই বাড়ীটীর শোভাসন্দর্শনে কুতূহলী হবামাত্রই সহসা তাঁর দৃষ্টির অভিমুখে স্থিতা উন্মাদয়ন্তীকে দেখলেন। তখন—

আপন অন্দরে নিতি সুন্দরীদলের
শরীরবিলাসে যাঁর তিরপিত আঁখি,
ধর্ম্মে চির অনুরাগী, ইন্দ্রিয়বলের
বিজয়ে নিরত যিনি, অনুদ্ধত থাকি;
সুবিপুল ধৃতিগুণ যাঁহার ভিতর,
পরযুবতীতে যাঁর নয়ন বিমুখ—
এ হেন রাজাও হয়ে মদনে কাতর,
অনিমেষ চোখে তারে নেহারে উৎসুক!

আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

এ বালা কি ঐ গৃহেরি দেবতা, অথবা জমাট চন্দ্রকর?
মানবী ত নহে, দেবী কি দানবী আসিয়াছে এই ধরণী 'পর?

তাকে দেখে অতৃপ্তনয়ন রাজা যখন এই ভাবে মনে মনে আলোচনা করছিলেন—তখন রাজরথ তাঁর মনোরথের একটুও অনুকূল না হয়ে সে স্থান অতিক্রম করে চলে গেল। সেই রমণীর প্রতি একাগ্রমনা রাজা, শূন্যহৃদয়ে স্বভবনে উপনীত হয়ে, গোপনে সারথী সুনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"শ্বেত প্রাচীরেতে বেষ্টিত সেই গৃহটি কি তুমি চেন ?
কেবা সে, দাঁড়িয়েছিল যে শুভ্র মেঘেতে বিজলি হেন ?"

সারথী বল্‌লে—'দেব! অভিপারগ নামে আপনার একটি অমাত্য আছেন, ওটি তাঁরই বাড়ী। আর যাঁকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন তাঁরি স্ত্রী, কিরীটবৎসের মেয়ে। নাম উন্মাদয়ন্তী।' এই কথা শুনে তাকে পরস্ত্রী জেনে রাজার মন ব্যাকুল হল, চিন্তাভারে তাঁর চোখ নিমীলিত হয়ে পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তদর্পিতমনা রাজা আত্মগত হয়ে বল্‌তে লাগলেন—

মৃদু সুমধুর হাসিতে যে মোরে উন্মাদসম করেছে,
রম্য আথরনিকরে ভরিয়া যেইজন আহা গড়েছে
'উন্মাদয়ন্তী' এ নাম তাহার, করেছে যা হওয়া উচিত তাই,
পাগল যে জন করে, নাম তার কিছু আর নাহি খুঁজিয়া পাই।

পাশরিতে ইচ্ছা করি বটে,
হৃদয়ে দরশ তারি ঘটে!
অথবা আমার এই মন
তারি মাঝে রয়েছে মগন।
আবার কখনো মনে লয়—
এ মনের প্রভু সে নিশ্চয়!

পর-রমণীতে মম এত অধীরতা,—
উন্মাদ হয়েছি আমি হায়!
ঘুম ত গিয়েছে মোরে একেবারে ছেড়ে,
লজ্জাও কি ত্যেজিল আমায়?

দেহের বিলাসে তার, হাসিভরা চাহনীর মাঝে,
অনুরাগে ভরা মম মন যবে বিরাজে নিশ্চল,
তখন অপর কাজে ডাকিতে কাঁসর যেই বাজে—
সে কাজের প্রতি মোর মন হয় বিদ্বেষ-বিকল।

এইরূপে মদবিচলিত-ধৈর্য্য হলেও রাজা তাঁর চিত্তকে ব্যবস্থিত করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও পাণ্ডু হতে লাগ্‌ল। চিন্তা'কুলিত ভাব আর দীর্ঘশ্বাসত্যাগ প্রভৃতিতে তাঁর আকৃতিতে কামকাতরের ভাব ব্যক্ত হয়ে পড়ল।

যদিও,

মহান্ ধৈর্য্যের বলে আপনার মনের বিকার
গোপন করিলা নরবর,
চিন্তায় স্তিমিত আঁখি, শরীরের কৃশতায় তাঁর,
ব্যক্ত তাহা হইল সত্বর।

আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে লোকের মনের ভাব বুঝে নিতে রাজার সেই অমাত্য অভিপারগ ছিলেন খুব একজন নিপুণ ব্যক্তি। রাজাকে দেখে, কি যে তাঁর ঘটেছে তা অভিপারগের বুঝতে বাকী রৈল না। রাজার এ অবস্থা হবার কারণটি তাঁর বোধগম্য হওয়ায়, এতে রাজার অনিষ্ট ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর মন শঙ্কিত হল; কারণ রাজাকে তিনি স্নেহ করতেন, এবং অতি বলশালী মদনের প্রভাবে মানুষকে যে কি হতে হয়, তাও তাঁর জানা ছিল। তারপর রাজাকে গোপনে কিছু জানাবার জন্যে তাঁর কাছে তিনি উপস্থিত হলেন, এবং রাজাকর্ত্তৃক কৃতাভ্যনুজ্ঞ হয়ে বল্‌তে লাগলেন—

দেব আরাধনে, হে নরদেবতা, আজিকে যখন আছিনু রত,
অম্বুদ-আঁখি যক্ষ সে এক হইল আমার সমীপগত।
কহিল আমারে, ওগো তুমি কেন দেখিছ না আঁখি মেলিয়া চাহি,
উন্মাদয়ন্তীপ্রতিনিবিষ্ট নৃপের হৃদয়ে শান্তি নাহি।

এই কথা বলে যক্ষ চকিতে হইল তিরোহিত,
সেই হতে, ওহে দেব, বিষাদ ঘিরেছে মোর চিত।
যাহা সে বলিয়া গেল, যদি প্রভু ঘটে থাকে তাই,
প্রসাদপ্রয়াসীজনে আজো তবে কেন বল নাই ?

অতএব আমাকে অনুগৃহীত করবার জন্যে উন্মাদয়ন্তীকে এখন আপনার গ্রহণ করা উচিত। তাঁর এই প্রস্তাবে রাজা লজ্জানতবদন হলেন। মদনবশগত হলেও চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মবলে তিনি কখনো ধৈর্য্যচ্যুত হন নি। তিনি স্পষ্টাক্ষরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বল্‌লেন—না, তা হতে পারে না, কেন না :—

আমিত অমর নহি,—পুণ্য হতে হইব পতিত,
তারপর পাপ এই সবাকারই হইবে বিদিত।
আর, তার বিরহেতে হিয়া তব পুড়ে হবে ক্ষীণ,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যথা তৃণ হয় অনলে বিলীন !

উভয় লোকেরি ঘটে অহিতসাধন
যেহেতু, অবোধে শুধু করে হেন কাজ।
একমাত্র সেইহেতু ভ্রমে কদাচন
নাহি করে সেই কর্ম্ম পণ্ডিতসমাজ।

অভিপারগ বল্‌লেন—দেব! এতে আপনার ধর্ম্ম অতিক্রমের কোনই আশঙ্কা নেই, কেননা :—

আমি যে করিব দান, তাহাতে সাহায্য বিতরিয়া
ধর্ম্মলাভই হইবে তোমার,
না করি গ্রহণ তারে, বিঘ্ন মম দানে আচরিয়া
অধর্ম্মই হইবে সঞ্চার।

হে দেব! এতে আপনার কীর্ত্তির উপরোধকও আমি কিছু দেখছি নে।

আমি আর তুমি ছাড়া এ বিষয়
জানিবে না কভু অন্য কেও,
অতএব, জন-অপবাদ ভয়,
করিতে হবে না শঙ্কা সেও।

আর এ কার্য্যে আমাকে পীড়া দেওয়া ত হবেই না, অনুগৃহীতই করা হবে। কারণ—

প্রভুর স্বার্থচর্চ্চাজনিত তুষ্টিভরা যে চিত্ত,
আঘাত বেদনা কোথায় সেখানে রয়,
অতএব দেব, নিভৃতে কামের সুখভোগ কর নিত্য,
মোরে পীড়নের শঙ্কা সে কিছু নয়।

রাজা বল্‌লেন—ছিছি, এ পাপ কথা আর নয়!

সকল দানেতে ওগো ধর্ম্মের সাধন নাহি হয়,
মোর প্রতি অতি স্নেহে তুমি না ভাবিছ এ বিষয়।

আমার উপর যেবা অতিশয় স্নেহে
নাহি চায় পানে আপনার,
এ হেন পরম বন্ধু, এ হেন যে সখা,
তার প্রিয়া সখী যে আমার।

অতএব আমাকে এরূপ প্রতারণা করা আপনার উচিত নয়। আর এ বিষয় অপর কেউ জানবে না বলেই কি পাপ হবে না?

আদেখায় নিসেবিত বিষের সমান
গোপনে আচরি পাপ, কেবা সুখ পায়?
দেবতা ও যোগী, যারা নির্ম্মল-নয়ান,
তারা নাহি দেখে—হেন কি আছে ধরায়?

আরো দেখুন—

নহে সে যে তব প্রিয়া, হায়,
প্রত্যয় করিতে কেবা পারে!
ত্যেজি তারে তুমি বেদনায়
দহিবে না, বুঝাইবে কারে?

অভিপারগ বল্‌লেন—

দারাপুত্র সহকারে আমিত তোমারি দাস,
দেবতা আমার তুমি প্রভু,
সেও ত তোমারি দাসী, অতএব ধর্ম্মনাশ
ইথে তব না হইবে কভু।

হে কামদ, দিছ তুমি মোরে বহু কামনার ধন,
আমার প্রিয়ারে আজি তোমারে করিব সমর্পণ।
ইহলোকে প্রিয় যাহা তাহাই করিয়া দান, নরে,
রমণীয় প্রিয় যাহা পরলোকে তাহা লাভ করে।

অতএব, হে দেব, আপনি তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—না, তা, হ'তে পারে না, কোনক্রমেই না। কেন?—

লেলিহান হুতাশনে মরিব পুড়িয়া,
অথবা মরিব খর তরবারি ঘায়,
যেবা শ্রী লভিনু চির ধর্ম্ম আচরিয়া,
শক্তি নাহি মোর করি পীড়ন তাহায়।

অভিপারগ বল্‌লেন—আমার ভার্য্যা বলেই দেব, যদি তার প্রতি-গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার প্রতি সর্ব্বজনের অভিলাষের অবিরোধী বেশ্যাব্রতের আদেশ করব, তারপর তাকে আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—আপনি কি পাগল হয়েছেন!

দণ্ড দিব, বিনা দোষে
ত্যজিলে কলত্রে।
ধিককৃত হইবে পুনঃ
হেথায়, পরত্রে।

অতএব এরূপ কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করতে বিরত হয়ে, যা ন্যায় তারই প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করুন।

অভিপারগ বল্‌লেন—

স্থখের বিলোপ মম, জন অপবাদ, আর ধর্ম্মের অত্যয়,
তব সখ্য-স্থখ-পাওয়া হৃদয়ে হবে না বোধ এই সমুদয়।
মহীতে মহেন্দ্র তুমি, দানের আহবে কোথা হেন হুতবহ?—
পুণ্যহেতু মোর, যথা ঋত্বিকে দক্ষিণা লয়, তারে তুমি লহ।

রাজা বল্‌লেন—অবশ্য আমার উপর অতি স্নেহবশতঃই আপনি নিজের হিতাহিত উপেক্ষা করে আমার স্বার্থ পরিচর্য্যায় উদ্যত হয়েছেন। বিশেষ করে এই জন্যেই আমি আপনার স্বার্থ উপেক্ষা করতে অক্ষম। তারপর, জনাপবাদের বিষয়েও নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না। কেন যায় না, তা বল্‌ছি—

লোক-অপবাদে যারা আদর না করে,
নাহি ভাবে পরকাল, ধর্ম্ম উপেখিয়া,
বিশ্বাস থাকে না কারো তাহাদের 'পরে
অচিরে লক্ষ্মীও যান তাদের ত্যেজিয়া।

অতএব আপনাকে বলি—

ধরমের অতিক্রমে দোষ যাহা—সেত স্থনিশ্চিত,
যেবা অভ্যুদয় তাহে, সে কেবলি সন্দেহজড়িত।
জীবনেরও লাগি যদি ধর্ম্মত্যাগে হয় প্রয়োজন,
তবুও তাহাতে যেন রুচি তব না হয় কখন।

কি আর বল্‌ব—

নিন্দা আদি দুখ মাঝে অপরেরে ফেলিয়া,
নিজ সুখে রত নাহি রহে সাধুজন,
পরে নাহি নিপীড়িয়া, ন্যায়পথে চলিয়া,
বেদনা আমার একা করিব বহন।

অভিপারগ বল্‌লেন—"প্রভুর উদ্দেশ্যে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমি যে কাজ করছি, তাতে করে আমার পক্ষে, আর দেব, দীয়মানাকে প্রতিগ্রহণ করে আপনার পক্ষে অধর্ম্ম সঞ্চারের অবকাশ আমি ত কিছুই দেখছিনে—পরন্তু শিবিগণ, সামন্ত ও জানপদগণ সবাই 'এতে অধর্ম্ম কোথায়' এই কথাই বলবে। অতএব দেব, তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—"দেখুন, আমার স্বার্থচর্য্যায় আপনি অতিমাত্র আসক্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বেশ ভাল করে একটু চিন্তা করে দেখুন। আর সামন্তগণ, জানপদবর্গ, শিবিগণ এবং আপনি আমি,—এদের মধ্যে ধর্ম্মবিত্তম কে?

অভিপারগ অমনি সসম্ভ্রমে রাজাকে বল্‌লেন—

শ্রুতিতে তোমার প্রভু অতি অধিকার,
বুধজনে সেবি (তব জ্ঞান যে অপার)।
অতি পাঠকারী তুমি করি বহু শ্রম,
ত্রিবর্গ বিদ্যার তত্ত্বে বৃহস্পতি সম।

রাজা বল্লেন—তাই যদি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি আর আমাকে প্রতারিত করবেন না। কেন না—

নয়ের (স্বভাব) আর হিতাহিত যত,
হয়ে থাকে নৃপতির চরিতানুগত।
কীর্ত্তিমান যেই রাজা, প্রজা তারে পূজে,—
ন্যায়পথে রব আমি এই সব বুঝে।

সুপথ কুপথ কিছু না ভাবিয়া মনে
গাভী যথা বৃষভের অনুগামী হয়।
নৃপে অনুসরি তথা চলে প্রজাগণে
শুভ কি অশুভ কারো মনে নাহি লয়।

তারপর আপনি আরো দেখুন—

নিজেরে শাসনে রাখি—সে শকতি নাহি যদি হয়,
মোর হাতে মানুষের কি ঘটিবে কহন না যায়।

অতএব হয়ে চির প্রকৃতির হিতমোক্ষমান,
নিজেরও লাগিয়া চাহি ধর্ম্ম আর যশ সুবিমল,
প্রজার নেতা যে আমি, গাভীদলে বৃষভপ্রধান,
আমি কি লভিতে পারি বাসনার বশের কবল?

রাজার এই অবস্থা দর্শনে প্রসাদিতমন অভিপারগ অমনি রাজাকে প্রণাম করলেন, আর কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—

কি ভাগ্যসম্পদ্‌শালী এ রাজ্যের প্রকৃতিনিকর,
পালনে নিরত তুমি যাহাদের, হে নরদেবতা!
বিসর্জ্জিয়া সুখসাধ, ধর্ম্ম-অনুগমনে তৎপর—
বনবাসী তাপসেও তোমা হেন সাধু মিলে কোথা!

'মহৎ' শব্দটি এই আজি মহারাজ,
তোমাতেই অর্থসহ করিছে বিরাজ।
অগুণীর যদি কেহ গুণগান করে
রূঢ় অতি ঠেকে তাহা আখরে আখরে।

মহৎ তোমার এই আচরণে আছে বল বিস্ময় কি আর,
সমুদ্র যেমন নানা রতনের, তুমি তথা গুণের আধার।

তাহলেই দেখা গেল তীব্রদুঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপন অটুট ধৈর্য্য আর সুঅভ্যস্ত ধর্ম্মের বলে নীচ মার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন। অতএব ধৈর্য্য-ধর্ম্মের অভ্যাসের জন্য যোগসাধন কর্ত্তব্য। ইতি—

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মহাদেব।

——:*:——

ভগীরথ-স্তুতিবাদে সুরধুনী যবে
বাহিরি' বৈকুণ্ঠ হ'তে বিশাল গর্জ্জনে
চলিল মহীর পানে—কাননে কাননে
মূর্চ্ছা গেল বিহঙ্গম পলকে; নীরবে
শুনি' সে গর্জ্জন; বনে বনে ফুকারিয়া
মৃগেন্দ্র শার্দ্দুল যত মার্জ্জারের মত
লুকাইল—হিমাদ্রির শৃঙ্গ শত শত
তুচ্ছ বালিরাশি যেন পড়িল খসিয়া।
হু হু হু হু শব্দে ছুটি' আসে বেগবতী,
মাতা বসুন্ধরা শুনি' কাঁপে থর থর—
মহী বুঝি ধ্বংশ হয়—কাহার শকতি
ধরিবে সে ভীমস্রোতে ?—তুমি গঙ্গাধর !
আপনার শির পাতি' সে কলুষ-হরা
ধরিয়া রক্ষিলে এই দীন বসুন্ধরা।

(২)

তোমারে ডাকে নি কেহ, সুরাসুরে যবে
দোঁহে মিলি আরম্ভিল সাগরমন্থন,
তোমারে ভুলিয়া কেহ চাহে নি, গরবে
যবে তারা করি' নিল অমৃত বণ্টন।
অবশেষে উঠি' এল তীব্র হলাহল!—
দেব যক্ষ রক্ষ নর কিন্নরের প্রাণ
গেল কাঁপি' মহাত্রাশে; পৃথ্বী কম্পমান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বুঝি আজি যায় রসাতল!
কোথা যাবে কি করিবে নাহি জানে কেহ—
দেব যক্ষ রক্ষ সবে শঙ্কিত বিহ্বল!
তুমি আসি' অবহেলে রক্ষিলে সকল,
পান করি কালকূটে; ত্রিদিবে অজেয়,
দেব মাঝে মহাদেব নীলকণ্ঠ তুমি,
অপ্রমেয়, অরিন্দম, জ্ঞানশক্তি-ভূমি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নবীনের প্রতি।

হে নবীন, হে তরুণ! পশ্চিম-অচলে
যেথা ধীরে ডুবিতেছে অস্তগামী রবি,
আঁখি সেথা বদ্ধ করি' বিষণ্ণ বিরলে
নাহি ফেল অশ্রুজল; নবারুণ-ছবি
উদয় অচলে যেথা বিশ্ব-মহাকবি
আঁকিয়া দিতেছে চির পুলক-হিল্লোলে
সেথা খোঁজ সত্য তব; প্রাণের কল্লোলে
যেথা যত উঠিতেছে লয় তান, সবি
বিশ্বকবি-গীত গান; মোরা তারি সুরে
পুষ্পসম ফুটি' উঠি' পলকে পুলকে
সোহাগে সুবাস টানি' দিগন্ত-আলোকে,
মূরছিয়া পড়ি পুনঃ অন্তরীক্ষ-পুরে;—
পশ্চিম-অচলে শ্রান্ত ঢলি' পড়ি' সুখে
আবার উদয়াচলে জাগি' হাসিমুখে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নতুন রূপকথা।

—:o:—

এক যে ছিল রাজা। রাজার নাম জীবনগুপ্ত, রাজার রাজ্য শাকদ্বীপ, রাজার রাজধানীর নাম মনে নেই। রাজার ধনৈশ্বর্য্যের অন্ত নেই, লোকজনের ইয়ত্তা নেই। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দেউড়ীভরা দরোয়ান, বাগিচাভরা ফুল। রাজার সাত-মহলা পুরী পৃথিবীর বুক আঁকড়ে ধরে' আকাশ ফুঁড়ে একেবারে কোথায় উঁচু হ'য়ে উঠেছে—উপরে তাকিয়ে দেখলে দেখাই যায় না কোথায় তার চূড়া কোন্ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। সাত-মহলা পুরী—তার মহলে মহলে দাস দাসী, মহলে মহলে চন্দন-কাঠের দরজা, মেহগনি কাঠের জানালা, দুধের মত সাদা শ্বেত পাথরের থামের উপরে উপরে আবীরের মত লাল রক্তপাথরের গম্বুজ—একেবারে কতদূর থেকে দেখা যায় যেন পলাশবনে পলাশ ফুটে আছে। সেই সব থামে থামে আবার কত কারু-কার্য্য, তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও ময়ূর তার পেখম ফুলিয়ে রঙ্ বাহার খেলছে, কোথাও হাতী তার শুঁড় ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিংহ তার প্রকাণ্ড থাবা পেতে বসে আছে, বাঘ রাগে বসে' গর্ গর্ করছে—এমনি সব কত কত শ্বেতপাথরের থামে থামে খোদাই করা। দেয়ালে দেয়ালে কত চিত্র। কোথাও সীতার বনবাস, কোথাও পঞ্চবটী, কোথাও মায়ামৃগ, কোথাও অশোকবন—এমনি সব কত কত

চিত্র নিপুণ তুলিতে চিত্রিত হয়ে দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। গম্বুজের ছাদে ছাদে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদল আঁকা—তারই পাশে পাশে আবার কতরকমের পাখী লতা পাতা। সাত মহলে রাজার সাত রাণী। সাতরাণীর গলায় মুক্তোর মালা, নাকে হীরের ফুল, কানে পান্নার দুল; তাদের মাথাভরা চক্‌চকে মিশমিশে কালো রেশমী চুলে গজমোতির হার; হাতে সোনার কাঁকন রাণীদের গায়ের রঙের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেছে, আঙুলে আঙুলে লাল ডগ্‌ডগে চুণি-বসান আংটী; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হীরে চুণি পান্না জহরতে সাত রাণীর রূপ একেবারে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। সাতমহলা পুরীতে সাত রাণীকে নিয়ে রাজা সুখে রাজ্য করেন।

রাজা প্রতি বৎসর বসন্ত এলে বনোৎসব করেন। যখন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়ার মাঝের মদের গন্ধ শীতবুড়ির নাকে ঢোকে, তখন শীতবুড়িটা যেন কিসের স্মৃতিতে শিউরে ওঠে, কিসের বেদনায় জেগে ওঠে। তার পরণের সাদা থানের কাপড়ে ধীরে ধীরে সবুজের আমেজ লাগে, মুখের বুকের হাতের ঢিলে চাম্‌ড়া সব নিটোল হ'য়ে আসে, চোখের শুক্‌নো চাউনি বিদ্যুৎভরা মেঘের মত হ'য়ে আসে—মাথায় কাশফুলের মত সাদা চুলের রাশ ভ্রমরের দলে ছেয়ে যায়—ফাটা পা দুটো কমলদলের মত হ'য়ে আসে, হাতের কাঠির মত আঙ্গুলগুলো চাঁপার কলি হ'য়ে জেগে ওঠে। তখন শীতবুড়িকে চেনে কার সাধ্য; তখন তার কালো চোখে বাঁকা চাউনি, পাকা ডালিমের কোয়ার মত লাল টুক্‌টুকে ঠোঁটের ফাঁকে যুথীর কলির মত দাঁত-দেখান হালকা হাসির রেখা, জরি-পেড়ে চুণি পান্নার বুটিদার গাঢ় সবুজ রঙের সাড়ীতে আর তার শরীর যেন ধরেই না;

সে সবুজ সাড়ীর চাইতেও যে সে অনেকখানি বেশি—এই কথাটা সে ভরা-বুক নিয়ে যেন জানিয়ে দিতে চায়। প্রতি ফাল্গুনে এমনি করেই শীতবুড়ির নবজন্ম হয়, আর রাজাও তাঁর সাত রাণীকে নিয়ে এমনি সময়েই বসন্তোৎসব করতে রাজধানী ছেড়ে চলে যান।

সেবার প্রথম ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গে "ফাল্গুনী"র বাঁশী বেজে উঠল। বনে বনে গাছে গাছে পাতায় পাতায় পুলক লাগল। কোথা থেকে একটা ভূঁইচাঁপা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার কচি মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আধ আধ কথায় গান সুরু করে' দিলে:—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফির্ব না রে"।

কোথা থেকে একটা ছোট্ট চড়াই তার ছোট্ট বুক ফুলিয়ে গলায় গিটকিরি কেটে গান জুড়ে দিলে—

"আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়
আকাশ আমি ভর্‌ব গানে"।

আমের মুকুলের গন্ধ ছোটার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি দলের ব্যস্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠল, ঘন পাতার আড়াল থেকে স-তান কোকিল ডেকে উঠল, বুল্‌বুল্ লতার গায়ে দোল খেতে খেতে পিউ পিউ করে' গলা সাধতে লাগল, দোয়েল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে নতুন গোঁফ-ওঠা ছোক্‌রার মত শিষ দিতে লাগল, শালিখেরা পর্য্যন্ত ছলদে ঠোঁট দিয়ে তাদের গিরিমাটির গা ঠোক্‌রাতে ঠোক্‌রাতে মহা আনন্দে তাদের বেসুরো গলায় কিচিরমিচির করতে লাগল। বনে

বনে লতা দুলল—পাতা কাঁপল—বাতাস ছুটল—চারদিকে মহাসাড়া পড়ে গেল। রাজা বললেন—"বসন্ত আগত, বনোৎসবের আয়োজন কর"।

রাজা বসন্তোৎসবে যাবেন। সাতমহলা পুরীর সাত মহল ডাক হাঁকে ভরে' উঠল। রাজপুরীর চার তোরণের নহবতে সানাইয়ের বুক চিরে ভৈরবী সুর ফুটে বেরল। কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়ঢাক সব একসঙ্গে বেজে উঠল। ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ করে' তাদের আনন্দ জানাল, হাতীশালে হাজার হাতী তাদের শুঁড় আকাশে তুলে বিশাল নাদ করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল। রাজা দুধের মত সাদা একটা ঘোড়ার উপরে সোয়ার হলেন; সাত মহল থেকে সাত রাণী বেরিয়ে এসে সাত দোলায় উঠলেন। রাজপুরীর বিশাল সিংহদ্বার খুলে গেল। রাজা সাদা ঘোড়ায় ঘোড়-সোয়ার হ'য়ে সাত দোলায় সাত রাণীকে নিয়ে সিংহদ্বার পথে বেরলেন—এমন সময় সেই সিংহদ্বার দিয়ে এক পরম সুন্দর পুরুষ প্রবেশ করে' রাজাকে অভিবাদন করে' দাঁড়াল।

—ওরে থামা থামা কে কোথায় আছিস! থামা সব কোলাহল, সব গীতবাদ্য, সব ডাক হাঁক, সব হাসি গান! ইঙ্গিতে সব থেমে গেল—কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়ঢাক সব যেন যাদুমন্ত্রবলে নীরব হ'য়ে গেল। নহবতে নহবতে সানায়ের হৃদয়-গলান সুর কানে কানে রেশ রেখে মিশিয়ে গেল, তুরঙ্গ সব বাঁকান-ঘাড় সোজা করল, হাতীর দল শুঁড় আস্ফালন বন্ধ করল। বাহকেরা সাত রাণীর সাত দোলা কাঁধ থেকে

মাটিতে নামালে ; রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। রাজার আর বনোৎসবে যাওয়া হ'ল না।

রাজা দেখলেন পরম সুন্দর পুরুষ। দীর্ঘ শরীর, উন্নত শির, তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ; গায়ের রঙ, সে যেন গলিত কাঞ্চন—গায়ের কোনখানে টিপি দিলে যেন আঙ্গুলের ছ'পাশ দিয়ে রক্ত ছুটে বেরবে, এমন স্বাস্থ্য। মাথা মুখ মুণ্ডিত। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোন আবরণ নেই, কেবলমাত্র একটুকু কৌপীন। রাজা বিস্মিত হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"মহাশয়! আপনি কে"?

আগন্তুক উত্তর দিলেন—"মহারাজ! আমি সন্ন্যাসী"।

রাজা বললেন—"মহাশয় অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন। সন্ন্যাসী কি? সন্ন্যাসী কে"?

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ! সন্ন্যাসী সেই, যে সৎ অসৎ নাশ করে' নির্ব্বিকার হয়েছে। সেই পরম সত্য একই সত্য—সেই সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। মহারাজ, এই যে জগৎ দেখছেন, এ কেবল আমাদের মায়ার সৃষ্টি—আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম"।

রাজা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—"মহাত্মন! এ জগত সব মিথ্যা? এই যে সংসার, ঐ যে আকাশ, এই যে ঘোড়া, ঐ যে হাতী—সব মিথ্যা"?

—"স্বপ্ন, মহারাজ, স্বপ্ন, ছায়াবাজী। হাতী কি থেকে বলছেন? ঘোড়া কোন্‌টাকে দেখছেন? আপনার যদি দৃষ্টি থাকত তবে দেখতে পেতেন, ও হাতীও নয়, ঘোড়াও নয়—খালি "ইলেকট্রনের" পুঞ্জীভূত সমষ্টি।

সুন্দর ফুল, সুন্দরী নারী, সুস্বাদ সোম—কোথায় মহারাজ?—আমি দেখছি কেবল ঈশ্বর। এই মিথ্যাকে চরম করে' মেনে পরম সত্য থেকে আমরা দূরে রয়েছি।"

রাজা এমন সব কথা কোনদিন শোনেন নি। তাই এ সব কথা শুনে উতলা হলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন—"মহাত্মন, ক্ষমা করবেন—আমার এখন সময় নেই—বসন্তোৎসবে বনে যেতে হবে। এ রাজ্যের এই রাজবংশের কোটি বছরের উৎসব এ—যা কোটি বছরের প্রত্যেক বছরটিতে সম্পাদিত হ'য়ে এসেছে। আমার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, আবার তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন—আবার তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্বে—এমনি লক্ষ রাজার উৎসবের স্মৃতি নিয়ে এই উৎসব গড়ে উঠেছে। এ উৎসব বন্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। মহাত্মন, রাজপুরীতে অবস্থান করুন। এক মাস পরে উৎসব থেকে ফিরে এসে আপনার কথা শুনব। রাজপুরীতে যখন যা প্রয়োজন হবে অনুজ্ঞা করবেন—তৎক্ষণাৎ তা পালিত হবে"।

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী—আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। আপনি উৎসব থেকে ফিরে আসুন—আমি অপেক্ষা করব"।

সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন।

—ওরে বাদ্যকরেরা থেমে রইলি কেন! তোরা সব বোকার মত সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন! বাজা বাজা—ঐ যে রাজা ঘোড়ায় উঠছেন—ঐ যে সাত রাণীর সাত দোলা বাহকেরা কাঁধে তুলে নিল—বাজা বাজা। চোখের এক পলক ফেলতে সোনার জীবন-

কাঠির স্পর্শে যেন সব জেগে উঠল—কাড়া নাকাড়া কাঁসি দামামা রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী মৃদঙ্গ করতাল জয়ঢাক—সব বেজে উঠল কাড়া নাকাড়া ক—র্‌র্‌র্ করে' উঠল, কাঁসি খন্ খন্ করে' উঠল, দামামা ডিম্ ডিম্ করে' উঠল, মৃদঙ্গ দম্ দম্ করে' উঠল, করতাল ঝম্ ঝম্ করে' উঠল, বেণু বীণা রবাব নানা মূর্চ্ছনা তুলল, জয়ঢাক ঢক্কা নিনাদ তুলল। লক্ষ ঘোড়া আবার ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির গায়ে খুর ঠুকতে প্রাচির গায়ে লাগল, হাজার হাতী শুঁড় দুলিয়ে তাদের চাঞ্চল্য জানিয়ে দিল—রাজা সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হ'য়ে সাত দোলাতে সাত রাণীকে নিয়ে বনোৎসবে যাত্রা করলেন। রাজা সঙ্গীসহচর নিয়ে সিংহদরজা দিয়ে প্রশস্ত রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন ;—রাজপুরীর চার তোরণে নহবতে নহবতে সানইয়ে সানাইয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বসন্ত-বাহারে স্থর উঠতে লাগল—

"গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।"

রাজা বনে এলেন। রাজার পিছনে সাত দোলায় সাত রাণী, তার পিছনে লক্ষ ঘোড়া, তার পিছনে হাজার হাতী, তার পিছনে বাদ্যভাণ্ড দাসদাসী অনুচর নিয়ে রাজা বনে এলেন, বসন্তোৎসব করবার জন্যে।

বনের অপূর্ব্ব শোভা। বনের বুক একেবারে পুরে উঠেছে—তালে তমালে শালে শিমুলে আমে জামে বকুলে পারুলে অশোকে অশ্বত্থে একেবারে ভরে' উঠেছে। লক্ষ রকমের লক্ষ গাছ তাদের

ঘন পাতার চামর ঝুলিয়ে দিয়েছে; কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ—চোখ-জুড়োন সবুজে সবুজে একেবারে চারদিক জড়িয়ে গেছে, চারিয়ে গেছে—সেই সবুজের বুকে বুকে আবার রঙের ঢেউ। সাদা লাল হলুদে গোলাপী বেগুনে নীল জরদ—একেবারে রঙে রঙে রঙ্‌বাহার। তারই মাঝে আবার মত্ত বাতাসের মাতামাতি, বাতাসে বনে নতুন করে' পরিচয়, নতুন করে' চিরদিনের প্রশ্নোত্তর। বাতাস ছুটতে ছুটতে একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন বর্ষণ করতে থাকে—

কে গো তুমি? আমি বকুল!
কে গো তুমি? আমি পারুল!
তোমরা কেবা? আমরা আমের মুকুল গো—

আবার সেখান থেকে ছুট্ দিয়ে আর একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—আবার জিজ্ঞেস করতে লেগে যায়—

তুমি কে গো? আমি শিমুল!
তুমি কে গো? কামিনী-ফুল!
তোমরা কেবা? আমরা নবীন পাতা গো—

আবার সেখান থেকে চট্ করে' ছুট্ দিয়ে কোন এক অশ্বত্থ গাছের আগডালে উঠে দোল খেতে খেতে গান ধরে' দেয়—

"এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
মিল্‌ব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।'

"অশোকবনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে,
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।"

রাজা সন্ন্যাসীর কথা একেবারে ভুলে গেলেন। লক্ষ গাছের লক্ষ ডালে লক্ষ দোলনা চড়ল—মহানন্দে বনোৎসব আরম্ভ হল।

বনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিচয় ত আজকার নয়, একদিনের নয়; ও পরিচয় সেই আদিম কালেরও আগে হ'তে—সেই কাল, যে-কালে বনের মানুষ ছিল বন-মানুষ। বনের সবুজকে যখন মানুষ হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করে, তখন ত বন কেবল বনই নয়—বনের চাইতেও সে অনেকখানি বেশি। মানুষের হৃদয়ের রঙ যে তখন বনের সবুজকে উজ্জ্বল করে' তোলে। সে তখন নির্জ্জীব নয়, মূক নয়—তখন সে হাসে, খেলে, গান গায়। ওই গানই ত চাঁদনী রাতে হাল্‌কা হাতে আকাশের গায়ে জ্যোৎস্নার আলপনা টানতে টানতে বিদ্যুৎবরণ পরীরা বেণু বনে বনে শুনতে পায়—

"ওগো দখিণ হাওয়া, পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে!
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া,
পরশ-খানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,"

"আহা এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।"

ওই গানই ত অপ্সরীরা তারা-জাগা ঊষায় তাদের সারা নিশার অভিসার থেকে ফিরবার পথে ঘুমন্ত চোখে ফুলন্ত গাছে গাছে শুনতে পায়—

"ওগো নদী আপন বেগে
পাগল পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।"

ওই গানের সঙ্গে যখন মানুষও গান গাইতে শেখে তখন ত সে মৃত্যুকেই বড় বলে মানতে চায় না। কিন্তু যাক সে কথা!

এক মাস পরে রাজা বন থেকে বসন্তোৎসব শেষ করে' রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে এসেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—"মন্ত্রী সন্ন্যাসী কোথায়? তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।" মন্ত্রী রাজাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে দেখে একেবারে চম্‌কে উঠলেন! এই সেই সন্ন্যাসী যাঁকে তিনি মাত্র এক মাস আগে দেখেছিলেন। কোথায় সে

নধর তনু—উন্নত শির তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ, কাঞ্চনের মত বর্ণ? সে মুখে যেন কে কালি মেখে দিয়েছে—সে চোখে যেন কে কুজ্ঝটিকা ভরে' দিয়েছে—প্রশস্ত ললাটে চাম্‌ড়া কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে—সারা শরীরটা একেবারে ঝুনো নারকেলের মত চিম্‌সে হ'য়ে উঠেছে। রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে' সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন—"মহাত্মন, আপনার একি পরিবর্ত্তন" ?

সন্ন্যাসী তাঁর অত্যন্ত শুষ্ক ঠোঁটে একটু হাসি এনে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"মহারাজ, গত একমাস আমি অনাহারে আছি"।

ক্রোধে রাজার চোখ দুটো জ্বলে উঠল—শরীর থর্ থর্ করে' কেঁপে উঠল—বুকের উপর রত্নরাজি ঝক্ ঝক্ করে' জেগে উঠল—কোষের অসি ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠল—রাজা মন্ত্রীর দিকে চোখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কঠোর কণ্ঠে বললেন—"এ কি ব্যাপার মন্ত্রী? আমার যে রাজ্যে কোনদিন সামান্য একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকে না, সেই রাজ্যে রাজার অতিথি হয়ে রাজপুরীতে অবস্থান করে' একমাস কাল অনাহারে!—মন্ত্রী এর অর্থ কি"? ক্রোধে রাজার বাক্ রুদ্ধ হয়ে এল, মুখে আর কথা সরল না।

মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন—"মহারাজ এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু মহারাজ, বনোৎসবে যাবার সময় এ দাস সন্ন্যাসীর নিজ মুখ থেকেই শুনেছিল যে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই—তাই এ দাস তাঁর আহারের কোন আয়োজন করে নি। সন্ন্যাসীও কোন অনুজ্ঞা করেন নি"।

রাজা সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললেন—"মহাত্মন, আপনার আহার্য্য কি" ?

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমি যখন কুরুবর্ষের রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করছিলেম, তখন প্রতিদিন রাজভাণ্ডারী দশসের করে' দুধ আমার আশ্রমে রেখে যেত"।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রী, রাজগোশালায় শ্রেষ্ঠ যে গাভী তিনটি রয়েছে সেই গাভী তিনটি সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত হোক"।

—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

রাজা সন্তপ্ত ও ব্যথিত অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

(২)

প্রশস্ত রাজসভা। রাজা সভা করে' বসে' আছেন। রূপোর ঝালর লাগান চুনি পান্নার চুম্‌কি বসান চন্দ্রাতপ—তারই নীচে সোনার ঝালর লাগান প্রশস্ত রাজছত্র—তারই নীচে সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত রাজসিংহাসন। রাজসিংহাসনে রাজা—মাথায় তাঁর রাজ-মুকুট, হাতে তাঁর রাজদণ্ড। রাজমুকুটে কত কত মণি মরকত প্রবাল—তাদের বুকে বুকে আলো প্রবেশ করে' আবার ছুঁচের মত সূক্ষ্ম আর বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। রাজাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘিরে কত কত পাত্র মিত্র অমাত্য সভাসদ্, কত কত বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধি। সভাসদ্‌দের উষ্ণীষের রত্নরাজিতে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে সভামণ্ডপ চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে, দ্বারে দ্বারে সদ্যফোটা ফুলের মালা ঝোলানো, তারই মাঝে মাঝে আবার চোখ-জুড়োন আম্র-পল্লবের মঙ্গল ইঙ্গিত। রাজসভা স্তব্ধ নীরব—একটুকু কোনখানে নড়াচড়া নেই। এ যেন

সত্যিকার রাজসভা নয়—এরা যেন সত্যিকারের মানুষ নয়। এ-যেন একখানা নিপুণ তুলিতে পটে-আঁকা ছবি।

ধীরে ধীরে সভামণ্ডপের বাইরে মন্দিরার ঠিনি ঠিনি মিষ্টি শব্দ উঠল—তারপর তারই সঙ্গে সঙ্গে বৈতালিক-কণ্ঠে রাজার মঙ্গলাচরণ গীত উঠল। একবার, দু'বার তিনবার ফিরে ফিরে বৈতালিকেরা রাজার গুণগান করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল, এমন সময়ে সভামণ্ডপের বৃহৎ দ্বার দিয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে উন্নত-শিরে সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

চকিতে রাজসভা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। চক্ষের পলকে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। রাজার পাশে রাজমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, অমাত্যরা উঠে দাঁড়াল, পাত্র মিত্ররা উঠে দাঁড়াল, সভাসদেরা উঠে দাঁড়াল, বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী তাঁর আজানুলম্বিত অনাবৃত বাহু উত্তোলন করে' সবার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারণ করলেন। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বের আসনে বসায়ে রাজা সিংহাসনে বসলেন, পাত্রমিত্র আমাত্য সবাই তখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল।

তারপর রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী রাজ্যের কুশল ত"?

—"মহারাজ——" মন্ত্রীর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। মন্ত্রীর কথা কেড়ে নিয়ে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ কুশল কোথায়? যেখানে রাতদিন ধরে' মিথ্যার পূজো চলছে—আগা থেকে গোড় পর্য্যন্ত অনৃতের লীলা চলছে—সেইখানে কুশল? মরুভূমির তপ্ত

বালি নিঙ্ড়িয়ে সলিল-বিন্দু মিলবে? বাসনার বহ্নির মাঝে স্নিগ্ধতার আশা? বিষবৃক্ষ কি চন্দন তরু হয়? পঙ্কে ডুবে কি রত্ন আহরণ করা যায়? মহারাজ কুশল নেই—অনৃতের ধ্বংস না করতে পারলে কুশল নেই"।

রাজসভা বিস্মিত হ'য়ে প্রায় রুদ্ধ-শ্বাসে সন্ন্যাসীর কথা শুনতে লাগল। কারো চোখে পলক পড়ল না। কে ইনি? মানুষ,—না স্বয়ং ভগবান মনুষ্যদেহ ধারণ করে' মর্ত্ত্যে এসেছেন!

শুধু মন্ত্রী তাঁর মাথা-ভরা পাকা চুল হেলিয়ে স-সম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মহাত্মান! আমি দার্শনিক নহি, সুতরাং যা আমি দর্শন করি তাকে অদৃশ্য বলে মানতে পারি নে। রাজকার্য্যে আমার চুল পেকে গেল, মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। মহাত্মান! সেই সাহসেই আজ আমি বলতে দ্বিধা করব না যে রাজ্যের কুশল"—তারপর রাজার দিকে ফিরে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—"মহারাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল। রাজ্যে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়েছে, প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রচুর অন্ন, রাজা জীবনগুপ্তের নামাঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে বানিজ্যতরণীর বহর পৃথিবীর সপ্ত-সমুদ্রের তরঙ্গমালার পরিচয় নিচ্ছে, শিল্পকলার নব নব সৃষ্টিতে সমাজের মনের সৌন্দর্য্যের ও প্রাণের সজীবতার চিহ্ন ফুটে উঠছে, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজ-জীবন সম্পদশালী উদার হ'য়ে উঠছে। মহারাজ! দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দময়। নরনারীর প্রাণের আনন্দে রাজ্যের আকাশ বাতাস আকুলিত। সেই আনন্দই ত উন্নত সৌধ-ঘেরা নগরীতে নগরীতে, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীতে পল্লীতে পুলক ছড়িয়ে আনন্দ-আলয় গড়ে'

তুলেছে—সেই আনন্দের আলো লেগেই ত বৃক্ষবাটিকায় তরুশ্রেণী সতেজ হ'য়ে আকাশের পানে আপনাদের মাথা নির্ভয়ে তুলে দেয়, সেই আনন্দেই ত সহস্র কল্লোলিনী সহজ গতি-ভঙ্গিমায় পৃথিবীর বুক কেটে কেটে শ্যামল ক্ষেতে আপনার স্নেহরস অপর্য্যাপ্ত করে' বিলিয়ে সাগরাভিসারিকা। মহারাজ! রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল। রাজরাজেশ্বর জীবনগুপ্তের রাজ্যে সারা বর্ষ ধরে' বসন্তোৎসব চলছে"।

সন্ন্যাসী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ, মহারাজ! আমরা কেবলই জাল বুন্‌ছি—ঊর্ণনাভের মত আমাদের অন্তর থেকে আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম সূতো বের করে' কেবলই স্বপ্নের জাল বুন্‌ছি। তারই উপরে আবার অজ্ঞানের তুলি চালিয়ে হাওয়ার মত অদৃশ্য রঙ দিয়ে আকাশ-কুসুম আঁকছি—এর শেষ কোথায় মহারাজ? কিসে এর সমাপ্তি মহারাজ? এর শেষ অমৃতে নয়—বিষে, আনন্দে নয়—হতাশায়, হাসিতে নয়—অশ্রুতে; মহারাজ! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু। মহারাজ, ইলেকট্রনের মায়া ধ্বংস করতে' না পারলে অমৃতের সাক্ষাৎ মিলবে না"।

মন্ত্রী বিনীত কণ্ঠে বললেন—"মহাত্মন! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু হোক্, কিন্তু সেই মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? আমার বয়েস আশী পেরিয়ে গেছে, হয়ত' কাল মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পরপারে কি আছে?—হয় অনন্ত জীবন, নয় বিরাট শূন্য; কিন্তু আমার ঐ আশী বৎসরের জীবনকে ছোট করে' এক মুহূর্ত্তের মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? অনন্ত কালের কোলে আশী বছরও যে আমি ছিলেম এইটেই যে আমার গৌরব"।

সন্ন্যাসী মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলেন—"কে

ছিল, কি ছিল মন্ত্রী?—ছিল শুধু স্বপ্নের বোনা সূক্ষ্ম জাল—ছিল শুধু আকাঙ্ক্ষার বোনা স্থূল জঞ্জাল—ছিল না, যা চরম ও পরম, যা অক্ষয় ও অব্যয়, যা অবিনশ্বর ও ঈশ্বর”—কথা বলতে বলতে সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দু'টি উৎসাহে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠল, তাঁর মুখমণ্ডল অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতিতে মণ্ডিত হয়ে গেল। আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে সমস্ত রাজসভার দিকে তাঁর মহত্বোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—“বল একবার ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা”। তাঁর সে কণ্ঠস্বরে সভামণ্ডপের বিরাট কক্ষ গুম্ গুম্ করে' উঠল, দ্বারে দ্বারে সদ্য-ফোটা ফুলের মালা সব কেঁপে উঠল, রাজছত্রের সোনার ঝালর নড়ে উঠল, চন্দ্রাতপের চুনি পান্নার চুম্‌কি সব ছল্ ছল্ করে' উঠল, আর রাজমুকুটের মধ্যমণি মহামরকতটা যেন নিঃশব্দে একটুকু হেসে উঠ্ল, রাজসভার কেউ সন্ন্যাসীর জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দিক থেকে আর চোখ ফিরাতে পারলে না—যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত রাজসভা সমস্বরে ধ্বনি করে' উঠল—“ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা”।

সন্ন্যাসী রাজ-সিংহাসনের দিকে ফিরে রাজাকে সম্বোধন করে' বললেন—“মহারাজ! আমি আপনার রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই, অপনার প্রজাবৃন্দকে সত্যের পথে অমৃতের পথে অমরত্বের পথে নিয়ে যেতে চাই—অনুমতি দিন”।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—“মন্ত্রী, শিপ্রানদীর তীরে সন্ন্যাসীর জন্য বৃহৎ মঠ নির্ম্মিত হোক্। আর রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীকে দক্ষিণা দেওয়া হোক্”।

পক্ককেশাবৃত মস্তক অবনত করে' মন্ত্রী বললেন—“যে আজ্ঞা মহারাজ”।

(৩)

শিপ্রা অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। সারা দিনমানে তার অস্থির বুক রোদে চিক্‌মিক্—চাঁদনীরাতে তার তরল হৃদয় জ্যোছ্‌নায় ঝিক্‌ঝিক্, দিন নেই, রাত নেই, শিপ্রা কলকল ছল ছল করে' গান গেয়ে গেয়ে ব'য়ে চলেছে। স্তব্ধ দুপুর বেলা যখন তমাল-তালীর বনে বনে প্রাণ-উদাসকরা ঘুঘুর ডাক থেকে থেকে জেগে ওঠে, তখন সেই নিস্তব্ধতার মাঝে শিপ্রার দু'তীরের ঘন দেবদারু বনেরা তাদের মাথা হেলিয়ে শিপ্রাকে বুঝি জিজ্ঞেস করে—ওগো শিপ্রা, তুমি গান গেয়ে গেয়ে কোথায় চলেছ?—আর শিপ্রা তার উত্তর দেয়—

গান গাহিয়া চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে যেথায় গো
আকাশ গায়ে সাগর শুয়ে ঊর্ম্মিমালায় খেলায় গো,
অসীম নভে অগাধ জল
কর্‌ছে সদাই ছল ছল
চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে গান গেয়ে মোর বীণায় গো।

চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে দুল্‌তে সুনীল দোলাতে
চল্‌ছি আমি অস্তিমেতে পারব খেলায় ভুলাতে
আমার গীতি আমার গান,
স্নিগ্ধ করি হৃদয় প্রাণ
গগন তলে সিন্ধুবুকে পারব কোথায় মিলাতে।

চল্‌ছি আমি সেই সুনীলে যেথায় সবই পুলক গো
গভীর জলের শান্তশীতল অসীম নভের আলোক গো,
আলোক যেথায় পুলক যেথায়
শব্দ যত স্তব্ধ যেথায়
লব্ধ যেথায় গল্প গীতে এই নিখিলের চালক গো।

গান্‌টা আমায় শিখিয়েছে বিশ্বপতির করুণা
এই গানেতেই ধরিত্রী ও রাত্রি দিবস মগনা
সুরু গানে সাঙ্গ গানে
সৃজন লীলার রঙ্গ গানে
এই গানই গো সজ্জামহীর নইলে মহী নগনা।

ওই গানেতে উঠ্‌বে জাগি আছিস্‌ যারা ঘুমায়ে
মুক্তি বিহীন মর্ম্মহীনের ধর্ম্মখানি জড়ায়ে,
বদ্ধ হয়ে রুদ্ধ ঘরে
মলিন মুখে আঁখির 'পরে
অবিশ্বাসীর হাস্যটুকু দিবস যামি ছড়ায়ে।

উঠ্‌রে জাগি আলোর মাঝে জীবন পথের আনন্দে,
মর্ম্মতলের দেবতা সেই মোহন মধু সু-ছন্দে,
নৃত্যে তারি তালে তালে
হাস্যে তারি ছল ছলে,
উঠ্‌বে জাগি লাস্যে তারি বর্ণে গীতে গন্ধে।

উঠ্‌রে জাগি ঊষায় যখন রক্ত রবি কিরণে,
পৃথ্বী তলের দূর্ব্বারাশি জড়ায় হিরণ বরণে,
উঠ্‌রে জাগি ক্লান্ত সাঁঝে
দিন্‌টী যখন রক্ত সাজে
অন্ধকারে ধরে যখন লুটায় মহীর চরণে।

উঠ্‌রে জাগি জীবন পথে উঠ্‌রে জাগি মরণে,
উঠ্‌রে জাগি মিলতে হবে বিশ্বপতির চরণে,
উঠ্‌রে জাগি—ছুট্‌তে হবে
উঠ্‌রে জাগি—লুটতে হবে
শিপ্রা যেমন রঙ্গে নাচি' লুটায় সাগর-চরণে।

এমনি করে' শিপ্রা ছুটে চলেছে—লক্ষ পল্লীকে ঘিরে ঘিরে, হাজার নগর নগরীকে বেড়ে বেড়ে নেচে নেচে দুলে দুলে ফুলে ফুলে ফেনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে জঞ্জাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে অক্লান্ত গতিতে ব'য়ে ব'য়ে চলেছে—আপন প্রাণের স্নিগ্ধতা কোমলতা শীতলতা অপর্য্যাপ্ত স্নেহরস ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এমনি করেই শিপ্রা সাগরাভিসারিকা। সেই শিপ্রারই তীরে এক বিরাট মঠ নির্ম্মিত হল—রাজ-আজ্ঞায়—সন্ন্যাসীর জন্য।

বর্ষা শেষ হ'য়ে গেল। শরতের সোনার রঙ জগত ভরে' ফুটে উঠল। সন্ন্যাসী তাঁর মঠে যাবার জন্যে রাজপুরী ত্যাগ করে' রাজপথে বেরুলেন। রাজপথে অগণ্য লোকের সারি চলেছে—রাজপথের পাশে পাশে অসংখ্য দোকানে বেচা কেনা চলছে। সন্ন্যাসীকে যে দেখল সেই মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। পথিক পথ ভুলে গেল—দোকানে

ক্রেতা বিক্রেতারা বেচা কেনা ভুলল—নাগরিকদের গৃহে গৃহে বন্ধ-জানালা সব খুলে গেল—তা দিয়ে অসংখ্য কুলাঙ্গনারা পলক হীন চোখে সন্ন্যাসীকে দেখতে লাগল। কত কিশোরী তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করল—কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধা তাঁকে পুত্র বলে বাঞ্ছা করল—সন্ন্যাসীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি সোজা চলেছেন আপনার গন্তব্য স্থানে। সবাই জিজ্ঞেস করে—কে ইনি? মানুষের মুখে মুখে কথার রঙ চড়ে। কেমন করে' রটে গেল যে কিছু দিন আগে স্বয়ং মহাদেব রাজাকে স্বপ্নে দেখা দেন—দেখা দিয়ে বলেন যে তিনি শীঘ্র মনুষ্য দেহ ধারণ করে' তার রাজ্যে উপস্থিত হবেন—এই সন্ন্যাসীই সেই মহাদেব। সন্ন্যাসী মঠে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মঠের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল—সেদিন দিন ফুরুতে না ফুরুতেই সন্ন্যাসী লক্ষ শিষ্য করলেন—মঠের চূড়া থেকে এক প্রকাণ্ড গৈরিক পতাকা উড়ল। বাতাসে সেই গৈরিক পতাকা সারা দিনমানে পত্ পত্ করে উড়ে উড়ে যেন বলতে লাগল—"মি—ত্থ্যা"—"মি—তথ্যা"।

সন্ন্যাসীর লক্ষ শিষ্য পঙ্গপালের মত সমস্ত শাকদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল—ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে। ধনীর অট্টালিকায়, বণিকের বাণিজ্যালয়ে, গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটিরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।" নগর নগরীর কোলাহলের মাঝে, শান্ত পল্লীর নীরবতার মাঝে, সবুজ বনের শ্যামলতার মাঝে কেবল ঐ রব ধ্বনিত হতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।" শাকদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন গৈরিক হ'য়ে উঠল—রোদের রঙ্ যেন গৈরিক রেণুতে ভরে' উঠল—বাতাস যেন গৈরিক গন্ধে পূর্ণ

হয়ে গেল—নীল আকাশ যেন গৈরিক রাগিণীতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। ওরে কি আছে?—কিছুই নেই, আমি নেই, তুমি নেই, জগত নেই—কিছুই নেই। ওরে এসব কিসের জন্যে—এই পরিশ্রম, এই কর্ম্ম এই ভোগ? থামাও থামাও সব মূর্খের দল যদি মঙ্গল চাও। এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে মাস কাটল—মাসে মাসে বছর কাটল—বছরে বছরে কত বছর কেটে গেল—ধীরে ধীরে নর নারীর প্রাণের অস্থি শিথিল হ'য়ে এল—ক্রমে ক্রমে জীবনের অমৃত স্বাদহীন হ'য়ে উঠল—এ সৃষ্টির শব্দ গন্ধ রূপ রস অর্থহীন বোঝা হ'য়ে পড়ল—ধনীর ভোগসামর্থ্য লয় পেয়ে গেল—মানুষের কর্ম্মসামর্থ্যে বাজ পড়ল—বণিকের বাণিজ্যালয় বিশৃঙ্খলায় ভরে' উঠল—কৃষকের লাঙ্গলের মুটো ঢিলে হ'য়ে পড়ল। সবার মুখেই ঐ এক বাণী—জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। কত কত ধনীর অট্টালিকায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল—কত কত বণিকের বাণিজ্য তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ল—কত কত গৃহস্থের বাসস্থান অমনি অমনি জ্বলে' উঠল—ক্ষেতে ক্ষেতে হালের বলদ অমনি অমনি মারা পড়ল। মানুষের অস্বীকারে সব অকৃতার্থ হ'য়ে উঠল। মন্ত্রী গিয়ে রাজসমীপে নিবেদন করলেন—"মহারাজ রাজ্যের ভীষণ অমঙ্গল উপস্থিত। দুর্ভিক্ষ আসন্ন।"

"দুর্ভিক্ষ আসন্ন? সে কি মন্ত্রী! দুর্ভিক্ষ আসন্ন! আমার রাজ্যে—যে রাজ্যে প্রতি বৎসর তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হয়—সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ! মন্ত্রী, আপনার ভুল হ'য়ে থাকবে—আপনার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত বুঝি।"

দুঃখের হাসি হেসে মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"আমার ভুল হয় নি—

আমি সত্য সংবাদই রাজ সমীপে নিবেদন করছি। রাজ্যে প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ আসন্ন। দেশের নর নারীরা জীবনে আস্থা হারিয়েছে, জীবনের আনন্দকে তাড়িয়েছে। কৃষক আর তেমন উৎসাহে তেমন করে, লাঙ্গল ধরে না—তার লাঙ্গলের মুঠো শ্লথ হ'য়ে আসে, মাতা ধরিত্রীকে আর সে তেমন চোখে দেখে না, সে আজ তার কাছে প্রাণহীন অস্তিত্ব-হীন, এই অবজ্ঞার বিনিময়ে সে আগে যে শস্য পেত তার দশমাংশের এক অংশ পায়, বাণিজ্যের শিল্পের অবনতি ঘটেছে, বণিকের চোখে এ জগৎটা তার কারাগার, অসুখের জায়গা অমঙ্গলের স্থান, তার বাণিজ্য-তরণী আজ কেবল কাঠের ভেলা, তার মধ্যে মানুষের প্রাণ নেই মন নেই আনন্দ নেই। বণিকের প্রাণের পুলকে আজ সপ্তসিন্ধুর তরঙ্গমালা কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে না, তাঁর জীবনের অবজ্ঞায় তার বিশাল বুক আজ ফুলে ফুলে উঠছে, তার কল্ কল্ ছল্ ছল্ অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে, তাই তার বাণিজ্য-তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ে। দার্শনিকেরা সূর্য্যের আলোকে নাকচ করে দিয়ে অমাবস্যার অন্ধকারের বুক চিরে স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সাহিত্যে কেবল পরলোকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মহারাজ—"

রাজা বিচলিত হলেন, মন্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বললেন, "মন্ত্রী আমি পরিদর্শনে বের হব, প্রস্তুত হও।"

রাজা ও মন্ত্রী দু'জনে ছদ্মবেশে রাজপুরীর গুপ্তদ্বার দিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজা ও মন্ত্রী রাজপথ ধরে' চলতে লাগলেন। রাজপথের দু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় নরনারী চলছে। সব যেন লক্ষ্মীহীন শ্রীহীন। রাস্তার দু'ধারের সৌধমালার ভিতর থেকে

যেন একটা নিঃশব্দ ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে উঠে আকাশে মিশে যাচ্ছে, নর-নারীরা সব যেন অর্দ্ধমৃত, তাদের সে উৎসাহদীপ্ত আনন নেই, তড়িতোজ্জ্বল চোখ নেই, যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে আপনাদের নিরেট দেহটাকে বোঝার মত ব'য়ে নিয়ে চলেছে আর ভাবছে কবে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে। দোকানে দোকানে বেচা কেনা চলছে, যেন কলের দোকানে কলের মানুষেরা কলের সাহায্যে হাত পা নাড়ছে, চারিদিক মৃত্যুর ছায়াতে সব কদর্য্য হ'য়ে উঠেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা—যেন তার মধ্যে বাস করছে সব "মন্ত্রি" রা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্যালয়—যেন সেখানে বসে' রয়েছে সব প্রেতাত্মারা, বাহির থেকে সেই সবই আছে, নেই কেবল সেই ভিতরের প্রাণের তড়িৎ—যে তড়িতের স্পর্শে সব সুন্দর হ'য়ে উঠবে সার্থক হ'য়ে উঠবে, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজা সব দেখলেন, তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে এল। রাজা রাজধানী ছাড়িয়ে জনপদ ছাড়িয়ে পল্লীতে প্রবেশ করলেন।

রাজা দেখলেন পল্লীর সে চোখ-জুড়োন চেহারা আর নেই। পত্রবহুল বৃক্ষরাশি যেন সব কৃপণ হ'য়ে উঠেছে, যা নেহায়ৎ না হলে নয় সেই কটা পাতা গায়ে জড়িয়ে তারা কঙ্কালের মত ডাল মেলে দিয়ে জড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষেতে ক্ষেতে আর সে শ্যামল শোভা আপনার মায়া বিস্তার করে হাসে না। দীঘির জলে আর মরাল মরালীরা সে আনন্দে সাঁতার কাটে না, পল্লী-আকাশ আর তেমন শিশুদের হাস্য কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে না, স্তব্ধ দুপুরে ছায়ায় ঢাকা বটগাছের তলে আর রাখাল বালকের বাঁশীতে তেমন সুর ফোটে না—আর সে পল্লীদেবালয়ে সান্ধ্য আরতির কাঁশর বেজে

ওঠে না। ভরা-জ্যোছনায় আর সে ঠাকুরমায়ের মুখে রূপকথার স্বপ্নের জাল বোনা নেই, সে সাধ আহ্লাদ সুখ সম্পদ যেন কোন্ এক যাদুকরের মায়া প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। দূর্ব্বাবিরল মাঠে মাঠে হাড় বের-করা গাভীর দল প্রাণপণে তাদের আহার্য্য আদায় করবার চেষ্টায় ধুকছে, পল্লীপাশ দিয়ে শীর্ণা নদী দীনা ভিখারিণীর মত থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে আপনার প্রাণহীনতার পরিচয় দিয়ে দিয়ে অস্ফুট ক্রন্দনে চলছে। রাজা যেখানেই যান সেখানেই কেবল শোনেন—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কি হবে রে ভাই মিথ্যার জঞ্জাল বাড়িয়ে কোনরকমে দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ভাল"। রাজা সব দেখলেন, সব শুনলেন, তারপর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি"?

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"মহারাজ! মানুষ ধরিত্রীকে অস্বীকার করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণহীনতায় তার চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতি নির্জ্জীব আনন্দহীন হয়ে উঠেছে, মহারাজ! আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে তার বিনিময়ে সে লাভ করেছে কেবল মৃত্যু। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে ইহলোকের দুঃখ পরলোকের সুখ হয়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকে সামর্থ্য হয়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা মহারাজ, ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গ লাভের সহজ ও সত্য উপায়"।

রাজা বিরাট দুঃখের ভার বুকে করে' রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

ধীরে ধীরে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্ন বস্ত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠল। যেখানে এক টাকায় আট মণ চাল মিলত সেখানে আট

টাকায় এক মণ চাল মেলে না। যেখানে তাঁতির বাড়ীতে চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে এলে এক জোড়া কাপড় মিলত সেখানে চার টাকায় একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। চারিদিকে হতাশা নিরাশা, কেবল হাহাকার। দেশের কত লোক একবেলা খেয়ে থাকল, কত লোক আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। আর কত লোক মরে গেল। কিন্তু দেশের লোকের এ দুর্দ্দশা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবারও শক্তি নেই—এমনি তারা প্রাণহীন। সবাই মনে করতে লাগল যে এ পৃথিবীর বুঝি এই রকমই ধারা। তখন দ্বিগুণ জোরে নরনারী-কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হতে লাগল "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। এই মিথ্যার কাছ থেকে যত শীঘ্র বিদায় নেওয়া যায় ততই ত সুবিধা। ঘরে ঘরে আরও পরিধেয় বস্ত্র গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে উঠল।

(৪)

এই রকম যখন শাকদ্বীপের অবস্থা তখন এ সংবাদ গুপ্তচর-মুখে জম্বুদ্বীপের রাজা হুনেশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছিল।

রাজা হুনেশ্বর সিংহাসনে বসে ছিলেন, সংবাদ শুনে একেবারে সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। "কি বললে, কি বললে গুপ্তচর? এই রকম অবস্থা? জম্বুদ্বীপের রাজা হুনেশ্বর তার পিতা মুঘলেশ্বর, তার পিতা বাণেশ্বর, তার পিতা চণ্ডেশ্বর এমনি সাত পুরুষ ধরে' শাকদ্বীপ জয় করবার চেষ্টা করেছে; আর বার বার পরাভূত হয়ে ফিরে এসেছে। আজ শাকদ্বীপের এইরকম অবস্থা! সেনাপতি, সাজাও সাজাও, সৈন্য সাজাও"। রাজা হুনেশ্বর সেনাপতিকে যুদ্ধ যাত্রার জন্যে সৈন্য সাজাতে আদেশ করলেন। তুরী ভেরী বেজে উঠল,

অসি ঝন্‌ঝনা জেগে উঠল, বর্ম্মফলক চিকমিক করে উঠল। পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য, দশ হাজার হাতি, বিশ হাজার ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে রাজা হূনেশ্বর শাকদ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

রাজা জীবনগুপ্ত খবর পেলেন, হূনেশ্বর আসছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দশ সহস্র হাতি বিশ সহস্র ঘোড়া নিয়ে শাকদ্বীপ জয় করতে। মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—"মন্ত্রী রাজ্যের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে পরোয়ানা জারি কর যে স্বদেশরক্ষার্থে আবার আজ অস্ত্র ধারণ করতে হবে, শাকদ্বীপের চিরশত্রু জম্বুদ্বীপের রাজা আজ সসৈন্যে আবার সমাগত। দেশের সমস্ত সমর্থ লোক সমবেত হোক, জম্বুরাজ যেন আবার পরাজয়-পুরস্কার নিয়ে ফিরে যায়"।

রাজ অনুচর ছুট্‌ল দিকে দিকে রাজার পরোয়ানা নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে, দেশের যুবক দলকে আহ্বান করতে। রাজ অনুচরেরা সমস্ত নগর নগরীতে প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রাজার পরোয়ানা জারি করলে, রাজ-আহ্বান জানিয়ে দিলে, তার পর তারা এমনি এমনি রাজপুরীতে ফিরে এল, তাদের সঙ্গে কেউ এলো না।

সেনাপতি নিজে বেরুলেন—সমস্ত দেশবাসীকে ডেকে ডেকে বললেন, "স্বাধীনতা হরণের জন্যে শত্রু আগত, ওঠো জাগো, যার বাহুতে কিছুমাত্র বল আছে, ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত আছে, দস্যুর হাত থেকে দেশ রক্ষার্থে, দাসত্বের কবল থেকে স্বাধীনতা রক্ষার্থে, বেরিয়ে এসো অগণ্য পল্লীর অসংখ্য কুটীর থেকে, সংখ্যাহীন নগরীর উচ্চ সৌধমালার ভিতর থেকে, অগণিত মানুষের দল, অদম্য অপরাজেয় অরিন্দম। সেনাপতির বাণী কারো প্রাণে কোন ঢেউ তুললে না, সে

নাগী আকাশে অমনি মিশিয়ে গেল। সেনাপতি একাকী রাজপুরীতে ফিরে এলেন, সঙ্গে কেউ এলো না।

রাজা নিজে বেরুলেন। তাঁর প্রজাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "এসো শাকদ্বীপের বীরের দল, আমাদের পিতৃপিতামহরা যেমন করে' জম্বুরাজগণকে, তাদের বাহিনীকে বার বার পরাজিত করে পৃষ্ঠ করে নষ্ট করে শাকদ্বীপের প্রত্যন্ত দেশ থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন, তেমনি করে আজ আমরা হুনেশ্বর আর তার বিশাল চমূকে বিধ্বস্ত করে তাড়িয়ে দেব। পরধনলোলুপ হুনেশ্বরের দু'চোখ আজ শাকদ্বীপে নির্ম্মিত বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করুক, তার সৈন্যেরা আজ শাকদ্বীপের বীরবৃন্দের তরবারীর ধার অনুভব করুক, এস বীরের দল, আর সময় নেই, শত্রু দ্বারে সমাগত"। রাজার কথা সবার এক কান দিয়ে প্রবেশ করে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজা ফিরে এলেন, কেউ এল না।

রাজা হুনেশ্বরের জয়ধ্বনি নিকট থেকে নিকটতর হ'তে লাগল। শাকদ্বীপের চারিদিকে কোথায়ও মৃদুকণ্ঠে কোথাও মৃতের কণ্ঠে, কেবল রব উঠতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"।

রাজা হুনেশ্বর দ্রুতবেগে শাকদ্বীপের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন, স্বচ্ছন্দ গতিতে, কোনখানে কোন বাধা নেই, কোথাও একখানি তরবারী তাঁর পথ আগলে বসে নেই, কোনখান থেকে একখানি বর্শা তাঁর সৈন্যের আরে এসে পড়ল না। রাজা জীবনগুপ্ত মাথায় করাঘাত করে' সিংহাসনে বসে' পড়লেন। "কি হবে মন্ত্রী, কি হবে! আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থে একটি লোক অগ্রসর হোল না। দেশরক্ষা কে করবে? লোক নেই। রাজকোষে কুবেরের ধন সঞ্চিত,

কি হবে ? লোক নেই। অস্ত্রাগারে অপর্য্যাপ্ত অস্ত্র মজুত, কি হবে ? লোক নেই—লক্ষ সৈন্যের বর্ষব্যাপী রসদ্ মজুত, কি হবে ? লোক নেই"। নিরাশায় রাজার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল।

রাজা হুনেশ্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। গৃহে গৃহে সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ, রাজপথে পথে আর সেদিন বাতি জলল না, একটি লোক চলল না, চারদিক স্তব্ধ মৃত্যুর মত নীরব, যেন কোন এক প্রেতপুরী। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার গভীর কালো হ'য়ে উঠল, হুনেশ্বর তাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দশ হাজার হাতি বিশ হাজার ঘোড়া নিয়ে এসে রাজপুরীর উত্তর দ্বারে হানা দিলেন, সেই সময় সেই আঁধারে রাজা জীবনগুপ্ত তাঁর সাত রাণীর হাত ধরে' চোখের জল মুছতে মুছতে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে রাজপুরী ত্যাগ করে গেলেন।

(৫)

রাজা জীবনগুপ্তের সিংহাসনে রাজা হুনেশ্বর বসে'। রাজা গুপ্তচরকে আহ্বান করে' জিজ্ঞেস করলেন—"গুপ্তচর, প্রবল প্রতাপান্বিত এই শকজাতি, যাদের কত শতাব্দী ধরে আমার পুর্ব্বপুরুষেরা জয় করতে পারে নি, সেই শকজাতির আজ এ দশা কেন ?"

গুপ্তচর বললে—"মহারাজ ! এই রাজ্যে দশ বৎসর পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী আসেন, তিনি প্রচার করেন যে, তিনি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই আবিষ্কার করেছেন যে এই জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে শকজাতি এ জগতটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে

দিয়ে আপনাদের আনন্দহীন প্রাণহীন করে তুলেছিল, তারই প্রতিশোধ এই দুর্দ্দশা”।

রাজা হুনেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—“সে সন্ন্যাসী এখন কোথায়” ?

গুপ্তচর উত্তর দিলে—“তিনি এখন শিপ্রাতীরে তাঁর মঠে অবস্থান করছেন”।

রাজা বললেন—“তাঁকে আমার সমীপে নিয়ে এস”।

সন্ন্যাসী রাজা হুনেশ্বরের সমীপে নীত হ’ল। রাজা হুনেশ্বর, আপনার গলা থেকে বহুমূল্য মণিহার খুলে নিজ হাতে সন্ন্যাসীর গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—“মহাত্মন, আমার পিতৃপিতামহরা সাত পুরুষ ধরে’ অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারেন নি, আপনি এক পুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন, সম্রাট হুনেশ্বরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ও এই যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করুন”।

তরপর সম্রাট তাঁর সেনাপতির দিকে চেয়ে বললেন--“সেনাপতি, সন্ন্যাসীকে আমার সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে রেখে আসবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক, তার জন্যে এক মাস সময় দিলেম, সন্ন্যাসীকে জানিয়ে দেওয়া হোক, ঐ এক মাস পর থেকে তাঁকে কোন দিন আমার সাম্রাজ্যের সীমানায় দেখতে পেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে”।

সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—“যে আজ্ঞা মহারাজ”।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্টি।

শরতের একমুঠা রৌদ্ররে জমায়ে
যে পদ্ম উঠেছে বেড়ে, তাই দিয়ে গড়া
দু'খানি মধুর আঁখি,—দু'টি পক্ষ্মছায়ে
সুগভীর স্বচ্ছলতা কূলে কূলে ভরা।
তারি মাঝে দৃষ্টিখানি করুণ-কাতর,
বাহুপুটে আলিঙ্গন মেলিয়াছে তার
বেপমান দৃষ্টি-বাহু—আত্মার অধর
পাঠায়েছে চুম্বনের চারু পুষ্পাধার!
ব্যাকুল বক্ষের দোরে আসন্ন উদ্যত,
অসমাপ্ত চিরন্তন দৃষ্টির চুম্বন—
বিদ্যুৎপ্রবাহে চিত্ত মুগ্ধ মন্ত্রহত :
এত বল কোথা পেল ও ভীরু নয়ন!
দু'টি আঁখি—একখানি দৃষ্টি—তারি মাঝে
নিখিল বিশ্বের লীলা নিঃশেষে বিরাজে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

——:*:——

(৩)

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল, যে পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া যায় ; চিতাদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকাগড়ণের, বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে কখন জান ?—বাচ্চাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া দায়। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা করা যেতে পারে, পায়ের একটা দাগ হতে অন্য দাগের ব্যবধান কতখানি, দেখলে সেটা সহজে বোঝা যায়। পায়ের দাগের আকার দুয়েরি সমান, খোকা-বাঘের পায়ের ফাঁদ খাট, আর খুকির লম্বা। এটা নজর করে দেখা ভাল, কোনও জীবেরই শিশুহত্যা করা ভাল নয়। এদের বেঁচে বর্ত্তে বড় হতে দেওয়া উচিত, এতে যদি তোমার হাতের শীকার ফস্‌কে অন্যের হাতে গিয়ে পড়ে তবুও এ স্বার্থ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বাঘ কিম্বা চিতা কি করে গরু মোষ মারে, এ খবরটা জানতে সবারই কৌতূহল হয়। এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য যদিও আমার ঘটে নি, তবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার অব্যবহিত পরেই আমি উপস্থিত

হয়েছি। হত জন্তুটির পিঠে কিম্বা ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাঁতের দাগ দেখা যায়, আর যে ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝুঁকে পড়ে, তা দেখলে বোঝা যায় শত্রুপক্ষ নিরীহ জন্তুটির উপর ব্যাঘ্র-ঝম্পনে এসে, সম্মুখের পায়ের থাবা দিয়ে ধরে' তার ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুখে করে, কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন ঝোপের অড়ালে কিম্বা তলায় রাখে, শকুন হাড়গিলে কিম্বা মাংসাশী জন্তুদের মুখ হতে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মস্ত একটা মোষকে এম্নি করে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অন্য পাড়ে রাখতে দেখেছিলাম। এম্নি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলে যে, সে দিকে যে মাটীর ঢিবি ছিল তাহ'তে এক আঁজল ধুলোও খসে পড়ল না। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটি প্রকাণ্ড, আর সে অতবড় মোষটিকে বেড়াল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেম্নি সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল, তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারো।

এসম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণত অজ্ঞতা এতদূর যে, অনেকেই গম্ভীর ভাবে বলেন, "কাপ্‌ড়া চাই মেম্ সাহেব" বলে যে ফেরি-ওয়ালারা সহরের অলি গলিতে ফেরে, ব্যাঘ্রবীরও তাদেরই মত তার শীকারের বোঝা পিঠে করে বয়ে' নিয়ে যায়। আর একটি হাস্যকর ধারণা এই যে, বাঘ গিয়ে মোষ কিম্বা গরুর ল্যাজে কামড় দিয়ে ধরে, দুটোতে খুব খানিকটে টানা হিঁচড়া চলে, তারপর সুযোগ বুঝে চতুর বাঘ মোষের ল্যাজের টানটা আলগা করে দেয়, আর সে যেম্নি মুখ থুবড়ে পড়ে আর অম্নি ইনি গিয়ে তার ঘাড়ের উপর চেপে বসেন।

এই হচ্ছে মামুলি বিশ্বাস, আর তুমি যদি এর বিপরীত কিছু বল, তা হলে সেটা তোমারই অজ্ঞতা বলে' প্রতিপন্ন হবে। এখানে আর একটা গল্প না বলে' এগিয়ে চলাটা ঠিক হয় না। একবার সুন্দরবনে বাঘে একজন নাপিতকে দিনে দুপরে আক্রমণ করেছিল, ধূর্ত্ত নাপিত ভয় পাবার পাত্র নয়, সে করলে কি জান?—তার পুঁটুলি হতে নরুণটি না বার করে বাঘের গলায় বসিয়ে দিলে, আর যাবে কোথা? বাঘ আর পালাবার পথ পায় না, কিন্তু পালাবার যো কি? চতুর নরসুন্দর ততক্ষণ তার লেজ ধরে আটক করেছে; ফলে কি দাঁড়াল জান?—থলের মুখ ফাঁক পেলে ইঁদুর যেমন পালায়, বাঘটি তেমনি করে দে চম্পট, কিন্তু আলাঙ্গুল ডোরাকাটা বাঘছাল খানি, বিজয়ী নাপিত ভায়ার হাতেই রয়ে গেল! দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব্ব ঘটনা অতঃপর আর ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সেরূপ নাপিত একটি মাত্র ভূভারতে জন্মেছিল, মরণ কালে এমন অসম্ভব বীরত্ব সে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে গেছে। যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমায় বলে ছিলেন, তিনি পরে জর্ম্মান দেশে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করতে যেয়ে মারা গিয়েছেন, কিন্তু গল্পটি অমর হয়েই আছে।

চিতার শীকার পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন, সে ঘাড়ে গিয়ে পড়ে না, গলায় কামড় দিয়ে ধরে থাকে, জন্তুটি মরে পড়ে গেলে, তবে তাকে ছাড়ে। লোকে বলে রক্ত শুষে খাবার জন্যে সে এমনি করে, কিন্তু এটাকে মেনে নেওয়া চলেনা, কেননা এসম্বন্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদূর জানি, তাতে বলতে পারি, চিতা আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকটা সাত্বিক, বাঘের মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিম্বা পর্য্যুসিত আহার করে না, আর তা ছাড়া চিতা পরের শিকার-করা

জন্তু আহার করে না। বাঘের অত বাচ-বিচার নেই, যা পায় তাই খায়, তবে ক্ষুধার তাড়নায় সুবোধ স্বভাবের জন্যে নয়! আমি দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার-করা একটি মোষ অধিকার করে বসে ছিল, তারপর যার সম্পত্তি, সে আসবামাত্র "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিবাক্য শিরোধার্য্য করে অবিলম্বে পলায়ন করলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল শুনেছি সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শীকার চুরি করে খেয়ে বেড়াত, কিন্তু যখন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ল, তখন দেখা গেল তার দেহখানি একেবারে অস্থি চর্ম্মসার। কারণ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হল যে, তার টাকরায় অনেকগুলো সজারুর কাঁটা আটকে রয়েছে, আর কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হয়ে গিয়েছে, মুখের চারিদিকে মৌচাকের মত ঘায়ের সমষ্টি, এ অবস্থায় চুরি করে খাওয়া ত দূরের কথা, মুখের গোড়ায় খাবার এগিয়ে এলেও, খাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বহুদিনের উপবাসে দেহখানি হাড়ের মালায় পরিণত। একজন মস্ত শীকারী আমায় বলেছেন, তিনি একবার একটা বাঘ মারার পর দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত একটা সজারুর কাঁটা বিঁধে আটকে ছিল।

বাঘ আর চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কত বড় হতে পারে, সে কথা অনেক শীকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু নানা শীকারীর নানা মত, তাই মাপ করবার নিয়ম সবার সমান নয় বলে' এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়! বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবার অব্যবহিত পরেই, তার লম্বাই চওড়াই কতখানি সেটা মাপা উচিত; কেননা দেরি হলে দেখা যায় তার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। আমি

একবার দশফুট লম্বা একটা বাঘ শাকার করি, জঙ্গল হতে তাঁবুতে বয়ে নিয়ে আসা, এই সময় টুকুর মধ্যে পাঁচ ছয় ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। এতে আমার বন্ধুদের ভারী আমোদ বোধ হয়েছিল, ব'লে রাখা ভাল যে সে দিন তাঁদের ভাগ্যে কোন শীকারই জোটে নি! মৃত্যুর পর সব জন্তুর শরীরই শক্ত হয়ে ওঠে, তবে বাঘদের দেহে এই কাঠিন্য যত শীঘ্র দেখা দেয়, অন্য পশুর শরীরে তা হয় না। চামড়া ছাড়িয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড় ছিল তার কোন খবরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-মাতা এ জাতীয় জন্তুদের যে পোষাকটি পরিয়ে দেন, তা' তাদের দেহে এঁটে বসে না, আলগা থাকে। এর উদ্দেশ্য এদের দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা চামড়াতেই আটক থাকে, মাংসে গিয়ে না পৌঁছয়, তা হলে প্রাণ হানির সম্ভাবনা অধিক। এদের গায়ে আঘাত-ক্ষত সর্ব্বদাই হচ্ছে—সেটা যাতে চামড়ার উপর দিয়েই যায়, বেশি সংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবারণের জন্যেই প্রকৃতি তাদের দেহের আচ্ছাদনটি ঢিলে রেখেছেন। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর দু'ফিট আন্দাজ বেড়ে যায়, চিতাবাঘের এর অর্দ্ধেক বাড়ে। একই দৈর্ঘ্য এবং আয়-তনের বাঘ ও চিতা কিন্তু ওজনে সমান হয় না। একটা বড় বাঘের ভারে একখানি বড় শক্ত চারপাই মড় মড় করে ভেঙে পড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণ ৩৫ সেরের বেশি হতে প্রায় দেখা যায় না, একটি বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণ পর্য্যন্ত হতেও পারে, এমনটা যদিও সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল, একটা বাঘের গায়ে গুলি লাগে নি, পালাবার সময় যেখানটিতে শীকারীরা ঘেরাও করে-ছিল, সে সেই দিকে ছুটে যেতেই আর সবাই পালিয়ে গাছে উঠে

পড়ল, এক বেচারী তাড়াতাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সে সেই খানটিতে পড়ে মরে আছে, ঘাড়টি মটকান, নখের কিম্বা দাঁতের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও ছিলনা। পলায়নতৎপর ব্যাঘ্ররাজ হয়ত একবার সন্তর্পণে তার ঘাড়ে হাত রেখেছিলেন (প্রণয়ীর সলজ্জ প্রথম সম্ভাষের মত!) তাতেই তার এই দশা, একেবারে "পপাত চ-মমার চ"। এ হ'তেই জন্তুটির ওজন যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য আর নিষ্ঠুরতায় আর কেউ বাঘের সমান না হ'লেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারী ডরায়। বনচর জন্তুদের মধ্যে এই কুকুরদের মত ঘৃণ্য স্বভাবের আর কোন পশু নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয়, আর সবাই আতঙ্কে সেখান হ'তে সুদূরে পলায়ন করে। ব্যাঘ্ররাজও এই "যেনগতা পন্থার" অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে, শীকারই যদি সব পালান, তবে শীকারী আর সেখানে বসে কি করবে বল? ভালুক আর পাহাড়ি-চিতা বুনো কুকুরকে তেমন ডরায় না, তার কারণ এরা সহজে গুহা গহ্বরে আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শীকার এদের উপদ্রবে একেবারেই মাটী হয়ে গিয়েছিল।

বাঘ, সাম্বর, অন্য মৃগপাল সব কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল, আমি পথ চেয়ে চেয়ে বসে যখন ফিরে এলাম তখন শুনলাম, তার দু'দিন পরে বাঘ ভালুক হরিণ নীলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারী চালাক; এক জায়গায় জড় হয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একই জন গিয়ে, এক একটা পাহাড়ের চূড়ায়

ওঠে, আর অন্যরা শীকার তাড়িয়ে তাদের দিকে নিয়ে যায়। সাম্বর-হরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে, কারণ প্রকাণ্ড ডালপালাওয়ালা শিং নিয়ে এরা বনের মধ্যে দিয়ে শীগ্‌গির দৌড়ে পালাতে পারে না। এই কুকুরের দলের এক আধটিকে মেরে ফেললেও আর গুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না, কিন্তু ঘায়েল করে যদি চলচ্ছক্তি রহিত করতে পারা যায়, তাহলে কাজ কতকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে এক জন স্কচ (Scotch) শীকারী তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। তিনি বলেন—"জন্তুদের মধ্যে এদের মত খেঁকী, বেয়াদব, পাজী জানোয়ার আর দুটি নেই" (The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts). এমন সকল শব্দের উপযোগীতা ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ না তার অপব্যবহার হয়। এম্নি একটি দুর্দ্দশাগ্রস্থ শব্দ (d-d) নিশ্চয়ই আদিম মানব-প্রবর "আদমের" মুখ হতে রাগের মাথায় প্রথম জন্মলাভ করেছিল,—আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইবা-র (Eve) ব্যবহারে হয় নি এ কথা কে সাহস করে বলতে পারে? আইন যাঁদের পেশা, তাঁরা বলবেন এম্নি আর একটি বহু প্রাচীন প্রথা তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে alibi, এটাও নিশ্চয়ই আদিম-পাপের মতই পুরাতন। আদম যিহোবার বিচার কালে এই alibi গরহাজিরের অছিলা করেছিলেন—কিন্তু বিফলে।—আমাদের জজ সাহেবরাও যদি এ কথাটা জানতেন, তাহলে তাঁদের হাতে কি জবর নজিরই থাকত!

একবার একটা চিতা, হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হ'ল তা আর কারো বোধগম্য হল না বলে, (এর কথা পরে আরো

শুনতে পাবে) আমরা সবাই শীকারী, লাঠিয়াল বরকন্দাজ তার অনুসন্ধানে বের হ'লাম। জায়গাটির পাশে এক টুকরা জঙ্গল ছিল, সেটা কারো নজরে পড়ে নি, কেননা সেখানে গাছপালা, কি ঘন ঘাস, এমন কিছুই ছিল না যা'র আড়ালে আবডালে কোন জন্তু, এমন কি একটা বেড়ালও, লুকিয়ে থাকা সম্ভব! আমরা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার এর চারিদিক উটকে পাটকে দেখে যখন কোনই কিনারা করতে পারলাম না, তখন এরই পাশে যে আখের ক্ষেত ছিল, সেই দিকে খুঁজতে যাব মনস্থ করলাম। লাঠিয়ালরা সবে মাত্র দু'পা এগিয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য সে বিষয়, আমার তাদের সব কথা বলা তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলটার মধ্যে কি যেন নড়ছে, তারপর দেখি কিনা, চিতাটি বুকে হেঁটে মস্ত একটা টিক্‌টিকির মত এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যিস আমার বন্দুকটা আমার কাঁধের উপর তৈরি ছিল। আচমকা শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল, আর মনে করলে সেটা হঠাৎ ফস্‌কে আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু যখন বাঘটাকে ভূমিসাৎ হয়ে পড়তে দেখলে, তখন আর তাদের বিস্ময়ের পারাপার রইল না। আমরা যখন তার খোঁজে চারিদিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিলাম, তখন সে কেমন করে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল, আর অতবার আনাগোণা করা সত্বেও যে আমাদের চোখে পড়ে নি, এটা ভারী আশ্চর্য্যি মনে হয়।

বাঘ শীকারের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা তোমাদের এখানে বলা ভাল, তার মধ্যে একটু মজার কথা আছে। গেল-বৎসর ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্পটা আমার আর K. G. B-র কাছে তোমরা অনেকবার শুনেছ। একটি বাঘিনী আমার নির্ঘাত গুলির

ঘায়ে মরে পড়েছে, আমরা সবাই মিলে, চারিদিক ঘিরে তার ডোরা-কাটা সুন্দর চামড়া খানির, আর নধর দেহের প্রশংসাবাদ করছি, জনবিশেক লাঠিয়াল কাছাকাছি, আর বেশির ভাগ পাহাড়ের মাথার উপর রয়েছে, আমাদের কাছে পৌঁছতে হলে, তাদের অনেক খানি পথ নেমে আসতে হবে, বাঘিনী-নিধন বার্ত্তা, লাঠিয়ালরা চীৎকার করে তাদের বলছে, তারা মহানন্দে পাহাড় হতে দৌড়ে নেমে আসছে, কাছাকাছি যারা ছিল তারাও ভিড় করে ঘিরে এসেছে, আমি আমার বন্দুকটি বাক্সবন্দী করেছি, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ভল্লুক দম্পতির হুপ হুপ শব্দ আমার কাণে এসে পৌঁছল। K. G B. বন্দুক হাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলেন, স্বাগত সম্ভাষণের মাহাত্ম্যে একটি ত তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হল, ইহজীবনের মত আর তার বাক্য নিঃসরণ হয় নি। অন্যটি চারিদিকে লাঠিয়াল শীকারীর গোলযোগে, বাঘ ভালুক মারা পড়বার বিভ্রাটের সুযোগে পলায়ন দিলে, সুখের বিষয় কারো কোন হানি করে যায় নি। আমি বাক্স হতে বন্দুকটি বার করে নেবার দু'এক মিনিটের মধ্যেই এত খানি কাণ্ড হয়ে গেল।

আর বেশি দূর না এগিয়ে, এলোমেলো ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে এখন কাজের কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আর চিতা শীকারের গল্প আমি প্রকৃত ঘটনা হতেই বলব। এ ব্যাপারে যেখানে সম্ভব, পায়ে হেঁটে শীকার করাই সব চেয়ে নিরাপদ উপায়, এ কথা জোর করে বলতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করছি নে—এ বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে হবে Still Hunting-কে, অর্থাৎ এক স্থানে স্থির হয়ে বসে শীকার করাকে। এ কাজে প্রচুর অভ্যাস আর অলৌকিক ধৈর্য্যের আবশ্যক। এ ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায়, সেটা বিরক্তি-

জনক লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শীকারী শুধু খুঁজেই মরে, কিন্তু অভীষ্ট লাভ হয়ত ভাগ্যে সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে ভরা জঙ্গলে এমন ভাবে শীকার করা সম্ভব নয়—পাহাড়ে যায়গায় এ সুযোগ খোঁজা দরকার আর সুবিধাও পাওয়া সহজ। বৃহদাকার জন্তু বিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায়, এ ভাবে হাত করতে পারাই শীকারীর মৃগয়া-কৌশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগয়ার নিদর্শন, ব্যাঘ্ররাজের ডোরাকাটা আঙরাখা, ভাঙকের লোমশ কোমল কম্বল খানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শৃঙ্গ যুগল, মহিষাসুরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শৃঙ্গ-ফলক, বরাহ অবতারের খড়্গের মত যুগ্মদন্ত, সংগ্রহ করে গৃহের শোভা, আর আপনার বীর্য্য গৌরব স্মরণীয় করতে চাও তাহলে পরিশ্রম করতে হবে, যে মানুষ এগুলি অর্জ্জন করতে চায়, বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেক খানি অংশ, আর শ্রেষ্ঠ অংশই দান করতে হবে।

মধ্য-প্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে, কিন্তু শীকারী সেখানে কমই যায়। কেননা সেখানে সহজ গতিবিধি, সৌখীন চালচলন চলে না। শীকার প্রত্যাশায় মৃত জন্তুর পাশে পাহারা দিয়ে বসে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। টোপ গেথে মাছ ধরবার জন্যে চুপ করে বসে থাকতে হয়, বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে পাঁঠা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়, তাকে আকর্ষণ করে আনবার জন্যে এইটি সব চেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্তু বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে পড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তাহলে বাঘটিকে তার মৃত-শীকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সম্ভাবনা। এই সব মৃত-শীকারের কাছে পৌঁছবার

জন্যে শীকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কান-কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না, আর শীকারীও তাঁর অনুচরদের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার পাওয়া আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায় এর কাছাকাছি কাক চিল গাছের ডালে বসে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ ই দিকে চেয়ে আছে। তোমায় আসতে দেখে শেয়াল-গুলো মনভারী করে নিতান্ত অনিচ্ছায় অন্যত্র সরে পড়ছে। ময়ূরের কেকা ধ্বনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হতে অদৃশ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না, এই সব লক্ষণ হতেই বাঘটি যে কোথায় আস্তানা নিয়েছে, তা বোঝা যায়। এখন তার কাছাকাছি পৌঁছতে হলে, গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আস্তে আস্তে এগোন ভাল, সম্ভব হলে মাঝে মাঝে দু'এক চক্র ঘুরে ঘুরে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু কখনই নালা কিম্বা নদীর শুক্‌ন খাল কিম্বা ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়ূর জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারী একটা মোহ আছে—কি যে মায়ামন্ত্র ব্যাঘ্রবীরের জানা আছে কিনা জানিনে, কিন্তু ময়ূর এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে দূরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শীকারীরা দেখে শুনে এই গুণ-জ্ঞানের ঠিক খবর জেনে নিয়েছে, আর শীকার করবার সময় এই দুর্ব্বলতার বিশেষ সুবিধা নিয়ে থাকে। আমি একবার শীকার করতে গিয়ে, বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ছিলাম, এক ঝাঁক ময়ূর কাছাকাছি চরছিল, দেখলাম একজন শীকারী বাঘের মত ডোরা-কাটা একটা হল্‌দেটে রঙের পর্দ্দা নিজের সম্মুখে আড়াল করে ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ময়ূর স্বভাবত ভারী ভীরু আর লাজুক, কিন্তু বাঘের মত এই ডোরা-টানা পর্দ্দা দেখে

তারা ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর্দ্দা যতই এগোয় ময়ূরগুলি ততই স্ফূর্ত্তি করে, বিচিত্র কলাপ আর পাখা মেলে আনন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। গ্রাম্য শীকারীটি পঁচিশ গজের মধ্যে গুলি করে একটিকে হাত করলে, কিন্তু তবুও অন্যেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্যে পালিয়ে গেল না। পাগলের মত কলরব করে সেই পর্দ্দারই আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, ইত্যবসরে শীকারী আরো একটিকে গুলি করে মেরে সামনের পর্দ্দা ফেলে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। এই পর্দ্দাকে তারা বলে 'বাঘিনী'—মোহিনী শক্তির আধিক্যবশত বোধ হয় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার চলেছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা শুনেছিলাম কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশ্বাস করি নি। অমন সুন্দর পাখী মেরে ফেলা ভারী নিষ্ঠুরতা, তবে অমন নিষ্ঠুরতা যে আমার চোখের সমুখে ঘটতে দিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ, শোনা-কথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম যে তার বড়াই নিতান্তই গাল-গল্প, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল অন্য রকম। সে বল্লে ময়ূর শীকার করা যে শীকারীদের ব্যবসা, তাদেরি কাছে এই বাঘিনীর চাতুরিটা সে শিখে নিয়েছে। এই শীকারীরা তীর ধনুকে ময়ূর শীকার করে থাকে। কোন কোন বন্য প্রদেশে যেখানে চারিদিক গুল্ম কিম্বা ঘন তৃণ-সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বালুকার স্তূপ আর জলহীন নালার প্রাদুর্ভাব, সেখানে শীকারী হাতী পাঠিয়ে, বাঘকে তাড়িয়ে তার হত-শীকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, যে হাতী এ বিষয় বিশেষ রূপে শিক্ষা পেয়েছে সেই কাজে লাগে, আর এমন একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

হাতীর উপর হাওদা দেওয়া হয় না, জিন-সওয়ারীর মত বসতে

হয়, পা রাখবার জন্যে দু'টি জায়গা থাকে, এটা বীরাসন সন্দেহ নাই কিন্তু নিরাপদ নয়, বিশেষত পথে এগবার সময় বার বার ডাল পালার বাধা অতিক্রম করতে হয়। এর উপর যদি দ্বীপেন্দ্রটি বীরেন্দ্র না হয় তাহলে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এমন একটি বিপুল বপু অনাহূত আগন্তুককে অকস্মাৎ আসতে দেখে বাঘ কিম্বা চিতা, এম্নি স্তম্ভিত হয়ে যায় যে প্রথম গুলি মারবার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। সম্বর হরিণও ঘন ঘাস-বনের মধ্যে ঠিক একই ব্যবহার করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু চিত্রক হরিণের বসতি, স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে প্রকাণ্ড আয়তনের হয়ে ওঠে, তাদেরও আমি অনেক বার অনেক গুলিতে এই উপায়ে শীকার করেছি।

এই রকম হাতীর উপরে বসে শীকার করতে গেলে, একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষ করে সাবধান হতে হবে। যে মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে প্রবেশ করবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে ততক্ষণ কিছুতেই নিজের বন্দুকটি হাত ছাড়া করবে না, তা সে যতই ভারী হোক না কেন? হঠাৎ যে পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটবে বলা কঠিন, বিপদ যে এসে দেখা দিয়ে যাবে না এ কথা কে বলতে পারে? না যদি আসে, সে ত ভাল কথা কিন্তু বনের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়ে, শীকারের খোঁজে বেরতে হলে, আগে হতে সাবধান হওয়াই ভাল, জান ত কথায় বলে "সাবধানে বিনাশ নাই"। আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই ভাল, তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে করে নিয়ে বেড়ালে তার সঙ্গে এমনি বন্ধুত্ব জন্মায় যে বিপদের মুখে সে সহায় হয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়ায়, আর অনায়াসে তার সাহায্যে শত্রু বিনাশ হয়ই হয়। যারা ক্রিকেট,

হকি, টেনিস খেলে তারা জানে, ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে কাজ দেখে!

P.—একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখতে গিয়েছিলেন, আমি বার বার বলা সত্বেও বন্দুকটি নিলেন না, রেখে গেলেন। একটা সরু নালা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, তার দু'ধারে খাড়াই পাড়, ঝোপ ঝাড়ে একেবারে ঢাকা, বেশি দূর যেতে না যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কানের কাছ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে গজেন্দ্র-গমনে চলে গেল। P.—যে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁর পায়ের শব্দ কিম্বা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চমকে উঠে থমকে,—পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি সুযোগ হারালে বল দেখি! P.—কে তোমাদের মনে আছে ত? Bisley আর অন্যত্র কত প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল, শেষ কালে একটা জ্বলন্ত বাড়ী হতে বসন্ত রোগী ছোট্ট একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে, সেই রোগে বেচারী দু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিত্তলের খোঁজে খোঁজে বহুদূর বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ূরের কর্কশ কেকা ধ্বনি কিম্বা কপোতের মৃদুগান ছাড়া আর কিছুতে চারিদিকের পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্য-সুলভ দু'একটি অপরিচিত অশ্রুত পূর্ব্ব শব্দ কানে আসছিল, তার, কোথা কিম্বা কেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিরল শব্দগুলিই যেন নিস্তব্ধতাকে আরো গাঢ়তর ও অস্বস্তিকর করে তোলে। কখনো কোন মৃত্তিকার স্তূপ ডিঙিয়ে, শুক্‌নো গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে কেবলি এগিয়ে চলেছি, একবার মনেও হয় নি, যে কোন কিছু হঠাৎ আমার

সম্মুখে এসে পড়বে কিন্তু তবুও চোখ যদিও কিছু দেখতে কিম্বা কান কিছু শুনতে পায় নি, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, কি যেন একটা আসছে, তারপর চোখ তুলেই দেখলাম—প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী, কুলোর মত কান ছুটো খাড়া করে, শুঁড় গুটিয়ে তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচার বিবেচনার সময় ত আর তখন ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি একটা ঘন বাঁশ ঝাড়ের মধ্যেই লুকিয়ে পড়লাম, যদিও আমার পিছু পিছু আসবার কোন পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই নি, তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্ব্বত-প্রমাণ একটি হস্তিনী শুঁড় তুলে হুঙ্কার করতে করতে দ্রুত অন্তর্ধান হল—গজেন্দ্র গমনে নয়। যদি আমি আর দু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে না আশ্রয় নিতাম, তাহলে কি যে ঘটত সে সম্বন্ধে অধিক না-ভাবা আর না-বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro Paradox ছিল, আর তোমরা ত জান হাতী মস্ত বড় জানোয়ার হলেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর স্থানে সত্বর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদযুগলের সম্মিলিত চেষ্টাতেও প্রাণ রক্ষা হত না, সেটা সুনিশ্চিত !

ক্রমশ—

বিসর্জ্জন।

—:*:—

তার নামটি ছিল টুলু; সে ছিল আমার বাল্য-সহচরী। তার সম্পর্ক, পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বাতাস সম্পূর্ণরূপ পরিহার করে' আমারই প্রাণে—আমার মর্ম্মের গভীর বেদনাতেই নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।

সে থাকত আমাদের পাড়ার রায়দের বাড়ীতে। কিন্তু রায়দের দেহের যে শোণিত-প্রবাহ, তার সঙ্গে তার রক্তের যোগ ছিল না; আবার প্রীতি বা স্নেহের কোন যোগসূত্রে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে তার যে কোন বন্ধন পড়েছিল, এমনও নয়। ঐ ক্ষুদ্র একটি বালিকা যেন ছিল রায়-পরিবারের মস্ত একটা দায়।

টুলুর এক মামি-মা ছিল রায়দের ঘরের ঝিয়ারী, সে যখন বিধবা হয়ে তার বাপের বাড়ী এল, তখন অনাথা ভাগিনেয়ীটিকেও সে তার সঙ্গে আনল। বিধবা-মেয়ের অস্তিত্বের গুরুভার আর রায়দের বেশি দিন বইতে হল না, কিন্তু মৃত্যুকালে একটি অনাথা বালিকাকে লালন পালন করবার দায় সে তার মা বাপের ঘাড়েই চাপিয়ে গেল।

জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার একটা সুযোগ টুলু পেয়েছে, কিন্তু রায়দের বাড়ীতে যে অবস্থায় তার দিন কেটেছে,—পশু-প্রদর্শনীর পশুর যে দশা, তার তুলনায় তা ছিল আরো দুর্ব্বহ। বাড়ীর লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এবং তাদের মনের যোগ ছিন্ন করে বালিকার

ক্ষুদ্র প্রাণ-পাখীটি মুক্তির অবাধ আকাশে আনন্দে যে ডানা মেলবে, অমন অবকাশ তার খুব অল্পই ছিল ; নিরন্তর তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে' আতিপাতি করে' তার দোষগুলো বের করবার এবং নানাভাবে তাকে গঞ্জনা দেবার উদ্যম ও উৎসাহ বাড়ীসুদ্ধ লোকের একান্তরূপেই ছিল। টুলু যে তাদের আপনার কেউ নয়, অথচ তাকে পালন করবার দায় তাদেরই, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মরণ হতে না পেরে তাকে নিয়ে তাদের কারুর আর স্বস্তিবোধ ছিল না। অনাথা বালিকাটির মুখের অন্ন তুলে ধরে তারা তার জীবন রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু তার প্রতি তাদের অন্তরের যে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব, তার বদ্ধ হাওয়াতে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটি নিরন্তর গুম্‌রে মরেছে।

আমার বিধবা-মায়ের আমিই ছিলুম একমাত্র সন্তান। তাঁর হৃদয়ের অজস্র স্নেহরাশি আমার ক্ষুদ্র প্রাণ-পাত্রটি কাণায় কাণায় ভরে' তুলে' আরো যেন উপছে পড়েছে, আর তার বিভিন্ন ধারার একটি ধারা ঐ অনাথা বালিকাকে আশ্রয় করেই বেগে প্রবাহিত হয়েছে। টুলুর কচি হৃদয়খানি কষাঘাতে নিরন্তর জর্জ্জরিত হয়েছে, থেকে থেকে দু'এক মুহূর্ত্তের ফাঁকে বালিকার অন্তরের ঐ ক্ষত স্থানে আমার মা-ই তাঁর স্নেহের হাতখানি বুলিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী টুলু যে এসেছে, তার দরুণ তাকে ঢের কথা শুনতে হয়েছে। রায়দের বাড়ীর দৃষ্টি গুপ্তচরের মত অলক্ষ্যে তাকে অনুগমন করে' সদাসর্ব্বদা তার গতি বিধি নিরীক্ষণ করেছে। ভালমন্দ সামগ্রী যখন যা-কিছু আমাদের বাড়ীতে হয়েছে, মা হয় ত হেঁসেল ঘরের এক কোণে বসিয়ে তাকে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রায়দের দৃষ্টি সেখানে গিয়েও পৌঁচেছে। টুলুকে তারা কত গালিগালাজ করেছে,—এক

রতি মেয়ে, কিন্তু তার উদরখানি যেন কুম্ভকর্ণের মত, বাড়ীতে এত যে খায় তবু কি তৃপ্তি আছে, আবার এবাড়ী ওবাড়ী গিয়ে পাত না পাতলে মেয়ের দিন আর যায় না। কিন্তু, অত যে বিড়ম্বনা, তবু টুলুর আমাদের বাড়ী আসা ক্ষান্ত হয়নি; দু'বেলা অন্তত দু'টিবার সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই এসেছে।

আমি তখন গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলে নীচের এক ক্লাশে পড়তুম; ইস্কুলে যারা ছিল আমার সহপাঠী, ইস্কুলের বাইরে আমি তাদের সম্পর্ক বড় একটা রাখতুম না। আমি ছিলুম বিধবা-মায়ের একমাত্র সন্তান; মায়ের অঞ্চলখানি আমাকে সদাসর্ব্বদা আকস্মিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছে। ইস্কুলের ক'টি ঘণ্টা ব্যতীত বাড়ীর বার হবার, এবং অন্যান্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে দৌড় ধাপ ও ছুটোছুটি করবার অবকাশ আমি খুব অল্পই পেয়েছি; অধিক সময় আমার কেটেছে অন্তঃপুরেই। ঐ সময় টুলু যখন একটু ফাঁক পেয়েছে আমাদের বাড়ীতে এসেছে, একটি নিঃসঙ্গ বালকের হৃদয়ের কারবার দিনে দিনে তাকে নিয়েই জমেছে।

ইস্কুল থেকে আমি বাড়ী ফিরেছি; তার অল্পক্ষণ পরেই টুলু আমাদের বাড়ীতে এল; সেদিন বালিকার কচি প্রাণের পল্লব আরো যেন নেতিয়ে পড়েছিল। আমার সুমুখে চুপটি করে এসে সে দাঁড়ালে, যেন নীরব মনোবেদনার জ্যান্ত একটি সাকার রূপ। বালিকার তাপ-দগ্ধ চিত্তে যে মুহূর্ত্তে একটি বালক-হৃদয়ের স্নিগ্ধ ও সুশীতল স্পর্শখানি লাগল, তার অন্তরের যে একটা নিবিড় বেদনা, তার পারিপার্শ্বিক হাওয়ার উত্তাপে এখনও অশ্রু হয়ে ঝরবার অবকাশ পায় নি; সেই নিমেষে তার দুটি ডাগর আঁখির পাতায় বিন্দু বিন্দু হয়ে

দেখা দিল। বালিকার প্রাণে সেদিনের একটি বিশেষ ঘটনা অতি নিদারুণভাবে আঘাত করেছিল।

টুলুকে ত বাড়ীসুদ্ধ লোক তাড়নাই করেছে, তাদের কাছে তার চিত্ত সদাসর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েই রয়েছে, সেখানে যার সাহচর্য্যে বালিকার হৃদয়খানি ঈষৎ মেলেছে, সে হচ্ছে তার প্রিয় সুহৃদ একটি বিড়াল। অবজ্ঞা ও অনাদরের পাঁচিল অলক্ষ্য হয়ে যেখানে উঠেছে, বালিকার অন্তরাত্মা থেকে থেকে যেন ঐ একটি ক্ষুদ্র জানলার অল্প একটু ফাঁকে মুখখানি বাড়িয়ে আলো-আকাশের আনন্দ-মূর্ত্তির ঈষৎ পরিচয় পেয়েছে।

টুলু বিড়ালটিকে বড় ভাল বেসেছে; বাড়ীর লোকদের বিষ-দৃষ্টির অন্তরালে কোন একটি নিরাপদ স্থানে কখনো সে যদি তার সাক্ষাৎ পেয়েছে, তাকে কোলে করে গায়ে তার কত হাত বুলিয়েছে, তাকে কত সোহাগ কত আদর করেছে; তার ব্যথায় কত সমবেদনা জানিয়েছে। আবার বিড়ালটিও ছিল এমনিতর যে বাড়ীর আর আর ছেলেপিলে যদি তার গায়ে হাত দিয়েছে, অমনি সে হয় ত দৌড়ে পালিয়েছে, অথবা হিংস্র একটি জীবের মতই ধারালো নখের সাহায্য নিয়েছে; আর টুলু যখন গিয়েছে, শান্তশিষ্ট শিশুটির মত তার কোলে এসেছে। বিড়ালটার সঙ্গে টুলুর যে অতটা সৌহার্দ্য ভাব, ওটা যাতে ব্যক্ত না হয়, সেদিকে ঐ ক্ষুদ্র বালিকার যদিও বিশেষ সাবধানতা ছিল, তবু বেশি দিন আর তা গোপন রইল না। আর যখন প্রকাশ পেল যে, বিড়ালটা টুলুরই একান্ত অনুরক্ত, তখন ঐ বিড়ালের সম্বন্ধে বাড়ীর লোকদের মনোভাব বিষ হয়েই উঠল। সেদিন টুলুর বড়ই আদরের ঐ যে বিড়ালটি, তার বিষাদঘন চিত্তে, সুদূর আনন্দ-লোকের একটি

ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বহন করে এনেছিল, তাকেই—ঐ বালিকার যারা নিষ্ঠুর বিধাতা, তার প্রাণের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি নদীর পারে 'অন্তরীণ' করেছিল ; আর বালিকা, তার অন্তরে নিদারুণ একটা আঘাত পেয়ে, আমারই কাছে এসেছিল তার সে বেদনা জানাতে।

অশ্রুভরা দুটি চোখের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তুলে ধরে টুলু আর্দ্রকণ্ঠে যখন জানালে, "তারা আমার বিড়ালটাকে নদীপার করে দিয়েছে"। বালকের মন তখন যেন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠল,— বালিকার প্রাণে তারা অন্যায়রূপে যে নিষ্ঠুর ব্যথা দিয়েছে, তার একটা প্রতিবিধান করবার উদ্দেশে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বললুম, "আমাদের বিশুকে কালই ওপারে পাঠাব, এবার তোমার বিড়ালটিকে আনিয়ে আমাদের বাড়ীতেই রেখে পুষব, দেখব কে আবার তাকে নদীপার করে"।

বিশু আমাদের বাড়ীর একটি চাকর, আমার সকল আবদার ঐ বিশুই শুনত। সেদিন বিশু বাড়ীতে উপস্থিত ছিলনা, নতুবা আমি তাকে সেই মুহূর্ত্তেই পাঠাতুম ; সময়ের অপেক্ষা আমারই সইছিল না। বালিকার দুঃখ সেই দণ্ডে ঘুচিয়ে তার প্রীতিসাধন করবার জন্য একটি বালকের অন্তর বড়ই উদ্বেল হয়ে উঠল। নদীটি আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় একপোয়া মাইল দূরে ছিল ; টুলুকে সঙ্গে করে' আমিই গেলুম, যদি বিড়ালটার কোন সন্ধান করতে পারি। যখন পাড়ের উপর এসে আমরা দাঁড়ালুম, শুনলুম, ওপারের একটা ঝোপের আড়ালে বসে বিড়ালটা মিউ-মিউ করে কাঁদছে। বিড়ালের কান্না শুনতে পেয়ে, টুলু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ; "আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়"।

বিড়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে, জলের একেবারে কিনারাতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু নদীতে সাঁতার দিতে সে আর সাহস করল না; আবার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে এবার আরো বেশি কাত্‌রাতে লাগল। টুলু হতাশ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল,— তার ঐ চোখের চাহনি অন্তরের দারুণ কাতরতাই জ্ঞাপন করছিল। বালিকার প্রতি আমার অন্তরের সহানুভূতি আমাকে জানিয়ে দিল, যে বিড়ালটিকে যদি ঐখানে ঐ অবস্থাতে রেখেই আজ বাড়ীতে ফিরি, সারা রাত তার বেদনা-বিদ্ধ হৃদয় অশ্রু হয়েই ঝরবে। বালিকার ঐ অশ্রু নিবারণ করবার আগ্রহ বালকের স্বাভাবিক ভীরুতার অন্তরে একট দুঃসাহস জাগিয়ে তুললে।

নদীর এক ঘাটে ছোট একখানি ডিঙ্গি-নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা দু'জনেই গিয়ে ঐ নৌকোতে উঠলুম। নদীর গভীরতা তেমন ছিল না, কষ্টে শ্রেষ্টে নৌকা আমি পাড়ে নিলুম; কিন্তু নৌকাখানি সিধে ভাবে না গিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে, স্রোতের টানে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে রেখে, দুজনেই পাড়ের উপর এসে দাঁড়ালুম; টুলু আবার ডাকল, আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়'। পুষি এবার বালিকার গলার আওয়াজ পেয়েই, দৌড়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হল।

যখন ওপারে আমার নৌকাখানি ভিড়েছিল তখনই সন্ধ্যা; এবার ফিরবার কালে যখন আমরা নদীর বুকে, তখন সাদা মেঘের টুকরোর মতই দিবাভাগের নিষ্প্রভ চাঁদ, জগৎ-মায়ের কপালে একটি রজতের টিপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল। প্রকৃতি তার অঙ্গের ধূম্র-ধূসর বসনখানি উন্মোচন করেছিল, তার দেহ থেকে আলোর উৎস ছুটে

ছিল। আর নদীটির যেদিক পানে গতি তার বিপরীত দিকে, দিগন্তের তরুশ্রেণীর মাথার উপরে,—নিবিড় একখানি মেঘ, একটি বিরাট বিহগের মতই পক্ষ বিস্তার করেছিল। আকাশ যেন উতলা হয়ে এদিক ওদিকে ছুটেছিল; তার ত্রস্ত-পদক্ষেপে নদীর বুক থেকে থেকে বিষম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। টুলু,—নৌকোর আগ-গোলুয়ের দিকে একটি জায়গায় বিড়ালটিকে কোলে করে বসে, নদীর দিকে একবার ঝুঁকে পড়ে দেখছিল যে যাদুকরের হাতের একটি রজত-মুদ্রার মত নদীর গর্ভে আকাশের একটি চাঁদ থেকে থেকে দশটি হচ্ছে, কখন বা একটি মশালের মত জ্বলে উঠছে, আবার এক একবার নদীর বক্ষে—চন্দ্রমা যেন সোনার একখানি মাদুর হয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীর পুকুরঘাটে মা আমাকে অল্প বয়সেই সাঁতার শিখিয়েছিলেন, কিন্তু আমার বড় বেশি ভয়-ভাবনা হতে লাগল টুলুর জন্যে। টুলুকে আমি বার বার সাবধান করলুম; কিন্তু বালিকার অন্তরের সাবধানতা সেদিন কি ছিল? হারিয়ে-যাওয়া যে অমূল্য নিধি, তার স্নেহানুরক্ত একটি বালকের প্রয়াস তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল, বালিকা তার ঐ ফিরে-পাওয়া ধন বুকে ধরে, রাক্ষস-পুরীর যে রাজ-কন্যা রাক্ষসদের সহবাসে অতি দুঃখে যার দিন অতিবাহিত করেছে, তারই মত প্রণয়-পাশে বদ্ধ একটি রাজপুত্রেরই যেন অনুসঙ্গিনী হয়ে, স্রোতে তার ডিঙ্গা ভাসিয়েছিল। রূপকথার কৌটোটির মতই যেন একটি কৌটো—ঐ একটি অনাথা বালিকার অন্তরে, এতকাল তার দুঃখ বিড়ম্বনার পাথর-চাপা হয়ে পড়েছিল, সে দিন ক্ষণকালের অবকাশে তার ঐ কৌটোর ডালাখানি যেন সরেছিল।

বালিকার প্রাণে আনন্দের হাট বসেছিল। নৃত্য-শীলা পরীদের সুস্বর-সম্বলিত উল্লাস-সঙ্গীতে তার হৃদয়ের দিক-দিগন্ত যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। নদীর এ-পারে ও-পারে যে আলো, প্রিয়জনের সহস্র চুম্বন-বর্ষণের মত অজস্র ধারায় এসে গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পড়েছিল, ঐ আলোকের মদে সেদিন টুলু তার অন্তরের শূন্য পেয়ালাটি ভর্ত্তি করেছিল। যে বাতাস দশাগ্রস্ত ভক্তের মত, নদীর তীরে, ধানের ক্ষেতের সোণার প্রাঙ্গনে আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সেই হাওয়াতে বালিকার চিত্ত যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিল। তাকে কত আমি সতর্ক করলুম, তবু তার অস্থিরতা কিছুতে গেল না; এক একবার জলের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে, বালিকা উল্লসিত চিত্তে নদীর বুকে চাঁদের খেলা দেখতে লাগল। একটা হাওয়ার বেগ একবার উদ্দাম হয়ে এসে, আমার নৌকোখানিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে জেলেদের একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছিলুম, সে ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে জলের ভিতর ডিগবাজি খেয়ে পড়লুম। তারপর আবার যখন আমি জেগে উঠলুম; দেখি যে হাওয়ার প্রবল বেগ আমার নৌকোখানিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আর অন্য একখানি নৌকো বেয়ে কারা যেন আমার দিকেই আসছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্ক ও ত্রাসে আড়ষ্ট হয়ে আসছিল; জেলেদের বাঁশটি নিকটে পেয়ে, সেইটে ধরে আমি নেয়েদের ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

টুলুর বিড়ালটাকে পার করে' নেবার উদ্দেশ্যে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গিতে উঠে, আমি টুলুকে সঙ্গে করে ও-পারে গিয়েছি, মায়ের কানে কি করে যেন এ-সংবাদ পৌঁচেছে। মা বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

দু'জন লোক আমার খোঁজে পাঠিয়েছেন। তারাই একখানি নৌকো-বেয়ে আমার দিকে আসছিল। যখন কাছে এসে তারা আমাকে তাদের নৌকোতে তুললে, তখন দেখলুম আমার ডিঙ্গিখানি খানিকটা দূরে গিয়ে, পাড়ের উপ্‌ড়ে-পড়া একটা গাছের সঙ্গে বেধে রয়েছে। টুলু সে নৌকোতে নেই। বালিকার কোলে তার আদরের যে বিড়ালটি ছিল, সাঁতার দিয়ে সেটি তীরে উঠেছে ও সেখানে এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করে' ডাকছে। অবোধ জন্তু জানেনা যে, সে যার প্রতীক্ষায় আছে সে আর কখনো আসবে না, তার ভালবাসার ধনকে বাঁচাতে গিয়ে সে আজ নিজে প্রাণ হারিয়েছে!

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

বাঁশি।

—:*:—

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেচে। অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কি করে? কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজ্‌চে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দ্দা একটঘায়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্চে

কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্‌ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম—তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল,—সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভ্যতার কষ্টিপাথর।

——:*:——

বনে যেমন অনেক রকম ফুল থাকে, যাদের চেহারা দেখলেই তাদের শুঁকতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু পরিমল লোভীকে তাদের নিকট হতে শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়, সেইরূপ সাহিত্য-কাননেও অনেক ফুল আছে যাদের বাহ্যিক চাকচিক্যই তাদের একমাত্র সম্বল। সে দিন জনৈক বন্ধুর হাতে ডাক্তার ফারেল লিখিত "Modern man & his Forerunners" বলে একখানি বই দেখলুম। বইটির নাম, মলাট, ছবি প্রভৃতি আমার মনকে গ্রেপ্তার করে বসল। ধার নিয়ে সেটিকে আদ্যোপান্ত পড়লুম। পড়ে কিন্তু লেখকের উপর রাগও হল আর মায়াও জন্মাল। রাগ হল তাঁর অদ্ভুত materialistic মতগুলো দেখে, আর মায়া হল তাঁর ঐতিহাসিক অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। লেখক পুস্তকের উপক্রমণিকায় বলেছেন যে তিনি ১৫।১৬ বৎসরের গবেষণার পরে বইটি লিখেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে তিনি যদি ইতিহাস চর্চ্চা ছেড়ে ডাক্তারিতে মনোনিবেশ করেন তাহলে তাঁর পক্ষে ও জগতের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

(২)

লেখক সভ্যতা নামক জিনিসটির ধর্ম্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের নামই হচ্চে

সভ্যতা। যে জাতি এ বিষয় যত বেশি কৃতিত্ব লাভ করেছে সেই জাতিই তত বেশি সভ্য। প্রকৃতির উপর আধিপত্যই হচ্চে সভ্যতার কষ্টি-পাথর। কোনো জাতির সভ্যতার পরিচয় নিতে হলে তার এই ক্ষমতার খবর নিতে হবে। ডাক্তার ফারেল আরও বলেন যে দাসত্বই হচ্চে সভ্যতার বনেদ। দাসত্বের উপর ভর করেই সভ্যতার চারুহর্ম্ম্য সর্ব্বস্থানে গঠিত হয়ে উঠেছে। দাসত্ব কোন না কোন আকারে সব সভ্যদেশেই বর্ত্তমান আছে। যে দিন এই মঙ্গলময় দাসত্ব প্রথা উঠে যাবে, সে দিন সভ্যতাও ভিত্তিহীন অট্টালিকার ন্যায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হবে। এইরূপ খেয়ালের চশমা দিয়ে বর্ত্তমান যুগকে নিরীক্ষণ করে যে ডাক্তার সাহেবের মনে কতকটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। জনসাধারণ চারিদিকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার পাবার জন্য চীৎকার করচে, মারামারি কাটাকাটি করচে, বিপুল অন্দোলন করচে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত একচেটে ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্চে। এই সব দেখেশুনে লেখক নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ফলে সভ্যতার, বিশেষত ইউরোপীয় সভ্যতার, স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মেছে।

(৩)

লেখক সভ্যতার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং যে-সামাজিক প্রথাকে সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ রূপে নির্দ্ধারিত করেছেন, প্রকৃত ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সভ্যতার বিলোপের উপর চোখের জল ফেলবার বিশেষ কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। রুশো (Rousseau) বলেছেন "আমি যদি কোন বর্ব্বর দেশের রাজা হই

তা হলে যে ব্যক্তি সে দেশে সভ্যতার আমদানী করবে ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবো"। লেখক সভ্যতার যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা পড়ে রুশোর সঙ্গে সায় দেবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে। জগতের উন্নতি যদি কষাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর দাসের শ্রমার্জ্জিত সম্পদের নাম হয়, তাহলে সে উন্নতির শেষ যবনিকার যত শীঘ্র পতন হয় ততই মঙ্গল। সভ্যতার যদি কোন আধ্যাত্মিক অর্থ না থাকে, তাহলে সে সভ্যতার দ্বারা মানবের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হতে পারে না। বাহুবলের সঙ্গে যদি নৈতিক বলের বিকাশ না হয়, তাহলে সেটা একটা মহা ভয়াবহ বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

(৪)

লেখক যে সামাজিক অবস্থাকে সভ্যতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন তার দৃষ্টান্তের জন্য পুরাকালের ইতিহাসের জীর্ণ নথি খোলবার দরকার নেই, একবার বর্ত্তমান জগতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যাবে। এই গত জুন মাসের Edinburgh Revew-এ Mr. W. C. Souily "The Colour Problem in South Africa" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটি পড়ে বোঝা যায় যে ডাক্তার কারেল নিরুপিত সভ্যতার গুণনিচয় দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে। সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর দৃঢ়রূপে আধিপত্য স্থাপন করেছে, সেখানে শ্রেণীবিভাগ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে এবং দাসত্ব তার ক্রূর অট্টহাসিতে দিগন্ত মুখরিত করছে। Mr. Soully

বলেন " within the union limits there is a population of six million souls, only a million and a quarter of whom are Europeans and throughout the greater area comprised by the four provinces—Cape, Transval, Free State and Natal—such a stringent and illiberal colour line is drawn that not alone have the non-European inhabitants, no voice in the management of the country but their social and economic conditions are such as to practically debar them from advancement. Moreover they are subjected to vexations, discriminating laws and are the victims of a deep and growing race-prejudice on the part of the Europeans." দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ডাক্তার ফারেল যা চান, তাই আছে। কিন্তু তাই বলেই কি, দক্ষিণ আফ্রিকা সভ্য জগতের শীর্ষ-স্থানীয় বলে গণ্য হবে? এই কি সেই সভ্যতা যার জন্য কোনো মানুষের মত মানুষ অকাতরে আত্ম বলিদান করতে পারে? এই কি সেই সভ্যতা যা নিয়ে আমরা এত গৌরব করে বেড়াই?

(৫)

এই গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণীর প্রতিপক্ষ দলের লেখকগণ, জার্ম্মাণীকে নানা বিশেষণে বিভূষিত করেন। জার্ম্মাণদের বলা হয় সভ্য-বর্ব্বর (Civilized Barbarian)। কথাটি অর্থহীন নয়, কারণ এর মর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাটির দ্বারা কি এ সত্যের

প্রকাশ হয় না যে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য ছাড়া অন্য কোন গুণের অস্তিত্ব না থাকলে একটা জাতিকে সভ্য বলে গণ্য করা যায় না। জার্ম্মাণদের মধ্যে বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, বিজ্ঞান ছিল, organization ছিল, কিন্তু তবুও তারা বর্ব্বর। কেন?—প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলবেন যে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, অপরের অস্তিত্বের সত্ত্ব তারা স্বীকার করে না, রাজনীতিতে যে ন্যায় অন্যায় পথ বলে একটা কথা আছে সেটা তারা মানে না, জাতীয় চুরি যে ব্যক্তিগত চুরির ন্যায় দোষনীয় একথা তারা বোঝে না, ইত্যাদি।

(৬)

কি কি গুণের ও ক্ষমতার সমাবেশ একটি জাতির মধ্যে ঘটলে তাকে সভ্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে মত ভেদ আছে এবং থাকাও স্বাভাবিক, তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে সভ্যতা নামক বিশেষণটি কেবল বাহুবলের নামান্তর মাত্র নয়। একজন আততায়ী যদি বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে তার পৈশাচিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে সুকৌশলে ব্যবহার করতে শেখে, আমরা তার জন্য তাকে, তার সভ্যতাকে আশীর্ব্বাদ করব না। সভ্যতার সম্বন্ধ পাশবিক ক্ষমতার সঙ্গে নয়—নৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে। বাহুবলের সঙ্গে সভ্যতার সমন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সে সম্বন্ধ নিত্য নয়—নৈমিত্তিক। যিশু খৃষ্ট একজন নিঃসহায় ব্যক্তি ছিলেন আর যে Pilate নাকি তাঁকে ক্রুশে টাঙিয়ে ছিল, সে ছিল একজন ক্ষমতাশালী রোম-প্রতিনিধি। রোমের

অতুলনীয় ক্ষমতা তার ইঙ্গিতে চলত। কিন্তু তাই বলে কি Pilate-কে যিশু অপেক্ষা বেশি সভ্য বলতে হবে? ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে, জাতির কথাই নিন। নব্যযুগের গ্রীসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এথেন্স অপেক্ষা অনেক বেশি। এখন গ্রীসে রেল-গাড়ী আছে, মোটর ছুটছে, ষ্টিমার চলছে, তোপ, কামান, বন্দুক, কল-কারখানা সবই আছে, আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোন চিহ্নই ছিল না। এ সব সত্বেও প্লেটোর এথেন্স কে আমরা নবীন গ্রীস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?—এর কারণ হচ্চে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ হয়েছিল আজকালকার গ্রীসে তার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে এথেন্স যে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিল এখনকার গ্রীসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের চেষ্টা এথেন্সই করেছিল এখনকার গ্রীসে সে চেষ্টা নেই। এবং উক্ত মহান্ উদ্দেশ্যদ্বয়ের অনুশীলনে এথেন্সের যে কৃতিত্ব লাভ হয়েছিল এখনকার গ্রীসের তা স্বপ্নেরও অগোচর। এইজন্যই আমাদের নিকট প্রাচীন এথেন্সের এত কদর। এই একই কারণে আমরা প্রাচীন ভারতকে নব্য ভারত অপেক্ষা এবং গেটের জার্ম্মাণীকে নব্য জার্ম্মাণী অপেক্ষা বেশি মহামূল্য বলে মনে করি।

(৭)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যেমন আমাদের অন্তরে বিচার-বুদ্ধি নামক একটা ক্ষমতা আছে, ভালমন্দ প্রশংসনীয় নিন্দনীয় নিরূ-পণের জন্যও আমাদের সেইরূপ একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটির

বাঙলা নাম হচ্ছে ধর্ম্মজ্ঞান, আর ইংরাজিতে তাকে বলে "The sense of right and wrong." ক্যাণ্ট সেটাকে Practical Reason বলেছেন। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা যে জিনিসটি অনুমোদিত হয় সেটি হচ্ছে বাঞ্ছনীয়—good. এই বুদ্ধির প্রাচুর্য্য যে জাতির মধ্যে ঘটেছে সেই জাতিই সভ্য আর যে জাতির অবস্থা ইহার বিপরীত, সে জাতিই বর্ব্বর। এই ন্যায়ান্যায় জ্ঞানই হচ্ছে সভ্যতার বিচারক। এর দ্বারা যাচাই করেই আমরা জানতে পারি যে কোন্ জাতি সভ্য আর কোন্ জাতি অসভ্য।

(৮)

কোন্ কোন্ ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গুণ প্রশংসনীয়, কোন্ কোন্ গুণ নিন্দনীয়, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তর মতভেদ আছে। এই মতভেদ-বশত কোন কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, morality ও এক রকম রুচি বিশেষ। একই কাজ এক জনের নিকট প্রশংসনীয় এবং অন্য জনের নিকট নিন্দনীয় বিবেচিত হয়। নৈতিক কর্ম্মের মধ্যে এমন কোন সাধারণ গুণ (common element) নেই যাকে সকলেই শিরোধার্য্য করে নিতে পারে। যদি থাকত তাহলে এ বিষয়ে এরূপ ব্যক্তিগত ও জাতিগত মতবৈষম্য দেখা যেত না। ভাল মন্দের বিচারও জ্যামিতির সিদ্ধান্তের মত অকাট্য হত। তাঁরা বলেন আমাদের ভাল মন্দের বিচার কতকটা খাদ্যদ্রব্যের উপাদেয়তার বিচারের ন্যায়। দুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন কাঁটাল এক জনের নিকট অমৃততুল্য অনুভূত হয় এবং সেই একই ফল দ্বিতীয় ব্যক্তির বমনেচ্ছা আনয়ন করে, সেইরূপ মাতৃ-হত্যাও কারও নিকট এক বিষম পাপ

রূপে অনুভূত হয় এবং কেউ তাকে একটা প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করে। কাঁটাল সম্বন্ধে রুচির বিভিন্নতা যেমন একটা ব্যক্তিগত জিনিস, মাতৃহত্যা সম্বন্ধে মতভেদও ঠিক সেইরূপ একটা ব্যক্তিগত রুচি-ভেদ মাত্র। সার্ব্বভৌমিক নীতি (Universal moral Law) বলে কোন জিনিস নেই, ওটা একটা অলিক স্বপ্ন মাত্র।

(৯)

এই জাতীয় দার্শনিক এ কথা ভুলে যান যে, যদি কোন রূক্ষ মেজাজের লোক তার এই অদ্ভুত মত শুনে ধৈর্য্য হারিয়ে লাঠি মেরে তাঁকে ঘায়েল করে বসে, তাহলে তিনিই তারস্বরে বলে উঠবেন—লোকটির সাজা হওয়া উচিত। জজ-সাহেব যদি রায়েতে লেখেন যে রুচির বিভিন্নতা দোষণীয় নয়, অতএব আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলে দার্শনিক ম'শায় ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে বলে উঠবেন, "বড় অন্যায় হয়েছে, সমাজ আর টিকবে না, শীগ্‌গির অরাজকতা আরম্ভ হবে। সভ্যতা এবারে লোপ পাবে," ইত্যাদি। কেউ যদি উত্তরে বলে, "কেন, অরাজকতা এলই বা—ক্ষতি কি?" দার্শনিক অমনই উত্তর দেবেন, "তাহলে বর্ব্বরতা ফিরে আসবে"। তার্কিক যদি বলে, "বর্ব্বরতা এলই বা ক্ষতি কি"? দার্শনিক বলবেন, "মানুষের সুখ চলে যাবে, দর্শন বিজ্ঞান লোপ পাবে, আরও নানা রকম অনিষ্ট হবে"। বোঝা গেল দার্শনিক মশায় ঐ জিনিসগুলিকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তার্কিক কিন্তু অত সহজে হার না মেনে তাঁর কথাতেই উত্তর দেবে, "যে সে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না। এ সব জিনিস তার নিকট অরুচিকর, এর প্রতিকার কি

কি কর্ব্বেন" ? দার্শনিককে তখন বলতেই হবে, "ও-ব্যাটার মাথার দোষ আছে, ওকে পাগলা গারদে পোরা দরকার, না হলে ও বিষম প্রমাদ ঘটাবে ইত্যাদি"। নীতিটাকে আম কাঁটালের সঙ্গে তুলনা করলে তার ফল এই রকমই হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের শত্রু হওয়া দোষণীয়, তা না হলে শত্রুকে জেলে পূরবার আমাদের কি অধিকার আছে ? দার্শনিক যদি বলেন, "আত্মরক্ষার জন্য আমরা ও-কাজ করতে বাধ্য"। তার্কিক তখনই বলে উঠবে "আত্মরক্ষার প্রয়োজন কি ? আমরা সকলে মরলুমই বা" ? তখন দার্শনিককে বাধ্য হয়ে বলতে হবে "জীবনটা বাঞ্ছনীয়, এটা একটা অমূল্য জিনিস। এ থেকে যা পার আদায় করে নেও"।

(১০)

দর্শন বিজ্ঞানের সব কচকচি ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আসল কথা এই যে ভালমন্দ বিচারের একটা ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে এবং আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটা হওয়া উচিতও মনে করি। ভাল মন্দের জ্ঞানটাকে আমরা রুচিবিশেষ বলে মনে করি নে। যা পাপ তা যে কেউ করুক আমরা সেটাকে দোষণীয় মনে করি। আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান (Practical Reason) বলে, ভাল কাজ সকলেরই করা উচিত আর মন্দ কাজ থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিত। জ্ঞানী যে-কারণে তাঁর বিচার বুদ্ধিকে মানেন, ঠিক সেই কারণেই তাঁর বিবেক বুদ্ধিকেও মানেন। দুটিই মানুষের ঈশ্বর দত্ত অমূল্য ধন, দুটিই সমান শিরোধার্য্য। অবশ্য কোন্ বিশেষ কাজটি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ

সেই নিয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা এ নিয়ে কি মতভেদ নাই? বৈজ্ঞানিকেরা এক সময় পৃথিবীকে চতুর্ভুজ বলতেন আর এখন বলেন সেটা গোলাকার। কিন্তু এ রূপ বিভিন্নতা ঘটেছে বলেই কি আমরা বলতে পারি যে পৃথিবী গোলও বটে আর চতুর্ভুজও বটে? এখন একজন যদি বলে যে রাম তার মাকে খুন করে মহাপাপ করেছে এবং আর একজন যদি বলে যে, না সে অক্ষয় পূণ্য অর্জ্জন করেছে, তাহলে এই দুইটি মত কখনো সত্য হতে পারে না। এর মধ্যে একটি সত্য আর একটি মিথ্যা। সত্যাসত্য নিয়ে মতভেদ ঘটলেই যেন আমরা বলে উঠিনা যে, সত্যাসত্য বলে কোন জিনিস নাই। সেইরূপ ভাল মন্দের বিষয় মতভেদ ঘটলেও এ কথা যুক্তিযুক্ত নয় যে, ভাল মন্দ বলে কোন জিনিস নেই। এ সব কথা হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে platitude কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের প্রকোপ যখন বড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায় তখন platitude হয় আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

(১১)

ভাল মানে, হওয়া উচিত। সভ্যতাকে যে আমরা ভাল বলি তার মানে সেটা হওয়া উচিত। আমাদের প্রথম স্থির করতে হবে যে কি কি জিনিস হওয়া উচিত। তারপর দেখতে হবে যে সে জিনিসগুলি কোন সমাজবিশেষে আছে কি না। যদি থাকে তবে সে সমাজ সভ্য আর যদি না থাকে তাহলে সে সমাজ বর্ব্বর। অবশ্য নিখুঁত সভ্যতা perfect civilization কোথাও পাওয়া যায় না। কখনও আমরা perfect state-এ পৌঁছুব কিনা, সে কথা আমি এখানে আলোচনা

করচি নে। আমি এখানে এই বলতে চাই যে perfection-এর একটা নক্সা পরিস্ফুট ভাবেই হোক আর অপরিস্ফুট ভাবেই হোক, আমাদের মনের মধ্যে অন্তরনিহিত আছে এবং সে নক্সার সঙ্গে যে-সমাজের যত বেশি সৌসাদৃশ্য আছে সেই সমাজ তত বেশি সভ্য।

আমি পুর্ব্বেই দেখিয়েছি যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করলেই সভ্যতা লাভ হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মনুষ্যত্বের বিকাশ যথোপযুক্তরূপে হয় নি বলেই বেঞ্জামিন কিড আক্ষেপ করে বলেছেন—"Civilization has not yet arrived, for that of the West is as yet scarcely more than glorified savagery." সভ্যতার সম্বন্ধও বাহ্যিক সম্পদের প্রতাপের সঙ্গে নয়, মানসিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে; দাসত্বের সঙ্গে নয়, সাম্যের সঙ্গে; বিজ্ঞানের সঙ্গে নয়, জ্ঞানের সঙ্গে। যেখানে মানুষের মন ফুলের মত ফুটে উঠেছে, যেখানে তার আত্মা পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে উঠে যাচ্চে, যেখানে দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতা সমাজকে তাদের স্বর্ণ শৃঙ্খলে ক্রমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তর ভাবে বাঁধছে, সেখানেই প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ হচ্চে। এ সব কথা মামুলি হলেও সত্য।

(১২)

দাসত্ব—সভ্যতার ভিত্তি নয়, ভিত্তি অসভ্যতার। মানুষ আর যে-কোন কাজের জন্য সৃষ্ট হোক, গোলাম হবার জন্য সৃষ্ট হয় নি। সুতরাং যে-সমাজে দাসত্ব আছে, তার সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ আছে। দাসত্বের দ্বারা প্রকৃত সভ্যতা কোনও সমাজে গঠিত হয় নি,

দাসত্ব সত্বেও গঠিত হয়েছে। কলিকাতা, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় নগরে অসংখ্য বারবনিতার সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। এমন বড় সহর নাই যেখানে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাদের জাল বিছিয়ে না বসে আছে। সমাজের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ চিরন্তন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে, উক্ত নগরগুলিতে যা কিছু সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়, তা বেশ্যা-প্রথার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে? ডাক্তার ফারেল দাসত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও কতকটা এই শ্রেণীরই যুক্তি।

(১৩)

সভ্যতা সমাজেই সম্ভবপর। সামাজিক-জীবন রক্ষার জন্য যে সব অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সবের সংস্থান যে-সমাজে নেই তার সভ্যতাকে lopsided (একরোখা) বলতে হবে। যে সব জিনিসকে সমাজ মূল্যবান মনে করে তাদের রক্ষার ক্ষমতা যদি সমাজের না থাকে, তাহলে আমরা সে সমাজের সভ্যতাকে পূর্ণাবয়ব বলতে পারি নে। এই সামাজিক আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞান একটি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির শক্তিসমূহকে আমরা নিজের বশে আনতে পারি এবং তাদের সাহায্যে সমাজের মঙ্গল সাধন এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি। এই হিসেবে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয়। আমার মনে হয় এই সামাজিক সত্যটি ডাঃ ফারেলপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁরা জীবনের অন্য সব সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে পড়েছেন। জীবনের মঙ্গল দর্শনে তাঁরা এমন মেতে গেছেন যে

এ ছাড়া যে জীবনের আর কিছু আছে, তা তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, জীবন কেবল একটা মল্ল-যুদ্ধ নয়, এটা আত্মার একটা অনন্তকালব্যাপী উন্নতির চেষ্টাও বটে। তাঁরা আত্মার এই মর্ম্মাস্তিক মন্ত্র ভুলে গেছেন—"আজ বাহায়েম বাহরা দারম, আজ মালায়েক হাম, আজ বাহায়েম বোগজর তা আজ মালায়েক বুগজরি"। অর্থাৎ—আমাদের মধ্যে পশুও আছে আর ফেরিস্তাও (angel) আছে। পশুত্ব ছেড়ে উঠ, তাহলে ফেরিস্তাদেরও ছেড়ে উঠবে।

ওয়াজিদ আলি।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

——:#:——

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

সে যে কত বৎসর আগে, আজ আমার তা মনে নেই, মনে আমি করতেও চাই নে। এক সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে, ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে বনপথে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হয়। তখন মাঘ মাস, আমি আমাদের দেশের বাড়ীতে ছিলাম। সেদিন ভোরে গাঁয়ের একজন লোক এসে আমায় খবর দিলে, গাঁয়ের সীমানায় আগের রাতে, তার একটা মস্ত মোষ বাঘে মেরে রেখে গিয়েছে। স্থানটি পরীক্ষা করে জানা গেল উভয় পক্ষের যুদ্ধের কোন চিহ্ন নেই। বাঘটি খুব সম্ভবত লুকিয়ে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করে ছিল, ঘাড়ে এসে পড়ে বেচারীকে প্রাণে মেরেছে। মহিষ-মাংস অল্পই সে আহার করেছিল এবং পাশের চষা-ক্ষেতে যে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তাহতে স্পষ্টই জানা গেল—তিনি একটি অসুরবিশেষ। তখন আমার বয়স একেবারেই কাঁচা, তা ছাড়া শীকারীদের উপর, উপরওয়ালাদের কড়া হুকুম যে, আমাকে বাঘ ভালুক শীকারের কোন উৎসাহ না দেয় কিম্বা সাহায্য না করে। সেই জন্যে শীকারীদের সঙ্গে নিয়ে বন পিটিয়ে বাঘটিকে যে ঘেরাও করব, তার কোন আশাই ছিল না। কাছেই একটা গাছে মাচান বাঁধা হল—

আসনটি নিরাপদ হলেও নিঃশব্দ ছিল না, একটু নড়া চড়াতেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ করে উঠত। সূর্য্যাস্তের বহুপূর্ব্ব হতেই আমি গিয়ে আসন নিলাম, সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি না ছিলেন শীকারী, না জানতেন তার কায়দা কানুন। অল্প কালের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে স্নাইপ আর হাঁস আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ক্রমে বন-প্রান্তর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে এল, শুধু রাত্রিচর পাখীর ডাকে মাঝে মাঝে সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্যে ভঙ্গ হচ্ছিল মাত্র। আকাশে প্রায় পূর্ণ-চন্দ্র, রাত্রিখানি যেন মাজা ফটিক। দুটি একটি বেজি টুক্‌টুক্ করে আসতে লাগল, ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে, মৃত মহিষের কাছে অগ্রসর হবার আগে, গলা বাড়িয়ে চারিদিক বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলে, কিন্তু সেখানে অধিকক্ষণ রইল না। এর পরে দু'একটি শিয়াল দেখা দিলে, আর দলের মধ্যে যার ক্ষুধা কিম্বা লোভ একটু বেশি তিনি আহার সুরু করে দিলেন। আমরা উপর হতে ছোট্ট একটি শুক্‌নো ডাল ছুঁড়ে দিতেই, চম্‌কে উঠে দেদৌড়। অনেকক্ষণ ধরে বলবার মত কোন ঘটনাই ঘটল না। রাত ৯টার পর নদীর ধারে কুকুর ডাকতে আরম্ভ করল, ক্রমে বস্তির কুকুরেরাও তার সঙ্গে যোগ দিলে। এ ডাকাডাকিও অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল, আর কোন নড়াচড়াও কোন দিকে রইল না, কেবল কাছাকাছি একটা শিমুল গাছ হতে কতক-গুলো শকুন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, হাত বিশেক তফাতে বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় জানোয়ারের নিশ্বাসের গভীর শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। বন্ধু আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে, বাঁয়ে যে দিকে দেখালেন বহু চেষ্টাতেও সে দিকে আমার চোখে কিছু

পড়ল না। একটি প্রকাণ্ড বাঘ ঠিক আমাদের মাচানের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল, বন্ধুর ধ্যাননিশ্চল দেহ আর তন্ময় দৃষ্টি হতেই বোঝা গেল তার সমস্ত মন বাঘটি আকর্ষণ করে নিয়েছে। দুএক নিমেষ সময় মাত্র, বাঘটি মাচানের নীচে হতে খোলা জমিতে বেরিয়ে ধীরে ধীরে মৃত মহিষের দিকে অগ্রসর হতে লাগল কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছিল সে এক অনন্ত যুগ।

সে এক চমৎকার দৃশ্য, সে যখন ধীরগম্ভীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল তখন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তার হলদের উপর কালো ডোরা-কাটা শরীর, এমন কি গলার কাছের দাড়াগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। নিঃশব্দে আমার বন্দুকটি আমি বাড়িয়ে ধরলাম (তখন আমার সেকেলে ধরণের ভারী বন্দুক ছিল), ঘাড়ের কাছটিতে নিশানা করে আওয়াজ করব আর কি, এমন সময় বন্ধু আমার কাপড় ধরে আর একটান দিলেন। সেই লক্ষ্মীছাড়া টানে, আমি তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম, প্রবীন ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে, তরুণ শীকারিটিকে 'উপদেশ' দিলেন, "আরে সবুর কর, যখন আহার সুরু করবে তখন মেরো"। হায় হায় আমার অদৃষ্ট! সবুরে মেওয়া ফললনা! যখন আবার ফিরলাম তখন আমার কামনার ধন অদৃশ্যপ্রায়। প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করে রইলাম, এই বুঝি ফিরবে কিন্তু "সে গেল ধীরে"—নাহি এল ফিরে! না আসবার কারণ হয়ত কিছু ঘটেছিল, মাচানটাতে কোন শব্দ হয়ত বা হয়েছিল, কিম্বা বন্ধুর চুপি চুপি কথা জোরে হয়ে গিয়েছিল (চুপি চুপি কথাও আমার কপালে জোরে হল!) যে অনিশ্চিত কারণই হোক, নিশ্চিত এই যে তাঁর দেখা আর পাওয়া গেল না। "মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে

বার বার, সে বাঘ এল না আর যে গেল ফিরে"। এক শিক্ষা আমার হল, সুযোগ ছেড়ে, আরো ভালো সুযোগের জন্য আর কখনো মুহূর্ত্ত-মাত্র অপেক্ষা করা নয়। আমার দুঃখের বাড়া দুঃখ এই যে, যা করতে পারতাম তা করি নি, আর সেই কথা ভুলতেও পারি নি।

এখন আমি তোমাদের আমার প্রথম ব্যাঘ্র লাভের গল্পটি বলব। এ লাভ এক অপূর্ব্ব আনন্দ, সে আনন্দের সহানুভূতি শুধু শুনে হয়না, নিজের অভিজ্ঞতা থাকলে তবে ঠিক বোঝা যায়। এই ব্যাপারের রঙ্গভূমি ছিল মধ্য-প্রদেশে—রেলওয়ে ষ্টেশন হতে বহুদূরে আমাকে যেতে হয়েছিল। কতকটা পথ গাড়িতে, তার পর টাটু ঘোড়ায়, সব শেষ হাতীতে চড়ে গিয়েছিলাম। এই ভাবে একটি সন্ধ্যা আর সারাটি রাত কাটল। পথে কোথাও থামতে না পারায়, এ যাত্রা বড়ই শ্রান্তিজনক হয়েছিল, যে রমনীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, জ্যোৎস্নালোকে সে পথ আরো সুন্দর হয়েছিল। আমার হাতীকে দেখে একটি রাত্রিচর পাখী ডাকতে সুরু করল, তার তীব্রস্বর সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিল, যতক্ষণ আমার হাতী ঘন তরুসমাচ্ছন্ন উপত্যকার গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে না গেল, ততক্ষণ আর সে সুর থামল না। যখন আমি আমার তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছিলাম—তখন পূর্ব্বের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি আর বিলম্ব না করে, শ্রান্ত শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল বলতে পারি নে কিন্তু মনে হল যেন, আমি যাঁর অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম, তিনি আমায় বড় বেশি শীগ্‌গির এসে জাগিয়ে দিলেন। শীকারীরা শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছে, যদি বাঘটিকে হস্তগত করতে চাই, তাহলে অবিলম্বে যাত্রা করা

আবশ্যক। বেলা দশটার সময় আবার আমরা গো-যানে যাত্রা করলাম—চৈত্র মাসের রৌদ্র মাথার উপর করে, পাহাড় পর্ব্বত ভেঙে, নদী নালা পার হয়ে, অগ্রসর হতে লাগলাম। শ্রান্ত বলদগুলি বদল করতে যে টুকু থামা আবশ্যক, তার বেশি আর কোথাও বিশ্রাম করা হয় না। শ্রান্তিকর দীর্ঘতম দিনেরও শেষ হয়, রাতটি ভালই কেটেছিল। আমাদের সঙ্গে প্রায়, ১০।১২টি বলদ ছিল, তার অধিকাংশই জরাজীর্ণ, বাঘকে লোভ দেখিয়ে আনবার উদ্দেশে এগুলিকে আনা হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশের হিন্দুর মত, মারহাট্টারা বাঘের উদর পূরণের জন্যে গরু বেঁধে দিতে আপত্তি করে না। সে যাই হোক এ গড্ডলিকা প্রবাহ অগ্রসর হয়েই চলল, আবার যখন কোন পাথরের উপর উঠে কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে নেমে, আবার উঠে চললে তখন আমাদের এম্নি ঝাঁকানি আর ধাক্কা খাওয়ালে যে, তার স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল যাবৎ আমাদের বুকের পাঁজরে দেহের হাড়েহাড়ে সজাগ রয়ে ছিল। রাত দুই প্রহরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, জেগে দেখি গাড়ী নালায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আর আমি খদে গড়িয়ে চলেছি!

গাড়ীর বলদগুলো প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিয়েছিল, কারণ গাড়ীর পিছনে যে সব বুড়ো বলদ বাঁধা ছিল, তারি একটার উপরে বাঘ এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল—অনেকক্ষণ হতেই খুব সম্ভবত এ পিছু নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। জেগে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, যমপুরীর রৌরব তার কাছে কোথায় লাগে! চীৎকার, বিলাপ, ক্রন্দন, হায় হায়, আক্রোশ, আক্ষেপ, এবং কপালে করাঘাত। আমার নাক দিয়ে কিঞ্চিৎ রক্তপাত ছাড়া আর বড় বেশি কিছু ক্ষতি

হয় নি। আবার সকলের যাত্রা করবার মত সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতে কিছুক্ষণ সময় গেল, সূর্য্যোদয়ের অল্প পরেই আমরা তাঁবুতে পৌঁছিলাম। পথে আর কোন বাধা বিঘ্ন হয় নি। কিছুক্ষণ পরেই সুসংবাদ কর্ণ-গোচর হল,—"গারা হোগিয়া"—অর্থাৎ বাঘে শীকার ঘায়েল করে গিয়েছে, আমাদের তাঁবু হতে বেশি দূরে নয়—কাছেই। প্রাতরাশের পূর্ব্বে কিম্বা পরে, মৃগয়াযাত্রা হবে সেই বিষয়ে তর্ক উঠল। মীমাংসা হল যে, পূর্ব্বে যাত্রাই সমীচীন। মহারাষ্ট্রীয় খাদ্য সম্বন্ধে যাঁদের রসনার অশিক্ষিত পটুত্ব নেই—তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও"।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল, আমরা মৃগয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। বন্দুকধারী শীকারী সবেমাত্র দুজন, আমি আর আমার বন্ধু। এছাড়া বন্ধুর অনুচরবর্গ, নানা যুগের নানা আকারের বন্দুক ঘাড়ে করে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকজন গাছে উঠে বসেছিল—বাঘ যদি পালাবার চেষ্টা করে তাহলে যে কোন উপায়ে তাকে পথে আনাই তাদের কাজ। এগিয়ে যে, জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম, তার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেখানে দাঁড়িয়েই চারিদিকে দৃষ্টি চলে। মাচানে উঠব না স্থির করেই, এই স্থান আমি মনোনীত করে ছিলাম। আমার গায়ের কাছে, উত্তর দক্ষিণে, গুল্ম-সমাচ্ছন্ন তৃণ-বিরল সঙ্কীর্ণ পথ। শীকার যেদিক হতে আসবে, সেদিকে ১০০ হাত পর্য্যন্ত আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। যদি বাঘটি আমার দিকে আসত, তাহলে সেই পথে যে ঘন সবুজ চারা গাছের সারি ছিল, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে সহজেই আসতে পারত। অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারীদের সোরগোল বেশ

শোনা গেল। একটা দাঁড়কাক, পাশের একটা পলাশ গাছের উপর উড়ে এসে জুড়ে বসে, মুখ ফিরিয়ে গাছের নীচে কি দেখে কে জানে, কেবলি গাল পাড়তে লাগল। দেখতে পেলাম, একটা গাছের পাশ-হতে নুয়ে-পড়া ডালের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে নিঃশব্দে একটি বাঘ আসছে। তখনও সে অনেক দূরে, দেখে বুঝলাম বাঘ নয় বাঘিনী, ঘাড় নীচু করে এগিয়ে আসছিল বলে সহজেই আমি তার ঘাড় লক্ষ্য করে আওয়াজ করলাম। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগল। আমি দুটো গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে আবার আমার দোনলা বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটা ছুড়লাম। যত দূর সম্ভব সে সবুজ গাছের সারির ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে এসেছিল, আমার বাঁয়ে পৌছবামাত্র আমি গুলি করি। আবার সে পড়ে গেল, আর একবার উঠবার চেষ্টা করে পারল না। তখন মাটীতে শুয়ে পড়ে গর্জ্জাতে লাগলে। আমি গাছের আড়ালে চুপি চুপি যতখানি পর্য্যন্ত এগোন নিরাপদ মনে হল, ততখানি পর্য্যন্ত গিয়ে, দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে শেষ সংঘাতিক গুলিটি মারলাম। সামান্য কি এক আওয়াজে সে আমার উপস্থিতি জানতে পেরে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত করে, আবার হুঙ্কার দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরে আর শক্তি ছিল না বলে পারলে না, পরমুহূর্ত্তেই আমি তাকে আত্মবশে আনলাম। সেই বিজয়-গৌরবে আমার সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হয়েছিল, আজও তার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নি। যখনি সেদিনের কথা মনে করি, আমার শরীর-মনে সেই তীব্র আনন্দ তেম্‌নি করে আবার জেগে ওঠে।

একটা কথা বলে আজকার চিঠি শেষ করব। আমি যে স্থানটি মনোনীত করে, বাঘের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেই পথে আসা ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিল না—কেন না "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যান,

বাঘের কথা আমার এখনও শেষ হয় নি, আর যতদিনে জরা-গ্রস্ত হয়ে, অকর্ম্মণ্য হয়ে না পড়ি, ততদিনে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজের অবসরে সেই সব শীকারের ব্যাপার আমি মনের মধ্যে, আবার অভিনয় করবার সুযোগ পাই, আর তখনি তোমাদের জন্যে সেগুলি লিখে সঞ্চিত করে রাখি। যাই হোক দেখি, এসব পুরানো কথা, তোমাদের কাছে কখনই পুরানো হয় না। আমি তোমাদের কাছে শীকার-সামন্ত সমীর খাঁর কথা বলেছি। এক সময় পুলিশ পাহারাওয়ালার কাজ তাকে করতে হত। সৌভাগ্যবশত, একদিন সে একজন মস্ত কর্ম্মচারীর সুনজরে পড়ে যায়—তিনি তাকে একখানি ছোট খাট জায়গীর দান করেন। এই সংস্থান হবার পর সে শীকার ব্যবসায়ে তার শরীর-মনের সব অধ্যবসায় নিয়োগ করে'

ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক করে তুলে ছিল। তার মত আর কাউকে অমন ব্যাঘ্র মহিষের খবর আনতে ও তাদের খুঁজে বার করতে দেখি নি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯০২ সালে, তখন সে দাঁত-পড়া বুড়ো, তবে শরীরে তখনও শক্তি ছিল, এতখানি বয়সেও শীকারের আগ্রহ তার যায় নি, রাত ৪টের সময় প্রতিদিন সে আমার তাঁবুতে আসত, দুয়ারে দাঁড়িয়ে একটুখানি আস্তে কাশলেই আমার সজাগ ঘুম ভেঙ্গে যেত। তারপর আমি, সমীর আর সমীরের চিরসঙ্গী একজন গোঁড়, এই তিন জনে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়তাম। বনের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাঘ ভুলিয়ে আনবার জন্যে যে সব গরু বেঁধে রাখা হত, রাতের মধ্যে তাদের কার কি অবস্থা হল তাই আবিষ্কার করাই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। রাত আর দিনের এই সন্ধিক্ষণেই বাঘ ভালুক সম্বর প্রভৃতি জন্তু রাত্রি ভ্রমণ শেষ করে' আপন আপন গুহা গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করে। সমীর খাঁর মত চতুর পথ প্রদর্শক সঙ্গে না থাকলে, একেবারে তাদের মুখে গিয়ে পড়া, কিছুই বিচিত্র নয়।

ঘাসবনে হরিণের স্বচ্ছন্দ পদধ্বনি, ভালুকের ধীর মন্থর পদ-ক্ষেপের প্রভেদ অনায়াসেই বোঝা যায়, আর বাঘের পদশব্দের সঙ্গে এদের ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই! এক বিড়াল ছাড়া আর কোন জন্তু বাঘের মত অমন মৃদু ধীর নিঃশব্দ পা ফেলে আসতেই পারে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ক্রমেই পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছিলাম, সমীর খাঁ তখন চুপি চুপি দুএকটি কথা কিম্বা সঙ্কেতে আমায় সতর্ক করে দিচ্ছিল। কিন্তু যখন বন-রাজ্যের সামান্য প্রজা, যথা মার্জ্জার, জম্বুক, সে পথে দেখা দিচ্ছিল তখন আর সমীর

খাঁ কিছুমাত্র সম্ভ্রম দেখায় নি, আর তাদের সম্বন্ধে এমন সব ভাষা প্রয়োগ করছিল যা তোমাদের না শোনাই ভাল। যে পথে বাঘ ভালুক সচরাচর আসা যাওয়া করে, সে পথ এড়িয়ে, বেশি দূর নিরাপদ স্থান হতেই, আমাদের বাঁধা গরুগুলির সন্ধান নিয়েছিলাম। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে অনেক সময়ই কিছু দেখা যেত না, বিশেষ যখন গরুগুলি শুয়ে থাকত কিম্বা যদি বাঘ তাদের মেরে ফেলে রেখে যেত। বিশেষ কাছে যাবার আগে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হতে, গাছের ডালে চড়ে লুকিয়ে বসে, কিম্বা কোন প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে, পাখী কিম্বা জন্তু কোথায় কে কি শব্দ করছে, তাও ভাল করে লক্ষ্য করে, তবে কাছে এগোন হত। আগের দিন কতকগুলি স্ত্রীলোক জঙ্গলে মহুয়া কুড়োতে এসে, পাহাড়ে নদীর ধারে একটি বাঘ দেখতে পেয়ে, তাঁবুতে আমাদের কাছে এসে খবর দিয়ে গিয়ে ছিল। তখন বেলা পড়ে এসেছে, চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি আমরা বনের চারিদিকে ব্যাঘ্ররাজের নজর স্বরূপে গুটিকত গরু বেঁধে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি যে তিনি গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণও অবিলম্বে পাওয়া গেল। পাশেই একটি নালা ছিল, আর সেখানে নামবার পথটি একেবারে খাড়া। কিন্তু এ অসুবিধা এড়াবার জন্যে গরুটিকে টেনে সে নালার কতক দূর নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নালার ধারে ধারে নেমে গিয়ে বাঘটিকে তখনই শীকার করে ফেলবার পরামর্শ সমীর খাঁ আমায় দিয়েছিল, আমারো যে সে প্রলোভন হয় নি তা বলতে পারি নে, তবে সেটা আমি সম্বরণ করেছিলাম। আমি যাঁর অতিথি, তাঁর অজানিতে এ কাজ করা ঠিক হত না। নালার ধারে ধারে লুকিয়ে বসবার মত,

শুটিকত জায়গা ছিল, কোন কোন শীকারী তখনি সেই সেই খানে উঁকি দিয়ে বাঘ কোথায় আছে তার সন্ধান নিতে চেয়েছিল কিন্তু দরকার হল না। পাশেই গজ পঞ্চাশ' দূরে, মহুয়া গাছে বসে একটা ময়ূর সে সংবাদ আমাদের জানিয়ে দিলে—পতিব্রতা ময়ূরীরাও চারিদিক হতে তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল 'ঠিক্ ঠিক্'। আমরা আর কিছু গোলযোগ না করে, মহানন্দে বাঘের শুভাগমনের সংবাদ নিয়ে তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথম বারে বাঘ আমাদের ফাঁদে পড়ে নি, পাহারাওয়ালাদের মাঝ দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে পালিয়ে ছিল। হঠাৎ চারিদিকে তাদের আনাগোণার শব্দ যে কেন থেমে গেল, আমরা সে কথা বুঝতে পারি নি, সমীর খাঁ ফিরে এসে তাড়াতাড়ি আমাদের ঠাঁই বদল করিয়ে দিলে। কাছেই জঙ্গলের ঘাস পোড়ান ছাই-এর উপর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গিয়েছিল। আমাকে নালার ওপারে গাছের নীচে জায়গা দিলে। বাঘ যে-পথে আসবে সে-পথের ঘাস উঁচুতে ছিল প্রায় তিন ফুট,—একটি গলিপথ নালার ধার পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ প্রায় বিশ হাত সোজা নালার মধ্যে নেমে তার পাশের পাহাড় মুখো উঠে গিয়েছিল। আমাদের শীকার-কর্ত্তা মাচানের উপর আসন করেছিলেন, তাঁর আপনার শীকারীর মতে সেইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান। এই শীকারিটিকে দেখলে, নিতান্ত হতচ্ছাড়া বদমায়েস ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু সমীর খাঁ শীকারতত্ত্ব জানত ভাল। এবারে বাঘটিকে নিঃশব্দে ঘেরাও করা হবে তারি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, দামামা কাড়া বাজবে না, শীকারীরা চুপচাপ আসবে, কেবল 'এগিয়ে আসছে' এই খবরটা জানাবার জন্যে মাঝে মাঝে শুধু গাছ কিম্বা পাথরের গায়ে কুড়লের

ঘা দেবে। আমি আমার দু'জন শীকারীর সঙ্গে আগে হতে ঠিক করে ছিলাম, তারা গাছ হতে ইসারা করে বাঘের গতিবিধি আমায় জানাবে। একজন শীকারী পাগড়ী নাড়াল দেখে বুঝতে পারলাম, বাঘ সোজা আমার দিকেই আসছে। দুএক মুহূর্ত্ত পরে প্রকাণ্ড জন্তুটিকে ঘাসের মধ্যে দিয়ে গজ সত্তর দূরে আমার দিকে আসতে দেখতে পেলাম। ঘাসের সেই সামান্য আড়ালের সমান হয়েই সে পিঠ নীচু করে এগিয়ে আসছিল। সমুখে পিছনে পাশে ১৫ গজ পরিমাণ জমিতে ঘাস দুলে দুলে, নদীতে নৌকা চলে যাবার পর, ঢেউ-খেলান যেমন একটি পথের চিহ্ন পড়ে, ঠিক তেমি দেখাতে লাগল। মাথা নীচু করে আসছিল তাই মাথার আড়ালে বুক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মাথায় গুলি মারবার পক্ষপাতী আমি নই। বাঘের মস্তিষ্কাংশ থাকে মাথার পিছন দিকে, তাই গুলি অনেক সময় তত দূর অবধি, সহজে পৌঁছয় না। ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ত্রিশ হতে কুড়ি, কুড়ি হতে দশ গজ' কাছে এল, তবুও যে ভাবে আসছিল তার কোন বদল হল না। আমরা দু'জনেই শীকার এবং শীকারী সমান উঁচুতে ছিলাম, মাঝের ব্যবধান শুধু সেই সঙ্কীর্ণ নালা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘাসের মধ্য হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে নালায় নামতে আরম্ভ না করলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আমার নিঃশ্বাস আর গুলি দুই রোধ করে রেখেছিলাম। তার স্কন্ধ আর মস্তকের সন্ধি স্থলে একটি গুলি খেয়ে সে চমকে লাফিয়ে উঠে নালার মধ্যে পড়ে গেল। কুকুর যেমন পিছনের পায়ে ভর করে, সমুখের পা বিছিয়ে, তারি উপর মুখ রেখে বসে, সেও ঠিক তেম্‌নি ভাবে পড়ে মাথাটা একবার এদিক, একবার ওদিক নাড়াচ্ছিল, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাত-গ্রস্থ রোগীর মত একেবারে নিশ্চল হয়ে.গিয়েছিল। ঘাড়ের পিছনে আর

এক গুলি খাবার পর মাথা নাড়াও বন্ধ' হয়ে গেল, মনে হল সম্মুখের ডানদিকের থাবার উপর মাথা রেখে সে অঘোরে ঘুমচ্ছে। গৃহস্বামীর শীকারী, তার প্রভু বাঘ পেলেন না দেখে ভারী চটে গেল। সে আর সমীর খাঁ পরস্পরের প্রতি নানা রূপ সাধুভাষা প্রয়োগ করতে লাগল, এর মধ্যে তার মনিব আবার একটা অবিবেচনার কথা বলে ফেলাতে ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। রাজার শীকারী বিদ্রূপ করে বললে, সমীর খাঁ আমায় সব চেয়ে ভাল জায়গাটি দিয়েছিল। সমীর তাকে বললে, "তুই একটা কুলি, তা না হলে বুঝতে পারতিস যে, বাঘকে বলদের মত ল্যাজে মোড়া দিয়ে চালান যায় না"। পরের দিন সমীর খাঁ তাদের উপর শোধ তুললে, আমার কপালে আর একটি বাঘ জুটে গেল। যে নালাতে আগের দিন বাঘটি তার শীকার-করা গরু টেনে নিয়ে গিয়ে ছিল, ঠিক তারি পাশাপাশি সোজা লাইনে নদীর একটি শুক্‌না খাল ছিল, সেই পথ ছাড়া বাঘের আর অন্য রাস্তা ছিল না। আগের দিন আমার অদৃষ্টে ব্যাঘ্র জুটেছিল বলে রাজা এসে নালার মুখে, যে দিক ছাড়া বাঘের আসবার ভিন্ন পথ ছিল না, সেই স্থানটি আগেভাগে দখল করে বস্‌লেন, এতে অন্যায় কিছু ছিল না, ঠিকই করে ছিলেন, তবে করবার ধরণটি ভদ্রোচিত হয় নি। তাঁর এই বে-শীকারী ব্যবহার সমীর খাঁর আদপেই পছন্দ হয় নি। যদিও বাক্যে বা ইঙ্গিতে, তখন কিম্বা পরে, সে তার মনোভাবের কোন আভাস কখনো দেয় নি। একটা জায়গায় সেই নালা হতে আর একটি নালা বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্কীর্ণ পথ সমীর খাঁর শ্যানদৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ঠিক সেই খানটিতে সে একজন শীকারীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিল, এই ব্যক্তি বাঘের পথরোধ করে, তাড়া দিয়ে তাকে

আমার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, এই ছিল তার মতলব, ঘাসের মধ্য দিয়ে ব্যাঘ্রটী অগ্রসর হচ্ছিল, তার ব্যঢ়োরস্ক ঘাসের জঙ্গল ছাড়িয়ে ঘাসের উপরে উঠেছিল। খোলা মাঠের সীমানায় এসে একবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঠিক আমার সম্মুখটিতে, পিছনে তার বনভূমির বিচিত্র শ্যাম যবনিকা, চিত্রপটে আঁকা, মুর্ত্তিমান মহিমার মত সে ছবি গম্ভীর ও সুন্দর। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল নিবিষ্ট, মনে হ'ল যেন অনাবৃত প্রান্তরে পদার্পণ করবার আগে, শব্দ অনুসরণ করে আপন গন্তব্য পথ ।স্থর করে নিচ্ছে। তার বিস্তৃত শুভ্র কবাট বক্ষ, আমার সম্মুখেই প্রসারিত, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বন্দুকের আওয়াজ হ'বামাত্র সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গিয়ে, পরের মুহূর্ত্তেই আবার পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াল, সম্মুখের পা দিয়ে আঁচড়ে যেন আকাশ চিরে ফেলবে! রাগে অধীর হয়ে আপন বুকে কামড় দিতে লাগ্‌ল, এইবার তাকে আগের চেয়ে আরো ভয়ানক অধিকতর বিস্ময়জনক মনে হয়েছিল। ডাইনে আর বাঁয়ে অনবরত স্নাইপ মারতে হলে যত শীগ্‌গির গুলি চালাতে হয়, ততটুকু সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় গুলি খেয়ে সে মৃত্যুশয্যায় ধরাশায়ী হ'ল। সন্ধ্যার সময় আমি যখন তাঁবুর বাহিরে বসে ছিলাম সমীর খাঁ

"Whispered there in the cool night air
What he dared not day by day light."

কথাটি হচ্ছে—ভারি কৌশলে বাঘ আমার পথে এসেছিল, রংজার শীকারীকে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়" শেখাবার জন্ম সে এ কাজ করে ছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯

হাওদা-শীকার।

"হাতীপর হাওদা"—আবার তার উপর নিজে রাজার মত বসে শীকার করতে খুব আরাম। হিমালয়ের তরাই, আসাম আর শ্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর, হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শীকার, এমন কি তিতির প্রভৃতি ছোট শীকার করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল যেন লম্বা ঘাস আর শরের গভীর সমুদ্র; এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আর এম্নি ঘন যে, সম্মুখে যে সব প্রকাণ্ড হাতি, শীকার সন্ধানে আরোহীকে নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আড়াল করে ফেলে। প্রতি পদেই গতিরোধ হয়, আর হাতীর পায়ের চাপে যে সব ঘাস ভেঙে পড়ে, সে এম্নি মজবুত যে ভাঙবার আওয়াজটা পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে প্রথম যেদিন আমি শীকার সন্ধানে গিয়ে ছিলাম, সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে—এ যেন বিচালীর গাদায়—হারাণ সূচ খুঁজতে যাওয়া, তবে মস্ত এই প্রভেদ যে একে যে খুঁজতে যায়, তার নিরাশ হতে হয় না—যার আশায় "ঢুঁড়ত ফিরি" তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতির উপর দোল খেতে খেতে তাক্ ঠিক্ রাখা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে, আর তা ছাড়া ঢেউ এর মত দোলায়মান ঘন ঘাসের মধ্যে কোন জানোয়ার চলে বেড়াচ্ছে, সে কথা ভাল করে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। হাওদা-শীকার ব্যয় সাধ্য—খুব কম লোকেরি এ রকম হাতি রাখবার সামর্থ্য হয়—আর যে দু চার জন রাখেন তাঁরাও এ সব হাতীকে

রীতিমত শিক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করেন না, এ ব্যাপারে গুটিকত রীতিমত শিক্ষিত হাতি নিতান্তই দরকার, আর এ রকম একটি হাতি পাওয়া সহজ নয়, যদি পাওয়াই যায় তাহলে তার দাম দিতে যে সোনার খনি উজাড় করে ফেলতে হয়, তাই বা ক'জনে পারে? হাওদা শীকারে কৃতকার্য্য হতে হলে, এই রকম হাতি অন্তত ২৪, ২৫টি নইলে চলে না—কাজেই বুঝেছ, আলাদিনের অপূর্ব্ব প্রদীপ যার নাই, তার ভাগ্যে এ শীকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্য আর প্রদেশের চেয়ে শীকার ব্যাপারে বেশি উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শীকার তাঁরা গৌরবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বল্লেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহার বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। কলপ-দেওয়া কড়া কামিজ 'কলার' ধারণ, তাঁরা মুনি ঋষির কৃচ্ছ্র সাধনের মতই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য, সনাতন স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অপেক্ষা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয়, এক সময়ে কেবল মাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল, এখন সে সকল সেবন তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে করে নিয়েছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন। নিঃশব্দসঞ্চার মখমল মোড়া হাওয়া-গাড়ী ব্যতীত চলা-ফেরা করতে তাদের মন ওঠে না। এই গুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যাত্মিক পরিমাপ—দৈহিক মাপটি তাদের ইংরাজ দর্জ্জির কাছে পাওয়া সহজ। এঁদের তরঙ্গায়িত বরবপু গুলি কোট প্যাণ্টে সাম্য করে রাখা

তাদেরই কর্ত্তব্য। কোথায় কখন কি ভাবে এ সৌন্দর্য্য ফেটে পড়বে, তার জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবার, দরবারে একজন রাজকীয় কর্ম্মচারী কোনো জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—" রাজা একটি সিগারেট খাবে কি "? আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি বলে উঠলেন,—"আমি শুধু হাভানা ব্যবহার করে থাকি—(হাভানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা দামী চুরুট)। আজ কালকার দিনে ম্যানিলা (Manilla) আর মিউরিয়ার (Muria) প্রভেদ বুঝতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার ও শালীনতার বিশিষ্ট পরিচয়; বিবিধ মদ্যের জাতি, গোত্র, গাঁই কুলজি, জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে সেত ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক অধিক গৌরবের পরিচয়। বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অতি অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এঁরা ছুরি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে পড়ে থাকায় তার শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বদা কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বর ও অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হীন-চরিত্র হয়ে পড়েছেন। মাঝে হতে রাজ-সুলভ মৃগয়া ব্যবসায়ের সমাদর চলে যাচ্ছে।

হাওদার উপর কোন কোন শীকারীর অভ্যাস আছে, অনেকগুলি করে গুলি-ভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান, তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। আমার মনে আছে যে, একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাস-বশত মারা যান। হাতি যখন উপরের দিকে উঠছিল, বন্দুক গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ হয়ে যায়, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যাস করলে

একটি বন্দুক রেখে আর একটি তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্ব্বদা ব্যবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে, তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায়, নতুন অজানা বন্দুকের কাছ থেকে তা হ'বার যো নেই। আর একটি কাজ কখনো করো না; সম্মুখে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে, জন্তুটিকে যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পাও, ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। হাওদা শীকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে—তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্ত্তি খেলে, যার যেমন নাম উঠবে, সেই ভাবে সাজান, কিম্বা শীকারের দলপতি আর সকলে যাঁর নিমন্ত্রিত অতিথি, তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন, সেই মত সাজান। এই সারি-বাঁধাটা ধনুকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শীকারের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধা-জনক। পতাকার সঙ্কেতে, এগোতে, পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিম্বা সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। দুএক জন শীকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শীকার জড় করিয়ে নিলে বেশি সুবিধা হবে। কোথায় কি ভাবে এ সব হাতি সারি বেঁধে দাঁড়াবে, সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায়, কিম্বা এই সব হাতির উপর এসে না পড়ে সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দু-ই কাজে লাগান দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে, বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে থাকার দরুণ অন্তত সেই সময়ের জন্য চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়, কেন না বাঘ যেম্নি এই হাওদাধারী হাতিটিকে দেখে, আর অম্নি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসে, সে বড় চমৎকার দৃশ্য, দেবতারা দেখলেও খুসি হয়ে যান। এস্থলে শুধু হাতিটি নির্ব্বিকার হলে চলে না—শীকারীর গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই, তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে ত শীকার মরে না, আর সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা করা চলে না, গুলি ছুঁড়তেই হয়, তা তোমার লক্ষ্য যেমনই হোকনা কেন, গুলি ফস্‌কে গেলেও এ সময় কাজ হয়। কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়, কারো ক্ষতি করবার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথায় খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও এই ঘন ঘাস জঙ্গলে, সে খবর জানতে দুএকদিন চলে যায়। যখন দেখা যায় মস্ত মস্ত শকুন, চক্র করে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, অথচ ঘাসের মধ্যে নামছে না, কিম্বা ভয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনি বোঝা যায় খুনী ব্যাঘ্রটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে। এই দস্যুটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে গরু ভেড়া বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি—এই উপায়ে একবার চমৎকার একটি বাঘিনাকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা শীকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া, হাতির মত সাহসী জন্তুও কাদায় পা বসে যাচ্ছে দেখলে, ভয়ে কাণ্ড-জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কালকের ঘটনার মত আমার স্পষ্ট মনে আছে। হাতির সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, তখন গারো পাহাড়ের চোরাবালির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে

লাগল, আমরা বন্য মহিষ আর জলাভূমির হরিণ-শীকারে বেরিয়ে ছিলাম, পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর, খুব সম্ভবত পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি, বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে পড়েছিল। যে জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা সযত্ন রক্ষিত শাদ্বলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরবালি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তখনি শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট স্থানে এসে পড়লাম—অনতি দূরে হাতচল্লিশ তফাতে শুক্‌নো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটি হাতি প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হতে লাগল—সবাই ভয়ে ডরে চীৎকার করতে করতে চলেছিল, যাদের পিঠে হাওদা ছিল সবচেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল তাদেরি। এই দলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটি হস্তিনী সব প্রথমে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছলে। এই বুদ্ধিমতী, বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ের উপর নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে, পা, রাখবার ঠাঁই করে নিতে লাগল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হতে গিয়ে রাজা—একটি হাতি হারালেন। সে পার-ঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল, বৃথায়; আস্তে আস্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাহুত শুধু প্রাণ হাতে করে, সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শীকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শীকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীতমনে সাহায্য করা। যদিই বা শীকার নিয়ে দুর্ভাগ্য-বশত, কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহলে শীকার-কর্ত্তা

এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল, তবু কলহ করে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনো উচিত নয়। একটুকুও মন ভারী না করে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি গ্রহণ করো। আর মনে করো সেইটিই তোমার পক্ষে সব চেয়ে বেশি সুবিধাজনক। স্বার্থপর অসন্তুষ্ট-চিত্ত লোকেরি "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে"। নির্ব্বোধ কিম্বা মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। গেল বৎসর আমারি চাক্ষুষ এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। খবর এল একটি প্রকাণ্ড বাঘ, বাথানের সবচেয়ে ভাল গরুটিকে মেরেছে, তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হয়ে শীকার শুদ্ধ এক শিমুল তলায় উঠেছে। আমরা সেদিন একটি আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শীকার কর্ত্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন—মারা পড়ে নি। সেই জন্যে সেদিন আমরা নতুন আগন্তুকেব খোঁজে আর গেলাম না, যদিও সহজেই এ কাজটি সেই দিনই উদ্ধার হতে পারত। আমাদের শাকার-কর্ত্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ সংস্কার বশতই হাতের কাজ শেষ করে, পরের দিনের অন্যটি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম-ঔষধ, নিদানকালের বিষবড়ি প্রয়োগ করবার ভার অন্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফললাভ করে আনন্দে তাঁবুতে ফিরে, পরের দিনের অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

গরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লিখবার মত প্রসঙ্গ নয়, বিশেষত তা হ'তে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গো-হত্যাকারীকে পাহাড়ে, মাঠে, খানা খন্দে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্য্যন্ত কোন কিনারা করতে পারলাম না, তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন-ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হতে তিনটি হাতি কম পড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল, আমাদের শীকার-নেতা এই সময়টি বৃথা অপব্যয় না করে, শীকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও পড়ে আসছিল, তাই আর একটিবার মাত্র খোঁজে বেরবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে, তারি তীরে, ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চারশ' আর প্রস্থে ১০০ কি ১৩০ গজ হবে। দুকোণায় জঙ্গলটি ফাঁক হয়ে এসেছে, গাছ পালা বড় একটা ছিল না। বাঘ যে পথে আসছিল, সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল, তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নতুন করে হাতির মুখ ঘুরিয়ে, বিপরীত পথে যাত্রা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম, ডানের দিকে খানিকটে খোলা ময়দান আর গো চারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিনটি হাওদায় তিন জন শীকারী ছিলেন, উভয় দিক হতেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে, উত্তম, উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম, তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হলে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০

গঞ্জ পর্য্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দুএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল, সে যেন ঠিক ন্যাড়ার মাথায় অর্ক ফলার মত, এদিকে ওদিকে খোঁচ খোঁচ শূয়োরের কুঁচির মত খাড়া খাড়া দুএকটি গাছ, সমস্ত মাঠটির অনুর্ব্বরতা, আরো যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধরে হাতির সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল, অল্প কালের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হতে লাগল, চারিদিকে উত্তেজনার আভাষ ততই দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হল। হাতীর হুঙ্কার, শুণ্ড আস্ফালন, প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হতেই বোঝা গেল যে বাঘ নির্দ্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতির সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। হাতিগুলি যেমন দৃঢ় ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হতে পলায়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ নড়ে উঠতেই, আমার সমস্ত শরীর যেন সতর্ক হয়ে উঠল, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। দুএক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য সুন্দর শার্দ্দূল রাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হল। তখন সে দূরে, অনেক দূরে, সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরো কাছে এগিয়ে আসবে, তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি, মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল—৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল, ব্যাঘ্র রাজ কোথায়? কোথায় অদৃশ্য হলেন? না অদৃশ্য হন নি। বিরল তৃণরাজির মধ্যহতে দেখতে পেলাম, তিনি ধরাশয্যা গ্রহণ করেছেন, বিশাল শরীর নিস্পন্দ, জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। মাহুতকে হুকুম দিলাম "বাড়াও" ডান চোখের উপর একটি সামান্য ক্ষত চিহ্ন, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক মিশ্রিত রক্তধারা বয়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাড়।

ক্রমশ—

"আনন্দ মঠ"।

——:০:——

'বন্দেমাতরং' গানটিই হচ্ছে "আনন্দ মঠ"-এর মূল কথা, এমন কি এ উপন্যাসের চেয়ে গানটির মূল্য অনেক বেশি এই মত নাকি স্বয়ং বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন, এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা সত্য কিনা জানিনে কিন্তু এর মধ্যে যে সমালোচনাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে, সেটা যে খুব সত্য সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। আনন্দমঠের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল"। কিন্তু আসলে তা প্রকৃত নয়। স্ত্রীলোক সকল সময়েই স্বামীর সহায় কিনা অথবা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য ভগবানের ইচ্ছাতেই স্থাপিত কিনা এ সব কথা বোঝাবার জন্য উপন্যাস লেখবার দরকার ছিল না। এ সব সত্য প্রমাণ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ বিস্তর অন্য উপায় ছিল। আশা করি এ কথা বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিম "আমন্দমঠে" কিছুই বোঝাতে চেষ্টা করেন নি, তাঁর মনে যে গভীর দেশভক্তি ছিল তাই তিনি আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করবার চেষ্টা পেয়েছেন।

বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের মধ্যে আনন্দমঠ যে অধিকাংশ পাঠকের

এত ভাল লাগে তার কারণ আনন্দমঠে মাতৃবন্দনার যে সুরটি বেজে উঠেছে, সকলের মনেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বস্তুত আনন্দমঠ আমাদের জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে—তাই বঙ্কিমের অন্য উপন্যাস আলোচনা করতে আমরা যদি বা সাহস পাই—আনন্দমঠের সমালোচনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অথচ এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, দেশকে ভক্তি করে যদি দেশের সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা না করি তবে তাতে দেশেরই ক্ষতি হবে।

(২)

আনন্দমঠ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে এ কথা সত্য, কিন্তু দেখতে হবে কোন্ গুণে আকর্ষণ করে। কেবল দেশের কথা আছে বলেই আমাদের ভাল লাগে, না দেশ-সেবার একটা মহৎ আদর্শ, দেশভক্তের একটা সর্ব্বত্যাগী বলিষ্ঠ স্বরূপ আর্টে ফুটে উঠেছে বলেই ভাল লাগে। দেশের কথা থাকলেই যাদের কাব্য বা উপন্যাস ভাল লাগে আমি তাঁদের দেশভক্তির প্রশংসা করি; কিন্তু অতি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে, এই সব শ্রদ্ধেয় লোক যদি সাহিত্য-আলোচনা ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিতেন তবে যে-দেশকে তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের অনেক মঙ্গল হত। খুব সম্ভব তাঁদের মতে কংগ্রেসের বক্তৃতার চেয়ে উঁচু সাহিত্য পৃথিবীতে দুর্লভ। ইতিহাস গড়তে সাহায্য করলেই অথবা দেশভক্তি থাকলেই যে উপন্যাস বা কাব্য আর্ট হিসাবে বড় হবে না এ কথা সকলেরই জানা উচিত। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইতিহাসে Uncle

Tom's Cabin-এর স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু তাই বলে আর্ট হিসাবে ও-বই বড় নয়। "La Marseillese" ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করেছে, কোন দেশের ইতিহাসে কোন গান তা করে নি। কিন্তু তাই বলে "La Marseillese" যে কবিতা বলে গণ্য হয় নি সে কথা সকলেই জানেন। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। "ভারত ভিক্ষা"তে ও "ভারত সঙ্গীতে" যতই দেশভক্তি থাক না কেন, আর্ট হিসাবে ও-দুই-ই অতি খেলো, একটি হচ্ছে বুড়ো স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক নাকে চোখে অশ্রু বর্ষণ—অন্যটি যাত্রাদলের বীরপুরুষের হুঙ্কার—উভয়ই হাস্যজনক। আর্টে ও সাহিত্যে শিল্পীর কেবল উদার ভাব বা মহৎ সংকল্প থাকলেই চলে না, তার উপযুক্ত প্রকাশ চাই। এই প্রকাশের সফলতার উপরই আর্টের সফলতা নির্ভর করে। সাহিত্যের সমালোচনা কালে এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ওজঃগুণ সাহিত্যের একমাত্র গুণ নয়, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। রান্নায় যেমন ঝাল, সাহিত্যে তেমনই ওজঃগুণ অক্ষমতা ঢাকবার উপায়। বিশেষত, বাঙলা সাহিত্যে সাধারণত আমরা যে ওজঃগুণে মুগ্ধ হই সে হচ্ছে বক্তৃতার ওজঃগুণ—চরিত্রের নয়।

(৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে বঙ্কিম আনন্দমঠ লিখেছিলেন, সে সময়টা ছিল আমাদের পক্ষে আশা ও উদ্দীপনার যুগ। তখন টাট্‌কা Byron-এর কবিতা পড়ে ও Burke-এর বক্তৃতা পড়ে

আমাদের পক্ষে কেবল সহজ নয়, অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। আমাদের তখনকার সাহিত্য এই অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। অথচ এই সব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তখনকার কাব্য-আলোচনা করলে এটা দেখা যায় যে, সকল উচ্ছ্বাসের চেয়ে বীরত্বের উচ্ছ্বাসটাই আমাদের সহজে আসত। আমাদের কবিরা উকীলই হউন বা হাকিমই থাকুন, যুদ্ধের প্রতি তাঁদের মনের একটু স্বাভাবিক টান ছিল। মাইকেল লিখলেন "মেঘনাদ বধ", হেমবাবু "বৃত্রসংহার", নবীনবাবু "পলাশীর যুদ্ধ"। বিদেশী কবিতা ও উপন্যাস পড়ে আমাদের মনে যে ভীষণ বীরত্বের উদ্রেক হয়েছিল, কাব্যে ও সাহিত্যে সেটা প্রকাশ না করে থাকবার উপায় ছিল না। এই Sentimentality-র যুগে আনন্দমঠের সৃষ্টি। বঙ্কিমের প্রতিভাও এই Sentimentality-কে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। আনন্দ-মঠের যা কিছু দোষ তার মূলে এই যুগের উল্লিখিত ভাবাতিশয্য। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে, কপালকুণ্ডলায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে—বঙ্কিমের লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ভঙ্গী, এই ভাবাতিশয্য তেমন করে প্রকাশ হ'তে দেয় নি। কিন্তু আনন্দমঠের আখ্যায়িকা আমাদের সাহিত্যে এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি মানুষের চরিত্র ও তার স্বাভাবিক পরিণতির ইতিহাস, কিন্তু আনন্দমঠে তিনি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করেছেন সে সকল সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনাপ্রসূত, এখানে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁকে এতটুকু সাহায্যও করে নি। আনন্দমঠ যে মহাবনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই মহাবনের মধ্যে প্রার্থনা দিয়ে যে গল্প আরম্ভ হ'ল, আমার মনে হয় সেটা মোটেই প্রক্ষিপ্ত

নয়, এর পিছনে এই সত্য আছে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে আনন্দ-মঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আনন্দমঠ স্বপ্নের মত সুন্দর হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের মত অশরীরি, অতএব আর্ট হিসাবে সার্থক নয়।

(৪)

আনন্দমঠ বঙ্কিমের হাতে কঠিন নির্ম্মম হওয়া উচিত ছিল—বঙ্কিমের হাতে এই জন্য বলছি যে, বঙ্কিমের প্রতিভাতে যে কেবল ব্রাহ্মণসুলভ শুচিতা ছিল তা নয়, ব্রাহ্মণসুলভ Austerity-ও ছিল। কিন্তু আনন্দমঠ Austere হয় নি। কুক্ষণে সত্যানন্দ প্রভু এত যত্ন করে "গীতগোবিন্দ" পড়েছিলেন। হয়ত যদি তেমনি যত্ন করে বেদ-ব্রাহ্মণ পড়তেন তাহ'লে আনন্দমঠ এতটা সৌখীন হ'ত না।

১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথা দিয়ে আনন্দমঠ আরম্ভ হ'ল। পদচিহ্ন গ্রামের যে বর্ণনা আমরা পেলুম তা ভয়ঙ্কর। প্রখর রোদ, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জ্জন, বড় বড় বাড়ীগুলোতে জনমানব নেই। এই জনহীন নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীতে মহেন্দ্র ও কল্যাণী। তারপর মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পদচিহ্ন পরিত্যাগ—ডাকাতের হাতে পড়া—সেই ডাকাতের "চেহারা অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ" তাদের "অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট অতি দীর্ঘ শুষ্ক হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি"। আসন্ন বিপ্লবের রুদ্র সুর এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় বেশ বেজে উঠেছে। কিন্তু এ সুর শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা হয় নি। আমরা ভেবেছিলুম দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করে, পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, বজ্রগর্জ্জনে তন্দ্রা ভাঙিয়ে—প্রলয়ের

দেবতা আসবেন। তাঁর অসির আভায় বিদ্যুৎ চমকাবে, তাঁর রথের চাকায় লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন-প্রাণ পিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ঝড় এল না, এল জ্যোৎস্না রাত্রি, এল গেরুয়া বসন, গান, হাসি, রসিকতা।

আনন্দমঠের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা দুর্ব্বলতা, একটা সহজ সফলতার ভাব দেখা যায়। তাতেই সত্যানন্দ হ'তে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত কারো মধ্যে তপশ্চর্য্যার প্রখর তেজ দেখি নে, কোথায় সেই দাঁতে দাঁতে চাপা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—কোথায় বার বার পরাজয়েও অটল ধৈর্য্য। সন্তানেরা সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু তপস্বী ছিলেন না। বস্তুত কঠোর তপস্যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তাহা কঠিন—তার ফলেরও কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই সে বিদ্রোহের সঙ্গে গান রসিকতার কোন সম্পর্ক থাকা স্বতই অসম্ভব বলে মনে হয়। বঙ্কিম সন্তান-বিদ্রোহের বিপক্ষ মুসলমান-রাজশক্তি বা ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যবল কাউকেও যথেষ্ট পরাক্রমশালী না করাতে, সন্তানদের প্রয়াসের মধ্যেও যথার্থ বিক্রম প্রকাশ পায় নি। প্রায় সকল যুদ্ধে অতি সহজেই মুসলমানেরা হেরেছে। সন্তানেরা কোন গ্রামে উপস্থিত হওয়ামাত্র মুসলমানেরা হিন্দু হয়েছে। সন্তানদের নেতারা কোন দিন মুসলমানের হাতে তেমন করে পড়েন নি, পড়লেও এমন কি জেলে বন্ধ থাকলেও, অতি সহজে সন্তানেরা তাঁদের উদ্ধার করেছে। যে অত্যাচার সন্তান-বিদ্রোহের কারণ এবং যে অরাজকতার উপর সন্তানব্রতের সার্থকতা নির্ভর করেছিল তার ছবি আমরা পাই নে। অথচ এটাই হচ্ছে এ বইয়ের background. ঘন কালো background-এর উপর রক্তের

মত লাল রং-এ অগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা উচিত ছিল ; কিন্তু আকাশের কালো রং ফিঁকে হওয়াতে আগুনের রং লাল না হয়ে সুখস্বপ্নের মত গোলাপী হয়েছে। বিপক্ষেরা দুর্ব্বল হওয়াতে সন্তানেরাও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সর্ব্বাঙ্গে রাম নাম ছাপ দিয়ে, কপালে তিলক কেটে অতিকায়কে যে কবি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে কেবল অতিকায়কে কাপুরুষ করলেন তা নয়, পাঠকদের মনে রামের বীরত্বের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিলেন।

(৫)

আনন্দমঠের দু'শ'পাতার মধ্যে প্রায় তিন চার বার যুদ্ধের কথা আছে। সন্তানেরা বেশির ভাগ সময়ে গান করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার উদ্ধার সাধন করেছেন। এই সকল যুদ্ধের পিছনে যে কোন রাজ্য স্থাপনের বা রাজধানী অধিকারের লক্ষ্য ছিল, তা মনে হয় না, তবু আনন্দমঠে যদি কিছু action থাকে তবে এই যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করলে দেখা যায় যে এ action-ও অতি মৃদু। পূর্ব্বেই বলেছি যুদ্ধের দিকে বাঙালী লেখকদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন বাঙালী লেখক যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি। তবে মাইকেলের মেঘনাদ বধে কিম্বা হেমবাবুর বৃত্রসংহারে যে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে সে হচ্ছে ধনুর্বানের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ দীর্ঘ ছন্দে দীর্ঘকাল ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলে বিশেষ দোষ ধরা যায় না। রাম কি বাণ ছাড়লেন তারপর রাবণ কি করলেন—মহাকাব্যে সর্গের পর সর্গ এরূপ বর্ণনা দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু কামান গোলার যুদ্ধ যদি কেউ সেইরূপ গম্ভীর

অচল ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বর্ণনা করেন তবে সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। নবীনবাবুর পলাশী যুদ্ধের বর্ণনায় "আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন" অথবা নবাব সৈন্যের যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে মোহনলালের দীর্ঘ বক্তৃতা "May be magnificent but it is not war"—চমৎকার হতে পারে কিন্তু যুদ্ধ নয়। বঙ্কিমও যে যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি, তার প্রধান কারণ, তিনি যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে চেষ্টা করব। এক যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভবানন্দকে কুড়িজন মাত্র সৈন্য নিয়ে পুল রক্ষা করতে হয়েছিল। বঙ্কিম লিখেছেন, "একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক, কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, যবন বাত্যা-পীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল—কিন্তু কুড়িজন সন্তান তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না"। কুড়িজন লোক নিয়ে এই যে rearguard action, এ যে কি strain তা কল্পনা করা কঠিন নয়। এই সামাল সামাল ভাব—সন্তান-সেনাপতি-দের উদ্বেগ—বর্ণনায় একেবারেই প্রকাশ পায় নি, এমন কি বঙ্কিম এ ব্যাপারটাকে যেন অত্যন্ত সহজ করে ফেলেছেন। ভবানন্দ তোপ দখল করে হাততালি দিয়ে বলছেন "বন্দেমাতরং,"—আবার বলছেন,

"জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি"। যুদ্ধক্ষেত্রেও রসিকতা চলছে। যুদ্ধে ভবানন্দ প্রাণ দিলেন। মৃত্যু-কালে তিনি ধীরানন্দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যুদ্ধ করছিলেন। আসল কথা সত্যানন্দ যে তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করেছিলেন সেটা মৃত্যুর পূর্ব্বে ভবানন্দকে না জানালে তাঁর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখান হত বঙ্কিম তাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধ যে বিশেষ ভয়ঙ্কর নয় তার প্রমাণ এই যে, বইয়ের শেষে দেখা গেল যে সন্তানদের প্রায় সকল নেতাই জীবিত রইলেন এবং সত্যানন্দের তিরোধানের পর যখন সন্তান-দল ভেঙ্গে গেল তখন খুব সম্ভবত সকলেই সুবোধ ছেলের ন্যায় ঘরে ফিরে চাক-রীর চেষ্টা করলেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর মিলন হল, তাঁরা পদচিহ্নে ফিরে গেলেন। জীবানন্দ মরে ছিলেন, তাঁকে বাঁচান হ'ল, না হলে শুভ মিলন হয় না,—তিনি ও শান্তি হিমালয়ে গেলেন। ধীরানন্দ জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর কোন কথাই নেই, অতএব বোধ করি তাঁরাও বেঁচে রইলেন। এক ভবানন্দের মৃত্যু হ'ল—তবে তাঁর স্ত্রী-পুত্র নেই সুতরাং বিশেষ ক্ষতি হ'ল না।

(৬)

আনন্দ মঠের সঙ্গে যখনই আমাদের প্রথম পরিচয় হল—তখনই তা Complete. হাজার হাজার লোক সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে—কামান সম্বন্ধে যে টুকু ত্রুটি ছিল, অতি সহজেই মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করে সে অসুবিধাও আর রইল না। এখন

যুদ্ধ আরম্ভ করলেই জয়লাভ নিশ্চিত। এই সম্পূর্ণতার পিছনে কত বছরের নিষ্ফলপ্রয়াস, কত অত্যাচার, কত অবিচার ছিল বঙ্কিম তার আভাষও দেন নি, অথচ এই লক্ষাধিক সাধারণ সন্তান—যারা যুদ্ধ করেছে, লুট করেছে, বঙ্কিম যাদের পরিচয়ও দেন নি, সে সব লোক বর্ত্তমানের কোন দুঃসহ অত্যাচারের ফলে বা ভবিষ্যতের কোন মহিমান্বিত আদর্শের আকর্ষণে নিজের চির দিনকার ঘরকন্না, পুরুষানুগত সংস্কার ত্যাগ করে প্রলয়ের আহ্বানে ছুটে এসেছিল—প্রাণ দিতে। কোথায় ছিল পণ্ডিতের টোলে জীবানন্দ আর শান্তি, কোথায় ছিল প্রাসাদে মহেন্দ্র আর কল্যাণী, কোথায় ছিল ভবানন্দ, কত দ্বিধা কত চিন্তার পর তাঁরা সত্যানন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—তা আমরা জানি নে, কিন্তু একথা সত্য যে আনন্দ মঠের ঈষৎ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু জগদ্ধাত্রী কালী ও দুর্গামূর্ত্তির সামনে সত্যানন্দের রূপক বক্তৃতার দ্বারা এ সকল সম্পাদিত হয় নি। এক মহেন্দ্রের দীক্ষা লওয়ার ইতিহাস আমরা পাই, তাও অতি বিচিত্র। আজন্ম ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত অতি সাধারণ লোক মহেন্দ্র, বেশি ইতস্তত না করে হঠাৎ দীক্ষা নিতে স্বীকার করলে। বাধা ছিল কল্যাণী, অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের অভাবে এক স্বপ্ন দেখিয়ে কল্যাণীকে বিষ খাওয়ান হ'ল, মহেন্দ্রের দীক্ষার পথ নিষ্কণ্টক হ'ল।

(৭)

সন্তানদের মধ্যে আমরা যাদের পরিচয় পাই সে হচ্ছে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও মহেন্দ্র, সমস্ত বইতে এঁরাই হচ্ছেন প্রধান পুরুষচরিত্র এবং সন্তানদের মধ্যে এঁরাই হচ্ছেন

সেনাপতি। যুদ্ধের সময়ে সব চেয়ে বেশি তরওয়াল ঘোরান এবং যুদ্ধান্তে বক্তৃতা দেওয়া আর সারং বাজিয়ে গান গাওয়া ভিন্ন এঁরা এমন কোন কাজই করেন নি, যাতে করে তাঁরা সেনাপতি হতে পারেন। সেনাপতির অপেক্ষা নভেলের নায়কত্ব এঁদের ভাল মানাত। সত্যানন্দ ও জীবানন্দ চমৎকার গাইতে পারতেন, ভবানন্দ দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, বঙ্কিম তাঁর "ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডলের" বর্ণনা দিয়েছেন, ভবানন্দও গাইতে পারতেন। মহেন্দ্র জমীদারের ছেলে, সেও বেশ গাইতে জানত, ধীরানন্দ বা জ্ঞানানন্দের এ সব গুণের কোন উল্লেখ নেই, তবে তাঁরা বড় দরের নেতা ছিলেন না। বঙ্কিম এঁদের এত সুকুমার করে সৃষ্টি করেছেন যে, মনে হয় যুদ্ধের মত দারুন নিষ্ঠুর ব্যাপারে এই সব সেনাপতিদের সুন্দর গেরুয়া বসনে কাদা লাগতে পারে। এঁরা যুদ্ধ করেছিলেন বটে কিন্তু "নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে" যুদ্ধ করেছিলেন —এঁদের সৈন্যদের অস্ত্রের ঝঞ্জনাও "ললিত তালধ্বনি সম্বলিত" ছিল। এই সব কবি-যোদ্ধারা যে যুদ্ধ জয় করতে পেরেছিলেন তার-কারণ টমাস, হে প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতিরা এঁদের চেয়েও অকর্ম্মণ্য ছিল। অনেক সময়ে মনে হয় সন্তান-সেনাপতিরা এ ব্রত গ্রহণ না করে "চির কুমার সভার" খাতায় নাম লেখালে—ঢের বেশি স্বাভাবিক হত। নায়িকাদের মধ্যে দেখতে পাই শান্তি সুন্দরী, বিদুষী; সত্যানন্দ জীবানন্দের তুল্য বলিষ্ঠ ছিলেন—সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অধিকার, কারণ তিনি যে গান গাইতে পারতেন তা নয়, তবে "রাগ-তাল-লয় সম্পূর্ণ" করে গীতগোবিন্দ গাইতে পারতেন। কল্যাণীও সুন্দরী—তিনিও যে অল্প স্বল্প গাইতে না জানতেন তা নয়, কারণ বিষ খেয়ে

মৃত্যুর পূর্ব্বেই "অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে" মোহভরে ডাকিতে লাগলেন —হরেমুরারে মধুকৈটভারে। তিনি শান্তির মত সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করেন নি, তবে নানা রকম গুরুতর কাজ সত্ত্বেও সন্তানদের নেতাদের কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁকে ব্যাকরণ, অভিধান এবং গীতা পড়ান হত। বঙ্কিম সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থাতেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন। বোধ করি তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধই কর আর যাই কর না কেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"।

(৮)

সত্যানন্দকে দল থেকে একটু আলগা রেখে, একটু উচুঁতে দাঁড় করান বোধ হয় বঙ্কিমের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে সে উচ্চতা রক্ষা হয় নি। নবীনানন্দ বেশে শান্তি যখন দীক্ষা গ্রহণ করল তখন সত্যানন্দ তার ছদ্ম বেশ ধরতে পারেন নি—যদিও পরে বলেছিলেন, "যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এ কাজে হাত দিতাম"। তার পর জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ যে ধনুকে গুণ চড়াতে পারতেন, শান্তি যখন সে ধনুকে গুণ দিল, তখন সত্যানন্দ যে কেবল বিস্মিত হয়েছিলেন তা নয়, ভীতও হয়েছিলেন। দাড়ির প্রাচুর্য্যে শান্তির প্রকৃত পরিচয় যখন প্রকাশ পেল তখন তার সঙ্গে তর্ক বিতর্কে সত্যানন্দ যেন খেলো হয়ে পড়লেন। আর একবার জীবানন্দের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি শান্তিকে বলেছিলেন, "মা দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে,

আমি সকল জানি। তোমার 'প্রলোভনে' তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে"। হ'তে পারে কার্য্যোদ্ধারের উপায় এই, কিন্তু এ সব কৌশল সত্যানন্দের মুখে মানায় নি। সমস্ত সন্তান-সম্প্রদায় যাঁকে অবতারের মত ভক্তি করত, হিমালয়ের গুহায়, আনন্দ-কাননে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা যাঁকে সন্তানব্রতে ব্রতী করেছিলেন, তাঁর সামান্য কথা আদেশ বলে মান্য হওয়া উচিত ছিল। শান্তির সঙ্গে বাদানুবাদে এ সব অনুনয় বিনয় তাঁকে মোটেই শোভা পায় নি। এতে মনে হয় যে অন্তরে যে প্রেরণা, যে মহত্ব থাকলে মুখের কথা দৈববাণী হয়ে ওঠে, সত্যানন্দের তা ছিল না। মাঝে মাঝে বঙ্কিম সত্যানন্দকে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলে দাঁড় করিয়েছেন। আবার পাছে বইর বাস্তবতা নষ্ট হয় তাই অলৌকিকতা বাদ দিয়ে কৌশলে ঘটনাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। ভবানন্দ যে কল্যাণীকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, এ কথা সত্যানন্দ জানতে পারেন; কি করে জেনেছিলেন সেটা বঙ্কিম প্রথমটা বলেন নি। অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে ভবানন্দ যখন প্রার্থনা করেছিলেন যে, ধর্ম্মে যেন তাঁর মতি থাকে তখন অদৃশ্য সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে সময়ে মনে হ'ল যেন সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা ভবানন্দের মনের অবস্থা জানতে পেরেছিলেন। তার পর জানা গেল যে, যে সময়ে ভবানন্দ কল্যাণীকে ও-সকল কথা বলেছিলেন তখন সত্যানন্দ কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত ভবানন্দ যাওয়াতে পাশের ঘরে লুকিয়ে কথাটা শুনেছিলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন ভবানন্দের প্রার্থনার উত্তরে

অদৃশ্য সত্যানন্দ "অতি মধুর অথচ গম্ভীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠে" তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ বনমধ্যে সত্যানন্দের কথা শুনে ভবানন্দের রোমাঞ্চ হয়েছিল এবং সত্যানন্দকে অনেক ডেকেছিলেন কিন্তু সত্যানন্দ কোনো জবাব দেন নি। যদি সত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই থাকে তবে এ সকল sensationalism-এর দরকার ছিল না—লুকিয়ে কথা শোনাতে, অস্বাভাবিক বায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ কথার জবাব দেওয়াতে যেন মনে হয় সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করছিলেন। এই সকল clap trap সত্যানন্দকে আরও হীন করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, সত্যানন্দ প্রভুর কি কাজ ছিল না—তীর্থপর্য্যটনের কথাটা না হয় মেনেই নিলাম, কারণ তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যখন অনিশ্চিত, বহু বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তবে হয়ত দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা যাবে, হয়ত চেষ্টা সফল হবে না, এমনি সময়ে বিদ্রোহীদের নেতাকে কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত মনোযোগ না দিলেও ক্ষতি ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তীর্থপর্য্যটন থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সত্যানন্দকে দেখা গেল গৌরী দেবীর বাড়ীতে কল্যাণীকে পড়াতে ব্যস্ত। সত্যানন্দ তখন আনন্দমঠেও যান নি। কল্যাণীর ঘরে ভবানন্দের সাক্ষাৎ হত, তাও তিনি করলেন না—বোধ হয় ভবানন্দ কি করে তাই দেখবার জন্যে। তা ছাড়া কল্যাণীর গীতাপাঠ না থাকলেও মহেন্দ্র-কল্যাণীর দাম্পত্য জীবনে বিশেষ গোলযোগ হবার ত কোন সম্ভাবনা ছিল না—হয়ত বা কল্যাণী বেশি শাস্ত্র পাঠ করলেই গোলযোগ হত, কারণ মহেন্দ্র বেচারাকে আমরা যতদূর জানি সে শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই জানত না। দীক্ষার পূর্ব্বে মহেন্দ্রকে প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে সত্যা-

নন্দ প্রভুর অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, কল্যাণী তখন স্বামী-কন্যার কোনো খোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ। বঙ্কিম আধ পাতা ভ'রে সে বিষণ্ণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় গীতার নির্লিপ্ততা শিক্ষা কল্যাণীর পক্ষে দরকার ছিল সন্দেহ নেই, তবে গীতা-পাঠের মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গল্পের ধারা ঝরণার মত চালিয়ে নিতে যে বঙ্কিমের তুল্য লেখক বঙ্গসাহিত্যে নেই, সেই বঙ্কিম আনন্দমঠে এমন সকল অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়েও গল্পের ধারা রক্ষা করতে পারেন নি। খুব সম্ভবত সত্যা-নন্দের নানাবিধ দুর্ব্বলতা বঙ্কিম বুঝেছিলেন এবং সেই কারণেই আবার এক চিকিৎসককে এনে এবং সন্তানব্রতের আরম্ভটাকে অলৌকিক রহস্যে আবৃত রেখে সমস্ত চেষ্টাকে গৌরব দিতে চেয়েছিলেন।

(৯)

সন্তানদের নায়কদের মধ্যে কারো character-ই বেশ স্বাভাবিক হয় নি। তবে মহেন্দ্রের চরিত্র অন্যের চেয়ে ফুটেছে। নানা রকম ভদ্রোচিত সংস্কারের মধ্যে আজন্ম পালিত মহেন্দ্র সন্তানদের হাতে পড়ে সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের বেশি বদল হল না। মহেন্দ্র সে রকম করে দলে মিশতে পারলেন না। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি কাজেকর্ম্মে এমন কি নামে যেমন আনন্দ মঠের সঙ্গে জড়িত, মহেন্দ্র তেমন জড়িত হন নি। নীরব ভাল মানুষ মহেন্দ্রের মুখে বঙ্কিম কোন বীররসাত্মক বক্তৃতা দেন নি, এমন কি শেষ যুদ্ধে প্রথমে যখন সন্তানেরা পলায়ন করছিল এবং পরাজয় যখন অনিবার্য্য বলে মনে হয়েছিল, তখন জীবানন্দ মহেন্দ্রকে

বলেছিলেন "এস এইখানে মরি"। মহেন্দ্র বলেছিলেন "মরিলে যদি রণজয় হইত তবে মরিতাম। বৃথা মৃ্ ্য বীরের ধর্ম্ম নহে"। অথচ অনাড়ম্বর ভাবে মহেন্দ্রই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিলেন। মহেন্দ্রের মত লোকেরা হয়ত বোঝে কম, জীবানন্দ ভবানন্দের মত প্রতিভাশালী নয়, কিন্তু একবার বুঝলে এ শ্রেণীর লোকদের মন থেকে সে শিক্ষা দূর হয় না। জীবানন্দ ভবানন্দ নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু মহেন্দ্র তা করেন নি। জীবানন্দ ভবানন্দ যা করেন খুব চটপট করেই করেন, মহেন্দ্রের কিন্তু দ্বিধার অন্ত ছিল না এবং সে দ্বিধার পেছনে ছিল তাঁর সংস্কার ও শিক্ষা। মহেন্দ্রের সঙ্গে ভবানন্দের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। ভবানন্দ সিপাহীদের হাত হ'তে মহেন্দ্রকে উদ্ধার করেন, তার পর যখন সিপাহীদের সঙ্গে সন্তানদের যুদ্ধ বাধে, মহেন্দ্র সন্তানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মনে হল যে সন্তানেরা দস্যু। মহেন্দ্র জানতেন যে ডাকাতি করা অন্যায়, অমনি তিনি সরে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ সিপাহীরা যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা ভবানন্দই যে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন এ সব কথার চেয়ে নীতি-শিক্ষার "চুরি করা মহা পাপ" এই শিক্ষাই প্রবল হল। আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে মিলনের পর পদচিহ্নে নিজের অন্তপুরে কল্যাণীর শয়নগৃহে নবীনানন্দ বেশে শান্তিকে দেখে মহেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত ও রুষ্ট হয়েছিলেন, তারপর যখন কল্যাণী নিজে নবীনানন্দের বাঘছাল খুলে দিতে লাগলেন তখন মহেন্দ্রের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা মুস্কিল হল। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল—"কি গোঁসাই, সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস"! মহেন্দ্র বললেন—"ভবানন্দ ঠাকুর কি অবিশ্বাসী ছিলেন"?

অর্থাৎ বিশ্বাস টিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও, আমি এসব পছন্দ করি নে। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল, "কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে"? জীবানন্দ বা ভবানন্দ খুব সম্ভবত এ অবস্থায় পড়লে, হয় সত্যই বিশ্বাস করতেন, না হয় নবীনানন্দের গলা ধরে বাড়ী থেকে বের করে দিতেন, কিন্তু মহেন্দ্র ফস করে মিথ্যা কথা বলে বসলেন, "কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম, কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল তাই আসিয়াছি"। আসলে মহেন্দ্র মহা বিপদে পড়েছিলেন, তিনি বিরক্ত বোধ করেছিলেন কিন্তু ভাবলেন "যে কল্যাণী একদিন অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল, সে কি অপরাধিণী হইতে পারে"? আমার মনে হয় কল্যাণীর বিষ ভোজনটা মহেন্দ্র নিছক দুঃখ হিসাবে গণ্য করেন নি, অবশ্য কল্যাণীর মৃত্যুতে তাঁর খুব আঘাত লেগেছিল সন্দেহ নেই, তবু মনে মনে এই জন্য একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করেছিলেন যে, আমার স্ত্রীর মত পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী কার, যে আমার ব্রত-সেবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য এক মুহূর্ত্তে বিষ খেল, সে কি সোজা কথা। আর কারো স্ত্রী করুক দেখি। মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখে শান্তি আত্মপরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল, অবশেষে "সাহসে ভর করিয়া নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিল", শান্তির ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। কিন্তু তবু নিস্তার নেই, নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু জীবানন্দ ঠাকুর কেন শান্তির সঙ্গে সহবাস করেন, এই ভেবে মহেন্দ্র ভারি বিষণ্ণ হলেন। কল্যাণী শান্তির পরিচয় দিল, "মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী"। যাহোক বাঁচা গেল, মহেন্দ্র এই ভেবে নিশ্চিন্ত

হলেন যে ভুলক্রমেও সে কোন দিন দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মেশেন নি। যে সব লোক দিব্যি খেয়েদেয়ে দিনে ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে জীবন কাটায় এবং নীতিপাঠের সকল নীতিগুলি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালন করে' পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে, মহেন্দ্র সেই জাতের লোক। যে মহেন্দ্রের উচিত ছিল উকীল কি অধ্যাপক হওয়া, সেই মহেন্দ্র হঠাৎ এক দিন সন্তানব্রত গ্রহণ করলেম অথচ বঙ্কিম তার কোন জবাবদিহি করা দরকার বোধ করেন নি। মহেন্দ্রকে বঙ্কিম অনেক বিষয়ে অবহেলা করেছেন। এই অবহেলাতেই মহেন্দ্র একটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন কিন্তু মনোযোগ দিলে মহেন্দ্র একটা ঘোরতর বীরপুরুষ বা মহাপুরুষ হয়ে উঠতেন এবং সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হতেন। আনন্দ মঠের মহাপুরুষদের গীতাপাঠ, হরিসংকীর্ত্তন, সুন্দর চেহারা এবং মাঝে মাঝে যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বক্তৃতা পড়ে পড়ে মহেন্দ্রকে ভালই লাগে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই।

পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্র সৃষ্টিতেই যে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। এই নারীচরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিম আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়ে ছিলেন। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে যখন স্ত্রীলোক অর্থে আমরা অবলা, সরলা, পতিব্রতা, পাঁচ ছেলের মা'র কথা ভাবতুম সেই যুগে ভ্রমর, শৈবলিনী, দেবীচৌধুরাণী, কুন্দ, রোহিণী—এদের ছবি আঁকা যে কঠিন ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বঙ্কিম মেয়েদের কেবল স্বাধীনা করেন নি, সবলাও করেছেন। শান্তিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, দেবী চৌধুরাণীকে ডাকাতের সর্দ্দারি করিয়ে ক্ষান্ত হন নি, এমন কি দলনীকে দিয়ে তকিখাঁকে পদাঘাত

করিয়েছেন, মৃণালিনীকে দিয়ে হৃষীকেশকে পদাঘাত করিয়েছেন। কিন্তু নারীচরিত্রেও আনন্দমঠ অন্য সকল উপন্যাস অপেক্ষা হীন। ভ্রমর, শৈবলিনীর সঙ্গে শান্তি ও কল্যাণীর তুলনাই হতে পারে না। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর কিম্বা চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, রাজসিংহে চঞ্চলকুমারী—সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রের মত। তাদের বাদ দিয়ে ও-সকল বই লেখাই হতে পারে না। আনন্দমঠে কল্যাণীর স্থান খুব সঙ্কীর্ণ—তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু শান্তি অনেকটা জায়গা অধিকার করেছে। জীবানন্দ, সত্যানন্দ সকলেই তার কাছে মাথা হেঁট করেছেন অথচ এই বইতে তার প্রয়োজন ছিল না। তার সমস্ত লাফালাফি, ঘোড়ায় চড়া, সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা নিয়েও সে একেবারে অনাবশ্যক। শান্তিকে বাদ দিলে আনন্দমঠের কোন অঙ্গহানি হ'ত না। জীবানন্দের সঙ্গে মিলে সে এমন কোনো কাজই করে নি যা আর যে-কোন সন্তান করতে পারত না। আসলে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করা, কুস্তিগীর, নির্লিপ্তার একটা আদর্শই বঙ্কিম সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শান্তিতে তার আরম্ভ—দেবীচৌধুরাণীতে তার পরিণতি। প্রথম যখন তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, প্রগল্ভা স্ত্রীলোক গড়েছিলেন তখন সে বেশ হয়েছিল কিন্তু যাই তাকে গীতা পড়িয়ে, কুস্তি শিখিয়ে, ঘোড়ার উপর চড়ালেন তখনই সে কেবল অবাস্তব নয়, অস্বাভাবিকও হয়ে পড়ল।

আনন্দমঠের মূল কল্পনার মধ্যে যে, কেবল ভাবাতিশয্য দেখা দিয়েছে তা নয়—অনেক সময় ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে তা অতিরিক্ত প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমের অনেক বইতেই একটু থিয়েটারি ঢং দেখা যায়—যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে গুলি করবার পূর্ব্বে

গোবিন্দলালের বক্তৃতা। আনন্দমঠে কল্যাণীর বিষ পানের দৃশ্যটাও প্রায় বাঙলা থিয়েটারের দৃশ্য হয়ে পড়েছে। কল্যাণী বিষ পাণ করে মহেন্দ্রের সঙ্গে duet গাইতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে সত্যানন্দ এসে উপস্থিত হলেন, তিনিও যোগ দিলেন। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে ষ্টেজের অন্তরালে ক্ল্যারিওনেট এবং বাঁয়া তবলা বাজতে লাগল এবং গানটা শেষ হবার পূর্ব্বেই টেরিকাটা, লালগেঞ্জীর উপর মিহি পাঞ্জাবী-পরা দর্শক বাবুরা "এনকোর" "এনকোর" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছু পরে যখন মহেন্দ্র গিয়ে হঠাৎ সত্যানন্দের কোলে বসল তখনকার দৃশ্যটা বাঙলা থিয়েটারের দর্শক মহাশয়রাও সহ্য করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আনন্দমঠের শেষ হ'ল ট্র্যাজেডিতে—দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সকল বাধা যখন দূর হয়ে গেল তখনই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজল। ইতিপূর্ব্বে আর একদিন বিদায়ের আহ্বান এসেছিল। সত্যানন্দ বলেছিলেন—"হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘীপূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব"। সেই মাঘীপূর্ণিমায় আবার যখন আহ্বান এল তখন না মেনে উপায় ছিল না। যুদ্ধ জয়ের পর কাউকেও কিছু না বলে সত্যানন্দ আনন্দমঠে একা ফিরে এসে বিষ্ণুমন্দিরে ধ্যানে বসলেন, তার পরে সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সামনে ক্ষীণালোকে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সেই নিস্তব্ধ পাষাণ মন্দিরে স্তিমিতালোকে বিষ্ণুর অঙ্কে মোহিনী মূর্ত্তির চোখ থেকে অশ্রুকণা ঝড়ে পড়েছিল কিনা কে জানে। সেই জনহীন, শব্দহীন, মহারণ্যের মধ্যে পড়ে রইল নিরানন্দ আনন্দমঠে পূজাবিহীন দেবতা, আর পড়ে

রইল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের নীচে হাজার অখ্যাত অজ্ঞাত সন্তানের মৃত দেহ।

আনন্দমঠের দোষের কথাই আলোচনা করা গেল কিন্তু এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, আমরা বঙ্কিমের প্রতিভাকে হীন মনে করেছি। সত্যানন্দের প্রয়াসের বিপুলতা অস্ফুট থাকুক—বঙ্কিমের প্রয়াসের বিপুলতা বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত নয়। বঙ্কিমের প্রতিভা ত কেবল আনন্দমঠ সৃষ্টি করে নি—চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষের সঙ্গে আনন্দমঠ পড়লে সে প্রতিভার বিপুলতা বোঝা যায়। আনন্দ মঠের সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও একথা আমরা ভুলতে পারব নাত যে, "ভারতভিক্ষা" ও "ভারত বিলাপের" দিনে বঙ্কিম মাতাকেই বন্দনা করেছিলেন এবং সুবর্ণনির্ম্মিত দশভুজা জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিয়ে বলেছিলেন—"এই মা, যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ ধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিণী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী এস আমরা মাকে প্রণাম করি"।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

উপকথা।

—:*:—

মানুষ ছিল একদিন অতি নির্বোধ, তাই সে তার পাশের সঙ্গিনীটিকে রেখেছিল ক্রীতদাসী ক'রে। তার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল লোহার শিকল—এমনি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে এদিক ওদিক করতে পারে; কিন্তু বাইরে দৌড়ে ছুটে না পালায়।

সঙ্গিনীটিও থাকত, ঠিক ক্রীতদাসীর মতই।

তার মনের কথা কে জানে? মানুষের কুটীরখানি সে মেজে ঘসে ধুয়ে মুছে চকচকে ঝকঝকে করে রাখত। উঠানে নিজ হাতে তুলসীগাছ গোড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে রাখবার প্রার্থনা জানাত। মানুষের ক্ষুধায় আহার জুগিয়ে দিত, তৃষ্ণায় জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত। মানুষ মনে মনে ভাবত, ও যে আমার জন্যে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে'।

মানুষের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাসলেন। তিনি মজা করবার জন্যে একদিন সঙ্গিনীটিকে তার পাশ থেকে সরিয়ে নিলেন।

মানুষ সে দিন কুটিরে ফিরে এসে দেখলে যে, ক্ষুধায় আহার নেই, তৃষ্ণায় জল নেই, পূজোর ফুল নেই।

দেখে মানুষ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি, চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করলে; কার সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে তা খুঁজতে লাগলে। এমন সময় বিধাতা এসে

উপস্থিত হলেন। নিতান্ত ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ রেগে বলে উঠল,—ব্যাপার কি ? কোথায় গেল আমার সে ? ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই, সেই যে সব করত।

বিধাতা বললেন—কেবল এই ?

মানুষ বললেন—তা নয় ত কি!

বিধাতা বললেন—বেশ তুমি সবই ঠিক ঠিক পাবে। তোমার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পুজোর ফুল, সব, কিছুরই ত্রুটি হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে মানুষ সব ঠিক ঠিক পেতে লাগল—তার ক্ষুধার আহার তৃষ্ণার জল পূজোর ফুল—সব ঠিক ঠিক আগেরই মত।

কিন্তু সঙ্গিনীটি আর ফিরলে না।

সেই ঠিক ঠিক সবই রইল—ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, কিন্তু সেই সুরটি ত তেমন করে বাজে না। সেই সুরটি—যে সুরটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ ক'রে রাখত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সন্তোষ আর তৃপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল, ফুলের পিছনে কেবলই ফুল—মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতার মত, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, হৃদয়হীন যন্ত্রের মত আপন আপন কর্ত্তব্য ক'রে যায়।

বাইরের কাজ সেরে মানুষ সেদিন ক্লান্তদেহে তার কুটীরে ফিরে এলো, দেখলে সব ঠিক ঠিক সাজান,—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কে চায়, কে চায় তোমার এ সব? কে চায়, কে চায় তোমার এই হৃদয়হীন বিদ্রূপ? কে চায়, কে চায় তোমার এই যন্ত্রচালিত নির্দ্দয়তা?

লাথি মেরে সে তার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিল—জলের পাত্র উলটিয়ে দিল, ফুলের রাশি ছত্র-নয় ক'রে দিল।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—আবার ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি? মানুষ ক্রুদ্ধস্বরে বললে,—ব্যাপার কি? কে চায় তোমার এ সব? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ওই হৃদয়হীন ভোগ-সামগ্রি। আমার তাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাসলেন। তার সঙ্গিনীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সে দিন তার সঙ্গিনীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে নিয়ে তার হাত দু'খানিতে সোনার কাঁকন পড়িয়ে দিল, তার গলায় মুক্তাহার দুলিয়ে দিল, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন ক'রে বললে,—তুমি ত ক্রীতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শূন্যকে সম্পদশালী করে তোল, তুমি ক্রীতদাসী নও।

সে দিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পূজো করতে বসল, সে ফুলের গন্ধে দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অদৃষ্ট?

—:o:—

(Henri Barbusse-এর ফরাসী হইতে)

শাদা ফাঁকা দেওয়ালের গায়ে খোলা জানলাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য—যেন একটা ছবি, যার শেষ নেই। আর বুড়ো দুটি বন্ধুও সেখানে বসেছিল,—পাথরে-কাটা মূর্ত্তির মতই ভাবার্থহীন।

তারা দু'জনে জীবনের শেষ ক'টা দিন পাশাপাশি কাটিয়ে দিচ্ছিল; একই কোণটুকুর ছায়া ও রৌদ্রে দু'টিতে গড়িমসি করত, একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রতীক্ষা করত, ও কখনো কখনো কথা কইত।

—"সকলি ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নেই,"—বুড়ো দমনক এমন ভাবে এই কথাগুলি বল্লে, যেন সে ইতিপুর্ব্বে যা বলেছে, বা মনে করেছে যে বলেছে, তারই এই শেষ কথা।

বুড়ো কুলদা উত্তরে বল্লে—"না, তা নয়। আর সকলের যেমন, অদৃষ্টেরও তেমনি ভুল হয়ে থাকে।"

প্রথম বক্তা মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লে। সে দৃষ্টির ভিতর ছিল একটুখানি মায়া এবং একটুখানি তাচ্ছিল্য—কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব কিছুই ছিল না, কারণ, এ বয়সে তার পক্ষে একটু এলোমেলো বকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

অপর ব্যক্তি ঘাড় নাড়লে,—সে ঘাড় এক আঁটি কাঠের মত চিম্‌সে ও খাঁজকাটা; এবং শুকনো কাঠখানার মত হাত দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে হাঁটু চাপ্‌ড়ে বল্লে—

—হাঁ হয়। আর এমনও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে, যার আবার প্রতিকার হয়।"

দমনক চাপা গলায় হুঁঃ বলে তার নিস্তেজ, লাল কোটরগত চোখ দুটি আকাশের দিকে তুল্লে। এই ভেবে তার মনটা নরম হ'ল যে, কিছুদিন বাদেই সেও মুখ খুল্লে হয়ত এমনি বাজে কথাই বল্‌বে।

কুলদা বল্‌তে লাগল—"আমি এককালে বীরনন্দিনীকে বিয়ে করেছিলুম। এখন আর আমি তার কথা মনেও করি নে। কিন্তু সেদিন একটি মেয়েকে দেখলুম, অনেকটা তার মত দেখ্‌তে; তাই তাকে আবার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বিয়ে করেছিলুম; আর তার দু'মাস আগে বন্দুকের এক গুলি মেরে তার বাপের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম।"

দমনকের হঠাৎ ভয় হ'ল যে, তার সঙ্গী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌ছে, এবং এ অবস্থায় সে নিজে বল্‌তে গেলে একলাই ঘরে রয়েছে। থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—

—"অ্যাঁ, কুলদা! তুমি ঘুমচ্ছ?"

—"না। আমি না ঘুমিয়ে ভাবছি। আমি যথার্থই সে মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম এবং যথার্থই সে বুড়োর দুই রগের মধ্য দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিয়েছিলুম। প্রথমেই ব'লে রাখি যে, সে মেয়েটি

বাপকে দেবতার মত পূজো করত, আর বাপও তাকে তেমনি ভালবাসত।”

ছোট ছেলে যেমন ক'রে গল্প শোনে, দমনক তেমনি আবার শান্ত ও লক্ষ্মীটি হয়ে বল্লে—

—“সে অনেক দিনের কথা।”

—“হাঁ, এতদিন আগেকার যে, মনে হয় যেন অন্য কার কথা বল্‌ছি, আর এ সব যেন আমি জন্মাবার পূর্ব্বে ঘটেছিল।”

বুড়ো যেন এক যুগ পিছিয়ে গিয়ে, স্মৃতির মত তার পূর্ব্বজীবনের অনর্গল ভাষা ফিরে পেয়ে বলে' যেতে লাগল—

—“বীরবাহু কর্ত্তা ছিল ধূর্ত্ত ও খাঁটি লোক। তাই সে আমাকে তার মেয়ে দিতে নারাজ ছিল। কারণ, আমি ছিলুম এক অকর্ম্মার ধাড়ি। আমার দ্বারা বাস্তবিক কোন কাজই হ'ত না,—এক তার মেয়েকে ভালবাসা ছাড়া;—কিন্তু যারা একমাত্র কাজ নিয়ে থাকে, তারা যেমন সেটা ভাল ক'রেই করে, আমারও এ বিষয়ে সেই কৃতিত্বটুকু ছিল। আমাকে সে মেয়েটি যেরকম মুগ্ধ করেছিল, সেরকম অপর কারো পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তার পরে ত সে বুড়ো হয়ে কতকাল হ'ল মরে গেছে। দমনক, শুনছ ত?”

—“হাঁ” বলে দমনক একটু কাছে এগিয়ে এল।

—“তাই বল্‌ছিলুম, তার বাপ মোটে রাজি ছিল না। চারপাশের সব লোকে তার মত বদ্‌লাবার অনেক চেষ্টা করলে; কিন্তু সে এমন ভাব দেখাত, যেন তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, বা বুঝতে পারছে না। বেশি দূর এগোতে কেউ সাহস করত না। কারণ, বীরবাহুর শরীরে যেমন রাগ তেমনি সামর্থ্য ছিল। তার বাহু ছিল কুস্তিগীর

পালোয়ানের মত, আর হাত দুটো ছিল শক্ত যেন হাতিয়ার। একদিন আমি সাহস করে তার সাম্‌নাসাম্‌নি কথাটা পেড়েছিলুম,—অতি নীচু গলায়,—কিন্তু সে আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে। ততক্ষণ নন্দিনীসুন্দরী রান্নাঘরের এক কোণ আশ্রয় ক'রে দুই মুঠো দিয়ে দুই চোখ ঢেকে ফোঁস-ফোঁস করছিল। আমি অক্ষমতায় ও লজ্জায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবলুম—এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এ প্রাণ রেখে আর কি লাভ, যখন জীবনের শ্রী ও আনন্দ যার হাতে, সে বেটা সয়তানের মত পাপিষ্ঠ ও ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ! আর যত কিছু চেষ্টা-চরিত্র করি না কেন, তার ফল হবে শুধু লোকের কাছে নিজেকে আরও বেশি অপদস্থ করা। তার চেয়ে জীবনের সঙ্গে শোধবোধ করাই ঢের সোজা কাজ ব'লে মনে হ'ল। আমার বন্দুকে এক গুলি ভরলুম,—আর প্রেমিক মানুষের মনের মত একটি সুন্দর রাত্রি দেখে মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড়তে লাগলুম। কাজ হাঁসিল করবার উদ্দেশ্যে বুড়ি-ক্ষেতের মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে বসলুম। কিন্তু বন্দুকটা মুঠোর মধ্যে সবে ঠিক করে ধরেছি, এমন সময় প্রথমে শুনতে পেলুম, পরে দেখতে পেলুম যে, একটি গাড়ী সেদিকে আসছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল—বীরবাহু কর্ত্তার গাড়ি!—আমারও ভাল কথা মনে পড়ে গেল যে, মাসের এই দিনেই সন্ধ্যেবেলা সে তাম্‌লি গিন্নীকে এক থলে টাকা দিতে যায়। ঘোড়াটা কদম কদম চলছিল। গাড়ীটা আমার নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল, আর আমি তাকে দেখলুম,—সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে; সেই লম্বা প্রকাণ্ড শরীর—যা আমার চক্ষুঃশূল—সেই পাখীর ঠোঁটের মত নাক, সেই মস্ত ছুঁচোলো দাড়ি, সেই কালো বর্ব্বর মূর্ত্তি, যেন

কাফ্রিদের রাজা। তখন যে পশু আমাকে এমন ভাবে কোণঠেসা করে' দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত করেছে, তাকে একেবারে হাতের কাছে বাগে পেয়ে আমার মাথায় এরকম খুন চ'ড়ে গেল যে, সে বলবার নয়। আমি এক লম্ফে উঠে পড়ে' বন্দুকটা ঠিক তার রগে তাক করলুম, ছুঁড়লুম। টুঁ শব্দটি না করে' সে যেন ঝাঁপিয়ে ঘোড়ার লেজের দিকে একটা বোঝার মত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ল। ঘোড়াটা ভড়্‌কে গিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে, ও মোড়ের কাছে রাস্তা ছেড়ে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে লাভচাঁদদের জোতজমার মধ্যিখানে গিয়ে পড়ল। আমি পালালুম—লম্বা লম্বা পা ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালুম,—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি, মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে, আমাতে আর আমি নেই। পাগলের মত বেগে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসে পড়বার পর তবে আমার হুঁস হতে লাগল যে কি করেছি। তখন যেন খোঁচা খেয়ে আরও মরিয়া হয়ে মাঠ ও বনের ভিতর দিয়ে দৌড় দিলুম। এই যে আমি সেকালের সব কথাই প্রায় ভুলে গেছি, কিন্তু আজও মনে আছে,—যেন সেদিনকার কথা—কোন্‌ কোন ভয়ঙ্কর ঝোপ সেদিন রাত্রিতে ডিঙ্গিয়ে গেছি, কোন্‌ কোন্‌ মারাত্মক বাধা উল্‌টে ফেলে দিয়ে পথ করে' নিয়েছি। মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা'তে যৎকিঞ্চিৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল শুধু এই বিশ্বাসে যে, বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করব, এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভিশপ্তের মত ছুটতে ছুটতে দেখি যে তাদের বাড়ীতে এসে পড়েছি—যে বাড়ী একজন এইমাত্র ছেড়ে গেছে, কিন্তু যেখানে আর একজন আছে। যখন এ বিষয়ে চেতনা হ'ল, তখন সে এত কাছে এসে পড়েছে যে তাকে আর একবার দেখবার চেষ্টা না করে থাকতে পারলুম না। একবার তাকে দেখব—

জানলার ভিতর দিয়ে—কেমন অপেক্ষা করে' বসে আছে, আগুনের লাল আভায় অন্ধকারে আধ-ফুটন্ত! দেওয়ালের বরাবর যত আস্তে পারি হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গেলুম; ফিরলুম।—আঃ! ঐ যে, জানলা খোলা আছে, তার ধারে সে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বসে আছে। সে বসে আছে যেন স্বর্গের দেবীর মত শাদা, আর আমার মনে হল তার ভিতর থেকে কি একটা আলো ফুটে বেরচ্ছে। সত্যি, সে হাসছিল! সে দেখতে পেলে আমি ক'হাত দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখে একটু চেঁচিয়ে উঠে হাতে তালি দিলে—আলো যেন আরও জ্বলে উঠল, হাসি যেন আরও ফুটে উঠল! সে বল্লে—"ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। বাবা রাজি হয়েছেন। তিনি দেখলেন আমি কি-রকম কষ্ট পাচ্ছি, তাই আমার দুঃখ দূর করবার জন্যে হঠাৎ হাঁ বল্লেন। এইমাত্র বেরিয়ে যাবার আগে তিনি হাঁ বল্লেন ও হাসলেন।"

আমি গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত বের করতে পারলুম না। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, চোখ কানা করে দিয়েছিল। জানিনে কেমন করে পিছু হট্‌লুম, কেমন করে দেওয়াল টপ্‌কে তার দৃষ্টি এড়ালুম, কেমন ক'রে পালালুম। কেবল মনে আছে সেই মুহূর্ত্ত, যে সময় নিজের বাড়ী পৌঁছলুম,—এক হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে, আর এক হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধরে'—পৃথিবীতে এখন ঐ হ'ল আমার একমাত্র সম্পত্তি! রান্নাঘরে ঢুকে, কোন আলো না জ্বালিয়েই, চোখ না খুলেই, আমার সাধের টোটা খুঁজলুম, পেলুম, ও বন্দুকে পুরলুম। কিন্তু অদৃষ্টের এই ভীষণ সর্ব্বনেশে অত্যাচার আমাকে এতদূর পিষে ফেলেছিল—আহা এমনি মারই মারলে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে সে খবরটা জানবারও অবসর

দিলে না,—যে আমার আত্মহত্যা করবার উৎসাহ পর্য্যন্ত নিতে গিয়েছিল। সেই জন্যই কি গুলিটা ফস্‌কে গেল ?—সে যাই হোক, ঘটনা এই যে, শুধু গুলির তপ্ত শ্বাসের আঁচটুকু আমার মুখে লাগল, আর সে শুধু আমার একগোছা চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। টল্‌তে টল্‌তে মাটীতে পড়ে গেলুম,—ভাবলুম মারা গেছি।

পরদিন বেলা দুফুরে ভরা দিনের আলোয় ঘুম ভাঙ্গল। সব কথা মনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কান ভোঁ ভোঁ করছিল, কিন্তু বাইরে একটা মহা সোরগোল হচ্ছিল; লোকজন পাড়া-পড়শীতে হৈ হৈ থৈ থৈ করছে। ঠিক সেই সময় জীবন জঙ্গ দরজায় এক ধাক্কা মারলে। আমার চেয়ে তখন সে বছর কতকের বড় ছিল, পরে বুড়োরোগে মারা গেছে। আর এক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার ফোক্‌লা মুখ গলিয়ে সে চেঁচিয়ে বল্লে—

—বীরবাহু কর্ত্তাকে কাল রাস্তায় খুন করেছে।

—অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলতে বলতে আমি পাঙাস মেরে ঘরের শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেলুম।

—সেই পাপ বেদের কাজ। তারা টাকার থলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়ে গেছে। তারা সব কথা খুলে বলেছে। তারা গ্রাম থেকে বেরবার মুখে গাড়ির উপর চড়াও হয়েছিল,—তার বাড়ী থেকে দু'পা বুড়ো পিঠে দশ ঘা ছুরি খেয়েছে, সে একেবারে মরে' কাঠ হয়ে গিয়েছিল, একগঙ্গা রক্ত পড়েছিল। তারপর তারা তাকে গাড়ির গদির উপর ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে আস্তে আস্তে যেতে দিলে।

অনেকক্ষণ পরে, বুড়ী-ক্ষেতের মোড়ে, ঘোড়াটা কংসপতির বাড়ীতে গিয়ে পড়েছিল।”

আমি তা'হলে তাকে মেরে ফেলি নি। কারণ সে আগেই মরে গিয়েছিল! মরাকে কেউ খুন করে না।—এখন দেখ্‌ছ,—এ স্থলে অদৃষ্টের হাত ছিল ব'ট, কিন্তু সে রাত্রিতে তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

অদৃষ্ট।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ফরাসী ভাষা থেকে "অদৃষ্ট" নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেতী অদৃষ্ট।

এ দেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল করতে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সত্য—অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ সত্য, তার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

(১)

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়ীতে। এই কলিকাতা সহরে খেলারাম পালের গলিতে খেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা-চৌড়া আর অত মাথা উঁচু-করা বাড়ী, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখ ও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখতে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে ভুল হয়। সেই সার সার দোতালা সমান উঁচু করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রং, সেই ঢং। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, তাও আবার বড়

নয়, ছোট; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাতা সহরে বড় রাস্তায় ও গলিঘুঁচিতে আরো দশ বিশটা মেলে, তবে খেলারামের বসতবাটীর স্মুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ—তার সিংহদরজার দু'ধার আগলে বসে আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে চেনা যায় না, আর পথচলতী লোকে বলে, বিলেতী-শেয়াল, তার কারণ, বয়েসের গুণে তাঁর ইঁটের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আর তার চূণবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল সন্ধ্যে, পয়সায় পাঁচটি করে খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে চেনা যায়।

(২)

এই সিংহ দুটির দুর্দ্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে কলিকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলিকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড় মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতী-দস্তুর সাজিয়ে ছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক করত, চকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ঘরময় খেলা করে বেড়াত। সে এক বাহার! তারপর সাটিনে ও মখমলে

মোড়া কত যে কোচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিষ ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানী-করা তুষার-ধবল, নবনীতসুকুমার মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্ত্রীমূর্ত্তি-সকল সেই বারান্দার দু'ধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত--তার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সদ্য নেয়ে উঠেছে, কেউ বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখতে মনে হত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক দিন বলেছিলেন,—"মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখলুম। এই পাষাণীরা যদি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তাহলে এ পুরী সত্যসত্যই অমরাপুরী হয়ে ওঠে" —একথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মো-সাহেব বলে ওঠেন, "তাহলে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হতে হত—শাড়ীর দাম দিতে"। এ উত্তরে চারদিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হল যে, ঐ সব পাষাণমূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলিকাতা সহরেও উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যে এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বলছি।

(৩)

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙ্গা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়েসের একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে ইঁদুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁদুরের—কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ জানতে হলে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষা-প্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিঁচুড়ি পাকালে, ও দুয়ের রসই সমান কষ হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকী-বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙ্গা ঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত একজন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়ছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোক সমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল, ব্যারিষ্টার নন, তা'হলেও তিনি ইংরেজী পোষাক পরেন—তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয্যে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফার্ষ্ট ডিভিসনেই পাশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু

আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literature-এ taste ছিল, অন্তত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষীরাজকে ছক্কড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে' ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে-রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের জমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙালী উকীল না হয়ে সাহেব কৌঁচুলি হলে তিনি যে Bar-এ ফেল করে bench-এ যে প্রমোশন পেতেন, সে কথা ত আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনের কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে জানেন?—ছেরেপ মুরব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনে'দী ঘরের ছেলে আর বড় মানুষের জামাই—অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

(৪)

বলা বাহুল্য, জমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L. পাশ করেন,

সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারী বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখনো অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরম হিতৈষী জনৈক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেন না, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁসিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তারপর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষী লোক। তাই তাঁর আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে দিতে পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত—আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বললেন,—"দেখ বাবাজী, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল শালিয়ানা দু'লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে ;—আর দেশে আমার শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো ?—জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে এক রকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি প্রজাকে সায়েস্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে ; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হলেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগ্‌বাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ-কড়া করে ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা হলেই তারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাজি খাবে। এক কথায়

তোমাকে একটু রাশ-ভারি হতে হবে আর একটু কড়া হতে হবে। বাবাজি এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন যোগানো কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।”

এ কথা শুনে চাটুয্যে-সাহেব আশ্বস্ত হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশ-ভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি হলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্শা, তার পর তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেসান অনুযায়ী— দু'সন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌর-কার্য্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশ-ভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চ্চনার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন রাশ-ভারি হতে না পেরে গম্ভীর হতে পারলেই জমিদারী-শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তারপর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়ে মানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। তিনি আফিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায়

আপিসে উপস্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলন থেমে গেল।

(৫)

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা-সাড়েবারোটার সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তারপর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক—সেখানে কর্ম্মচারীরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হলেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হলেও বেলা এগারটাতে হাজিরা সই করতে সুরু করে দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর ক'দিন লাগে?

মুস্কিল হল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরোণো আমলা। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়েসের মধ্যে বিশ বৎসরকাল সে এই ষ্টেটে একই পোষ্টে একই মাইনেতে—বরাবর কাজ করে' এসেছে। এতদিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়েনি, তার কারণ, সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু দুটি জিনিস, এক তার স্ত্রী, আর এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার

প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যে রকম চমৎকার, তার সাজা তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব্ব প্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় "প্রিয়ে, প্রিয়তরে প্রিয়তমে" এই সম্বোধন এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই যথার্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে ধরে পুরো চারপৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত হয়ে উঠেছিল। এইজন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল।

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কল্কের প্রথমে বেশ করে ঠিকরে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে' সেজে, তার উপর আল্গোছে মাটীর তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে স্তরে স্তরে টিকে সাজিয়ে, তার পর সে টিকার মুখাগ্নি করে, হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধ ঘণ্টা তদ্বিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে' নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না, এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের

কাজ করতেন এবং সে কাজও তিনি করতেন অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে, সে ফুরসৎ তাঁর কত কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুরে দেওয়া তাঁর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাড়তে চাইত না, সত্য কথা বলতে গেলে তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারীর কাজ করত—আর সবাই জানত যে, অমন হুকোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাড়ীতেও পাওয়া দুষ্কর। তার করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, খরসান ও অম্বুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনি সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মাইনে যে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে। অথচ তাঁর বেতন বৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেন না, তাঁর স্ত্রী ক্রমান্বয়ে নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বসল না। ফলে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল যে, আপিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্ত্তৃপক্ষদের মন জুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করত, যা খুসি তাই বলত,—কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্ত্তৃপক্ষেরাও তার কথায় কান দিতেন না; কেন না, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন পেনসানভোগী।

(৫)

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশি মুস্কিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয় সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম্ম হতে' অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে চাটুয্যে-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বললে—হুজুর। সাড়ে আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া-খাওয়া করে, এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌঁছান যায়" ?

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক হয়ে রইলেন, তার কারণ তাঁর নিজেরও অভ্যেস ছিল ঐ সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিসে আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌঁছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে' আপিসে আসাটা চাটুয্যে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিৎ।

দুদিন না যেতেই, চাটুয্যে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণ-

বন্ধুকে ডেকে কখনও তন্মুহূর্ত্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন তখনই শোনেন যে প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে এক দিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতর স্বরে বললে—"হুজুর, আমি গরীব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাক্‌লে সিগারেট খেতুম, তা হলে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠতে হত না। বাঁ হাতে অষ্ট প্রহর সিগারেট ধরে ডান হাতে কলম চালাতুম"।

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল ; কেন না, হুজুর নিজে অষ্টপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন। একখানি জরুরি দলিল যা এক দিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেখানা প্রাণবন্ধু যখন দুদিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না ক'রে নিত্য ঘণ্টাখানেক ধরে আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হল এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল। হুজুরের উপর দু-দু-বার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এই জবাব করলে,—"হুজুর

আমার লেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি"।

—"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা আর বেশি পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরো পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয়—বাজে লেখা কেন"?

—"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছি নে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। গরীব মানুষের না হলে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হলে ত ছাইপাঁশ লিখেও দেশের মাসিকপত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম"।

এর উত্তরে চাটুয্যে-সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে মাসিক্ পত্রিকার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকম বেনামী প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা যে ছাইপাঁশ বলত, এ কথা আর যার কাছেই থাক, তাঁর কাছে ত আর অবিদিত ছিল না। তিনি আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলেন—"দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে ফেলল—"বড় মানুষের জামাই! কিন্তু অদৃষ্ট ত আর সবারই সমান নয়"।

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাকরোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে তর্জ্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল, আর এক ছিলিম ভাল করে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু

নিজে সাফাই হবার জন্য ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা কওয়ার অভ্যাস তার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

(৭)

চাটুয্যে-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বহাল করা হোক। নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজী সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন প্রাণবন্ধুর দ্বারা কস্মিন্‌কালেও কাজ চলে নি, অতএব যে চাকরী তার এতদিন বজায় ছিল আজ তা যাবার এমন কোনো নূতন কারণ ঘটে নি। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরুতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তার যে কাজ চিরকাল করে এসেছে ভবিষ্যতেও তাই করবে—অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল, তারপর সপ্তম দিনের সকাল বেলা চাটুয্যে-সাহেব রাগের কণাটুকুও মনের কোনো কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তারপর তিনি যখন ধড়া-চূড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" সে চিঠি এই—

"প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর একখানি

মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে নেক নজরে দেখেন না, কেন না আমি চোর নই অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবাই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানেজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখি নি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তার প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ অমন বুদ্ধি অমন বিদ্যে অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা খুসি। প্রিয়পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই মেরে বসেন। এঁর হাতে ষ্টেটটা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা-পাঁচটা ঠায় বসে থাকা। ইনি ভাবেন ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জান?—ঠিক একটি সাক্ষী-গোপালের মত। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে, কর্ম্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানি নে। কেন না, যারা কাজের হিসেব জানে না তারাই ঘণ্টার হিসেব করে—সেই পুরুতদের মত যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে, 'হুজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি'। ইনি এতেই খুসি, কেন না এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেপাফা-দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত তা'হলে পোষাক পরলেও সাহেব

হওয়া যেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান?—মেম-সাহেব। অন্তত দূর থেকে দেখলে ত তাই মনে হয়। কেন জানো?—এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর রংটা ফ্যাকাসে—সাবান মেখে, আর মুখে দাড়ি গোঁফের লেশমাত্র নেই কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও আবার ক'টা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেম-সাহেবের মেম-সাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, আমার মত গুণী-লোকের চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কিনা অনেক দিন আছি বলে জায়গাটার উপর মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা, কেন না তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতে কাণা। তাই তাঁকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেম-সাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়, এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি সুন্দরী, প্রায় তোমার মত। তারপর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত খায় না, মদও খায়, চুরুটও খায়। ইনি বিদ্যের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক এর গৃহিনীকে যে চিঠিখানি লিখেছি সে একটা পড়বার মত জিনিষ। আমার দুঃখ রইল এই যে সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে দিয়েছি আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই কর্ত্রীঠাকুরাণী খুব ভাল লেখা পড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামী এ দুজনের মধ্যে

কে বেশি গুণী। আশা করছি কাল তোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।”

চাটুয্যে-সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্ঠহাসি হেসে স্ত্রীকে বললেন—“এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোড়া হয়েছে।’

বলাবাহুল্য পত্রপাঠ, প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরল। চাটুয্যে-সাহেব সব বরদাস্ত করতে পারেন এবং স্ত্রীর কাছে অপদস্ত হওয়া ছাড়া। কেন না তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পত্নী-গতপ্রাণ।

এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে লিপি সংশোধনের কোনোরূপ উপায় ছিল না, কেন না তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবযুগের কথা।*

——:*:——

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যখন বেশি দিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার যো নেই, যে পথে হোক তাকে যখন চলতেই হয়, তখন যে-সভ্যতা কিছুদিন টিঁকে থাকে, তারই যুগের পর যুগ আসে। অর্থাৎ—এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের খানিকটাকে দু'একটা সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট লক্ষণ অনুসারে পূর্ব্বাপর থেকে সেটিকে তফাৎ করে তার একটা যুগ নাম দিয়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের কারবার চালান। এবং এ হিসাবে পরবর্ত্তী যুগ মাত্রেই পূর্ব্বের যুগের তুলনায় নূতন যুগ। কিন্তু 'নবযুগ' কোন নূতন যুগ নয়, সে হ'ল নবীন যুগ। গাছের জীবনের বার্ষিক ইতিহাসে শীতে যখন পাতা ঝরে' ন্যাড়া ডাল ক'খানি টিঁকে থাকে সেও একটা নূতন যুগ; কিন্তু যখন বসন্তের স্পর্শে তার সারা দেহ রঙ্গিন কিশলয়ে সাড়া দেয় সেইটি হ'ল তার নবযুগ।

কোনও সভ্যতারই এমন সৌভাগ্য ঘটে না যে আগাগোড়া তার জীবনটা হয়, একটা একটানা উন্নতির ইতিহাস। কখনও দৌড়িয়ে, কখনও খুঁড়িয়ে এমনি করেই মানুষের সভ্যতা চলে। কখনও তার জীবনে আসে প্রাণের জোয়ার, যা তাকে অপূর্ব্ব লীলা ও অভিনব সৃষ্টির পথে নিয়ে যায়। কখনও বা তার প্রাণের স্পন্দন মৃদু হয়ে

---

* চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

আসে, অবসাদ এসে সমস্ত শক্তিকে চেপে ধরে ; সে তখন প্রাণপণে প্রাচীন সৃষ্টিকেই অঁাকড়ে ধরে থাকতে চায়, ভয়, পাছে নূতন পথে পা দিলেই যা-কিছু পুঁজি তাও বুঝি হারায়। সভ্যতার এই যে সম্প্রসারণের যুগ, মুক্ত-প্রাণের বিচিত্র লীলার যুগ, এর প্রারম্ভই হ'ল 'নবযুগ' ; যে-যুগ নবীন সৃষ্টির বেদনার পুলকে আকুল, যার অরুণালোক রাত্রিশেষে সভ্যতার নব সূর্য্যোদয় ঘোষণা করছে। যে প্রবন্ধ-পুস্তকখানি আমরা আলোচনা করছি, তার কথা এই যে বাঙালী জাতির সভ্যতায় আজ এই রকম একটি নবযুগ এসেছে।

নবযুগ যে এসেছে, ১০২ পৃষ্ঠার এই ছোট পুঁথিখানি তার একটা প্রমাণ। বইখানিতে লেখকের নাম নেই। প্রকাশক মহাশয় "প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে 'প্রবর্ত্তকে' বাহির হইয়াছিল"—এ ছাড়া বিজ্ঞাপনে আর কিছুই বলা আবশ্যক মনে করেন নি। সুতরাং লেখকের সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল দমন করে আমরা লেখার সঙ্গেই পরিচয় করব।

বইখানিতে 'মুখপত্র' ধরে মোট ন'টি প্রবন্ধ আছে। সবগুলি একই সুরে বাঁধা, এবং তাদের অন্তরের কথা মোটামুটি একই। লেখকের মর্ম্মবাণীটি এই প্রবন্ধগুলির নানা বি[illegible] মধ্য দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধগুলি[illegible] এই অন্তরের বাণীই হচ্ছে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুঁথিখানিতে লেখক যা বলেছেন তার দু'টো ভাগ আছে। একটা হচ্ছে বিচার ও যুক্তির দিক—অর্থাৎ তত্ত্বাংশ, আর একটা হচ্ছে অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক—অর্থাৎ সাহিত্যাংশ। প্রথমটা তর্কের বিষয়, সুতরাং তা নিয়ে তর্ক উঠবেই। দ্বিতীয়টি নিয়ে কোনও তর্ক উঠবে না। সেটি নবীন বাঙলার একেবারে অন্তরে গিয়ে

পৌঁছিবে। কেননা বিংশ শতাব্দীর বাঙলার মর্ম্মকথাটি এ প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যের সুষমাময় মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বিচারের কথাই আগে বিচার করা যাক। বিচারের বিষয় হ'ল আমাদের অর্থাৎ—হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ। এ প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রায় সব ক'টি প্রবন্ধেই আকারে ইঙ্গিতে ফুঠে উঠেছে। কিন্তু 'মানুষের কথা' প্রবন্ধটিতে লেখক সোজাসুজি একটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। "আমরা ত চির-কাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমরাও ধরাপৃষ্ঠে গৌরবোন্নত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উদ্রেক করিত না। তখন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আর নাই। কেন? অধঃপতনের কারণ কি? আমরা কোন্ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আজ আমাদের এ অবস্থা?"—এবং মীমাংসায় লেখক বলেছেন, "ইহার একই উত্তর, সে উত্তর হইতেছে এই যে, আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অস্বীকার করিয়াছি—তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। আমরা মনুষ্য-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি।" উত্তরের ব্যাখ্যায় লেখক বুঝিয়েছেন যে মানুষ তার দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান; তার বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়; তার কর্ম্ম, ভোগ, ত্যাগ এই সব নিয়েই তবে মানুষ। যদি এর মধ্যে কতকগুলিকে অস্বীকার করে, অমঙ্গল ভেবে পিষে ফেলবার চেষ্টা করা যায় তা হ'লে মনুষ্যত্বকেই পঙ্গু করা হয়। ফলে জাতির মন থেকে জীবনের যে সহজ আনন্দ, সে আনন্দ থেকে মানুষের সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও বৃহতের সৃষ্টি, সেটি চলে যায়।

তখন জীবনটাই হয়ে ওঠে দুর্ব্বহ ভার। তাতে আর কোনও প্রাচুর্য্য, কোনও লীলার জায়গা থাকে না। তখন কর্ম্ম হয় জীবনযাত্রা, ধর্ম্ম হয় প্রাণহীন আচারের লোহার শিকল, ভোগ হয় প্রাণপণে প্রাণকে আঁকড়ে থাকা, ত্যাগ হয় অপৌরষের অক্ষমতা। লেখক বলেন, "হিন্দুজাতিটা কয়েক শতাব্দী ধরে' এই অস্বীকারের, এই পিষে-ফেলার কাজটা করে আসছে। আর তার অধঃপতনও হয়েছে তখন থেকেই, আর সেই কারণেই। জাতির শিক্ষকেরা সমস্ত জাতিটাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবন দুঃখময়, জগৎ মায়া, ভোগ অমঙ্গল। আর এই দুঃখ থেকে, মায়া থেকে, অমঙ্গল থেকে মুক্তির এক উপায় কর্ম্ম-ত্যাগ, ভোগে বিরক্তি, জগৎকে অস্বীকার। জীবন ও জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হ'ল পুরুষার্থ। কিন্তু সে পথে পা' বাড়াতে হলেই চাই "ইহামুত্রফলভোগ বিরাগং," কি একালে কি পরকালে ফল ভোগে বিতৃষ্ণা। এই শিক্ষা যখন জাতির হাড়ে হাড়ে বসে গেল তখন তার জীবন হয়ে উঠল বিস্বাদ, প্রাণ হ'ল আনন্দহীন, কর্ম্ম হয়ে উঠল বেগার। দেহের রক্তপ্রবাহ মৃদু হয়ে গেল, তার হাত পা শিথিল হয়ে এল। তাতে জাতিটা যে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল তা নয়, কেন না "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সে হয়ে উঠল আমরা বর্ত্তমানে যা, অর্থাৎ—'জড়ভরত'। তার কর্ম্মও থাকল, ভোগও গেল না; কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা হয়ে উঠল একটা 'কর্ম্মভোগ'। এই পেষণের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "জীবনে উচ্ছ্বাস শক্তির অনুভব করিতেছি—মনে হইতেছে যে শক্তির বলে অশান্ত সিন্ধুকে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি। কিন্তু খবরদার—সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা

খেলিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগসামর্থ্যের আভাস পাইতেছি, বুদ্ধিতে আশ্চর্য্যরূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু না, উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপিয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে না পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া ফেলিতে না পারে—এ সৃষ্টিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি আহরণ করিতে না পার।"

এ বিষয়ে যে তর্ক উঠবে তা এই যে, সত্যিই কি হিন্দু জাতিটা তার দুঃখবাদী দার্শনিকদের আর মায়াবাদী আচার্য্যদের উপদেশ মনে অাঁকড়ে ধরেই জীবনের আনন্দ হারিয়ে, সৃষ্টির ক্ষমতাকে পঙ্গু করে' ক্রমে 'জড়ভরত' হয়ে উঠেছে? এই দুঃখবাদ আর মায়াবাদ, এ কি জাতির জীবনের আনন্দহীনতার কারণ, না তার ফল? রোগের নিদান না রোগের লক্ষণ? হয়ত এ মতবাদগুলির উদ্ভব হয়েছে তখন যখন হিন্দুজাতির মন সরস ও সচল ছিল, কেন না দার্শনিক চিন্তাও একটা সৃষ্টি, সচল মনেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু জাতির জীবনের উপর লেখক এদের যেমন প্রভাব কল্পনা করেছেন সে কি সম্ভব? জাতি যখন 'জীবনে উচ্ছ্বাসশক্তির অনুভব' করছে, যখন তার মনে 'কল্পনার অনন্ত খেলা খেলছে,' 'বুদ্ধিতে নব নব উদ্ভাবনী শক্তি' ফুটে উঠছে, তখন সে কি বৈরাগ্যের বাণীতে কান দেয়; না, কান দিলেও মন দেয়? সৃষ্টিপদ্মের আনন্দমধু যার জিহ্বাতে লেগে রয়েছে তার কানে 'জগৎ মিথ্যা' মন্ত্র জপে দিলেই কি সে মধু তিতিয়ে উঠবে? বরং এই কি সত্য হওয়া বেশি সম্ভব নয় যে, হিন্দুজাতির জীবনে

যখন ভাটা ধরেছে, সহজ আনন্দের উৎস যখন শুকিয়ে এসেছে তখনি সে ঐ মতবাদগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে? এবং তাদের শিক্ষায় আরও বেশি করে নিরানন্দ, বেশি করে কর্ম্ম-বিমুখ হয়ে উঠেছে? জাতির জীবনে এই যে ওঠা নামা, উৎসাহ অবসাদের যুগ একটার পর আর একটা আসে, লেখক তা মোটেই ভোলেন নি। তাঁর 'মুখপত্রে' এ কথা তিনি চমৎকার করেই বলেছেন। কেন যে মানুষের সভ্যতার এই নিদ্রা জাগরণ, বিকাশ সংকোচ, একের পর আর আসে তার রহস্য কে জানে? এ ত জীবন মৃত্যুরই রহস্য! এবং সে পুরাণ রহস্য চিরদিনই গুহাস্থিত, এবং হয়ত চিরদিনই তেমনি থাকবে। অবশ্য প্রত্যেক সভ্যতারই উত্থান পতনের একটা ইতিহাস আছে। হিন্দুর সভ্যতারও তা আছে। এবং সে ইতিহাস নিশ্চয়ই জটিল; এক কথায়, একটা সূত্রে গেঁথে ফেলার বিষয় নয়। কারণ মানুষের সভ্যতা জিনিষটিই অতি জটিল, এবং হিন্দু-সভ্যতা আর সব সভ্যতার চেয়ে কম জটিল ছিল মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে সে ইতিহাস কল্পনায় ছাড়া এখনও গড়ে তোলা চলে না। কেননা তার পনর আনাই এখনও আমাদের অজ্ঞাত। এবং হয়ত তাকে ঠিক সত্যকরে বিচার করবার মত এখন আমাদের মনের অবস্থাও নয়। বর্ত্তমানের দারিদ্র্য না ঘুচলে পূর্ব্বপুরুষের কি ঐশ্বর্য্য কি দারিদ্র্য, কিছুই মন খুলে বিচার করা সহজ নয়।

কিন্তু এ সব বিচার বিতর্কের কথা এখানেই শেষ করা যাক্। এই সব যুক্তি-বিচার এ প্রবন্ধগুলির প্রধান কথা নয়। লেখকও তাদের প্রধান করতে চান নি, লেখাতেও তারা প্রধান হয়ে ওঠে নি। এ প্রবন্ধ-পুঁথিখানির প্রধান কথা ও প্রাণের কথা হ'ল বাঙালীর

জীবনে আজ দীর্ঘরাত্রিশেষে জাগরণের যুগ ফিরে এসেছে। সেই সহজ আনন্দ ভগবান আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন যার প্রাচুর্য্য হল সভ্যতার সমস্ত সৃষ্টিধারার মূল উৎস। লেখকের প্রাণে এই আনন্দের যে সুর বেজে উঠেছে প্রবন্ধগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তারই ঝঙ্কারে মুখর। এবং আগেই বলেছি, এ সুরের ঢেউ নবীন বাঙলার একেবারে মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করবে। হিন্দু-সভ্যতার কেন পতন হ'ল, এ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু লেখক যখন ডেকে বলেছেন—"আমরা যারা নবীন—যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে; অতীতের বোঝা যাদের প্রাণ হ'তে নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে দূর করে রাখতে সক্ষম হয় নি—তাদের আজ লড়াই করতে হবে এই ত্যাগ মন্ত্রের বিরুদ্ধে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্ত্তণ্ড-তাপে কাটিয়ে অবসন্ন দেহে শুষ্ক মুখে সন্ধ্যার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে চলে পড়ছে তারা করবে না—ঊষার স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাধকের বেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তারা করবে, আমি আহ্বান করছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় নি'ক।" তখন তার আহ্বানে, আজ বাঙলায় যারা নবীন তারা সাড়া দেবেই দেবে। কেননা আনন্দের এ সুর তাদের প্রাণে এসেও পৌচেছে। এ সোনার কাঠি যাকেই স্পর্শ করেছে সেই মনে জানে—যে-ত্যাগের মন্ত্র বিশ্ব থেকে মানুষকে বিমুখ করে সে যারই ধর্ম্ম হোক আজ বাঙালীর পক্ষে সেটা পরধর্ম্ম। শীতের দীর্ঘ রাত্রির পক্ষে 'অচলায়তনের' পাথরের ঘের ও আচারের কম্বল-চাপ কতটা উপযোগী কি অনুপযোগী, এ নিয়ে বিচার চলে। কিন্তু আজ

বসন্তের ঊষায় রঙ্গীন উত্তরীয় গায়ে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়াতেই হবে।

এ বইখানি যিনিই পড়বেন দুটি প্রবন্ধ বিশেষ করে' তাঁরই চোখে পড়বে। এর একটি হ'ল "দরকার," আর একটি হ'ল "ইয়োরোপের কথা।" দ্বিতীয় প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন, "আসল, সে বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা নয়—সে অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তাই।" ও কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা যায়।—সাহিত্য মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা নয়, অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তারই প্রকাশ। অবশ্য যে চিন্তা করে আর যে করে না, এ দু'য়ের অন্তর এক রকম নয়, এবং তাদের সৃষ্ট-সাহিত্যও এক দরের নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অন্তরের ভিতর দিয়ে না এলে জিনিষটি মোটে সাহিত্যই হয় না। এ দুটি প্রবন্ধে লেখক যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন বাঙলা দেশে তা সুলভ নয়; কিন্তু সে চিন্তা এসেছে লেখকের অন্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আর প্রকাশ হয়েছে সাহিত্যের সুন্দর মূর্ত্তিতে। "দরকার" প্রবন্ধটির কথা এই:—"দরকারের তাগিদে মানুষ সভ্যতা গড়ে নাই, কেননা বেশির ভাগ দরকার সভ্যতারই ফল। এই সৃষ্টিটা অদরকারা বলেই, এ পৃথিবীর হাজার বস্তু, হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানে দরকার সেখানেই দাসত্ব।" "Necessity is the mother of invention—এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা—necessity, invention-এর mother ত নয়ই, মাসী পিসীরও কেউ নয়—ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃত জনের কথা, ধরতাই বুলিরই একটা বুলি। Invention-ই বল, discovery-ই বল, আর যাই বল,

এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—প্রকাশ করবার আনন্দ—সৃষ্টি করবার আনন্দ।” ‘ইয়োরোপের কথায়’ লেখক এই রকম আর একটি ‘ধরতাই’ বুলির’ টুঁটি চেপে ধরেছেন। সেটি হচ্ছে—আধুনিক ইয়োরোপ জড়সর্ব্বস্ব আর আধুনিক বা প্রাচীন হিন্দু আধ্যাত্মিক “ইয়োরোপ তার অন্তরের, তার প্রাণের, তার জীবনের আনন্দ দিয়ে যে সভ্যতা গড়ে’ তুল্‌ল—যে সভ্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল—যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পুরাতন দেহে নূতন প্রাণ জেগে উঠল—সে সভ্যতা একটা গভীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ’তে না পারে—তাতে হাজার রকম ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে—হয়ত তাতে মানুষের সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান হ’য়ে ওঠে নি—কিন্তু তাই বলে’ যে সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে’ আছে কতগুলো জড়বস্তুসমষ্টির উপরে এ কথা যে বলে তার মত জড়বাদী এ ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। জড়বস্তুর এমন শক্তি এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মানবে না।” “বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইউরোপকে গড়ে’ তোলে নি—ইউরোপই বস্তুসমষ্টির জন্ম দিয়েছে—আপনার অন্তরের শক্তিতে—জীবনের আনন্দের আতিশয্যে—প্রাণের গতির বেগে। আসল কথা হচ্ছে যে জড় জড়ই, যতক্ষণ না সেটা মানুষের অন্তরের শক্তিতে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। সুতরাং ইউরোপ আজ যা, তার মূল কারণ হচ্ছে তার জীবনে অনুভূত—প্রাণে ওজস্-রূপিনী চিৎশক্তি—তার জীবনদেবতার, ভগবানের এ সৃষ্টিতে লীলা-বিলাস।” তারপর প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথায় লেখক অতি সরস করে’ দেখিয়েছেন যে, কথায় কথায় আমরা যে আধ্যাত্মিকতার মাপকাটি বের করি তার মাপে হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের যুগগুলিকে

জড়সর্ব্বস্ব বলে' ঠেলে দিতে হয়।" যে যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে সে যুগে কি তারা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বল্কল পরে' সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করতেন—না সীতাদেবী নিজ হাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অম্বল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন? গীতা রচনা হ'ল, সে ত একটা ভীষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসটা কেবল জড়বাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হত তবে এমন আধ্যাত্মিক জাতি যে হিন্দু, তাদের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি করবার জন্যে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে' উঠত না।" লেখক এই কথা বলে' তাঁর "ইউরোপের কথা" শেষ করেছেন,—"আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান অধিকার করে' বসবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে' থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাঁতিরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে, আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক্ক কদলীর চাষ করবে, তবে তাঁরা নিরাশ হবেন নিশ্চয়।"

এ প্রবন্ধ দুটির অন্তর্দৃষ্টি যেমন গভীর, এদের ভাষাও তেমনি লঘু, প্রকাশের ভঙ্গীও তেমনি সরস ও বিচিত্র।

তাঁর ন'টি প্রবন্ধ জুড়ে লেখক তাঁর স্বজাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার অনেকগুলিকে গালমন্দ বললে খুব ভুল হয় না। টুর্গেনিক তাঁর রুডিনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "জাতিকে গাল দেবার কেবল তারই অধিকার আছে, জাতিকে যে ভালবাসে। "নবযুগের কথা" পড়ে' কারও সন্দেহ থাকবে না যে, লেখকের সে অধিকার নেই।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

বাদল ধারা।

——:*:——

আষাঢ়।

ভোর বরষার জলে ভাসা আজ এ আমার পল্লীপারে
বাজ্‌ল উতল একি রে সুর বাজ্‌ল আলোর বিভোর তারে,
বাজ্‌ল মোর এ বিভল হাওয়ায়, বাজ্‌ল জলের কলস্বরে,
বাজ্‌ল সবুজ রেখায় রেখায়, বাজ্‌ল মেঘের থরে থরে,
বাজ্‌ল সারা গগনেরি অযুত সাঁঝের কাজল পরা
আঁখিকোণের অবাক্ ধারায় কোন্ নিবেদন—বাঁধন হরা!

পাল টেনে ঐ বাতাসে কি ছুট্‌ল রে আজ ছুট্‌ল তরী
পরিয়ে দিয়ে গানের মালা ভোর সাগরের লহর ভরি,
সুরের শাড়ী উড়িয়ে ধু ধু নূতন জলের তেপান্তরে
সবুজ বাঁশী বাজিয়ে নিখিল ছুট্‌ল রে আজ পাগল করে!
বন ভেঙে দূর ছায়াবীথির লহর-নাচা নিরুদ্দেশে
গেয়ে গেয়ে ধর্‌লে পাড়ি অশ্রুপাগল আলোর দেশে!

ফুলে' ফুলে' মেঘের কোলে কেঁপে কেঁপে ধানের ক্ষেতে
অথা' জলের পাপ্‌ড়িফোটা মেতে নাচের ফুলবনেতে

দোল্ খেয়ে ঐ পাতায় পাতায় ছুট্‌ল রে আজ ছুট্‌ল তরী
দুধারে তার ভাঙা ঢেউয়ে নূপুরে সুর পড়্‌ছে ঝরি,
পড়্‌ছে ঝরে' পাখীর মুখে—সিঁদূর-আঁকা যাত্রাপথে
বুকে বুকে ভোরেরি খৈ ভুবন ভরে ছিটা'ল কে !
কূলে কূলে বাজ্‌ল কাঁকণ—আধেক গাওয়া মনের কথা—
বাদল রাতের পুঞ্জকরা ব্যাকুল কূলের আকুলতা
বাজ্‌ল ছায়ার কমলমনে ভেজা-আলোর চরণতলে
বাতাসেরি কানের পাশে বাজ্‌ল জলের ছলক্ ছলে,
গুঞ্জরিল আকাশে গান আলোধারার মধ্যখানে
তরী আমার ছুট্‌ল ভরে অফুরণ ঐ গানে গানে !

উড়িয়ে দিল পথের বাঁকে নিশানখানি বকের পাখা
কবুতরের মনমাতান মোহনপুরের রৌদ্রমাখা,
ঘোড়ঘুঙুরে বৈঠা আমার হাঁসের ঝাঁকে পড়্‌ল মরি !
যত প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে সকল গানের সুর শিহরি !
মেঘে মেঘে বনকাননে ডঙ্কা আমার বাজায় রে কে—
পালাল যে আকাশ ছেয়ে 'বৌ কথা কও' লিখে রেখে !
বাজাল ঐ ডাহুক দূরে ছোট্ট তাহার ডুগডুগিটি
ওই পারে তার যে আছে আজ এই যে রে তার আস্‌ল চিঠি !

কি সে জানে কখন্ হল পড়া লিখন ভর-সভাতে
চখাচখীর চোক বুলিয়ে সকল মাঠের যতেক হাতে !
ঠেক্‌ল কখন হঠাৎ পায়ে ছেলের দলের, গণ্ডগোলে,
রট্‌ল যে তা যত মাতাল দাদুরিদের মত্ত রোলে !

থম্‌কে-থাকা নূতন বৌয়ের ঘাটের পথ আজ এমন দিনে
একি বাতাস উথাল-পাথাল বাজায় এসে বুকের বীণে?
চোকের তারার সব সীমানায় বিছান আজ আঙনখানি
কর্‌ল যে আজ কর্‌ল তারে কর্‌ল রে আজ মনের রাণী!

আকাশপারে ঢেলে কাল খল্‌খলিয়ে হাস্‌ছে মুখে
আখরগুলি শেষ করে সব গালে গায়ে মেখে চুকে,'
দুষ্ট ছেলে কচি দাঁতে ফুটিয়ে চেয়ে হাসির রেখা
মুক্তামালার মত করে ছড়িয়ে দিল সকল লেখা!

শ্রাবণ।

দু'ধার থেকে তা নিয়ে যে শরবনে কি মাতামাতি
পাকাধানের ক্ষেতে ক্ষেতে লাগ্‌ল বিষম হাতাহাতি,
অগাধ হল ফিস্‌ফিসানি খস্‌খসানি বাঁশবনে আজ
ঘোমটা টেনে কলার বনে কিসের কথা? ঐ অত কাজ?
হাসির বাঁশী, নিশাসরাশি, জম্‌ল কি গো নয়ন পুটে
কুঁড়ের পথে আঁচলপাতা কার হল—কার পড়্‌ল লুটে?
হারাদিনের অদূরকথা, বুকের কারো আশার ভরা,
তাই দিয়ে আজ খুল্‌লে কি গো প্রথম দিনের অঝোর ঝরা?
ভাস্‌ল যে আজ সেই ধারাতে তালপাকান রুক্ষজটা
সকল-সহা মুক্তমাঠের যাদুর পাহাড় মানুষ কটা;
কম্‌ল না দুরন্তপনা কম্‌ল কোথা কচুর বনে?
কান্না হাসি সব ঠেলে যে নাচ্‌ছে ওরা ক্ষণে ক্ষণে;

কোমর কেচে ধঞ্চেরা সব স্রোতের মুখে জুট্‌ল এসে
শিঙারি সুর লাগ্‌ল কানে কেয়াফুলের গন্ধে ভেসে,—
বুঝ্‌বে কি গো আর ওরা আজ ? আর কি ওরা থাক্‌তে পারে ?
দাঁড়াল সব জয়পতাকা চরণ ঘিরে সারে সারে !
মাছরাঙারি পাখায় পাখায় ফড়িংগুলির পায়ে পায়ে
সব কথা যে রঙিন্ হয়ে ছড়িয়ে গেল গাঁয়ে গাঁয়ে !
ছড়িয়ে গেল সকল রাতের রক্তরেখার উপর দিয়ে
হাজার দিনের হাসির পায়ের ধূলোরিদাগ ধুয়ে নিয়ে
ঢেউয়ের নাচে নাচাপরাণ চপলস্রোতের সাথে সাথে
চোকের আগের পথেরি ঐ কোলাকুলির আঙিনাতে !
বুকচেরা পথ মাঠের বুকে সিঁথির মত রইল আঁকা
বাউল ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গানের ভুবন মেল্‌ল পাখা !
মেল্‌ল পাখা হাজার তরী চল্‌ল যে সব পাখীর মত !
সবুজ মেঘের কিনার দিয়ে বাঁশীর সুরে তন্দ্রাহত,
রেখে রেখে গেল নিশাস্ উধাও জলের বুকের ঢেউয়ে
খুল্‌বে ঢাকন কখন্ কি তার জান্‌বে কি তা জান্‌বে কেউ এ ?
বুকের মাণিক চল্‌ল যে আজ রৌদ্রঢালা অভিসারে
নয়তো সে কোন্ দূর অজানা ধারানিবিড় অন্ধকারে,
হয়তো আকুল ধরণীর এই আপনহারা পারাবারে
নয় তো আতুর মিথ্যা প্রাণের হাজার ঘাটের পারাপারে ;
নয় তো আপন বুকের ঠাকুর বুকে ঢেকে কর্ম্ম করা,
নয় তো হাওয়ার হাসির ভেলা, নয় আগুণের ভূষ-পশরা !
—বাজিয়ে নিয়ে সকল বেদন জলধারার খঞ্জনীতে
ভাটিয়ালের প্রভাত সুরের পরাণভরা গহনগীতে !

ভাদ্র

কথা শুধু জান্‌ত দুজন—পানকৌড়ি আর কল্‌মিলতা
ভিজে ভিজেও মিল্‌ল না তো আজো তাদের মনের কথা !
বিষম কালো উড়্‌ল যে কেউ নীল হয়ে কেউ ফুলায় যে গাল,
ঝিনুকগুলির বুকেই শুধু রইল গোপন একটুকু লাল
শাপ্‌লা মেয়ে চুপি চুপি বল্‌তে এসেই হল্‌দে হয়ে
এলিয়ে পড়ে ঝাউমাসীদের ডরে ভয়ে একটু কয়ে ;
পাড়ায় পাড়ায় হল না গো ইশারার আর একটু দেরী
জলে স্থলে একেবারে অম্‌নি তাহার বাজ্‌ল ভেরি !
গগনরাণী হাওয়ার গায়ে ফুলের ডালা দিল ঢেলে
শুপারীগাছ নেয়ে উঠে হেসে হেসে পড়ল হেলে,
খোঁপায় কাঁটা কদমবধূ শুন্‌তে এসেই কথাটি সে—
আঁচলে টান পড়্‌ল যেমন—মুদল আঁখি শিউরে উঠে !
—গভীর সুরে রেশটি তাহার কার দুয়ারে দিল হানা
সুদূরে যার বাজ্‌ল মাদল ?—কোথায় রে তার কোন্ ঠিকানা ?
ছুট্‌ল পাগল সব নিয়ে আজ আকাশপাতাল সব ভাসিয়ে
জটায় জটায় ছুল্‌ল আঁধার হাসিতে তার দিক কাঁপিয়ে
কোথায় ছিল গোপন মনে এত কথার আঁখির বারি ?
বুকের কোলে খুল্‌ল যে আজ গভীর নিশার খুল্‌ল ঝারি !
বিবশ করে' নিশীথসুরের আলাপনে ভুবনখানি
বাজিয়ে দিল মনতারাতে উদাসরাতের অসীম বাণী

বাজিয়ে দিল ঝিল্লীরবের আঁধারফাটা তীব্র সুরে
প্রাণসাগরের কোন্ গোপনে ভুবন যে আজ চল্‌ল পুড়ে,
চল্‌ল অপার আজ্ অবারণ প্রাণের পূজা পুষ্প ফলে
লক্ষ হাজার ঝর্‌ল কমল উছল অতল স্রোতের জলে !

ঝর্‌ছে তাহার পাপ্‌ড়িগুলির পাখার কাঁপন প্রাণের পাতে
অজানা সুর বাজ্‌ছে তালে জীবনবনের মন্দিরাতে !

জ্বল্‌ছে যেথায় মাটির প্রদীপ কুঁড়ের কোণে মিটমিটিয়ে
নদীর ভাঙন ঘরের পিছে, দেখ্‌ছে উঠে গিয়ে গিয়ে,—
পড়্‌শীঘরের আস্‌ছে সারা চল্‌ছে সাড়া ডাকে ডাকে
কার চরণের শব্দটুকু পড়্‌ছে নিশির থাকে থাকে ?

দেয় নি ওরা আঁধারে আজ দেয় নি ওরা সুর নিভিয়ে
ঘাট যে ওরাই বিশ্ববীণার—গড়াগানের রক্ত দিয়ে,—

গড়া কোথায় স্বপ্নে ঢালা কোন্ সে বিশাল ইন্দ্রপুরী
ভুবনবাণীর জমাট ব্যথার কোথায় রে মঠ আঁধার জুড়ি ?

চম্‌কে উঠে কেকার ডাকে পেখমতলে লুটিয়ে পড়া
পিয়ে সুরা সুরসাগরের শঙ্খ কিরে ঘুমায় ওরা ?
জাগ্‌বে কখন জাগ্‌বে কখন জাগ্‌বে ওরা ? জাগ্‌বে কিরে ?
দশদিকে যে বাজ্‌ল মাদল নাম্‌ল বাদল সুরে ঘিরে !

তারায় তারায় বাজ্‌ল যে শাঁখ ছায়াপথের সাগরজলে
অস্তগিরির কোন্ সে চূড়ার কোন্ সে গুহার বাসার তলে ?
কাঁপছে যেথায় জলের গায়ে সন্ধ্যারতির রেশ-অবশেষ—
চল্‌ছে বেজে তারেই ঘিরে—কোড়ার ডাকের নাই যে রে শেষ,!

বাজল তৃণের শিরায় শিরায় কাঁপিয়ে জলের অধীর ধারা
বাজ্‌ছে যেন যুগ হতে যুগ—একি রে কোন্‌ ধ্রুবতারা !
বাজ্‌ছে রেণুর পুলকপুরে নীরব চির বধূর ভালে
বাজ্‌ছে ঘরের জাগা বুকে বাজ্‌ছে ঘুমের অন্তরালে,
ধর্‌ছে না তার সুরের ধাবা—ছাপিয়ে যে তার উঠ্‌ছে কানা—
বাজ্‌ছে সুরে এপার ওপার দিগন্তের আজ সব মোহানা !
ফাঁক দিয়ে তার দীপের আলো পড়্‌ল না আর ভুবন মাঝে
অথির আকাশ নদীর কানে শুধুই কেবল গানটি বাজে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

কথিকা।

—:*:—

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কি যেন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে যেদিকেই যায় ঠেকে যায়। এদিকে বাড়ি, ওদিকে বাড়ি, সাম্‌নে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একটুখানি আকাশের রেখা দেখ্‌তে পায়—ঠিক তার নিজেরই মত সরু, তার নিজেরই মত বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বল ত, তুমি কোন্‌ নীল সহরের গলি ?"

দুপরবেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্য্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না!"

বর্ষামেঘের ছায়া দুই সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েচে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে পড়ে' চম্‌কিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুক্‌নো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত ?"

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়া গলির মধ্যে হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়; ধূলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়্‌তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগ্‌লা দেবতার মাৎলামি!"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জ্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁদুর—সে জানে এই সব হচ্চে বাস্তব। কোনোদিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন?"

অথচ শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পূজোর নহবৎ ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এদিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিনীর আঁচলটার মত বাড়ি-গুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে' যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর যাকে মনে ভাব্‌চি মস্ত একটা কিছু, সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্ধু।

—:০:—

(১)

এক নতুন বন্ধু পেয়েছি। সে সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় অষ্টপ্রহরই আমার ঘরে এসে বসে থাকে।

সকালে বলে—"আহা কি সুন্দর সকাল, কি শান্ত সময়টা, পাখী ও ছেলেদের কলরবে শুধু মুখরিত দিক্—এ সময়টা আমি তোমার বন্ধু এসেছি তোমার কাছে, আমার সৎকার কর, কোথাও যেও না, ঘুরে বেড়িও না। বোসো দিকিন ভাই, খাতাটি নাও দেখি, আসন করে বসে মনের ভিতর ডোবো'ত এবার ?"

তাই যদি করি, তবে সকাল পেরোলে দেখি বন্ধু আমার স্নিগ্ধ হাস্যমুখ। নয়ত কোথা উধাও।

দুপুরে বলে—"আহা কেমন উদার ব্যাপক সময়টা। ঘুমুবে নাকি ? তবে আমি চল্লুম।"—হেসে হেসে আকাশবিহারী আকাশে মিলিয়ে যেতে চায়।

যদি বলি—"না, ঘুমোব না, বল কি করি, কি করলে তোমায় কাছে রাখতে পারব।"

সে পাশে এসে হাতে হাতখানি রেখে বলে—"তবে এসো, এই জানালার ধারটাতে এসে বোসো। দেখ দিকি কেমন মাঠ—ঐ

মাঠের শেষে দিগন্তের পরপারে কত কি সম্ভাবনা, কত কি আশা, কত কি গান, কত কি সৌভাগ্য ঝিক্ ঝিক্ করছে। ঐ মরীচিকাকে ধরে ফেলে বাঁধতে পার না? ছবিতে, লেখায়, গানে, ভাবে জড়াও না?

সন্ধ্যে বেলায় বলে—"একটুখানি চুপ করে বসে থাক শুধু। আর কিছুই কোরোনা।"

(২)

স্বায়ত্ত সকালও আছে, দুপুরও আছে। বন্ধু কিন্তু আর আসে না। মাঠ ছেড়ে সহরে এসেছি। কাঠকাঠরা, আলমারি টেবিল চৌকির রাশল, বিছানা পত্তর, খাটের মাথায় গোটান মশারি, ছড়ান কাপড়, হোল্ড, টিফিন বাস্কেট, ট্রাঙ্ক, হ্যাণ্ডব্যাগ ও সাজগোজের নানা উপাদানে ঘর ভরা, চিকফেলা জানলার গায়ের ভিতরে একটুখানি আকাশের পট। বন্ধুর চরণ আর তাতে পড়ে না।

কে সে বন্ধু? আগে ভেবেছিলুম তার নাম বুঝি "সময়"; এখানে দেখছি "সময়" সেই আছে, কিন্তু বন্ধু নেই। তবে কি সে শুধু অবসর নয়, অবকাশ? মনের আর ঘরের, কালের স্থানের আর দুয়েরই? যেমন শূন্য মনে ভিন্ন বন্ধুর সমাগম হয় না, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন স্থূলের ঠেসাঠেসিতেও বন্ধু স্ফূর্ত্তি পায় না?

(৩)

অনেক দিন আর সেরকম করে আকাশ সাঁৎরে বন্ধুকে আমার দিকে আসতে দেখি নে। কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়লেই তাতে

যে তার আভাষ মাখান রয়েছে তার স্পর্শ পাই। যদি নীরবে বসে থাকি, যদি নিজের মাঝে ডুবি তবে বন্ধু আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে এসে আবার জড়িয়ে ধরে। কে সে বন্ধু ? কে সে সুজন, জনতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনলে যাকে পাওয়া যায় ? সে কি আমার ভিতরের সম্পূর্ণতা ?

(৪)

আমার কতক সময় আর আমার নেই। বাক্‌দত্ত করে ফেলেছি। পাছে তার কিছু ফেলাছড়া হয়, পরের জিনিষ হরণ করে ফেলি তাই ভয় হয়। তাই ভয়ে ভয়ে নাওয়া, ভয়ে খাওয়া। প্রতিশ্রুত সময়ে পদক্রান্তি না হয়। সময়ের বাক্যদান আত্মসাধনার জন্য কোন শরীরী বন্ধুকে। তা হতেই হঠাৎ চিন্‌লেম্ অশরীরী বন্ধু তোমার কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং ! তুমি আমার অন্তর্য্যামী !

(৫)

দহরাকাশে যে অন্তর্য্যামী, বহিরাকাশে সেই বিশ্বাত্মা। হৃদাকাশ যাঁর আসন, চিদাকাশ তাঁরই বসন। দিগম্বরের পরিধান সেই অম্বরের প্রতি, সেই শূন্য কহেন—আকাশের প্রতি, শূন্যের প্রতি মানবাত্মার তাই এত টান। মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু।

কিন্তু আত্মা বা বিশ্বাত্মাকে শূন্যভাবে সর্ব্বদা মনন করা যায় না, ধরা ছোঁয়া যায় না, ধরে রাখা যায় না। তাকে সূক্ষ্ম হতে যতই সূক্ষ্মতর হোক্ না কেন রূপের বা রেখার নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে আনতে

পারলে মন যে আলম্বন পায় তাতে চরিতার্থতা দ্রুত পরিপাক লাভ করে। তাই গুরুর মাহাত্ম্য, অবতারের সার্থকতা।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু
বন্ধুরাত্মাত্মনোস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।"

আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মচেষ্টায় আত্মজয় করে তারই আত্মা তার বন্ধু।

সেই ধ্রুব নিত্য বন্ধু কখন কখন অন্তর ছেড়ে মর্ত্ত্যবন্ধু হয়ে বাহিরে দেখা দেয়। হে অশরীরি! তোমার মর্ম্মবাণী চর্ম্মের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হলে বুঝি শ্রেয় কর্ম্মে প্রবৃত্তি সহজ হয়? তাই অরূপ তুমি রূপধারী হও? যাকে অর্জ্জুন বলেছিলেন—

"শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।"

জগতে দুটি ধারা প্রবাহিত। এক শাসনের বা প্রহরীগিরির, অন্যটি গ্রহণের বা প্রীতির। কৃষ্ণাবতারে এই দ্বিধারার সঙ্গম হয়েছিল। অনুশাসিতা যে সে কবি হওয়া চাই, রসিক হওয়া চাই, বন্ধু হওয়া চাই—শুধু গুরু নহে। তার নিকট থেকে আবদার চাই—

"আমায় সব সমর্পণ কর।"

আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মচেষ্টাদ্বারাই আত্মজয় করতে হবে। কিন্তু আত্মা যে ঘটে ঘটে বিরাজিত, তাই ঘটান্তরেও তাকে বন্ধুমূর্ত্তিতে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ প্রবল। মানবাত্মা আপনাকে আপনার কাছে জমিয়ে রেখে তৃপ্ত নয়, সে আপনাকে দিতে চায়।

"আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে!"

মানবের মর্ম্মোত্থিত এ ক্রন্দনের নিবৃত্তির জন্য নেবার লোক চাই, দেবার পাত্র চাই যে কইতে পারে।

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।"
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং।

যাকে অর্পণ করবে, যার নিকট সব কিছু বাক্‌দত্ত হবে সে যদি সাম্‌নে এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তবে তন্মনা হয়ে, তদ্ভক্ত হয়ে তাকেও নমস্কার।

শ্রীসরলা দেবী।

উড়ো চিঠি।

—:*:—

ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯১৯।

অমর!

তুমি আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সকাল দশ ঘটিকা এগার মিনিট বার সেকেণ্ডের সময় তোমার শ্রীহস্তের একখানি পত্র আমার এ দীনের কুটীরে এসে পৌঁচল—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"।

যাহোক তোমার চিঠি পড়ে এতদিনের নীরবতার কারণ বুঝলুম। চিঠিখানায় আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত একটা অভিমানের সুর ফুটে উঠেচে।

"ইউরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েচে বলে যে, সে রাত পোহালে গরদের জোড় পরে টিকি রেখে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদম্‌ বলতে বসে যাবে তা নয়,"—আমার এ কথায় তুমি রাগ করেচ। আমাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে অমন ironical মনের ভাব তুমি আমার কাছে থেকে আশা কর নি; লিখেচ, এতে তোমার অন্তরে একটা আঘাত লেগেচে। কিন্তু ও-কথা আমি ironically লিখি নি—অমন একটা apt allusion আমি আর কোথাও খুঁজে পেলুম না, তাই ওটা লিখেচি। ওটার মধ্যে একটা

সত্যের চেহারা দেখতে পাই বলেই ওটা অমন জায়গায় অমনি করে লিখেছিলুম। এতে তোমার বা আর কারো অভিমান করবার কি আছে জানি নে।

তুমি আমায় ঘোর materialist বলেছ,—আমার materialism নাকি আমার পত্রে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। আমার চিঠিতে যে microscope দিয়ে materialism-এর সূক্ষ্ম পরমাণু কোথা থেকে বের করলে, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অতীত। তোমার বিশ্বাস, আর শুধু তোমারই বা বলি কেন, আজকাল এ দেশের প্রায় সবারই বিশ্বাস, যে-কেউ এই জগৎটাকে ফাঁকি বলে উড়িয়ে না দেবে সেই অদার্শনিক, অধার্ম্মিক, অনাধ্যাত্মিক, আসুরিক—সে দৃষ্টিহীন, জ্ঞান-হীন, বদ্ধ, রুদ্ধ, আসক্ত। এই যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েচে আজ যদি সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা থাকত তবে এই অবস্থাটা দাঁড়াতে পারত না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা তখন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের একটা অতি সহজ সম্বন্ধ থাকত, তখন সংস্কৃত ভাষা আমাদের মুখে মুখে থাকত বলে আর তখন সেটাকে দেবভাষা আখ্যা দিতুম না; সুতরাং আমাদের আত্মার চাইতে পদে পদে তার একটা বড় মূল্য দিয়ে বসতুম না। যে-লোকটা লিখতে পড়তে জানে না বা অতি কম জানে তার কাছে যে ছাপার হরফের মূল্য কি, আর কতটা, তা ত সেই Scotch peasant-ই প্রমাণ করেছিল, যখন সে তার শেষ যুক্তি দাখিল করেএই বলে যে, I saw it in print. আমরা যখন সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করি, বিশেষত তার দর্শনের কোঠায়—তখন আমাদের মাথা ভয়ে ভক্তিতে অমনি নত হয়ে আসে, তারপর ঐ মাথা-নত অবস্থা এমনি অভ্যাস হয়ে যায়

যে যখন সে-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি তখনও আর ঘাড় সোজা হতে চায় না। কেবল যে সোজা হতেই চায় না, তাই নয়—সোজা হওয়াটাই তখন একটা মস্ত অ-ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় হয়ে উঠে। কেবল তাই আমরা লক্ষ করা নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুই জনা সংস্কৃত জানিনা বলে, জানলেও তা পড়বার ইচ্ছে বা অবসর হয় না বলে, আর ইচ্ছে আর অবসর হলেও কঠোপনিষদের বদলে ঋতুসংহারই খুলে বসি বলে, সে-কালের দার্শনিক মতগুলো একালে আমাদের কাছে বাজারে-গুজবের আকার ধারণ করে দেখা দিয়েচে। এই যেমন ধর—মায়াবাদ, এই মায়াবাদ যে আসলে কি তা আমিও জানি নে, তুমিও জান না—শঙ্করভাষ্য আমিও পড়ি নি, তুমিও পড় নি—ও রাম শ্যাম যদু কেউ-ই পড়ে নি—শঙ্করের আসল মায়া কি ছিল, তা কেউ জানে না। অথচ সকলের মুখেই মায়াবাদ। এবং যে আজ জন্মালে সেও বলচে জগৎটা মায়া, ও যে কাল মরবে সেও বলচে জগৎটা মায়া। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এসে বলচে জগৎটা মায়া, ভিক্ষে পাই গো। গৃহস্থ এসে বলচে—জগৎটা মায়া, চরণধূলি চাই গো। তিলককাটা বৈষ্ণব বলচে—জগৎটা মায়া, এস রাধাকৃষ্ণের নাম করি। রুদ্রাক্ষ-আঁটা তান্ত্রিক বলচে—জগৎটা মায়া, এস কারণ-বারি পান করি। এই যে বাজারে সস্তা মায়াবাদের বুলি, এই বুলি আওড়ানই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, এবং এই বুলি খেতে শুতে যেতে না আওড়ানোটাই যদি জড়বাদের লক্ষণ হয় তবে আমি যে জড়বাদী তার কোনো ভুল নেই। তবে spiritualism আর materialism-এর সংজ্ঞা ঠিক ঐ কি না সে সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ আছে যে সন্দেহটা এই জগৎটা আছে কি নেই—এ সন্দেহের চাইতে সন্দেহজনক।

(২)

কিন্তু সে যাহোক, আমি তোমায় হলফ করে বলতে পারি যে আমি জড়বাদী নই, কেননা জড়ও যে চৈতন্যেরই বিকাশ এই আমারও বিশ্বাস। আমাদের এই গোঁড়ামীর দেশে যে এক রকম আধ্যাত্মিকতার গোঁড়ামী আছে সেই গোঁড়া আধ্যাত্মিকবাদীও আমি নই। আমার ঘাড়ে যদি নিতান্তই কোন বাদ চাপাতে চাও তবে যে-বাদটায় তোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ বাধবে না সেটা হচ্চে লীলাবাদ। আমি ভগবানের লীলা মানি। আর এই লীলা মানি বলেই আমি জড়ও মানি চৈতন্যকেও মানি, অর্থাৎ—অন্নকেও মানি, আত্মাকেও মানি, ভোগকেও মানি, যোগকেও মানি—আলাদা আলাদা করে নয়, এক সঙ্গে। আমি যে Kipling নই, সে সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত, সুতরাং—

"East is east and west is west
And never the twain shall meet."

এত বড় একটা কথা বলবার সাহস আমার নেই। আসলে অন্ন ও আত্মার মধ্যে বিরোধটাই আমার কাছে স্পষ্ট নয়, তার চাইতে ঢের বেশি স্পষ্ট তাদের মিলনের দিক এবং সেই দিকটাই হচ্চে মঙ্গলের দিক, কল্যাণের দিক। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমার ওই কথা সমর্থন করবার জন্যে আমি তোমায় উপনিষদ থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু যা বাঙলায় বল্লুম তা যদি না মান, তাহলে সংস্কৃত শ্লোক তুল্লেই যে অমনি বুঝে যাবে—এ কথা মনে করা আসলে তোমার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করা

হয় ; কিন্তু আর যাই হোক সে কটাক্ষ তোমার বুদ্ধির প্রতি আমি করতে পারি নে। কিন্তু উপনিষদ থেকে এই যে-শ্লোক তুল্লুম না, সেই শ্লোকই প্রমাণ যে সেকালে ঋষিদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কাঁধে পাখা লাগিয়ে দিবারাত্র আকাশে উড়ে বেড়াতেন না,—কেবল বায়ু সেবন কর্তে'।

(৩)

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার একটা মস্ত বড় আপত্তি কি জান ?—সেটা হচ্চে এই যে, তা এত ভীষণ লম্বা যে আমরা মেপে তার হিসেব করে উঠতে পারি নে।—আর যদি বা পারি তবু সে হিসেব মনে করে রাখতে পারি নে। ওর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিই চলে না— মাঝপথ পর্য্যন্ত এসে তারপর হয় দৃষ্টি থেমে যায়, নয় ত ঝাপসা হয়ে আসে। যেখান পর্য্যন্ত এসে আমাদের দৃষ্টি থেমে যায় ঐ সেইটেই হচ্চে "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগ"—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা চলে আমাদের মধ্যযুগ। এ যুগে ভারতীয় চিন্তা-জগতে একটা বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছিল এবং এই ভাবকে আশ্রয় করে একটা নতুন দর্শন গড়ে উঠল। এর van guard হচ্চেন বুদ্ধ, আর rear guard হচ্চেন শঙ্কর। আমরা আমাদের জাতীয় অতীতের লম্বা রাস্তায় ঠিক ঐ খানটায় পর্য্যন্ত দেখতে পাই বলে আমাদের আজ সবারই মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, সে ধারণাটা হচ্চে এই যে, আবহমানকাল থেকে হিন্দুর ভারতে ছিল মাত্র দুটি জিনিষ—এক পর্ণকুটীর আর শীর্ণ ঋষি।

সে কালের ঋষিরা সবাই শীর্ণ ছিলেন কি না সে তর্ক না হয় না-ই তুল্লুম কিন্তু ঐ কারণেই আজ আমাদের চোখের সুমুখে নৈমিষারণ্যের বৃক্ষলতাগুল্ম এমনি নিবিড় হয়ে উঠেচে যে তা ভেদ করে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়া একটুও দেখা যাচ্চে না, সৌতি সনকাদি ঋষির মুখে চাপ্‌দাড়ি এমনি কাল হয়ে উঠেচে যে পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের মাথার সুবর্ণ মুকুট একটুও চোখে পড়চে না। তাই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের একটি অক্ষরও আজ আমাদের মনে নেই, আর মনে থাকলেও তা অতি যত্ন করে মুখে আনি নে। কেন না মুখে আনলেই তার একটা যুক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে দিতে জান হয়রান হয়ে যাবে। তার বদলে আজ আমরা আওড়াচ্চি—"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা" অথচ যখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের জাতির দুর্দ্দশা হল কেমন করে? সোজা উত্তর—ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েছে বলে। এখন জিজ্ঞেস কর—ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি?—তখন দেখবে পাঁচ জনের মধ্যে চার জনের সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই, আর বাকি একজন এমনি উত্তর দেবে যাতে হাসির চোটে পিলে ফাটে। সেদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—"আচ্ছা বলুন ত আমাদের ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি?" তিনি উত্তর দিলেন—"বাপুহে ধর্ম্মের অধঃপতনের আর বাকি কি, আজকাল ব্রাহ্মণরাও যখন রেলগাড়ী চাপচে।" ব্রাহ্মণ এমনি ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলেন যে, তাঁর ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটা উপনিষদে স্থান পাবার যোগ্য। অথচ এটা কারো কাছেই শুনবে না যে, আমাদের যে ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েচে এবং যার জন্যে এমন দুর্দ্দশা হয়েচে সেটা হচ্চে "মনুষ্যত্ব" ধর্ম্মের অভাব। আমাদের প্রথম

ধারণা যে মানুষ আসলে হচ্চে কচিখোকা, তাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শাসনে রাখতে হবে। আর আমাদের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, মানুষ নামক জীবটি আসলেই কু, ভাষায় যাকে বলে হাড়পাজী। তাকে এতটুকু স্বাধীনতা দিয়েচ কি সে গিয়ে নরকের পথে নেমেচে, অর্থাৎ—মানুষের আসল সদিচ্ছাটাই হচ্চে তার নিজের ধ্বংস সাধন করা—এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের ঘরে বাইরে বন্দোবস্ত। বাইরে অস্ত্র আর ঘরে শাস্ত্র। শুনতে শুনতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে মানুষের আত্মঘাতী না হয়ে বেঁচে থাকবার একই উপায় আছে—সেটা হচ্চে পরবশ্যতা। এর পাল্লায় পড়েই মানুষের ধর্ম্মের বিকাশ হতে পারছে না, যে বিকাশ হচ্চে মানুষের আনন্দের ও স্বাধীনতার বিকাশ। অথচ আমাদের সবারই ধারণা যে আমাদের যা-কিছু দুঃখ, তা হচ্চে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ সেটা মানি নে বলে। কিন্তু সবার চাইতে মজার কথা হচ্চে এই যে, আজ আমাদের নজর পরপুরুষের অস্ত্রের উপরে পড়েচে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি মোটেও পড়ে নি—ভিতরের বাঁধনই যে বড় বাঁধন—একথা আমরা চোখ মেলেও মানি নে। তারপর বিশেষত আমরা যখন আজ সবাই পলিটিক্যাল, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা একেবারেই দেশদ্রোহীতার পরিচায়ক। আমরা জাতিটা কি না আধ্যাত্মিক তাই বাইরে থেকে যা আমাদের চর্ম্মের উপরে এসে পড়েছে তাই আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিন্তু ভিতর থেকে যা আমাদের মর্ম্মের উপরে পাথর চাপিয়ে রেখেচে তা আমাদের মোটেই চোখে পড়চে না। দিব্যদৃষ্টি আর কাকে বলে—বল ?

(৪)

ধান ভানতে শিবের গীত এখানেই শেষ করা গেল। এখন শোন লীলাবাদ আমি মানি বলে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি ?

তুমি হাজার সাত্ত্বিক হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমায় একটি কথা বলে রাখচি যে কেবল সাত্ত্বিকতাকে আশ্রয় করে একটা মানুষ বসে থাকতে পারে ; কিন্তু একটা সমাজ বা জাতিকে গড়িয়ে বেড়াতে হবে। ইউরোপে যে এত Balance of power-এর কথা শোন, একটা কোনো সমাজের মঙ্গল চিরকাল ধরে রাখতে চাইলে সেই সমাজের মানুষদের মধ্যেও তেমনি একটা Balance of সত্ত্ব, রজ, তম চাই। এই কলিযুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম— ত্রেতায় যখন ধর্ম্ম ছিল এখনকার চাইতে তিনগুণ, তখনও কিন্তু বিশ্বামিত্রকে আসতে হয়েছিল দশরথের কাছে, রামলক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে তাড়কাসুর বধ করবার জন্যে। ত্রেতাতেই যখন এই তখন কলিযুগের কথা অনুমান করেই নিতে পার। বায়ুপিত্ত কফের সামঞ্জস্যেই মানুষের দেহের স্বাস্থ্য—স্বত্ত্ব রজ তম—এই তিনের সামঞ্জস্যে সমাজদেহের মঙ্গল। খালি সাত্ত্বিকতায় দেহটা আত্মা হয়ে সমস্ত মানুষটা আকাশে মিলিয়ে যাবে, খালি তামসিকতায় আত্মাটা জড় হয়ে সমস্ত মানুষটা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে, চাই এ দুয়ের মাঝে রজ। রজ দু'হাত দিয়ে দু' দিককার সত্ত্ব ও তমকে টেনে রাখবে। সত্ত্বকেও উড়তে দেবে না, তমকেও লুটতে দেবে না। তবেই মানুষ নামক জীবটির মঙ্গল— ভগবানের এই লীলার মাঝে। কিন্তু রজও যদি অতিরিক্ত প্রবল

হয়ে ওঠে তা হলেও ঘটবে আবার দুর্ঘটনা। রজটা হচ্চে আগুন—এই আগুণ যদি টু-হানড্রেড ডিগ্রী ফারেন্‌হিটে উঠে যায় তবে তৎক্ষণাৎ একদিকে আত্মাটা বাষ্প হয়ে যাবে, আর একদিকে দেহটা ভষ্ম হয়ে ধ্বসে পড়বে। তিন গুণের এই তিন অমঙ্গল থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে তার জীবনে এ তিনের একটা Balance (সামঞ্জস্য) স্থাপন করতে হবে। মানুষ তার ত্রি-গুণকে অতি সহজেই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে সেই দিন, যেদিন সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে সে তার প্রকৃতির দাস নয়—সে তার ঈশ্বর।

(৫)

তুমি এইখানে একটা কথা বলতে পার যে সত্ত্ব ও রজকে না হয় মানলুম—কিন্তু তমর দরকারটা কি ?—দরকার আছে। জান ত জাহাজের খোলে ballast পূরে দেয়—জাহাজের তলা ভারি রাখবার জন্যে। নইলে বাতাসের একটু জোরে আর ঢেউয়ের একটু তোড়ে জাহাজ এমনি হেলবে দুলবে যে, তাতে জাহাজের স্থৈর্য্য রক্ষা করা দায় হবে। তমটাও হচ্চে মানুষের প্রকৃতিতে ঐ ballast, এই তমের ভারেই মানুষ কোনো রকমে মাটীর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ তম-এ যদি মানুষের তলা ভারি না থাকত তবে সে কোন্ দিন প্রস্‌পেরোর এরিয়েল বা এঞ্জেল গেব্রিয়েলের মত পাখা মেলে আকাশে উধাও হয়ে যেত। এ তম আছে বলে সত্ত্ব তাকে উড়িয়ে নিতে পারছে না, রজও তাকে পুড়িয়ে দিতে পারছে না।

অবশ্য যাঁরা মায়াবাদী বা নির্ব্বাণবাদী তাঁদের কাছে আমার এ মত উপস্থিত করাই ধৃষ্টতা। কেন না তাঁদের পক্ষে সমস্ত দেহটা

আত্মা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেই বা কি আর সমস্ত আত্মটা দেহ হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেলেই বা কি—ও-দুয়ের একই ফল, অর্থাৎ—সমাধি। কিন্তু তুমি যদি লীলাবাদ মান তবে আমার কথাগুলো এক দৃষ্টিতেই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার করে দেখবে কি ?

(৬)

তোমাকে নিশ্চয়ই আজ আমাদের এই নব জাগরণের যুগে, যখন আমরা সবাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে এমন কি বেকাজে পর্য্যন্ত গীতার শ্লোক আওড়াই তখন একথা নতুন করে জানিয়ে দিতে হবে না যে আমাদের দেহের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে আত্মা বড়, অর্থাৎ—যা যত বেশি অদৃশ্য তা তত বেশি প্রধান। এ তিনের মধ্যে আত্মা জিনিষটা এত অদৃশ্য যে বিদ্যাপতির ভাষায় "লাখে না মিলিল এক", কে তার খোঁজ খবর পায় ? সুতরাং ঐ আত্মার কথাটা ছেড়েই দেওয়া যাক। বাকি রইল দেহ ও মন, এ দুয়ের মধ্যে মন বড়। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই, অর্থাৎ—যাঁরাই হিন্দুসমাজে বসবাস করছেন, তাঁদের এই মন নামক জিনিষটি interned হয়ে আছে। শাস্ত্রীয় বালুর চরে এই internment-এর camp, চারদিক সঙ্গীন কাঁধে শ্লোক-পুলিশ পাহারা দিচ্চে। এই internment ভেঙেছ কি, একেবারে সমাজ থেকে নির্ব্বাসন। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে মান তবে দেহের internment-এর চাইতে মনের internment অবস্থা যে সাংঘাতিক একথা তোমাকে লজিকের খাতিরে মানতেই হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বুই

অনার ওটা খেয়ালেই আসে না। তার কারণ মনের internment অবস্থা দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এবং ঠিক সেই জন্যেই ওটা বেশি মারাত্মক। কিন্তু আর যারই যাহোক, আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে জ্ঞান হওয়া থেকে মনের interned অবস্থা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি।

উপরে আমি কেবল তোমার কাছে থিওরিই দাখিল করেছি সুতরাং তার ব্যাখ্যা দিতে আমি ন্যায়ত বাধ্য।

জন্ম থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন যে কেমন ভাবে চালিত হয় তার রঙ্গ-রসহীন ইতিহাস এখানে তোমায় না হয় নাই দিলুম। উপরে যে থিওরি দাখিল করেছি, কেবল আমার জীবনের দুটি ঘটনা দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করব। সেই যে দুটি ঘটনা তা সমাজের কাছে হয়ত অতি অকিঞ্চিৎকর, এমন কি নেহাৎ বাজে, কিন্তু আমার কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। এ দুটি ঘটনা ঘটলে সমাজের কোনো ক্ষতি হত না অথচ আমার পরম লাভ হত। এ দুটি ঘটনার কথাই তোমার জানা আছে। প্রথম আমি বিলেত যেতে চেয়ে ছিলুম আর দ্বিতীয়টি হচ্চে এই যে আমি তোমার ভগ্নিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওর প্রথমটি ঘটল না, কারণ পূজ্যপাদ তোতারাম স্মৃতিশিরোমণি মহাশয়— যাঁকে আমার দাদামশাই ইষ্টদেবতার মত দেখতেন—তিনি স্পষ্ট করে আমার ঠাকুরদা'কে শুনিয়ে বলেছিলেন যে নোনাজলের গন্ধ যার নাকে ঢোকে তার এদিকে ওদিকে অর্থাৎ—ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম গোণা-গাঁথা একশ' তিরাসি পুরুষের বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে আণ্ডাবাচ্চা সবা-রই নরকবাস নিশ্চয়। আর ওর দ্বিতীয়টি ঘটল না তার কারণ আমার

নাম শ্রীমান্ অশাস্তকুমার "ভট্টাচার্য্য" আর তোমার বোনের নাম শ্রীমতী শাস্তিলতা "গুপ্তা"। এর মানে হচ্চে এই যে, আমার মধ্যে মন বলে যে একটি জিনিষ আছে সেই মনের দুটি বিশেষ চিন্তা, দুটি heroic ইচ্ছা যার জন্যে আমি নিজে দায়ী, সেই দুটি চিন্তা কর্ম্মে অনূদিত হল না বাইরের চাপে, সমাজের চাপে। মন বিরক্ত হয়ে বললে—এই ত তোমার সমাজ, এখানে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দেওয়াই প্রশস্ত, এখানে চিন্তা করতে যাওয়াই ঝকমারি, এখানে মন যদি জাগে, মন যদি সংকীর্ণ জায়গা থেকে একটুকু ফুটে ওঠে অমনি চারদিক থেকে সমাজ তাকে চাপতে থাকে। এমন অবস্থায় মন বেচারী কি করে, সে ঘুমিয়ে পড়ল, মন যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন জীবন বললে—মন যখন ঘুমল তখন আমি আর জেগে থেকে কি করব। তখন সে চোখ বুঁজে দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। চারদিকে বাইরে কত না হৈ চৈ কত না হাসিকান্না রাগ। চোখ-বোঁজা জীবনের কাছে সে সব স্বপ্নের মত এসে পৌঁচতে লাগল।

কিন্তু সে যাহোক এইখানে বাঙালীজাতি আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে সে-অবস্থায় যে শ্রীমান্ ভট্ট ও শ্রীমতী চট্টোর বিয়ের, সঙ্গে শ্রীমান্ "ভট্ট" ও শ্রীমতী "গুপ্তা"র বিয়ের, কি মানসিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি ব্যবহারিক কোনো দিক থেকে একটুকুও প্রভেদ নেই কিম্বা আমি বিলেত গেলেই যে সমস্ত ভারত মহাদেশটা ভারত মহাসাগরের নীচে তলিয়ে যেত না—এসম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে পারতুম, যে বক্তৃতাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ দুয়েরই রক্ত গরম হয়ে উঠত; কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র চিঠির পৃষ্ঠা ত তোমার গোলদীঘিও নয়, গড়ের মাঠও নয়। সুতরাং

অসাধারণ শৌর্য্যে সে-লোভ সম্বরণ করে ঐ যে দুটি ইচ্ছা আমার সম্পাদন হল না তার ভিতরের দিকটার একটা কথা তোমায় বলব।

এইখানে আমি তোমার কাছে স্পষ্ট করে কবুল চাচ্চি যে, আমি বিলেত গেলেই যে আমার সুমুখে শক্ত দুটো শিং বা পিছনে লম্বা একটা লেজ গজিয়ে যেত বা তোমার বোনকে বিয়ে করলেই যে হোমরুল ফলটা—যা আজ ভীষণভাবে ডানে বাঁয়ে দুলছে, তা টক্ করে বোঁটা ছিঁড়ে আমাদের একেবারে নাকের ডগার উপরে এসে পড়ত, তা নয়। কিন্তু ঐ যে দুটি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ দাঁড়ালে—এই ঘটনাটার পিছনে একটা principle আছে, যেটা সমাজের পক্ষে মারাত্মক। এই principle-টা হচ্চে এই যে, সমাজ তার প্রত্যেক সভ্যদের বলচে—দেখ তোমাদের ভাবতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না, কোন বিষয়ে ইচ্ছা করতে হবে না। আমি আছি, আমার বাঁধা নিয়মের পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাও, তাতেই তোমার মোক্ষ।

এই বন্দোবস্তে প্রথমত মানুষ নামক জীবটি ব্যর্থ হয়ে উঠছে, কেন না মানুষ ত কল নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, ইচ্ছা আছে, Will আছে—কিন্তু সমাজ মানুষের এই সকলের মুক্তগতি দিতে নারাজ। সমাজ বলচে—মানুষ তোমার মন চাই নে, বুদ্ধি চাই নে, কল্পনা চাই নে, ইচ্ছা চাই নে, Will চাই নে—চাই তোমার স্মরণশক্তি, চাই তোমার মুখস্ত করবার বিদ্যে। এই রকম করে সমাজ যখন তার সভ্যদের কেবল হুকুম তামিল করবার যন্ত্র করেই তুলচে—এর শেষ কুফলটা আবার গিয়ে সমাজের বুকেই বাজচে।

সমাজ নামক জিনিষটিকে যদি বিশ্লেষণ কর তবে দেখবে যে, সমাজ প্রাণবস্ত, সমাজ শক্তিমান। আসলে সমাজ আর যাই হোক বহুব্রীহি সমাস নয়। সমাজ প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকেই তার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান ইত্যাদি আহরণ করছে। সুতরাং যখন সমাজের সকল সভ্যই, কি মনের দিক থেকে কি চিন্তার দিক থেকে কি কল্পনার দিক থেকে কি শক্তির দিক থেকে, একেবারে শূন্য; তখন সমাজ তাদের কাছ থেকে কেবল শূন্যই লাভ করতে পারে। আসলে জড়জগতে ও মনোজগতে একটা প্রভেদ আছে। দশখানা কঞ্চি একত্র করলে তা বাঁশের মত মোটা ও শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু দশজন বোকাকে একত্র করলে একজন স্যর অ্যাইজ্যাক নিউটন হ'য়ে উঠে না।

সুতরাং চাই ব্যক্তিগত মানুষের মুক্তি—তার চিন্তার মুক্তি, কর্ম্মের মুক্তি—এই মুক্তির ভিতরে যে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার আনন্দে প্রত্যেক মানুষটি তার সমাজকে আনন্দময় করে তুলবে, তার প্রাণের গতিতে মনের কল্পনায় বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজকে পূর্ণ করে তুলবে—তখনই আমরা দেখতে পাব সমাজ-দেবতা একটা কাঠের পুতুল নয় বা East End Co-র দম দেওয়া ঘড়ি নয়—সে দৃষ্টিবান, জ্ঞানবান ও শক্তিমান। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজ সত্যকে পাবে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রেমকে পাবে ও শক্তির ভিতর দিয়ে সম্পদ ও গৌরবকে লাভ করবে।

লিখতে লিখতে চিঠি প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। সময়ও যায়। কাজেই এখানেই দাঁড়ি টানলুম। কেন না তোমাকে আমি একটা

example set করতে চাই। সে example-টা হচ্চে এই যে, ভদ্র-লোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার উত্তর সাড়ে চার মাস দেরী না করে' সেই দিনই দেওয়া। ইতি—

তোমার চিরকেলে

অশান্ত।

শিল্পী।

—:o:—

শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাসদগণের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠ্‌ত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আঁকার বিরাম ছিল না।

*　　*　　*　　*　　*

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে প'ড়ল।

গৃহলক্ষ্মী ব'ললেন—রাজার কাছে যাও; তাঁর কৃপাকটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে।

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিখানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বল'লেন—উদ্যানবাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্ব্বপুরুষ-গণের কীর্ত্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে।

সভাসদেরা আশ্বাস দিলে—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

নাগরিকদের আশা হ'ল—দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ষু সার্থক করবে।

রাজপ্রসাদতুষ্ট হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

* * * * *

শতেক রাজার মুখচ্ছবি ভিত্তিগাত্রে ফুটে উঠ্‌ল; অমাত্যদের ভাবহীন মুখের ছায়া অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল; নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাসদেরা দিলে—বাহবা; নাগরিকেরা দিলে—অভিনন্দন।

শিল্পীর মুখ গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

* * * * *

শিল্পীর বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মানস-প্রিয়ার অর্দ্ধসমাপ্ত মুখখানি রেখায় সমাপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

রংএর সঙ্গে রং মিশ্‌ল, রংএর 'পরে রং পড়ল; কিন্তু মুখের সে মৃত্যু-বিবর্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে, বিত্ত সম্পদ দূরে ফেললে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিলে; কিন্তু সে মুখে প্রাণের আভাষ ফুটে উঠ্‌ল না।

* * * * *

শিল্পী তখন কলাদেবীর দ্বারস্থ হ'ল।

দেবী বললেন—শিল্পীর বুকের রক্ত দিয়েই আমি তার মানস-প্রিয়ার মুখে জীবনের আভা ফুটিয়ে তুলি; শিল্পীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার মানস-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি।

শিল্পী বললে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ গ্রহণ করুণ।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না। স্বর্ণমুদ্রার রঙে যে দিন তুলি রাঙিয়ে ছিলে, সে দিন হ'তে তুমি মৃত। তোমার আত্ম-বলিদানে অধিকার নাই, ফলও নাই।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা খসে পড়ল। আর মানস প্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূন্যে চেয়ে রইল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

ভারতের নারী।

—:*:—

শ্রীযুক্ত "সবুজ পত্র" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ভাদ্র-আশ্বিনের সবুজপত্রে "ভারতের নারী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সম্পর্কে আরও গুটীকতক কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি সুলেখক হইবার যোগ্যতা রাখি না অথবা সেরূপ উচ্চাশাও মনে পোষণ করি না। সুতরাং আমার বক্তব্য আপনাদের পত্রে স্থান পাইবে কি না জানি না। তথাপি সত্য অপ্রিয় হইলেও প্রকাশনীয় ও মাননীয় এই বিশ্বাসে অগ্রসর হইলাম।

আজকাল খবরের কাগজ পড়িলে ও "দেশসেবী"দিগের বক্তৃতা শুনিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। এখনকার শঙ্খ ভেরী, তুরী, দামামা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কর্ণ বধির হয়; এবং ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির বর্ণিত বিক্রম আধুনিক বীরদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। "ভারতের নারী" প্রবন্ধে যে মহাবীরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎশ্রেণীভুক্ত সকলের চোখে যদি আগুন থাকিত, তবে বোধ হয়, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্র সিংহ প্রভৃতিকেও ভস্ম হইতে হইত। অস্ত্র আইন আছে বলিয়া চোখের আগুনের কথা বলিলাম, ইহাতে বীরত্বের অবমাননা হইল, কিন্তু উপায় নাই। ভারতের নারী সম্বন্ধে এই

"দেশসেবি"গণের মত ও বক্তৃতা আকাশেরও উর্দ্ধে উঠে। মাতৃত্বের গৌরবস্থল, ত্যাগের আদর্শ, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রভৃতি বহুবিধ মহান্ আখ্যা দ্বারা স্ত্রীজাতির গৌরববর্দ্ধন করিলেই যদি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইত, তবে ভারতের নারী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজনই থাকিত না। অনেক সময় গলাবাজী করিয়া মামলা জেতা যায়, কিন্তু তাহাতে সত্যকে বিচলিত করা যায় না। বার তের বছরের বালিকার মাতৃত্ব লইয়া বাগাড়ম্বর ও দেশের ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার এক ভারত ব্যতীত ও হিন্দুসমাজ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য বা অসভ্য সমাজে বা দেশে প্রচলিত আছে কি না সন্দেহ। পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দক্ষতা ভগবান আমাদিগকে কি উদ্দেশ্যে দিয়াছেন জানি না, তবে এটী ঠিক কথা যে আমি চোখ বুজিলেই আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না, ইহা পাগলছাড়া অপর কেহ মনে করে না। নারীকে আমরা কত বড় গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাহা দু একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়। এই সে দিন কলিকাতা সহরে পুলিস এক পথভ্রষ্টা, অপহৃতা দশ বৎসরের বালিকাকে উদ্ধার করার পর, তাহার শ্বশুর ও স্বামী স্বীয় পবিত্রতা অটুট রাখিবার জন্য তাহাকে গ্রহণ করা উচিত মনে করিলেন না। হিন্দু আইন, ব্যবহার ও আচার, সকলই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনেক নীচে রাখিয়াছে। দেশে গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই ইহার প্রমাণ আছে। বাগবাজীদ্বারা এতবড় স্পষ্ট সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সতীদাহ নিবারণের সময় গোঁড়া হিন্দুসমাজ রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরাট সভা করিয়া যে বহু-স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদের দরখাস্ত বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন তাহা মনে করিলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন

লজ্জিত হইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে পল্লীগ্রামে এখনও এমন সংসার আছে যেখানে আহার ও রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে নারী পুরুষের সমান যত্নের পাত্র বিবেচিত হয় না। এই সব জানিয়াও ইংরাজদের চেয়ে আমরা যে কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া কেহ কেহ গলার জোরে রাত কে দিন করিতে চান। অনেকস্থলে দেখা যায় পবিত্র স্বামী একটু খুঁত পাইলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। তিনি তাহা করিলেও অসহায় নিরপরাধিনী সমাজের দয়ার দাবী করিতে পারে না। কার্য্যত স্ত্রীজাতিকে যে এ সমাজের কোন্ স্থানে বসাইয়াছি, এই গেল তাহার এক প্রমাণ।

নারীর পাপের কথা বিশ্বাস করিতে আমরা যত প্রস্তুত ও উৎসুক এত আর কেহ নয়। ভারতের নারী বিলাতের নারীর অপেক্ষা বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা পায় একথা খুব জোর করিয়া যিনি বলিবেন তাঁর ধীরতার খুব অভাব আছে বলিতে হইবে। আমরা নারীর সত্য বা মিথ্যা, কোনরূপ দোষ পাইলেই তাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, এরূপ আর কোন দেশে আছে কি? পুরুষের সাত খুন মাপ; তৃতীয় চতুর্থ পক্ষও অনায়াসে চলিতে পারে, কিন্তু বালবিধবা নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের আগুনে পুড়িয়া মরিবে আর আমরা বড় গলায় ও হাততালি দিয়া বাহবা দিব, এ দৃশ্য ভারত ছাড়া কোথাও নাই। আজকাল স্বদেশকে ভালবাসি না একথা কেহ বলিতে চাহেন না। এ বেশ কথা, কিন্তু সমাজের অঙ্গে যে গলিতকুষ্ঠ দেখা যায়, তাহাকে সযত্নে ও সম্মানে ঢাকিয়া রাখিলে দেশের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হবে। স্বদেশপ্রেমের নামে

দেশের কঠিন রোগগুলিকেও যে কেহ কেহ ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা মরণেরই লক্ষণ। ইংরাজের উপর চোখ রাঙাইলে অথবা দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া বাহাদুরী নিলে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের চেয়ে আমরা কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া যদি নিজের দুর্ব্বলতাকে পরাক্রম, ব্যাধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ও কুবুদ্ধিকে বিজ্ঞতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, তবে ইংরাজের কোন লোকসানই নাই। তাহাতে আমাদের বিকারই প্রমাণিত হইবে।

এইত গেল নারীর কথা। ভারতের নরের কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। লণ্ডনে সংস্কার আইন (Reform bill) গঠিত করিবার জন্য যে সমিতি (Joint committee) বসিয়াছে তাহাতে সাক্ষ্য দিবার সময় কে একজন বলিয়াছিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান সমাজ উল্টান পিরামিডের (pyramid) মত মাথা-ভারী। কথাটা শুনিয়া আমাদের রাজনৈতিক পাণ্ডারা—বর্ষাকালে ভেককুলের মত তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কথাটা কি একেবারে মিথ্যা? প্রাচীনকালে ভারতবাসীর সত্যই ছিল চরিত্রের মূলভিত্তি। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কার আইন এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়িলে বোধহয় যে নিজের কোটকে বজায় রাখিবার জন্য সব পক্ষই মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া মামলা ফতে করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর্জ্জীদলিলে কোন খুঁত না থাকিলেই হইল, মোকদ্দমা যদি মিথ্যাও হয় তবু মিথ্যাসাক্ষী যোগাড় করিয়াও জিতিতে হইবে, এই চেষ্টাই সব রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু

আমরা সাহেবদের দেশের মত শাসনপ্রণালী চাই, অতএব আমরা জোর করিয়া বলিব যে দেশের চাষাভুষা পর্য্যন্ত সংস্কারের অপেক্ষায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে; কারণ ইহা না বলিলে যদি না পাই। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে রাজা সাজিবার সময় মুখমণ্ডলে নানা-রকম রং প্রলেপ দেয় এবং ভাড়া-করা রাজপোষাক পরে। সেইরূপ নেতা-নামধারী অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শকের মন ভুলাইবার জন্য জীর্ণ, ক্ষতযুক্ত সমাজদেহকে বহু পুটিং দিয়া সাজাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ভেদবুদ্ধি ও অন্ধ-কুসংস্কার এখনও দেশে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে, কেহ কেহ স্বজাতি-প্রেমের ভাণ করিয়া এই সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেছেন। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে ছোট ছোট এমন গণ্ডী আছে যাহার সীমা লঙ্ঘণ করা অসমসাহসের কার্য্য; কিন্তু এসকল দেশ-উদ্ধারকারীদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। অল্পসংখ্যক লোক ইংরাজী শিখিয়া চীৎকারে গলা ফাটাইয়া বলিতেছে, "ইংরাজের সমাজে যেমন সাম্য আছে, আমাদেরও তেমনি আছে, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দাও।" এদিকে বাংলার গ্রামে গিয়া দেখ, সমাজ যাহাদিগকে অতি নীচ ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কি দুঃখ দৈন্য কি নির্জীব জীবন। হিন্দুসমাজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বহু কষ্ট ও চেষ্টাদ্বারা নিজের পায়ে পক্ষাঘাত আনিয়াছে। রোগ যত কঠিন হইতেছে বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার প্রলাপও তত বাড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের মুখে ধাবিত দেখিয়া দু'একটী অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে গিয়া গোঁড়াদের এমন কি অনেক "দেশহিতৈষীর" তিরস্কার ও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক প্রকার উন্মাদ

রোগের বর্ণনা আছে, কিন্তু এরূপ উৎকট রোগ চিকিৎসকদের জ্ঞানেও আসে নাই। হিন্দুসমাজ জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় জলে পড়িয়া মরিতে চায়, বারণ করিলে তাড়িয়া আসে। কয়েকজন লোক লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং ইংরাজের সঙ্গে তর্ক করিতে পারে আর সমাজের সকল শ্রেণীর লোক অশিক্ষিত, অসার, নির্জ্জীব, এ সমাজের তুলনা উল্টান পিরামিডের সহিতই হয়। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে সকলেই দেখিবেন হিন্দুসমাজে বাঙ্গালী শ্রমজীবির সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। নৌকার মাঝি, কলের মজুর, চাষা, কুলী প্রভৃতি বলিষ্ঠ শ্রমজীবী বাঙ্গালী লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুসমাজের মাথাটা মোটাই আছে, হাত পা নাই বলিলেও চলে। দেশের সমাজের যারা মেরুদণ্ড, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবি। তাহাদের শিক্ষার ও উন্নতির কোন চেষ্টাই নাই, তাহারা সমাজের লাঞ্ছনা ও অবমাননা এখনও সহ্য করিতেছে, আর জন কয়েক লোক তাহাদেরই প্রতিনিধি সাজিয়া হৈ চৈ করিতেছে। সমাজ নিজের প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন নিজের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার বিষয়ে অন্ধ, অথচ মুষ্টিমেয় লোক নেতা সাজিয়া গোলমাল করাকেই কর্ত্তব্য মনে করিতেছে, যেন ইংরাজকে গাল দেওয়াই স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। যাহারা গলাবাজিতে পটু এবং বিলাত গিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত তাহারা কি বাংলার পল্লীস্বাস্থ্য ও এক শ্রেণীদ্বারা অপর শ্রেণীর উপর অত্যাচারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন? যাহারা নিজের দেশভাইকে সর্ব্ববিষয়ে নিজের সমান জ্ঞান করিতে শিখে নাই, পরের কাছে নিজেকে জাহির ও স্বীয় দোষ গোপন করাই যাহাদের কার্য্য—বিধাতা তাহাদের শাসন হইতে দেশকে রক্ষা করুন। নারীর অসহায় অবস্থার সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর

অশিক্ষিত লোকের অসহায় অবস্থার অনেক সাদৃশ্য আছে। দেশকে ভালবাসিতে হইলেই যে দোষকেও ভালবাসিতে হইবে একথা কোন শাস্ত্রে নাই। "আমি তোমার চেয়ে খাটো না" একথা বলিবার পূর্ব্বে নিজেকে একবার মাপিয়া দেখা উচিত। আমি বড় কি ছোট তাহা আমার চেয়ে পরেই ভাল বলিতে পারে। মানুষ নিজেই যদি নিজের সুবিচার করিতে পারিত তবে অপর বিচারকের দরকার হইত না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নড়াল কলেজ
২৪ নভেম্বর ১৯১৯।

আলো ও ছায়া।

——:o:——

বীণাকে কথা দিয়েছিলাম বড়দিনের সময় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাব। তাঁর সাধ হয়েছিল পোষকালী দেখে পুণ্যসঞ্চয় করবেন—আমার সখ চেপেছিল কংগ্রেস দেখব।

যথাসময় বীণা আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। জবাব ঠিকই ছিল—আমি বল্‌লাম কথাটা আমারও মনে আছে, কিন্তু ইনফ্লু-য়েঞ্জার ভয়েই সেটি রাখতে পারছি নে।

—ও সব ছুতো শুনতে চাইনে আমি।

—এটা কি একটা ছুতো হল? খবরের কাগজখানা পড়ে দেখ দেখি একবার।

—ও সব বাজে পড়া রেখে এই চিঠিখানা আগে পড়—বলে' বীণা আমার হাতে একখান চিঠি দিলেন।

—এ কি? তোমার দাদার লেখা যে! ওঃ তুমি একেবারে ডাক্তা-রের সর্টিফিকেট হাজির করেছ সঙ্গে সঙ্গে।

—করব না? তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে নাকি?

—আচ্ছা দেখি সতীশ কি লিখেছে।

পড়ে' বুঝলাম চিঠিখানা বেনামীতে আমাকেই লেখা। সতীশ লিখেছে যে কলকাতায় অসুখ হচ্ছে বলে' যদি কারো ভয় হয়, সে

বাইরের লোকের—যাঁরা শুধু খবরের কাগজ পড়ছেন। সে আরও লিখেছে যদি কলকাতায় আসার মতলব থাকে, তবে অসুখের ভয়ে পিছিও না, কারণ বছরে এমন দিন এবং জগতে এমন স্থান পাওয়া যাবে না, যখন মানুষ মরবে না বা যেখানে তার অসুখ হবেনা।

অগত্যা আমাকে হার মানতে হল।

আমি কলকাতায় যাব শুনে বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এমন ভূষণ এসে স্পষ্টই বললে—তুমি ক্ষেপেছ না কি ?

—কেন বল দেখি ?

—কলকাতায় যাচ্ছ এই সময়ে—তাও আবার যাচ্ছ সপরিবারে !

—হাঁ, তা যাচ্চি বটে, কিন্তু ক্ষেপি নি—

—তার বড় বাকীও নেই। যত লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, আর তুমি যাচ্ছ সেখানে মজা দেখতে।

—পালাবে কোথা ভাই—পালিয়ে কি নিষ্কৃতি আছে ? এখানেও কি লোক মরছে না ? বরং খতিয়ে দেখলে বুঝবে লোক এখানেই বেশি মরছে।

—তা হয়ত সত্য, কিন্তু এ হ'ল দেশ, আর সে—

—কলকাতাও রাজধানী। বাঙলা দেশের সেরা জায়গা।

অতঃপর হতাশভাবে ভূষণ বলল—অর্থাৎ তুমি যাবে।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম হাঁ।

—তবে বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু সাবধান ভাই, বেশি দিন থেকো না এবং সাবধানে থেকো।

—সাবধানে থাকতেই হবে কারণ প্রাণটা ঠিক পড়ে'-ত পাওয়া নয়। আর—

—কবে ফিরবে ?

—তার ঠিক নেই, তবে মিছামিছি দেরী করব না। যাচ্ছি বেড়াতে, সখ মিটে গেলেই ফিরব।

কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সতীশের কথাই ঠিক। বোধ হয় না ৬৮ সহরে মারীভয় হয়েছে।

তিন চার দিন বেশ কাটল। ভয় ও ভাবনার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। শুধু সকালবেলা খবরের কাগজ পড়বার সময় একটু ভাবনা হ'ত। কিন্তু ভয়ের খবর তাতেও ছিল না। অসুখ দিন দিন কমে আসছিল।

হঠাৎ তারপর একদিন বিকেলের দিকে বীণার শরীরটা খারাপ বোধ হল, পরদিন দেখেশুনে সতীশ গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—তাইত—

আমি জিজ্ঞাস করলাম—কি দেখলে ?

—নিউমোনিয়া হয়েছে—সাবধানে থাকতে হবে।

খুব সাবধানেই থাকা হ'ল—ভাল ডাক্তার দেখ্‌ল, দামী ওষুধ পড়ল কিন্তু কোন ফল হল না।

বীণাকে ধরে রাখা গেল না।

ছেলে মেয়ে দুটিকে সেখানেই রেখে পরদিন সকালের গাড়ীতেই আমি কলকাতা ছাড়লাম।

গাড়ী ছাড়বার তখন একটু দেরী ছিল। কামরার ধারে সতীশ চুপকরে দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে আমিও তেমনি বসেছিলাম।

সামনে একটী ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন—আঃ বাঁচা গেল, ইনফ্লুয়েঞ্জাটা তাহলে গেল এতদিনে।

চকিতের মত তাঁর দিকে চাইতে তিনি কাগজখানা আমার সামনে ধরে আবার বললেন—এই দেখুন মশাই, কাল মোটে একটা মরেছে। এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ধীরে ধীরে আমার হাতখানা নিয়ে সতীশ শুধু তার হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

ঝাঁপ দিয়ে পরক্ষণেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

প্রবোধ ঘোষ।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

—:*:—

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারি পরিচিত কোন স্থানে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হতে একটি ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজনে ভারী ভয় পেয়ে গেল, পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কাঠভাঙা, ফল কুড়িয়ে আনা, একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। নিজে অলক্ষ্য থেকে শীকার ধরবার পক্ষে সেই ব্যাঘ্রটির বিশেষ সুবিধাজনক, অনেকগুলি জায়গা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গরুর গাড়ীর সারি ঘুরে ঘুরে আসে সেইখানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন শুনলাম। তিনি বাঘিনী হলেও শীকারী কম ছিলেন না, গাই বলদ ছাগল ভেড়া সবই উজাড় করছিলেন। স্থানীয় শীকারী তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়েছিল, সন্ধ্যেবেলায় সে তখন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরছিল, কিন্তু বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্ত্তুস (cartridge) ছিল তাতে আওয়াজ হয় নি, বাঘিনী সেই যে চম্‌কে পলায়ন দিলে, আমরণ সে আর প্রলোভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি। কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের সন্ধানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ

নয়, যদিও একথা বড় একটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না জানি, কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হোক ব্যবসায়জীবীর জীবন স্বাধীন নয়, কেননা তিনি মক্কেলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা খান, তার কাজ না বাজিয়ে, তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ করবার সুযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝেই কাজের মধ্যেই খেলার সুযোগ করে নি, তাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়, গাঁটের কড়িও মন্দ খরচ হয় না (আর একথা আগে হতেই বলে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য্য আমার বড় একটা নেই)। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় করে মফঃস্বলে মামলা করতে গিয়ে সপ্তাহান্তে যে দুদিন কাছারী বন্ধ থাকে আমি সেই অবসরে দু' একবার শিকারের যোগাড় করেছি। মনিব্যাগ খালি হয়েছে বটে কিন্তু শীকারের ঝোলায় বাঘ ভরেছি। একবার একজন জজ মজা করে আমায় বলেছিলেন মফঃস্বলে আমার দুই শীকারই জোটে—এক মক্কেল, দ্বিতীয় বাঘ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল, পুরাণ ব্যাধির মত এ দুটোই আমায় পেয়ে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করি তখন আমার দু'একজন হিতৈষী মক্কেলদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন আইনের চেয়ে শীকারেই আমার বুদ্ধিটা খেলে ভাল। যে সব মানুষের শীকার-বাতিক আছে, ইংরাজ তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতী। ছুটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছারীর চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল, সেখানকার মত চাঁদ দেখে এখানে মুসলমান পরবের ছুটি হয় না আর তা ছাড়া সৎ খৃষ্টানের মত তাঁরা একদিন ছেড়ে দুদিন কর্ত্তব্য বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে থাকেন। সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আরো দিন কত বেশি ছুটি পাওয়া গিয়েছিল।

তবে এই সব অল্পদিনের ছুটির মুস্কিল এই যে, আপনাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না, মনের মধ্যে কাজের ফাঁসটা টানাই থাকে, বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছু করা ঘটে না।

শীকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ষ্টেশনে এসে, আমার সঙ্গ ধরলেন। রাতদুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম, আর যাদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁরা পোঁটলা পুঁটলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবার পর, একজন হাসতে হাসতে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন। শুনে আমার বন্ধুর যে হাসির ফোয়ারা ছুটল তা আর বন্ধ হ'তেই চায় না। তাঁর যেন হাসির হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়ল, আমি তাকে বোঝালাম —

> Stone walls do not a prison make,
> Nor iron bars a cage.

কারাগার হলেও নির্দ্দোষী আমাদের কাছে সেটি শান্ত আশ্রমপদ বলেই মনে হয়েছিল।

ভোর হ'তে না হ'তে আমরা রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করলাম। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর আধুনিক রথ, কিছুক্ষণ পরে ব্রিটিশরাজের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে সে দশ ক্রোশ পথ এসেছিল। এর কিম্বা এরি মত লোকের হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

তবু মনে করলাম আবার যদি এ পথে আসি, তবে যেন শীকারের সুবন্দোবস্তের জন্যে এম্নি কারো হস্তগত হ'বার সৌভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম। এর আগেই শীকার সন্ধানে লোক জড় করে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য। গোধূলির শ্যামচ্ছায়ায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত হয়ে এল, তখন চারিদিক হতে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান রব, বারম্বার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গল বাদ্য।

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি খবর, আমার বন্ধু সেটা সুবিধার কথা মনে করেন নি, আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্ছনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হোক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন, তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্য্যোদয়ের শুভলগ্নে খানিক দূরে বাঘিনী একটি স্ত্রীলোককে ভোগে লাগাবার উদ্যোগ করছিল, পারে নি, সে কোন রকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাঘ্রী একটি নালার মধ্য দিয়ে অন্য পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তার পায়ের টাট্‌কা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে যে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তার পায়ে হতে ঝরে-পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নালার

পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে সেইখান হতেই তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল, কোথাও গড়িয়ে-পড়া একখণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া সুকুমার লতা গুল্ম, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ, এই দেখেই পথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সত্বর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠে নি, কেননা স্থির নিশ্চয় না হয়ে, পা বাড়ান আমরা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রমটি ছেড়ে সে অধিক দূরে অগ্রসর হবে না জেনে নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট, তার দুটি ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ দুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উঁচু একটি পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম, যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরো দুটি পাথরের ঢিবি, আর গুটিকত গাছও ছিল। ঘাটের পথ চেয়ে দু'চারিটি সরু গলি, এরি মাঝ দিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটিকত গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এম্নিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি, অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অসুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হলেই যে লুকোবার সুবিধা হয়, শীকার তোমার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ ভাবে চলে যায়, তোমায় দেখতে পায় না, সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না ; মানুষের গন্ধ হয়ত

বা পায় কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে সে গন্ধও কম হয়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ বসে থাক, তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবার, ধরা পড়বার সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাজ কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে, শীকারীর মজ্জাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে ওঠে তখন কোথাও আর এতটুকু কাঁপে না কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম সেখান হতে চারিদিকে গাছপালা আর গলি ঘুঁজির জন্যে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডানে হতে পাহাড়টা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. B.-কে ছিলেন একখানি ছোট্ট খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া অন্য একটি পাহারার জায়গা, সেইখানকার একজন গোঁটিয়া তাঁর সঙ্গে ছিল—চট করে গাছে চড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হোক না, সে তারি মধ্যে অবলীলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার সুবিধা করে নিত, কোন রকমে আড়ষ্ট হ'ত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাক্‌ও ছিল ভাল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষার পর, তবে বনের মধ্যে হ'তে যে সব শীকারীরা বাঘ তাড়া করে আনছিল, তাদের সোরগোল শোনা গেল, আরো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর আদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেখলাম স্থূলাঙ্গী একটি ব্যাঘ্র ত্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে, নিমেষের জন্যে সে প্রস্তরস্তূপের ব্যবধানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—পর মুহূর্ত্তেই তার মস্তক আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্রই আমি তার স্কন্ধদেশ

লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কি একটু শব্দ হয়েছিল, তাতেই সে ঘাড় ফিরলে, গুলি তার কাণের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল তৎক্ষণাৎ সে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়চড় করল না, তখন বন্দুকের যে নল খালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার পুরে কি ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শীকারীরা কয়জন পাহাড়ের মাথা হতে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে আর বাকী কয়জন সম্মুখে কিছু দূরে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যবনিকা পতন না হয়, ততক্ষণ এ সাবধানতার বিশেষ আবশ্যক। জয়গর্বে উৎফুল্ল আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না, সঙ্কেত-সূচক বাঁশীটি বাজিয়ে দিলাম, তখনই চারিদিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সঙ্কেতের অভ্যর্থনা করল। K. G. B. আর গৌটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন, সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্র-রাজ-পত্নীর রাজ-যোগ্য অঙ্গচ্ছেদ আর বরাঙ্গের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাহাড়ের মাথার উপর যে সব শীকারীরা ছিল তাদেরি মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌঁছতে পারে নি, সেই সঙ্কট স্থান হতে নেমে আসবার জন্যে তারা ব্যাকুল অথচ ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। এই খানেই ২রা সেপ্টেম্বরের ভল্লুক-বিভ্রাট ঘটেছিল, সে কথাতো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্য্যঙ্কে, ভল্লুকটিকে অপর একটিতে শয্যা রচনা করে দিয়ে বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা করল, আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গৌটিয়া গজ-রাজের পুচ্ছ দেশে

লম্বমান হয়ে, তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে, মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চল্‌ল। বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি, সংহাররূপিণী শার্দ্দূল-বধূর মৃত্যুতে তাদের আনন্দ আর ধরে না। কাছে দেখলাম বাঘিনীটি কৃশোদরী তার চামড়াখানি বড়ই সুন্দর। আমার এবারের হোলির উৎসব বনের মধ্যে, নরখাদক ব্যাঘ্রের তপ্ত রক্তের আবীর কুঙ্কুমে সুসম্পন্ন হল।

আমরা অবিলম্বে এ শুভসংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার আপিসের সাহায্যে বাড়ীতে, আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে আর আর মহানুভাব বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সেগুলির উত্তরও নিয়ে এল, তবে বাড়ী আর আমার কৃতজ্ঞ নিমন্ত্রণ কর্ত্তার কাছ হতে যে আন্তরিক সহানুভূতি পূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কেউ করে নি।

শীকার করে এমন সুন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়- তবে তাকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চর্ম্ম শোধনকারী Messrs Rowland Word-এর বরাবর এ চামড়া লণ্ডন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জর্ম্মানদের অনুগ্রহে জাহাজ ডুবির অসম্ভব ছিল না। এর আগে, আর পরে, যে সব পার্শ্বেল পাঠিয়ে ছিলাম সবগুলিরই পৌঁছ সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু অনেকদিন কোন সংবাদ না পাবার পর হৃদয় বিদারক সংবাদ এল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শ্বেলটি হারিয়ে গিয়েছে। হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এই শোকাবহ ব্যাপার! এ ক্ষতিপূরণ হবার উপায় ছিল না—তূণ পাশবতাই এই ক্ষতির মূল কারণ!

ক্রমশ—

ডিমোক্রাসি।

——:০:——

আজকের দিনে লোকের সঙ্গে কথাই কও আর খবরের কাগজই পড়ো, কানে আসবে ও চোখে পড়বে শুধু একই কথা—ডিমোক্রাসি। এই কথাটা আমাদের মনকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সেখানে অন্য কোনও ভাবনা চিন্তার আর স্থান নেই—অবশ্য এক পেটের ভাবনা ছাড়া। অথচ দেখতে পাই ও-কথাটার অর্থ প্রায় কেউ বোঝেন না। আমাদের নীরব জনসাধারণ ও আমাদের পলিটিকাল বাক্যবাগীশেরা এ বিষয়ে সমান অজ্ঞ। এ অবস্থায় কথাটা যে-দেশ থেকে এসেছে সে-দেশের দু'চারখানা বই একটু নাড়া চাড়া করা গেল—কথাটার যথার্থ মানে বোঝবার জন্যে। এই রাজনৈতিক সাহিত্যালোচনার ফল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি। বলা বাহুল্য যা লিখছি তার ঠিক নাম হচ্ছে "নোট"।

(২)

প্রথমত মর্লি সাহেবের Compromise-খানা আবার পড়লুম। আমাদের দেশে একদল লোক আছেন যাঁরা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় কলম চালান। কর্ম্মের পথ সরল নয়, অতএব বুদ্ধি খুঁড়িয়ে চলুক—এই তাঁদের উপদেশ। সম্ভবনীয়তার রাশ মেনে চলতেই হবে, তা না হলে অতিবুদ্ধি গলায় এবং পায়ে দড়ি জড়িয়ে

খানায় পড়বে—খানায়-পড়া অবস্থা যখন সর্ব্ববাদী নিন্দনীয় তখন গোড়া থেকে বুদ্ধিকে ধীর কদমে চালানই শ্রেয়। কিন্তু তাড়ির মাদকতা ময়দার মতন নির্জ্জীব এবং নিরেট পদার্থের পক্ষে রুটীতে পরিণত হবার জন্য যেমন দরকারী, তেমনই ভাবরাজ্যে বুদ্ধির সাহসিকতা, উত্তেজনা এবং সূক্ষ্মতা নিরেট ঘটনাবলীকে সজীব করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—অন্তত এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। ভলটেয়ার, রুশো, ডিডেরোকে বাদ দিয়ে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চ্চা যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করাও তাই। ভাব এবং কর্ম্মের ঘটকালীতে মর্লি সাহেবের বিধান নেওয়াই বিধেয়, কেননা তিনি নিজে একজন কর্ম্মবীর। তাঁর মত এই যে, বুদ্ধির বন্ধুর পথে সাহসে ভর করে চলাই উচিত, কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক জড়তার ফলে ভাবের দুর্দ্দমনীয়তা সহজেই মন্থরগতিতে দাঁড়াবে। ভাব যদি প্রথম থেকেই সম্ভবের কাছে মাথা নীচু করে তাহলে না-হয় বুদ্ধির বিকাশ, না-হয় ভাবের প্রকাশ।

এখন স্মার্ত্তের কথা যদি সত্য হয় তাহলে মানতে হবে যে, বর্ত্তমান ভারতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাঁধে একটা বিশেষ রকমের দায়ীত্ব এসেছে—বিশেষত বাঙালীর, সে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটানোর দায়। তবে বাঙালীর নামে আগে থেকেই বদনাম রয়েছে যে, তারা কুছ্-কাম্‌কা নেহি। আমি বলি এ নিন্দা অনর্থক, কেননা আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে কাজের লোকের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু মাথা ঘামাবার লোকেরই. আর সেই অভাব যখন বাঙলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূরণ করেছে তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও করবে। আমার দুঃখ এই যে আমরা পূর্ব্বে ঐ অভাব পূরণ করেছি কোন দায়ীত্ব বোধে নয়। কি সাহিত্যে,

কি ধর্ম্মে,, কি বিজ্ঞানে দায়ীত্ব-জ্ঞান নয়, প্রকৃতির তাড়নাই আমাদের ভাবের গতি নিরূপণ করে দিয়ে থাকে। এক রাজনীতির ক্ষেত্রেই আমরা মনের খেয়াল অপেক্ষা নিজেদের কর্ম্ম ক্ষমতা, চরিত্রবল একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের উপর বেশি নির্ভর করি, কেননা কি সাহিত্য কি ধর্ম্ম স্বীয় চেষ্টায় তত গড়ে তোলা যায় না, যত যায় রাজ-নীতি ও সমাজ-নীতি। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। কিন্তু সব বিষয়েই আমরা সৃষ্টি-ছাড়া, তা না হলে একই গলায় একই ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের জন্য আবেদন করতুম না। Mill এবং Comte সমাজ-সংস্কারে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির জড়তা দেখে ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, সেই জন্য লোকের জড়-'বুদ্ধির' মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করলেন—নব্যন্যায় লিখে। আমাদের দেশে দেখছি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ মুক্ত রাখতে কেউ ব্যস্ত নন, তাই বীরবলের কথা হচ্ছে 'এখন ভিক্ষের ঝুলি টাঙ্গিয়ে রেখে বুদ্ধি চালনা করা যাক। আগে পথ-বিচার করা হোক, না-হলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাব'।

(৩)

ধরা যাক্ ডিমোক্রাসি কথাটা। আমাদের ধারণা ও-একটা ধর্ম্ম, ন্যূনকল্পে একটা মহৎ-আদর্শ। কল্পনার যাদুতে যাই ভাবা যাক্ না কেন, ওটা আসলে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ প্রণালী মাত্র। আমাদের দেশ-নায়কেরা কিন্তু এ কথাটি না বুঝে ও-বস্তুকে ধর্ম্ম হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাই তাঁদের প্রত্যেক বক্তৃতায় ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আ-কাঁড়া, ঠিক করা হয় ঐ আদর্শের

চালুনী দিয়ে। আমরা যদি ডিমোক্রাসিকে শাসন-প্রণালী হিসেবেই ধরি তাহলে দুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। প্রথমত ডিমোক্রাসি আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না? দ্বিতীয়ত আমাদের ভিক্ষা-পত্রের দফাগুলির সঙ্গে ডিমোক্রাসির ষোল আনা মিল আছে কি না?

(৪)

স্বরাজের কোন জীবন্ত ধারা বর্ত্তমান না থাকলেও স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের দেশে নতুন নয়। তারপর এই যুদ্ধের কৃপায়, ইংরাজ-শাসন এবং শিক্ষার ফলে, পৃথিবীর রাজকীয় সমস্যার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি যে আমাদের চলতে গেলেই বিশ্বমানবের সাথে এক পথেই সমান পা-ফেলে হাঁটতে হবে, অতএব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে "হাঁ, ডিমোক্রাসি আমাদের চাই"। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

সাধারণ-তন্ত্র যে জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ এই যে পূর্ব্বতন শাসন-প্রণালীর ভিত্তি অপেক্ষা এর ভিত্তি ঢের বেশি পাকা। পুরাকালে রাজ্যের ভিত্তি ছিল রাজার গুণ, এখনকার ভিত্তি লোকের সংখ্যা। রাজ্যতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, এক Federation ছাড়া Aristotle এ বিষয়ে যে তত্ত্ব নিরূপণ করে গেছেন তা সনাতন। তাঁর মতে প্রথমে থাকে একের রাজত্ব, সেই এক রাজা যখন স্বার্থ-সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে প্রজার হিত-সাধনে কুণ্ঠিত হন, তখন তাঁর সভাস্থ সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রের দল নিজেদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করেন তখন হয় অনেকের প্রভুত্ব। সেই বহু আবার যখন এক

গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে গণ-হিত ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠেন তখন একজন শক্তিশালী পুরুষ জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে নিজে tyrant হয়ে বসেন। তাঁরও পরোপকার বৃত্তি যখন বংশ পরম্পরার কাছে হার মানে তখন জন-সাধারণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেখা যায় যে সাধারণের বুদ্ধি কোন অ-সাধারণ সমস্যার সুচারু-রূপে সমাধান করতে পারে না, তখন একজন মূল-গায়েন এই গোলে-হরিবোল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান বীরগর্ব্বে। আবার একের প্রভুত্ব সুরু হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বীরের আসর নেই, মূল-গায়েন আর বংশ-পরম্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যজগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে রাজ্য-শাস-নের জন্য বিশেষ দরকার বলে কাজের ভার একদল বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা সাধারণের কাছে নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্য জবাব-দিহি করতে বাধ্য। এরি নাম গণ-তন্ত্র।

(৫)

অতঃপর দাঁড়াল এই যে ডিমোক্রাসি একটি শাসন প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ ব্যাপার সংখ্যামূলক। জন-সাধারণের ভিতর অবশ্য ভাল মন্দ সব প্রকৃতিরই লোক আছে, তবুও সাধারণ লোকের বুদ্ধির সমষ্টি জনকয়েকের অসাধারণ বুদ্ধির অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু যেকালে রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক আছে তখন তাদের

পরিচয় জন্মের দলিলের বদলে কর্ম্মের দলিল হতেই নেওয়া শ্রেয়। এদের কার্য্যকারিতার বিচারক হবে অবশ্য জন-সাধারণ।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি অন্য শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য হতে বিভিন্ন? সকলেরই উদ্দেশ্য ত প্রজার মঙ্গল। তবে মঙ্গল কথাটার মানে এক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র। আগে ছিল যাঁদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার তাঁরা যখন বেশি বোঝেন তখন তাঁদের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। এখন এর মানে হচ্ছে প্রজার নিজের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। য়ুরোপে যেদিন থেকে পোপ আর জার্ম্মাণ-সম্রাটের ঝগড়া বাধল সেই দিন থেকেই লোক-বাসুকী মাথা নাড়া দিয়ে নিজের সজীবতার পরিচয় দিলে—কুলীন-তন্ত্রের আসন টলল। Humanism-এর শিক্ষা যখন Erasmus, Colet, Abelard প্রভৃতি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন, যখন renaissance-এর প্রসাদে মানুষের আত্মপূজার আরতি বেজে উঠল, যখন Martin Luther ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন, অবশেষে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা লোকায়ত্ব হল তখন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে। এই শুভ মুহূর্ত্তে ফরাসী-বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হল—সেই বিপ্লবের তন্ত্রধারকেরা দেখিয়ে দিলেন যে এক গণ-তন্ত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের আনন্দে নিজের প্রকৃতির সব কলিগুলো ফোটাতে পারে, যা পূর্ব্ব-শাসনতন্ত্রে একেবারে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু গোষ্ঠী-ধর্ম্ম পুরাতন বলেই যে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। তাই নতুন অবস্থায় পড়ে গোষ্ঠী-ভাব জাতীয়-ভাবে পরিণত হল। Idea of Democracy রাজ্যতন্ত্রে রূপান্তর ঘটালে। কিন্তু রূপান্তরিত জাতীয়-ভাবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য হল একটি

ভূতপূর্ব্ব উপায়ে। চিরকালই রাজা তাঁর সভাসদ আমীর-ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে শুধু বিপদ্‌কালেহ্যুপস্থিতে। সম্ভ্রান্তবৃন্দের পক্ষে রাজার প্রসাদ প্রজা-হিতের চেয়ে বেশি ফলদায়ী, তাই তাঁদের দ্বারা জাতির যা মঙ্গল-সাধন হত তা কেবল পেটের দায়ে। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল যেখানে রাজার আত্মীয় স্বজন পার্শ্বচর অনুচরবর্গ ছাড়া একটি জমিদারের দল, একটি পুরোহিতের দল এবং রাজ-কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাচিত সাধারণ-দলের প্রতিনিধিরা আহূত হতেন রাজাকে সৎ পরামর্শ দেবার জন্য। ইংলণ্ডে প্রথম তিন দল একত্র হয়ে এক সভায় সেই দিন থেকে বসতে আরম্ভ করলেন যেদিন John-এর দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে Normandy-র যোগ-সূত্র ছিন্ন হল। আর সাধারণ দল বসলেন অন্যত্র কিন্তু দুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ রইল। ইংলণ্ডে এইরূপে এক জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সামঞ্জস্য রক্ষা হল। ফরাসী দেশে তিন দল আলাদা represented হত। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই এই সভার উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেরাই শাসন কার্য্য সমাধা করতেন। কিন্তু ষোড়শ লুইএর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি আবার এই ব্যবস্থাপক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন প্রজার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার জন্য। প্রশ্ন উঠল এই যে, তিন দল আলাদা আলাদা না একত্রে ভোট্ দেবে। রাজার মৎলব আলাদা, প্রজার মৎলব একত্রে, ফলে ঘটল ফরাসী-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে জমিদারের দল কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ বা বাণিজ্যে মন দিলেন। সেই থেকে Separate representation of class-interests-এর পরমায়ু শেষ হল। বর্ত্তমান কালে

ইটালার রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের নকল বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৫০ সাল থেকে প্রুসিয়া, সেক্সনি এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ Municipality-তে ভোটারগণ তাদের টেক্স দেবার ক্ষমতা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হত। অষ্ট্রিয়াতে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও লোক সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত—জমিদার, সহরবাসী ব্যবসায়ী, গ্রাম-সঙ্ঘ এবং জন-সাধারণ। হাঙ্গেরি দেশে Table of magnates-এ শুধু বড় লোকেরাই বসতে পেতেন। কিন্তু গত যুদ্ধের ধাক্কায় এই রাজ্যগুলো ধূলিসাৎ হয়েছে, নতুন শাসন-প্রণালী যা অবলম্বিত হল তার বিশেষত্ব এই যে সমগ্র জাতিই হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। বীরবলের মতে গত যুদ্ধে ব্যক্তি-তন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে এবং তিনি ১৯১৫ সালে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। ডিমোক্রাটিক জাতিরাই জয়যুক্ত হয়েছে, আর পরাজিত জাতিরা ডিমোক্রাসি অবলম্বন করেছে। তাঁর কথা যেকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন তাঁরই মতানুসারে যে সব জাতির জীবন ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর গঠিত তাদের ইতিহাস হতে রাজনীতির মূলতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া উচিত —বিশেষত যখন বাকী য়ুরোপের জীবন তাদেরই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালী এমন কি জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়াতেও (রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে) যেকালে এ রকম ঘরের ভিতর ঘর সৃষ্টি করা বোকামীর পরিচয় এবং জাতীয়তার সর্ব্বনাশ-সাধক বলে পরিগণিত হয়েছে তখন বর্ত্তমান-ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতেই আমরা যে নির্ব্বিবাদে Communal representation-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি এই

প্রমাণ যে আমাদের মনে আজও দেশাত্মবোধের ঘোরতর অভাব রয়েছে। আমাদের দেশ-নায়কেরা দু'দলে একমত হয়ে আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ কর্‌লেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদের তার মারাত্মক ফল ভোগ কর্‌তে অবশ্যই হবে।

(৬)

তাহলে আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য? ভাগ্যক্রমে ভোটের ব্যবস্থা স্থির করে প্রাদেশিক লাট-সাহেবদের মত নিয়ে নতুন ধরণে সভা বসাতে এখনও এক বৎসর। ইতিমধ্যে দেশের দলপতিরা এই সত্য প্রচার করুন যে, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে য়ুরোপ যখন Separate Communal representation জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমাদের দেশে য়ুরোপ এবং আমেরিকা যে-উপায়ে সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়তা রক্ষা করেছে সেই উপায়ই অবলম্বন করা সঙ্গত। য়ুরোপের সত্য আমাদের দেশে খাটবে বিশেষত যখন দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতই হোক য়ুরোপের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংলণ্ডের শিষ্য হয়েই আমরাও রাজনীতির শিক্ষানবিশী করছি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতির তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমত যারা ভোট দেবে তারা এক দল। দ্বিতীয়ত যারা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য চালাবে তারা আর এক দল এবং যারা ভারী-দলের আনুকূল্যে সাধারণের মত লক্ষ্য করে রাজ্য-শাসন করবেন অর্থাৎ Executive, তাঁরা হচ্ছেন তৃতীয় দল। কে কি রকম ভাবে ভোট দেবে, কি রকম ভাবে ব্যবস্থাপক সভা গড়া হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যপস্থাপক

সভার সম্বন্ধ কি হবে এই তিন বিষয়ের তথ্যের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ programme নিয়মিত এবং নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমেই ভোটের কথা ধরা যাক। ভোট দেবার অধিকার সম্পত্তি-মুলক কিম্বা মনুষ্যত্ব-মুলক, যে মুলকই হোক না ভোট দেবার রীতি সাধারণত দুই রকমের। প্রথমত প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি স্থানীয় ভোটের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হবে—একেই বলে Scrutin d' arron dissement, ভাষান্তরে district system. দ্বিতীয়, প্রতিনিধি ঠিক করা হবে একটা সমগ্র প্রদেশের ভোট একত্র নিয়ে, এই প্রদেশের ভিতর অবশ্য অনেক জেলা আছে। যদি দশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভোটারের হাতে একটা লিষ্ট থাকবে সেই লিষ্টে অন্তত দশ জনের নাম থাকবে, ভোটার তখন বিচার করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে গুণানুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে দেবে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যা ভোট পাবেন তিনিই প্রথমে নির্ব্বাচিত হবেন এই রকমে পর পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। একে বলে Scrutin de liste, ভাষান্তরে General ticket system. এই দু'পদ্ধতিরই দোষ-গুণ আছে এবং দুই পক্ষেই বড় বড় কৌন্সিলী দাঁড়িয়েছেন। ফরাসী দেশে Montesquieu, Mirabeau থেকে আরম্ভ করে Duguit পর্য্যন্ত; ইংলণ্ডে Lord Brougham থেকে Sidgwick, Balfour; জার্ম্মাণীতে Bluntschli—এঁরা সকলেই বলেন যে জাতীয়-জীবনের সমস্ত প্রবাহগুলির অবাধ গতির পক্ষে district system ভাল, আবার Robespierre থেকে M. Goblet পর্য্যন্ত সকলেই Scrutin de liste-এর পক্ষপাতী। দু'দলেই যখন মহা মহারথী রয়েছেন তখন

নিজেরাই আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের পক্ষে কোন্‌টি ভাল। District method-এর বিপক্ষে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমত নির্ব্বাচনের গণ্ডী ছোট হলে অনেক সময় অযোগ্য লোককে ভোট দিতে হয়। দেখা গেছে যে, যে-সব সহরে ward অনুসারে alderman বাছাই হয় সেখানে ঘুষের জোরে যোগ্যতা থই পায় না।

দ্বিতীয়ত এই সব অযোগ্য লোকেরা নিজেদের ছোট গণ্ডীর অতিরিক্ত কোন জাতীয় ভাবের ধারণা মনে পোষণ করতে অপারগ। ফ্রান্স এবং ইটালীর ইতিহাসে এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে—ইটালী বুঝে স্থঝে district method ছেড়ে দিয়েছে। এই রীতিতে যে-সব Deputy পাঠান হয় তাঁরা নিজেদের কেবলমাত্র জেলার প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন, সমগ্র দেশেরও যে তাঁরা প্রতিনিধি এ কথা তাঁরা মনে ভাবতেই পারেন না—সেইজন্য তাঁরা নিজের ভোটারদের খুসী করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে দেশের রাজকার্য্য চালাবার কথা তাঁদের মনে থাকে না। Daudet তাঁর Numa Roumestan বইয়ে এঁদের দুর্দ্দশার কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন—কোথায় একটা বাজার বসাতে হবে, কোথায় কার ছেলের চাকরী করে দিতে হবে এই সব কাজ করতে করতে তিনি ভোটারদের বাজার-সরকারে পরিণত হন। District system-এ যে পরিমাণে তোষামুদী এবং ঘুষের প্রশ্রয় পায় তার তুলনা কুত্রাপি নেই।

তৃতীয়ত এই উপায়ে শাসকের দল ভোট অনুসারে যে স্থানের যত সংখ্যক প্রতিনিধি হওয়া উচিত তা অপেক্ষা নিজেদের মনোমত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি হস্তগত করবার জন্য জেলাকে খেয়াল অনুসারে বিভাগ করেন।

এসব গেল বিপক্ষের কথা। স্বপক্ষের কথা হচ্ছে district system-য়ে প্রথমত ভোট দেওয়া সহজ হয়, প্রতিনিধি ভোটারদের পরিচিতেরমধ্যে একজন এবং সেই পরিচয়ের জোরেই তিনি জেলার অভাব দূরীকরণে বেশি তৎপর থাকেন। দ্বিতীয়ত এ উপায়ে যাঁদের দল সংখ্যায় কম তাঁদের মতেরও যথাযোগ্য মুল্য দেওয়া হয়। সাধারণ-তন্ত্রের দোষই এই যে মতের গুরুত্ব অনুসারে দলের ভারীত্ব নির্দ্ধারিত হয় না। General ticket system অনুসারে যে-কোনও দল চালাকী করে সব প্রতিনিধিগুলিকেই হস্তগত করতে পারেন—সেইজন্য আমেরিকা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পদ্ধতি ত্যাগ করে district method গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত Bradford সাহেবের মতে যে-কালে অশিক্ষিত ভোটারের পক্ষে সূক্ষ্মভাবে ভোটপ্রার্থীদের গুণ বিচার করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা অসম্ভব, জনসাধারণকে সেকালে party-guide-এর হাতে পড়তেই হবে; অতএব স্বাবলম্বনই শ্রেয়।

মোটামুটি এইত গেল যুক্তির কথা, দৃষ্টান্তের কথা তারপর। ফ্রান্স ১৭৯১ সালে Scrutin d' liste আরম্ভ করেন, ফলে দেশের তিন দল একমত হয়ে রাজার অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, তারপর নেপোলিয়নের যুগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, কিন্তু তা সত্বেও তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার এই ভোটের কৃপায় ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে বসলেন কিন্তু তাঁর কার্য্যকলাপ দেখে ফ্রান্স মনস্থির করলে যে Dictator-এর যুগ চলে গেছে, তাই ১৮৭৬ সাল থেকে রাজবংশের পুনরাগমন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে Scrutin d' arrondissement পুনঃপ্রতিষ্ঠ হল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভায় কি দেশাত্ম-

জ্ঞান, কি ধর্ম্ম-জ্ঞান সবই লোপ পাচ্ছে, তাই ছোট দলগুলিকে এক করে একটি স্থায়ী Republican দল গড়বার প্রয়াসে Scrutin d' liste-এর আশ্রয় পুনরায় গ্রহণ করা হল। কিন্তু Boulanger আবার যখন নূতন নেপোলিয়ন হতে চাইলেন তখন ১৮৮৯ সালে district method ফিরে এল। ফলে ফরাসা দেশের ব্যবস্থাপক সভার দুর্দ্দশার কথা সকলেই অবগত, বিস্তর ছোট দলের উপদ্রবে বড় দলের স্থায়ীত্ব নেই, মন্ত্রীদলের পরমায়ু গড়পরতা ৮॥০ মাস এবং কোন কার্য্যেই তাঁরা নিজেদের দলের উপর নির্ভর করতে পারেন না—ব্যবস্থাপক সভা সে দেশে হয়ে উঠেছে একটা Debating club. ফ্রান্স নিজের দুরবস্থার কথা বোঝে কিন্তু পাছে আবার কেউ ভোটারদের ঠকিয়ে নেপোলিয়ন হয়ে বসে এই ভয় তার এখনও ঘোচে নি—শুধু তাই নয় ফ্রান্স বহুকাল থেকেই সুস্পষ্টভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত এবং জেলার শাসন-প্রণালী রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র থাকা সত্বেও অতিশয় centralised. তার উপর সে দেশে আছে—ল্যাটিন বুদ্ধির চিরন্তন symmetry-প্রিয়তা, এই সব কারণে এখনও ফ্রান্স district method-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য। বর্ত্তমান কালে এক ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পর্টুগাল, স্পেন, কোবে, জাপান, অনেক Swiss Cantons, আইসল্যাণ্ড, টেস্মেনিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড ব্যতীত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এই Scrutin d' liste মেনে নিয়েছে। সাধারণ-তন্ত্রের অনিবার্য্য দোষ এই যে যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় কম সে-সম্প্রদায় নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতে পারেন না। কিন্তু General ticket system অবলম্বন করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সব দেশেই তাঁদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এখন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দুই-ই দেখান গেল। আমার কথা এই যে district system-এর যে দোষগুলি য়ুরোপে দেশাত্মবোধ অত সুগভীর থাকা সত্ত্বেও প্রকট হয়েছে—যথা ছোট ছোট দলের মধ্যে জাতীয়তার অভাব, গণ্ডীর বাইরে যাবার অক্ষমতা—এগুলি ত ভারতবর্ষের সনাতন দোষ—তার উপর য়ুরোপ আমেরিকা যা পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ—communal representation, তাই আমরা যেচে নিলুম। কাজেই আমার মতে আমাদের general ticket system অবলম্বন করলে খানিকটা বাঁচাও, নচেৎ আমাদের ব্যবস্থাপক সভা একটা দলাদলীর আড্ডা হবে।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচ্যে শক্তিবাদ।*

—:*:—

জীবনযাত্রার রীতির মত নৈতিক ধারণাও প্রাচ্যদেশে বহুবিধ; তথাপি সাধারণত পাশ্চাত্য জগৎ মনে ভাবে যে, নৈতিক হিসাবে প্রাচ্যের সকল ভাবের ধারা পাশ্চাত্যের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কর্ম্মের আদর্শ লইয়া যখন আলোচনা চলিতে থাকে তখন পরস্পরের পক্ষে পরস্পরকে বুঝিতে পারা কঠিন; কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তাহার চিরাগত সামাজিক প্রথা বদ্ধমূল হইয়া জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং এক জাতি অন্য জাতির প্রথা একেবারে অন্যায় না হউক ঠিক ন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। তাই যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে পরস্পরের নৈতিক ও কর্ম্মের আদর্শ তুলনা করিয়া দেখে, তখন সহানুভূতিতে অন্তর্দৃষ্টির অভাব হইবারই কথা। তথাপি ভারতের সমাজ-নৈতিক চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিতে করিতে সরল, প্রাচীন আর্য্যজগতে গিয়া পৌঁছাইলেই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যে আজ যে সকল গুণের আদর, প্রাচীন ভারতীয়গণও সেই সকল গুণকেই শ্রদ্ধা করিতেন। পাশ্চাত্যে প্রাচ্যসম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা ঠিক নহে, পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যের নৈতিক সাহিত্যও সর্ব্বদা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে

---

* (Paul Rienski-র Political and Intellectual Currents in the Far East হইতে)।

যে, সত্যানুরাগই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। ভারতের প্রাচীনশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, ধৃতি প্রভৃতি বীরোচিত সদ্‌গুণও অবহেলা করা হয় নাই।

কিন্তু ক্রমাগত বিদেশীর নিকট পরাজিত হইয়া নানারূপ পরিবর্ত্তনে এবং জাতিভেদ প্রথার প্রচলনে ভারতীয় সভ্যতা ক্রমেই যত জটিল হইতে লাগিল, নীতিশাস্ত্রও ততই তাহার প্রাচীন সরলতা হারাইয়া ফেলিল। নীতিশাস্ত্রের নানারূপ বিভাগ হইল, নানারূপ অনাবশ্যক অংশ তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ত্যাগধর্ম্ম (doctrine of renunciaticn) জাতির মনে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ভারতের পরবর্ত্তী যুগের চিন্তা—সংসারত্যাগ, কর্ম্মবিরতি, জীবনের দুঃখকষ্ট ধীরভাবে সহ্যকরা, এই সব প্রবৃত্তির অনুকূলে। তখন এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ শান্তভাবে সকল শক্তি নিরোধ করিয়া মানুষকে শুদ্ধ ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিল। বারবার বহিঃশত্রুর ভারতজয়, দুর্দ্দম্য জড় প্রকৃতির অত্যাচার, জাতীয়তার অনুভূতির অভাব, এই সকল মিলিয়া চিন্তা জগতের এই সব ভাবকে আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই এই জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে এক মহা সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত দেখিতেছি। নব নব জাতীয় শক্তির উদ্বোধন দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন ভাবে নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে, দেখান হইতেছে যে, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ ও ভগবানের বিধান মাথায় তুলিয়া লওয়া (Submission) হিন্দুধর্ম্মের জটিল শাস্ত্রের একটি অংশমাত্র; দেখান হইতেছে যে পুরুষোচিত গুণ, যে-সব গুণে মানুষকে অধিক কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলে, সে-সব গুণেরও হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া

থাকে। এই সব বীরোচিত গুণ এখন প্রাচ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। জাপানে জাতীয়ভাবের ফল দেখা যাইতেছে, জাপান তাহার জাতীয়-জীবনে যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা এশিয়ার অপরাপর দেশের আদর্শ স্বরূপ।

(২)

হিন্দুদের তুলনায় চীনাদের দার্শনিক আলোচনার প্রবৃত্তি অনেক কম। সহজ বুদ্ধিতে যাহা নীতি-অনুমোদিত মনে হয় তাহাই তাহারা পালন করে। চীনারা চিরকাল শান্তিপ্রবণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্ত-ভাবে দাঁড়ানই তাহাদের চরিত্রের প্রধান বল; বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া তাহারা যেরূপ ভাবে নানা অমঙ্গলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহাতে তাহারা ঋষি টল্‌ষ্টয়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, "চীনাকে আদর্শ কর; দেখ এই বিপুল জনসঙ্ঘ কেমন শান্ত ও ধীরভাবে জীবনযাপন করে, বিদ্রোহাচরণ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া শান্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া কেমন ভাবে তাহারা 'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না' Resist not Evil—এই নীতি পালন করে"। চীনা দার্শনিক লাওট্‌জ্ (Lao-Tze) চীনাদের এই জাতীয়-আদর্শ অনেকটা পরিস্ফুট করিয়াছেন। লোকে ইঁহাকে চীনের এপিক্‌টিটাস্ বলে। তিনি reason-কে যেরূপ ভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন তাহাতে গ্রীকদার্শনিকের সঙ্গে তাঁহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহার মতে, reason যেমন ভাবে জগতে ও মানব মনে অভিব্যক্ত, তাহাতে মানবশক্তিকে আত্মপ্রত্যয়বিশিষ্ট

(Self conscious) করার কোনই প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত তিনি, যিনি সহজ ভাব অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহার নিজের reason-এর প্রয়োগ ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিশ্বের reason-কে স্বীয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন। যুক্তি করে সবাই, কিন্তু সবাই আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় না। লাওট্জ্-এর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা-বর্জ্জনের অর্থ অবশ্য অকর্ম্ম নয়, ইঁহার উপদেশ—সকল বস্তু স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠুক, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে বাড়াইতে যাইও না। কিন্তু জন-সাধারণ তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে তাঁহার প্রচারিত নীতির অন্তরে যাহা ধর্ম্ম ও শক্তির সহায় ছিল তাহা দুর্ব্বলতায় পরিণত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানে অনেক চীনার মতে জাতীয় প্রতিষ্ঠা-নের যে-সব অসম্পূর্ণতার জন্য চীন অসংখ্য অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্য এই লাওট্জ্-ই দায়ী।

আজ আমরা দেখিতেছি যে এই বিপুল জনসঙ্ঘ জাগিয়া উঠিয়া নিজের অন্তরে নূতন শক্তির পরিচয় লাভ করিতেছে, ইহাদের মন কর্ম্মযোগের প্রতি আরও অনুকূল হইয়া উঠিতেছে; চীনে—আত্ম-প্রতিষ্ঠাবর্জ্জনের দেশ চীনে—সামরিকতা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। শক্তি লাভই যে জাতীয়-আদর্শ তাহা সকল দেশের সাহিত্যে আজ পরিস্ফুট। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য আজ অনেকে ক্ষতিস্বীকারে অগ্রসর, স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলে সামরিক বেশ পরিধান করিয়া সৈন্যদের মত শিক্ষা পাইতে আগ্রহান্বিত। এতদিন দেশে লোকে যুদ্ধবৃত্তি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, আজ সে ঘৃণা নূতন নূতন শক্তির আবির্ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে। চীনা বীর ওয়াং-ইয়াং-মিং এই নূতন ভাবের বন্যা দেশের সাহিত্যে

আনিয়াছেন, তাঁহার রচনার মূল্য যে কত বেশি, তাহা জাপানীরা প্রথমে দেখাইয়া দেয়। আজিকার দিনে তিনি চীনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান লেখক। কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই—চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণাম যদি কর্ম্ম না হয়, তবে সে চিন্তা ও জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা এই হিসাবে পরীক্ষা করিতে হইবে যে তাহা কর্ম্মজীবনের পক্ষে সহায় কি না। নিজে তিনি সংসারী ছিলেন, এবং স্বীয় মত এমন ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, বীরোচিত কর্ম্মে পাঠকের উৎসাহ জন্মে। কর্ম্মের জন্য এই উৎসাহ, বিপ্লববাদের ভাবে এবং পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় অভিব্যক্ত হইতেছে; বৃদ্ধ দার্শনিক বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত এসব পছন্দ করিতেন না। অন্যায় যে সহ্য করিতে হইবে, এ ভাব চীন দেশ হইতে অনেকটা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে এই বিশ্বাস যে, শুধু বীরত্বের দ্বারাই জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সকলের সমাধান করিতে হইবে। ওয়াং-ইয়াং-মিং-এর কথাগুলি চীনের কর্ণে যেন তূর্য্যনিনাদ করিতেছে।

প্রাচ্যে কর্ম্মযজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত জাপান। শুধু তাহার বর্ত্তমান জীবন নয়, তাহার অতীতও এই কর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছে। প্রাচ্যে একমাত্র জাপানেই ইউরোপের মত সামরিক সামন্তশ্রেণী (Military feudalism) গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন তাহার অন্তরে জাতীয়-সত্তার পূর্ণ অনুভূতি জন্মিল তখনও সামন্ত-প্রথার সামরিক দিকটা তাহার কর্ম্ম ও ভাবের কেন্দ্র হইয়া থাকিল। ভারতে ও চীনে পুরোহিত ও পণ্ডিত যেমন গৌরব লাভ করিয়া

আসিয়াছে, জাপানে কখনও তেমন হয় নাই। জাপান, বুদ্ধ ও কনফিউশিয়াস, এই উভয়ের ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার আপন চিন্তার ধারা দিয়া এই দুই ধর্ম্মকে জাতীয় ভাবের সহিত মিশাইয়া লইয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বাদে যে বিরোধ আছে তাহাতে ভয় না পাইয়া জাপান তাহার জাতীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্মনীতি এরূপভাবে গড়িয়া তুলিল যে তাহাতে মানবশক্তির উৎকর্ষ ও অভিব্যক্তি প্রধান স্থান অধিকার করে। সামরিক যুগ হইতে সে তাহার 'বুশিদো' বা ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্লেটো ও হিন্দু দার্শনিকগণ সত্যানুরাগ, মহাপ্রাণতা, সাহস ও অন্যান্য যে-সব গুণ ক্ষত্রিয়োচিত বলিয়া বর্ণনা করেন, এই 'বুশিদো' ধর্ম্ম সেই সকল গুণকেই প্রশ্রয় দেয়। নব্য জাপান, জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই নীতি চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই; স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সামরিক যুগে যে-সব বিধি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে-সকল বর্ত্তমান শ্রমজীবি-সমাজের নৈতিক সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে অপারগ।

(৩)

সমসাময়িক প্রাচ্যচিন্তার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, যে এই সব প্রাচীন জাতি কর্ম্ম ও শক্তির তত্ত্ব কতদূর ভেদ করিতে পারিয়াছে। এই সকল বিষয়ে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের প্রভেদ থাকিবেই, মৌলিক ভেদের জন্য বাহিরের উন্নতির পথও স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে যাহা বুঝায় আজও সে ভাব প্রাচ্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই

মানবের ব্যক্তিত্বের এই যে প্রাধান্য, স্বচ্ছন্দ বিকাশের এই যে অবসর, ইহার মূল খুঁজিতে গেলে গ্রীস রোমের ক্লাসিসিজ্‌মের (Classicism-এর) নিকট যাইতে হইবে। ক্লাসিক আদর্শ আত্মসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত; যাহা শুধু কৌতূহল তৃপ্তি করে, ভয় উৎপাদন করে বা বুদ্ধিভ্রংশ জন্মায় সে-সব ছাড়িয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে ভাব ও ভাষাকে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা—ইহারই নাম ক্লাসিক ভাব। এইরূপে আত্মদমন হইতে স্বাধীনতা জন্মে। এই আত্মসঙ্কোচনের ফলে মানুষ পরস্পরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বুঝিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্য মনে হয় যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদী পাশ্চাত্য সকলের প্রতি সমান ভাবে নৈতিক বিধান প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে, নীতির সহিত সমাজতন্ত্র মিশাইয়াছে। কিন্তু 'ব্যক্তিত্ব আত্মসংযমের ফল' একথা মনে রাখিলে এ ব্যাপার তেমন অসম্ভব বোধ হইবে না।

এই সকল ব্যাপারে অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মস্ত বড় ভেদ রহিয়া গিয়াছে। মানবজীবনে কর্ম্মশক্তি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা জানিবা মাত্র প্রাচ্যদেশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যেসব কর্ত্তব্য বিহিত আছে তাহাদের দোহাই দিতে চায়। প্রাচ্যের বর্ত্তমান যুগে প্রধান সমস্যা—শক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছাড়িয়া মানবসাধারণের জন্য বিহিত নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করিলে কি তাহা লাভ করা যাইবে? সমাজধর্ম্মে সাধারণ-তন্ত্র চলিবে, না অভিজাত তন্ত্র?

এশিয়ার প্রধান দেশ তিনটির মধ্যে চীনই গণতন্ত্রের দেশ; যখন পৃথিবীতে অপর কোনও দেশ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী বলিয়া স্বীকার করে নাই, তখন চীনের অবস্থা এরূপ ছিল যে সমগ্র

সমাজের পক্ষে Community সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে সর্ব্ব-সাধারণের সম্মতির আবশ্যক হইত। বর্ত্তমান জাতীয় পরিবর্ত্তনে এই প্রজাতন্ত্রের ভাব আরও পরিস্ফুট, রাষ্ট্র এখন সাধারণের মতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। জাপানে যে একটা নামমাত্র পার্লামেণ্ট প্রচলিত আছে তাহা ছাড়াইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন শাসনপ্রণালী দেওয়া হইবে যাহাতে ইহার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই লোকায়ত্ত হইতে পায়।

সমাজধর্ম্মে বহুর প্রাধান্য থাকিবে, না কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বরেণ্য করিয়া রাখা হইবে এই সমস্যার মীমাংসা দূর-প্রাচ্যে কিরূপ ভাবে সমাধান হয় তাহা দ্রষ্টব্য বটে। ভারতে ও জাপানে সমস্যা দাঁড়াইতেছে এই—জাতীয় জীবনে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রাচীন পন্থা অবলম্বন না করিয়া অন্য কি উপায়ে সেই শক্তির বিকাশ সাধন করা যাইতে পারে? আর যদিই বা এই প্রাচীন ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে তবে এমন কোনও উপায় আছে কি যাহাতে ইহার প্রভুধর্ম্ম (master morality) সর্ব্বসাধারণের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। আর চীনের সমস্যা—যে স্বল্পসংখ্যকের নেতৃত্ব জাপানে এতদূর বিকাশিত যাহা ভারতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে, সেই নেতৃত্বের বিকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া জাতীয় জীবনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় কি না? ইহা যে অসম্ভব, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে চীনের সমাজধর্ম্মে গণতন্ত্রের ভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে পারে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে সভ্যতার এই বিকাশ-রঙ্গভূমি এশিয়ায় প্রভুধর্ম্ম ও দাসধর্ম্মের মহা বিরোধের এত শীঘ্র সামঞ্জস্য হইতে চলিল?

এ কথা হয় ত সত্য যে, প্রাচ্যের ভাবুকগণ যখন ইউরোপের সহিত আমাদের সভ্যতা তুলনা করিয়া দেখেন তখন তাঁহারা যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ফলে ব্যক্তিগত শক্তি ফুটিয়া উঠে এদেশে সেই ব্যক্তিত্বের অভাবই বিশেষ করিয়া বোধ করেন। উচ্চ আশায় তাঁহাদের মন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, নবজাগরণের জাতীয় উদ্বোধনের ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের ধারণা, মানবকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ লাভ করিতে ও কর্ম্মে পরিণতি লাভ করিতে হইলে তাহার পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা আবশ্যক। তাই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ান যে অতীতের কোন্ বিধানের বলে সমস্ত জাতির মধ্যে নেতৃত্বের ভাব সঞ্চারিত করা যায় এবং আশা করেন যে এই সব বিধি-বিধান হইতে মানুষের ব্যক্তিত্ব এমন ভাবে ফুটাইতে পারিবেন যে তাহাতে জাতীয়-জীবন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

(৪)

বর্ত্তমান যুগে জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্যের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রকৃতির অত্যাচার সহ্য করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহা দূর হইয়া এখন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বাসনা এশিয়ার মনেও জাগিতেছে। সে দিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য-জীবনে বিশ্বের রহস্যের দিকটাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। প্রাচ্য বুঝিতে তেমন চায় না, যেমন সে কল্পনা করিতে চায়, ব্যাখ্যা করিতে চায়, ডষ্টয়েভস্কি বলিয়াছিলেন, "রাশিয়াকে বুঝিতে পারা যায় না, রাশিয়াকে বিশ্বাস করিতে হইবে।" (Russia cannot be understood, she must be believed in.) এই ভাব লইয়া

প্রাচ্য চারিদিকে যাহা কিছু উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যময় তাহাতেই মুগ্ধ থাকিতে প্রস্তুত। তাহার মতে জীবনের প্রত্যেক ভাব কোন রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশমাত্র! সর্ব্বত্রই ভূতযোনি আছে, দরিদ্রতম হিন্দু কৃষকের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল। চীনাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল ভূতযোনীতে পূর্ণ। গভীর বনে, উপত্যকার মধ্যে, জাপানীরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তাহাতে কখনও প্রবেশ করে না; কিন্তু সে-সব মন্দির বিদেহ বীর-আত্মার ও দেবতার আবাস। যখন স্তব্ধ সন্ধ্যার নীরবতায় প্রকৃতি শব্দহীন তখন অনেকে জালযুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া সম্ভ্রমের সহিত মন্দির মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস প্রাচ্যজাতির, বিশেষত ভারতীয় ও জাপানাদের বীরপূজায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাহারা মহাপুরুষকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে, তাঁহাদের পূজা তাহাদের নিকট অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য যেন চারিদিকে আধ্যাত্মশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং এই আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর ভিতরই তাহার জীবন বাড়িয়া উঠে।

কিন্তু প্রাচ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ধারণা প্রচলিত নাই, ধারণাটি এই যে, রহস্যময়ী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির সকল কর্ম্ম এক নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে চলিতেছে। প্রাচ্য জনসঙ্ঘের মনে এখনও যথেচ্ছাচারী ভূতযোনী রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম এখনও জনসাধারণের মনে ছাপ মারিয়া যায় নাই। জড়জগতের শৃঙ্খলারও এক বিশ্বজনীন নিয়মানুযায়ী সংহতভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের ধারণা সুদূর অতীতে তাহাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রচারিত

হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্যে এ ভাব যেমন বহুজনবিদিত, প্রাচ্যে তেমন নয়।

প্রতি প্রাচ্য মনের এইভাব দুই কারণে জন্মিয়াছে; প্রথমত স্বভাবের শক্তি দেখিয়া মানব-মন ভীত ও সঙ্কুচিত হয়, এই সব শক্তির শাস্তা ও নিয়ন্তারূপে সে আর নিজকে ভাবিতে পারে না, দ্বিতীয়ত প্রাচ্যের দার্শনিক মন (philosophical mind) আত্মা লইয়াই এত ব্যস্ত যে সে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্ত্তবাদ লইয়া এক জটিল শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে বটে কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে (Experimental method) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে শিখে নাই। কিন্তু আমরা যে শক্তিবাদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহাতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতি প্রাচ্যের মনোভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবেই। পাশ্চাত্যে মানববুদ্ধি ও শক্তি যে-বিষয়ে এতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সে-বিষয় প্রাচ্যের অভিজ্ঞতার বাহিরে থাকিবে না। ইহার মধ্যেই জাপানীরা জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে আর ভারতে মহা আন্দোলন চলিয়াছে —সঙ্কীর্ণভাবে প্রাচীনগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রচলিত প্রথা বর্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার এই যে সদ্য জাগ্রত প্রবল বাসনা, ইহার সহিত প্রাচ্যের গভীরতম ভাব মিশান আছে।

(৫)

কিন্তু প্রাচ্যে যদি এই শক্তিবাদ ও কর্ম্মবাদ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাবও সেই সঙ্গে

বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। জাপানীরা যে পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্যে শক্তিলাভ করিয়াছে, তাহা শুধু আপন আদর্শ ও সভ্যতা আরও দক্ষতার সহিত রক্ষা করিবার জন্য। "শক্তি সঞ্চয় কর যেন নিজত্ব বজায় রাখিতে পার" (Make yourself strong so that you may retain the right to be yourself)—শুধু জাপানের নয়, চীন ও ভারতের মনোভাবও ইহাই বলিয়া মনে হয়, বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করা কর্ম্মজগতে শ্রেয় বটে, কিন্তু মানুষের আত্মা, তার মনোজগতের রহস্য, মানবাত্মার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা, এই সব ভাব জড়জগতের যে-কোন ব্যাপার অপেক্ষা তাহাকে অধিক মুগ্ধ করিবে। এই উদার আধ্যাত্মভাব পৃথিবীকে দিবে, সংসারে ইহা চিরস্থায়ী করিবে, ইহাই প্রাচ্যের প্রধান কাজ—প্রাচ্যের নিকট ইহা অতি উৎসাহের ও উদ্দীপনার কথা। প্রাচ্য জানে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—তাহার ব্যষ্টির উন্নতি, কর্ম্মজগতে শক্তিবিকাশ, সরল ও সুন্দর কার্য্যপ্রণালী, জটিল যন্ত্রতন্ত্র, এ সকলের মূল্য প্রাচ্য বোঝে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও ভাল করিয়া জানে যে, মানুষের আত্মা শুধু এইসব উন্নতি, এইসব বাহিরের সিদ্ধি দিয়া সর্ব্বদা অভীষ্ট লাভ করে না, জানে যে যন্ত্রতন্ত্র আত্মাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, কলের চাপে মানুষের চিত্তবৃত্তি একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। যখন সে দেখে অতি গভীর চিন্তারাজ্যেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জড়বাদ ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন সে অনুভব করে যে প্রাচ্যেরও একটা কথা বলিবার আছে এবং সে কথা জগৎ শুনিবে। প্রাচ্য আশা করে, এই জড়বাদ হইতে সংসারকে সে মুক্তি দিবে। ঠিক কোন্ পথে কেমন করিয়া দিবে তাহা এখনও পরিষ্কার বুঝিতে

পারা যায় না ; কিন্তু পাশ্চাত্য যেমন তাহার কর্ম্মজগতে প্রাধান্যে গৌরব বোধ করে, প্রাচ্যও তেমনই এই চিন্তা হইতে আশা ও সান্ত্বনা লাভ করে যে তাহার আধ্যাত্মিকতা জগৎকে মুক্তি দিবে। আধ্যাত্মিক জগতে যে-বস্তুর মূল্য আছে সেই বস্তু লাভের জন্য যদি প্রাচ্যে তাহার নবজাগ্রত শক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত।

সাহিত্য বনাম পলিটিক্স।

——:০:——

গত পয়লা জানুয়ারি তারিখে একটি বন্ধুর বাড়ীতে আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুকাল পরে আবার দেখা হয়, তিনি প্রথম কথা যা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে হচ্ছে এই—

"এখন তুমি কি করছ ?"

আমি উত্তর করলুম—"বিশেষ কিছুই না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—

"হাঁ আমিও তাই মনে ভেবেছিলুম। কি কংগ্রেস কি কন্‌ফারেন্স, কোন দলেই তোমার নাম দেখতে পাই নে। পলিটিক্সে যোগ দেও না কেন ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একজন প্রবীন মডারেট বলে উঠলেন—

"ওদের কথা ছেড়ে দিন। ও সাহিত্য নিয়েই বসে আছে, যেমন ওর ভাই রয়েছে শিকার নিয়ে"।—এ কথার কোনও জবাব খুঁজে না পেয়ে একটু ভদ্রতার হাসি হাসলুম। কেন না আমার সাহিত্য-চর্চ্চার সঙ্গে আমার অগ্রজের মৃগয়াচর্চ্চার যোগাযোগটা কোথায় এবং কতখানি তা ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। মনে হল যে হয়ত লোকের শ্বাস যে আমার ভ্রাতা যেমন জঙ্গলের বাঘ ভালুকের উপর গুলি

চালান আমিও তেমনি মনোজগতের চতুষ্পদদের উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করি। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে ভদ্র-সমাজে বাক্য-সম্বরণ করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই শ্রেয়।

এই ঘটনার দিন দুই তিন পরে আইন ব্যবসায়ীদের একটি আড্ডায় কার্য্যগতিকে উপস্থিত হবামাত্র জনকয়েক যুবক এসে, আমি কেন পলিটিক্সে যোগ দিই নে, সেই বিষয়ে যৌবনসুলভ মুরুব্বিয়ানা সহকারে আমার কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি উত্তর করলুম—"শরীরে যে সব গুণ থাকলে মানুষে পলিটিসিয়ান হতে পারে আমার দেহে সে সব গুণ নেই বলে।"

এ জবাব তাঁদের কাছে অবশ্য গ্রাহ্য হল না। তাঁদের ধারণা যে রক্ত মাংসের শরীরমাত্রই পলিটিসিয়ান হবার পূরো ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। নইলে তাঁরা পলিটিসিয়ান হলেন কি করে? অতএব স্থির হল, পলিটিক্স থেকে আলগা হয়ে থাকায় আমি দেশের প্রতি আমার আসল কর্ত্তব্য অবহেলা করছি। এ অভিযোগের কি প্রতিবাদ করব মনে ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একটি নবীন Extremist বলে উঠলেন—

"কেন উনি ত বাঙলা সাহিত্য লিখছেন, সেও ত একটা মন্দ কাজ নয়। Artistic কাজ করবার জন্যও ত দেশে দুচার জন লোক চাই।"

বাঙলা লেখাটা একেবারে অকাজ নাও হতে পারে, এ সন্দেহ যে ইংরাজি বক্তাদেরও আছে এর পরিচয় পেয়ে আমি অবশ্য চমৎকৃত হলুম, বিশেষত যখন শুনলুম যে আমরা যা করি পলিটিসিয়ানদের মতে সেটি হচ্ছে আর্টিষ্টিক কাজ। বুঝলুম যে রাজনীতির বিশ্বকর্ম্মাদের বিশ্বাস, তাঁরা যে মাতৃমূর্ত্তি গড়ে তুলছেন তার সাজের জন্য আমরা আগে

থাকতেই পাঁচ রকম সোনা রূপোর নয়, রাঙতার অলঙ্কার বানিয়ে রাখছি। এ অবস্থায় চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলুম। কিছু বলতে হলে বলতে হত এই কথা যে, তোমরা যদি সত্যসত্যই মায়ের প্রতিমা গড়ে তুলতে কৃতকার্য্য হও তাহলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে আসতে হবে, আর এ যুগে যারা মনের কারবার করে তারাই হচ্ছে যথার্থ ব্রাহ্মণ, বাদবাকী সকলে অন্তত এদেশে, হয় বৈশ্য, নয় শূদ্র। বলা বাহুল্য এ জবাব artistic হত না, অর্থাৎ—শ্রোতাদের কাছে তাদৃশ শ্রুতিমধুর হত না।

(২)

উপরোক্ত দুটি ঘটনাই সম্পূর্ণ সত্য, তিলমাত্র কাল্পনিক নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজকের দিনে দেশের পলিটিক্স সম্বন্ধে কারো পক্ষে উদাসীন হওয়াটা কেউ সঙ্গত মনে করেন না। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ইংরাজি শিক্ষিত লোকের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন করাটা বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে এখন অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে, এবং যিনি রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকেন সমাজের কাছে তাঁর একটা জবাবদিহি আছেই আছে, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি হন একজন সাহিত্যসেবী। কেননা যে একমাত্র বস্তু নিয়ে আমাদের পলিটিক্সের কারবার, অর্থাৎ—বাক্য, সে বস্তু সাহিত্যিকদেরও হাতে আছে এবং পলিটিসিয়ানদের অপেক্ষা বেশি পরিমাণেই আছে। কেননা পলিটিক্সের কাজ গুটিকয়েক মুখস্থ বুলির সাহায্যেই চলে যায় কিন্তু সাহিত্যের কাজের জন্য চাই অনেক মনের কথা। পলিটিক্সের কথার নোট বদলাই করে যে অনেক ক্ষেত্রে সিকি পয়সাও মেলে না, তা ভুক্ত-

ভোগী জাতমাত্রেই জানে, অপর পক্ষে সাহিত্যের কথার পিছনে যে অক্ষয় অর্থ আছে এ সত্যও সভ্য জগতের কাছে অবিদিত নেই।

(৩)

দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার সঙ্গে সকলের স্বার্থ যে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জড়িত সে জ্ঞানটা অবশ্য আমাদেরও আছে, কেন না এ জ্ঞানলাভের জন্য দিব্যদৃষ্টির দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে পলিটিক্সে হাত লাগাবার সবারই যে সমান অধিকার আছে একথা চট্‌করে মানা কঠিন। সে কথা মানতে হলে এ কথাও মানতে হয় যে ও-বিষয়ে বিশেষকরে কারও অধিকার নেই, অর্থাৎ—ও হচ্ছে সমাজের একটা বেওয়ারিস মাল। আসলে কিন্তু ও হচ্ছে সংসারের আর পাঁচ রকম ব্যবসার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবসা, এবং এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীর ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে। তবে যে পলিটিসিয়ানরা যাকে পান তাকেই দলে টানতে চেষ্টা করেন, সে শুধু দল পুরু করবার জন্য। এবং যে যত বেশি অনধিকারী তাকে ধরে যে এঁরা তত বেশি টানাটানি করেন তার কারণ, নেতারা জানেন যে ঐ শ্রেণীর লোক তাঁদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হবে। আর সেই সঙ্গে এও তাঁদের জানা আছে যে এক পক্ষের মেষেরাই অপর পক্ষের উপর বাঘ হয়ে বসে। এ সত্ত্বেও সাহিত্যিকদের এক্ষেত্রে টেনে আনা বৃথা। এ জাতীয় জীবরা পলিটিক্সের সিংহব্যাঘ্র হতে যেমন অক্ষম, গড্ডলিকা হতে তার চাইতেও বেশি অক্ষম। এরা সব একবর্গা লোক।

সে যাই হোক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পলিটিক্সে মেতে যাওয়াটা সাহিত্যিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। ইউরোপের ইতি-

হাসে এর প্রমাণ পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে পরধর্ম্ম গ্রহণ করা যে ভয়াবহ, এ কথা ত আমরা সবাই ভক্তিভরে যখন-তখনই আওড়াই। এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সাহিত্যের ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গ'ড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। যার মন নামক পদার্থ নেই, তারও যে মত থাকতে পারে তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যায়। বরং সত্য কথা বলতে হলে, যে ক্ষেত্রে প্রথমটির যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির তত প্রভাব।

আর এক কথা, এ জাতের লোকের হাতে পড়াটা পলিটিক্সের পক্ষেও ক্ষতিকর। পলিটিক্স কবির হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ভাবমদমত্ত, দার্শনিকের হাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ঔপন্যাসিকের হাতে অদ্ভুত ও ঐতিহাসিকের হাতে ভূতগ্রস্থ। একথা যে সত্য তার প্রমাণের সন্ধানে কি আর বিদেশে যেতে হবে? কিন্তু পলিটিক্সের মোটা কারবার হচ্ছে তেল-নুন-লকড়ি নিয়ে, অতএব এ কারবারে সাহিত্যিক অংশীদার হলে সে কারবার ফেল মারবারই বেশি সম্ভাবনা। এ কারবারে সাহিত্যিক থাকতে পারেন শুধু, ইংরাজিতে যাকে বলে sleeping partner, সেই হিসেবে। এ হিসেবে এ ব্যাপারে তিনি চিরকালই আছেন কেননা ভাবের মূলধন একা তিনিই যোগান, কাজ চালায় শুধু যত শূন্য বক্রোদারে। পরের ভাবের ধনে পোদ্দারী করবার চাতুরী যিনি জানেন তিনিই না শ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান!

উপরে যা সব বললুম সে নিজে সাফাই হবার জন্য নয়, কেননা আমি কবিও নই, দার্শনিকও নই, ঔপন্যাসিকও নই, ঐতিহাসিকও

নই, এক কথায় আমি সাহিত্যিকই নই। আমি লেখক বটে কিন্তু সে হচ্ছে টীকা টিপ্পনির, অর্থাৎ—আমার কলম সর্ব্বঘটেই আছে, সে কলম পলিটিক্সের কালিও বার বার মুখে মেখেছে। জন্মের ভিতর কর্ম্ম আমি একবার মাত্র একটি গল্প লিখেছিলুম, কিন্তু সেটি গল্প নয়, "রাম শ্যামের" জীবনচরিত। অনুগ্রহ করে যিনি সেটি পড়বেন তিনিই দেখতে পাবেন যে তার ভিতর কাব্যরস বিন্দুমাত্রও নেই, আছে শুধু ছাঁকা পলিটিক্স এবং সে পলিটিক্সের ভিতর দার্শনিক তত্ত্বের নাম গন্ধও নেই, আছে শুধু নিরেট সত্য।

অতএব আমি যে কেন পলিটিক্সে যোগদান করি নে তার জন্য সমাজের কাছে আমার জবাবদিহি নিশ্চয়ই আছে। আমার কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে, আমি যোগ দিই নে কেননা দিতে পারি নে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক।—

আজকের দিনে পলিটিক্সে যোগ দেবার অর্থ, হয় মডারেটের, নয় extremist-দের ক্ষুরে মাথা মোড়ানো। আমি যে এ দু দল থেকেই তফাৎ থাকি, তার কারণ এ দু'দলের মতামতের ও কার্য্যকলাপের মধ্যে আমি বিশেষ কোনও প্রভেদ দেখতে পাই নে। এ অবস্থায় কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? দু'দলেই যা করছেন, পলিটিক্সের পরিভাষায় তার নাম constitutional agitation, তবে প্রথম দল ঝোঁক দেন এর প্রথম পদ, অর্থাৎ—বিশেষণের উপর, আর দ্বিতীয় দল ঝোঁক দেন এর দ্বিতীয় পদ, অর্থাৎ—বিশেষ্যের উপর, এই যা তফাৎ। এ ছাড়া আর যা প্রভেদ আছে সে হচ্ছে আসলে প্রকাশের ভাষায় ও ভঙ্গীতে, অর্থাৎ—এ দু'দলের আসল পার্থক্য হচ্ছে রীতিগত, ইংরাজীতে যাকে বলে style, তাই নিয়ে এঁদের যত দলাদলী। যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের

বাক্য প্রধানত করুণ রসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত বীররসাত্মক। এ ত হবারই কথা, কেননা মডারেটরা দেশ উদ্ধারের উপায় বা'র করেছেন বুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremist-রা উপায় স্থির করেছেন বুরোক্রাসিকে গালাগালি করা। পলিটিক্সে এ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে, তবে অস্থানে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করলে এই গলাগলিটে আমার কাছে যেমন দৃষ্টিকটু, এই গালাগালিটেও আমার কাছে তেমনি শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। এই দু'পক্ষের কৃতকার্য্যতার দুটি টাট্‌কা উদাহরণ নেওয়া যাক। মডারেটরা সেদিন টাউনহলে এক সভা করে যে সব বক্তৃতা করেছিলেন তার সুর এমন মিনমিনে যে তা শুনে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা চুরি করে আমার বলতে ইচ্ছে যায় "সালসা খাও, সালসা খাও"! তারপর extremist দল সেদিন গোলদিঘিতে লর্ড সিংহের পিছনে যে রকম ফেউ লেগেছিলেন তা শুনে আবার দ্বিজেন্দ্রলালেরই কথা চুরি করে দেশের লোককে বলতে ইচ্ছে যায় "ঘটিবাটি সামলা"! আমার মতে আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দেওয়ায় যেমন আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া হয় না, তেমনি আত্মসংযমে জলাঞ্জলি দেওয়ায় আত্মমর্য্যাদার পরিচয় দেওয়া হয় না। তার উপর নাকিকরুণ ও খেঁকি-বীর—এ দু'ই আমার কানে সমান বেসুরো লাগে। রস মাত্রেই ব্যভিচারী হলে বিভৎস হয়ে পড়ে, তা সে ছিঁড়েই যাক আর গেঁজেই উঠুক। জানি যে এ কথায় আমার সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোক সহানুভূতি করবেন না। কিন্তু কি করা যাবে—শাস্ত্রেই বলে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। এ কথা শুনে রাজনৈতিকের দল যদি চটে বলেন যে রাজনীতিতে সুরুচির কোনও স্থান নেই, তাহলে অবশ্য

আমাকে নিরুত্তর থাকতে হবে। রাজনীতিতে সুনীতির যে কোনও স্থান নেই তার প্রমান ত আজকের দিনে মহা মহা দেশের মহা মহা পলিটিসিয়ানরা সকাল-বিকেল দিচ্ছেন, অতএব সুরুচি কোন্ দলিলে সেখানে প্রবেশ লাভ করবে ?

মরুক গে সুনীতি আর সুরুচি। রাজনীতির রাজ্য হতে ও-দুটিকে নির্ব্বাসিত করে দিলেও সেই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিকেও যে গলাধাক্কা দিতে হবে এমন কথা বর্ত্তমান ইউরোপীয় পলিটিক্সের আদিগুরু স্বয়ং Machiavelli-ও বলেন না এবং একটু ভেবে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ও-দু'দলের কোন দলে যোগ দেওয়াটা আজ সুবুদ্ধির কার্য্য হবে না। কারণ কালে এ দু'দলের কোন দলই টিকে থাকবে না, সত্য কথা বলতে গেলে, এর একটি দল ত ইতিমধ্যে গত হয়েছে। মডারেট দল ত সেদিন আত্মহত্যা করেছে, সম্ভবত অচিরাৎ সরকারী স্বর্গ লাভ করবার আশায়। আমাদের পরস্পারের ভিতর নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগ সম্বন্ধে ত কোনরূপ মতভেদের অবসর নেই। যার শরীরে মানুষের চামড়া আছে তার গায়েই ত পিটনি চাবুক কেটে বসেছে। সুতরাং অমৃতসহরের দিকে যাঁরা পিঠ ফিরিয়েছেন পলিটিক্যাল হিসেবে তাঁরা যে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, সে কথা বলাই বেশি।

তারপর রিফরম্ বিল আমাদের পলিটিক্সের বনেদ নতুন করে পত্তন করেছে। এতদিন আমাদের পলিটিক্স দুই চোখ আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরাজী বইয়ের উপর, ভবিষ্যতে তার এক পা নামাতে হবে বাঙলার মাটীতে ; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের এক চোখ রাখতে হবে প্রভুদের উপর, আর এক নজর দিতে হবে দাসেদের উপর। এ ভঙ্গীটি সুদৃশ্যও নয়, সহজসাধ্যও নয়। উপরন্তু অবস্থাটা

হবে টলমলায়মান। কিন্তু উপায় কি? ডু-ইয়ারকি সামলানো ইয়ারকির কথা নয়। কথার রাজ্যথেকে একধাপ নেমে আমাদের কাজের রাজ্যে আসতেই হবে। এ কাজের জন্য নূতন দলের দরকার।

(৪)

অতঃপর ধরে নেওয়া যাক্, যে এদেশে ডিমোক্রাসির গোড়াপত্তন হয়েছে। আর ডিমোক্রাসির অর্থ যে, Sovereignty of the people, এ তথ্য কংগ্রেস সেদিন মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসাধারণের কাছে ইংরাজি ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এখন দেখা যাক্ people শব্দের অর্থ কি। কোনো দেশের সকল লোক মিলে কখনো একটা people হতে পারে না, এক ভাষায় ছাড়া; কেননা শিক্ষা দীক্ষা অর্থ সামর্থ্যের প্রভেদ অনুসারে একটা জাতি নানা জাতিতে বিভক্ত। এবং এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও এক নয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির পথও এক নয়, বরং অনেক স্থলে এদের ভিতর একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী। এই কারণে ডিমোক্রাসির দৌলতে যে রাজশক্তি people-এর হাতে আসে তাও বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর কালক্রমে এই বিভিন্ন অংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশেও আজ না হোক্ কাল তা হবে, যেহেতু তা হতে বাধ্য। সুতরাং এই হস্তান্তরিত রাজশক্তি কোন্ শ্রেণীর ভাগে কতটা পড়ল সেইটি জানতে পারলেই জানতে পারা যায় যে, এই Sovereignty কোথায় গিয়ে মজুত হল।

সকলেই জানেন, এ তন্ত্রে ভোটশক্তিই রাজশক্তি। এই রিফরমের প্রসাদে আমাদের demos, অর্থাৎ—চাষাভুষো রাতারাতি কম করেও তের চৌদ্দ লাখ ভোটের মালিক হয়ে উঠেছে আর বাদবাকী আমাদের

সবার কপালে লাখ কতকের বেশি জোটে নি, তাও আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে।

ফলে দাঁড়াল এই যে, বাঙলার প্রজা অতঃপর হল বাঙলার রাজা।

এর উত্তরে অনেকে বলবেন, দানের রিফরমে জনগণ ত একদম পুরো রাজত্ব পেলে না, পেলে শুধু স্বরাজের শিক্ষানবিশী করবার অধিকার। তথাস্তু। তাহলে প্রজাবাহাদুর যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন একথা অস্বীকার করবার আর যো নেই। অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ-পলিটিক্সের কাজ হবে এই যুবরাজের মোসাহেবি করা। যাঁরা মনে করছেন যে তাঁরা এ ক্ষেত্রে উক্ত রাজা হবুচন্দ্রের মোসাহেবি না করে তাঁর উপর সাহেবি করবেন তাঁদের ভুল দু দিনেই ভাঙ্গবে। আমরা যা করব সে হচ্ছে এই—আমরা সবাই আমাদের হবুরাজকে বলব, lend me your ears. কেউ বা সে কান চেপে ধরবার জন্যে, কেউ বা তাতে মন্ত্র দেবার জন্যে। দু'জনেরই উদ্দেশ্য হবে এক। কান টানলে মাথা আসে, সুতরাং প্রজার কর্ণধার হয়ে তার মাথাকে ভোট আফিসে টেনে নিয়ে যাওয়াই উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়। প্রভেদ যা, তা উপায়ে। কেউ বা স্বকার্য্য উদ্ধার করতে চাইবেন অর্থ বলে, কেউ বা বাক্য বলে। এ অবস্থাতেও আমাদের পলিটিক্সে আবার দু-দল হবে। তবে মোটামুটি ধরতে গেলে একদল প্রজারাজকে গালাগালী করবার জন্যে প্রস্তুত হবেন আর একদল প্রজারাজের সঙ্গে গলাগলি করবার জন্যে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এ দু'দলেরও পরমায়ু এক ইলেকসান পেরুবে কি না সন্দেহ। এই দু-দলের টানাটানিতে ও চেঁচাচেঁচিতে হবুরাজ যখন চোখ রগড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন তখন এ দু-দল ভেঙ্গে আবার দুটি নতুন দলের সৃষ্টি হবে।

যখন জনগণের তাড়নায় পলিটিক্সের তাস আবার নতুন করে ভাঁজা হবে তখন কালো লাল সব সাহেবগুলো এক দিকে জড় হবে আর কালো গোলাম আর এক দিকে, বলা বাহুল্য লাল গোলাম এদেশে নেই, সব সাহেব আর টেক্কা ?—যে মারতে পারে সেই হবে। বিবির কথা উল্লেখ করলুম না এই জন্যে যে, আমাদের পলিটিক্সের নতুন জুয়ো-খেলায় লাল কালো নির্ব্বিচারে বিবি বাদ দেওয়া হয়েছে। গত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু এর জন্য মনের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর সহাশ্রুপাতী। এঁদের Communal representation না দেবার কোনোরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। যে সব কারণে নানা সম্প্রদায়কে বিভিন্ন representation দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সে সকল কারণ একাধারে বর্ত্তমান। প্রথমত স্ত্রীজাতি যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র জাতি, সে জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালাদেরও আছে। এ জাতিভেদ স্বয়ং ভগবানের হাতে তৈরি। এরা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র চিরস্থায়ী separate community, এবং অন্তত ভারতবর্ষে খাঁটি community. এদেশে পুরুষ যথার্থ পুরুষ না হলেও মেয়ে যে যথার্থ মেয়ে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত এরা অশিক্ষিত। তৃতীয়ত যদিচ এরা দ্বিজমাত্রকেই জন্ম দেয় তবু নিজেরা দ্বিজ হতে পারে না, এরা সব শূদ্র। চতুর্থত এরা অস্পৃশ্য না হলেও Depressed class. পঞ্চমত এরা লাটসভার গৃহসজ্জারূপে যে যে পরিমাণ সে সভার শোভাবৃদ্ধি করতে পারত তার কোনও জরিজরাবতপরা পগ্গধারী সম্প্রদায় তার সিকির সিকিও পারবে না। তারপর এদের সঙ্গে আমাদের entente cordiale বহুকালথেকে রয়েছে এবং

কস্মিনকালেও যাবে না। আর এককথা, এঁরা লাট সভায় বসলে গভর্ণমেণ্টকে minister নির্ব্বাচনের জন্য আর ভাবতে হত না। স্ত্রী-মন্ত্রীকে কেউ ঘাঁটাতো না। ও শাসনে আমরা অভ্যস্ত Home Member হবার জন্য ত এঁদের প্রত্যেকেই সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু যেহেতু উক্ত মন্ত্রীপদ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রেখেছেন তখন হস্তান্তরিত বিষয়কটির মধ্যে একটির minister ত ভারতরমণীকে অনায়াসে করা যায়, অর্থাৎ—Educational Member! সুতরাং এত গুণ সত্ত্বেও এরা যে সাম্প্রদায়িক ভোট পেলে না, এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই। তবে কংগ্রেসের দল ভরসা দিয়েছেন যে আমাদের যে-সব দাবী এ ফেরা গ্রাহ্য হয় নি, অতঃপর সে সবের জন্য তাঁরা তুমুল আন্দোলন করবেন। আন্দোলনটা প্রধানত অবশ্য এই স্ত্রী-ভোটের জন্যই করা হবে তাহলে তাঁরাও এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারবেন। তখন আমাদের রাজনৈতিক দোল হয়ে উঠবে ঝুলন। এর চাইতে উল্লাসের কথা আর কি আছে?

সে যাই হোক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতঃপর একটি বৈশ্যের দল আর একটি শূদ্রের দলের সৃষ্টি হবে। এবং এই দুটি দলের মধ্যস্থতা করবার জন্য প্রয়োজন হবে আর একটি ব্রাহ্মণ দলের, যারা এই পরস্পর বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য করে প্রজাশক্তিকে যথার্থই রাজশক্তি করে তুলতে চেষ্টা করবে।

(৫)

রাষ্ট্রের মূল শক্তিই যে প্রজাশক্তি, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা যে রাজ্যে অধিকাংশ লোক দেহে মনে ও চরিত্রে দুর্ব্বল, সে দেশে

স্বদেশী রাজশক্তি বলে কোন পদার্থ থাকতেই পারে না, সে দেশে সে শক্তি বিদেশী হতে বাধ্য এবং এযুগে সেই বিদেশের যে বিদেশে প্রজাশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, পুঞ্জীভূত ও প্রবল।

এখন দেখা যাক আমাদের হবুরাজের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি।—

প্রথম দফা—আজকের দিনে হবুরাজের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। তিনি নিরন্ন বলে আমাদের চাইতে যে তাঁর ক্ষিধে কম, মোটেই তা নয়। মেয়েরা বলে ছোট ছেলেরা বড়দের তুলনায় হাতে ছোটবড় হলেও পেটে এক। কথাটা ঠিক কি না জানি নে, কিন্তু এটি ধ্রুব সত্য যে ছোটলোকেরা বড়লোকদের তুলনায় পদে ছোটবড় হলেও পেটে এক। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে সব প্রথমে সে খেতে চাইবে এবং তার জন্য যথেষ্ট অন্নের ব্যবস্থা করতেই হবে, কেননা মুখের কথায় কারও পেট ভরে না, হোক না সে কথা যেমন বিশাল তেমনি রসাল, যেমন প্রচুর তেমনি মধুর। সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও এদের রসদের সুব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা অন্নই হচ্ছে প্রাণ।

দ্বিতীয় দফা—হবুরাজের জন্য বস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতে হবে। পলি-টিসিয়ানদের মতে আমাদের এই গরমের দেশে বেশি কাপড়ের দরকার নেই, কথাটা ঠিক; কিন্তু বেশি না হোক কিছু কাপড় চাই ত, নেংটি কখনো রাজবেশ হতে পারে না! যাতে লজ্জা নিবারণ হয় না তার সাহায্যে রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় কি করে? তা ছাড়া মন্ত্রী গবুচন্দ্র যখন জামাজোড়া পরে বরবেশ ধারণ করবেন তখন রাজা হবুচন্দ্র ডোরকৌপীন ধারণ করতে আদপেই রাজী হবেন না।

আত্মসম্মান জ্ঞানও হচ্ছে মানবের একটি সামাজিক শক্তি—এবং উক্ত জ্ঞান প্রধানত বস্ত্রজ।

তৃতীয় দফা—হবুরাজের পেটে ভাত না থাকলেও পিলে আছে। এবং সেপিলে অতি প্রবৃদ্ধ, মাপে প্রায় পেট্রিয়টদের হৃদয়ের তুল্যমূল্য। কিন্তু পিলেতে পেট মোটা হলে হাত পা সব সরু হয়ে আসে। তারপর পিলের আর এক দোষ এই যে, যে কেউ যখনতখন তাকে চমকে দিতে পারে। সুতরাং হবুরাজকে যদি মানুষ করে তুলতে হয় তাহলে তার উদরস্থ অতিস্ফীত প্লিহাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই, পরিষ্কার জল, খোলা হাওয়া, ডাক্তার এবং ওষুধ। যে-দেহে স্বাস্থ্য নেই, সে-দেহে ও সে-মনে যে শক্তি নেই, এর প্রমাণ ত আমরা হাড়েহাড়ে পাই।

চতুর্থ দফা—হবুরাজ এখন একদম নিরক্ষর। পলিটিসিয়ানরা বলবেন যে রাজা বাহাদুরের পেটে বিদ্যে না থাক্ মাথায় বুদ্ধি আছে। এ কথার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। বিদ্যাবুদ্ধি অবশ্য এক বস্তু নয়। বুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে বিদ্যের পরিচয় যে লোকে দিতে পারে, তার পরিচয় ত এদেশের আইন-আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যে ও সংবাদ পত্রে নিত্যনিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু জাতির এ অবস্থা ত আর চিরদিন থাকবে না। একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে, আর একদিকে তেমনি আমাদের জনগণকে কিঞ্চিৎ বিদ্যাচর্চ্চাও করতে হবে। বিদ্যাবুদ্ধি এক বস্তু না হলেও ও-দুয়ের যোগাযোগ না হলে দু-ই ব্যর্থ হয়। জ্ঞানও হচ্ছে একটি শক্তি এবং সমগ্র জাতির অন্তরে সে শক্তির সৃষ্টি করতে হবে। অপর কোনও কারণে না হোক্, স্বজাতির আত্মরক্ষার জন্যও হবুরাজকে

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানো দরকার। রাজা মূর্খ হলে এত খামখেয়ালি হন যে রাজ্যের দিনে দুবার ওলটপালট হয়।

অতএব অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, এই নালায়েক হবুরাজের আজকে আমরা উছি হয়েছি, তাঁর শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার বৃটিশরাজ আমাদের হস্তে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁর ভরণপোষণ অশনবসনের ব্যবস্থা করা। তেল-নুন-লকড়ির সংস্থান সবারই চাই এবং অধিকাংশ লোকের ও-ছাড়া আর কিছুই চাই নে। মানুষ যদি বেঁচে না থাকে ত বড় হবে কি করে? আর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যা সত্য, জাতিবিশেষের পক্ষেও তাই সত্য। একটা জাতি কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি বই ত আর কিছুই নয়। এখন ভেবে দেখুন ত এই রিফরম আমাদের ঘাড়ে কি বিরাট কর্ত্তব্যের ভার চাপিয়েছে।

সত্য কথা বলতে গেলে এ কর্ত্তব্য সম্যকরূপে পালন করবার শক্তি আমাদের একরকম নেই বল্লেই হয়। প্রথমত বাক্‌পটুতা ও কর্ম্মকৌশল এক বিদ্যে নয়। যার ধড়ে এর প্রথম গুণ আছে তার ধড়ে দ্বিতীয়টি না থাকতেও পারে এবং না থাকবারই বেশি সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত দেশের লোকের মনের ও দেহের খোরাক জোগানের পক্ষে দেশের অবস্থা প্রতিকূল। কেন কি বৃত্তান্ত তা বোঝাতে হলে রাজনীতি ছেড়ে আমাকে অর্থনীতির বিচার সুরু করতে হবে। সে আলোচনা আমার অধিকার বহির্ভূত। তবে পলিটিসিয়ানরা সে আলোচনা নিশ্চয়ই তুলবেন, কেন না সকল বিষয়েই তাঁদের সমান নৈসর্গিক অধিকার আছে! আমি আন্দাজ করছি যে আমাদের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে মুখ খুলবেন তখন দেখা যাবে যে তাঁদের

মুখ দিয়ে উদ্গীর্ণ হচ্ছে ছেরেফ্ ধূম। এত হবারই কথা, তাঁদের অন্তর যে বহ্নিমান সে কথা তাঁরাই বলেন। পলিটিক্সের সে ধূম পান করে দেশের লোকের মাথা ঘুরে যাবে। ও ধূমপানে বেচারারা ত আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। কাজেই তারা নেশার খেয়ালে হাতি ঘোড়া কিনবে কিন্তু "যো হাতি মোলেগা ওত তুরন্ত চলা যায়েগা।" তার পর? এস্থলে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে বাঙালী পলিটিসিয়ানদের ইকনমিক্সের মূলসূত্র হবে ইকনমি, অর্থাৎ—ন্যাকামি।

স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করবার জ্ঞান ও শক্তি আমাদের দেহে আজ না থাকলেও কাল তা সঞ্চয় করা কঠিন হবে না। কিন্তু তার জন্য চাই উক্ত কর্ত্তব্য পালন করবার আন্তরিক প্রবৃত্তি, যা ভদ্র সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিতরে আজ যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আমাদের সমাজ আমাদের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দেহে যে মন গড়ে তুলেছে সে মন সমাজকে গণতান্ত্রিক করে তোলবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে মনের এ বিষয়ে প্রতিকূলতা অনেকটা কমে এসেছে বটে কিন্তু তাই বলে তাকে আজও নীচুকে উঁচু করবার অনুকূল করে নি। একথা যে সত্য তার পরিচয় ইংরাজি আইডিয়ার আবরণ ভেদ করে নিজের নিজের মনের দিকে তাকালে ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাত্রই অবিলম্বে পাবেন।

সুতরাং আমরা যদি সত্য সত্যই স্বজাতিকে স্বরাট করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার জন্য চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্কার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা। কিন্তু এ পরামর্শ দেওয়া যত

সহজ, নেওয়া তত সহজ নয়। যে সকল ভাব যুগযুগের দাসত্বের আওতায় আমাদের মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত শিকড় নামিয়াছে এক দিনে সেই আগাছাগুলিকে সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলবার জন্য যে পরিমাণ মনের সাহস ও শক্তি চাই তা আমাদের নেই। অথচ আমরা যদি জাতকে জাত মানুষের মত মানুষ হতে চাই তাহলে এ অসাধ্য সাধন আমাদের করতেই হবে। আর এই মন বদলাবার ভার পড়বে বিশেষ করে সাহিত্যের হাতে, সুতরাং সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিক্সের মোক্তার হয়ে ওঠেন, সাহিত্য যদি পলিটিক্সে লীন হয় তাহলে দেশ আজ যে তিমিরে আছে কালও সেই তিমিরেই থাকবে। অতএব নবীন সাহিত্যিকদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা মনোজগতের চতুষ্পদদের উপর তীর চালান, হোক না তাঁদের পদগৌরব যত বেশি, আর যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা ধ্যানবলে মায়ের সর্ব্বললামভূতা যৌবনাঢ্যা অপাপবিদ্ধা অনবদ্যাঙ্গী মানসীমূর্ত্তি গড়ে তুলুন যে আদর্শমনশ্চক্ষুর সুমুখে দেশের কর্ম্মীর দল ভারত-সভ্যতার সেই জাগ্রতপ্রতিমা গড়ে তুলবে—বিশ্বমানব যা পূজা করতে প্রস্তুত হবে।

আমি কিন্তু এখন চললুম সাহিত্য ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ দিতে, তবে যদি কোন পলিটিক্সের স্কুলে, বয়েস বেশি হয়ে গিয়েছে বলে আমাকে ভর্ত্তি না করে, তাহলে যেখানে ছিলুম সেখানেই আবার ফিরে আসব, অর্থাৎ—সাহিত্য ও পলিটিক্সের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

বীরবল।

টীকা ও টিপ্পনী।

দ্বিজেন্দ্রলাল একবার বড় দুঃখে বলেছিলেন "বলিত হাসব না" ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর সে দুঃখের কথা শুনে দেশসুদ্ধ লোক হেসেছিলেন। কিন্তু যে-কেউ কখনো হাস্যবর্জ্জন করবার জন্য স্থিরসংকল্প হয়েছেন তিনিই জানেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের দুঃখ কতদূর মর্ম্মান্তিক। দেশের লোক আমাদের কিছুতেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট দিয়ে থাকতে দেবে না। তারা থেকে থেকেই এমন কথা বলবে, এমনি অঙ্গভঙ্গী করবে যাতে করে আমরা দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হব।

দেশের এই ছোটবড় লাট দরবারগুলোতে থেকে থেকেই যে সব প্রহসনের অভিনয় হয় তা দেখে যিনি হাস্যসম্বরণ করতে পারেন তিনি হয় মুক্তপুরুষ, নয় জড় পদার্থ।

এই দেখনা সেদিন সেখানে কি কাণ্ড ঘটল। বড়লাটের রাজপাট কোথায় বসানো হবে তাই নিয়ে সেদিন সেখানে তুমুল আলোচনা, জোর ও ঘোর তর্ক হয়ে গেছে।

প্রস্তাব ছিল দুটি।—

প্রথম—লাটপাট যেখানে হোক এক জায়গায় গাড়া উচিত। ডেরাডাণ্ডা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানটা বে-সরকারী মেম্বরদের মতে যেমন অর্থহীন তেমনি অর্থসাপেক্ষ। রাজার পক্ষে সন্ন্যাসীর

আচরণ এদেশে শোভা পায় না—কেননা এর একজন হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রস্থল আর একজন তার বাইরে।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহাবক্তৃতা করেছিলেন কিন্তু সরকারী জবাব হ'ল—যখন রাজাসন বাঙলার মাটী থেকে তোলা হয়েছে তখন permanent settlement-এ সরকার আর রাজি নন।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে, যাঁরা এ প্রস্তাবের পক্ষে মহা ওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিপক্ষে ভোট দিলেন।

এ ব্যাপার দেখে যাঁর চোখে জল আসে তাঁর আসুক আমার কিন্তু বেজায় হাসি পায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—রাজধানী যেখানে ছিল সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক, অর্থাৎ—কলিকাতায়। দিল্লির আব-হাওয়া নাকি শুধু শরীরের পক্ষে নয়, মনের পক্ষেও মারাত্মক। অপর পক্ষে কলিকাতা সহরে ম্যালেরিয়া নেই আর যদিও থাকে ত বস্তিতেই আছে—বড়লোকের ঘরে তা বড় একটা ঢুকতে পারে না আর সাহেবলোকের ঘরে মোটেই পারে না। তারপর মনের আব-হাওয়া এ সহরে যতটা চাঙ্গাকর, ইংরেজীতে যাকে বলে bracing, ভারতবর্ষের অপর কোথাও তত্তুল্য নয়। বোম্বাই সহরে হাওয়ার ভিতর কলের ধোঁয়া ঢুকেছে, দিল্লিতে কবরের ধূলো আর মান্দ্রাজের মনোবায়ুর মধ্যে অক্সিজেন নেই।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহা মহা বক্তৃতা করলেন। এর উত্তরে সরকারী জবাব হল, "তোমরা যা বলেছ সে সবই ঠিক, বিশেষত ঐ মানসিক জলবায়ুর কথা। কলিকাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর থেকে দূরে থাকায় সরকার কি বিরহ বেদনা সহ্য করছেন তা সরকারই

জানেন, তবে কি না গতস্য শোচনা নাস্তি। বড় লাট যখন কলিকাতাকে একবার তালাক দিয়েছেন তখন তাকে আবার নিকে করা অসম্ভব, বিশেষত যখন তার খরচা বেজায়।"

এ জবাবের নির্গলিতার্থ পুনর্মূষিক হতে কোন সিংহই রাজি হয় না, উপব্রিটিশ সিংহও নয়।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল, যাঁরা এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে মহাওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। লাটসভায় আমরা মুখ খুলি এক দিকে আর একদিকে হাত তুলি। এ ব্যবহার দেখে যাঁর কাঁদতে ইচ্ছে যায় তিনি কাঁদুন, আমি কিন্তু না হেসে থাকতে পারি নে।

(২)

লাটসভা দিল্লিতেই বসুক আর ফতেপুর শিকরীতেই বসুক তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, কেননা সে সভায় আমি কখনো বসব না। এ ত আর আকবর বাদশার দরবার নয় যে বীরবল সেখানে উচ্চাসন পাবে? কিন্তু লাটপাট কলিকাতায় কায়েম হলে একটি কারণে খুসি হতুম।—

লাটদরবারে দেশী মেম্বরেরা নানারূপ সেজেগুজে যে নানা ছাঁদে অভিনয় করেন তাতে আমার কোনই দুঃখ নেই কিন্তু দুঃখ এই যে বাঙলার যত এরণ্ড দিল্লির মরুভূমিতে সব দ্রুমায়তে।

আজ দুদিন হয় নি, পাটেল বিলের বিচারস্থলে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও হাটখোলার শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, বাঙলা দেশে nobody who is any body

পাটেলবিলের স্বপক্ষে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে লাট-দরবার কলিকাতায় বসলে উক্ত দরবারীযুগল এ হেন উচ্চভাষ কখনই করতে পারতেন না, কেন না এ সত্য তাঁদের কাছে কিছুতেই অবিদিত থাকতে পারে না যে, বাঙলার সুবুদ্ধি তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতো।

তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নন্দী-রায় কোম্পানি লাটসভায় যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া সুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব। আমরা কেউ বলতে পারি নে আজকের দিনে বাঙলায় somebody কে? কেননা somebody-ত্ব যে কিসের উপর নির্ভর করে, শিক্ষা-দীক্ষার উপর না বংশাবলীর উপর, জাতির উপর না গুণের উপর, বাক্‌পটুতার উপর না কর্ম্মশঠতার উপর, টাকা ধার দেওয়া না নেওয়ার সামর্থ্যের উপর, টিকির উপর না টেড়ির উপর? এ সব প্রশ্নের জবাব আমরা কেউ করতে পারি নে। অতএব আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অদ্য তারিখে nobody is anybody.

অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই রাম শ্যাম যদু হরি প্রত্যেকেই somebody হয়ে উঠেছেন। যাঁর বিদ্যে নেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের দলভুক্ত হচ্ছেন, যিনি কোন ভাষাই জানেন না তিনি সকল ভাষাতেই বক্তৃতা করছেন, যাঁর রোকড়খতিয়ান ব্যতীত অপর কোনও বইয়ের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তিনি সাহিত্যের সমালোচনা করছেন, শূদ্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে, নবশাখ ব্রাহ্মণ সমাজের গোষ্ঠিপতি হয়ে উঠছে। অতএব একথাও আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অদ্যতারিখে everybody is somebody.

এই প্রমাণ যে ইংরাজি শিখেও ইংরাজি শাসনের ফলে হিন্দুসমাজ একদম ভেস্তে গেছে, শাস্ত্রসঙ্গত ও আচারগত উচ্চনীচের অধিকার ভেদ কার্য্যত কেউ মানে না ও কেউ কাউকে মানাতে পারে না। যে জাতিভেদ প্রথা সমাজে ঢিলে হয়ে গেছে সেই প্রথা আইনে কশে রাখবার বিরুদ্ধে পাটেলবিল হচ্ছে একটি প্রতিবাদ মাত্র। অতএব উক্ত বিলের বিপক্ষতাচরণ করা সমাজে প্রোমোশন প্রাপ্ত somebody-দের পক্ষে শোভা পায় না। তবে সংসারের নিয়মই এই যে, যার পক্ষে যা শোভা পায় না তাই করতে সে চির উদ্যত। এ ব্যাপারের একটি বিলেতি নজির দেখাচ্ছি। বেশি দিনের কথা নয় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকে গির্জ্জেয় গিয়ে ভগবানের কাছে যে এই প্রার্থনা করত—

"God bless the squire and his relations
And keep us in our proper stations"—

এ কথা ইংলণ্ডের লোক আজ বিশ্বাসই করতে পারে না। সুতরাং আশা করা যায় যে Squire-এর জায়গায় ব্রাহ্মণ বসিয়ে আজ অব্রাহ্মণেরা ইংরাজরাজের কাছে যে ঐ স্তবই পাঠ করছেন, ভবিষ্যতে বাঙালী সে কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না, অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে এ দেশের যদি কিছু থাকে। ইতিমধ্যে আমরা একটু হেসে নিই।

(৩)

আমাদের শিক্ষিত সমাজে হরেক রকমের অদ্ভুত জীব আছে কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত হচ্ছে টিকিওয়ালা ডিমোক্রাট। লোক হাসাতে এঁরা অদ্বিতীয়। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ নেওয়া যাক। সেদিনকের লাটদরবারে সবাইকে অবাক্ করেছেন M. R.

Ry. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। উক্ত ইংরেজি অক্ষর ক'টি সাটে কি বলতে চায় জানি নে। আমার একটি সঙ্কেতজ্ঞ বন্ধু বলেন, "ওর অর্থ Madras Rohilkhund Railway." এ ব্যাখ্যা আমি গ্রাহ্য করি। ভৌগোলিক হিসেবে উক্ত দুই প্রদেশের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও যোগাযোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক হিসেবে আছে। রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকেই কিস্কিন্ধাতে গিয়েছিলেন এবং সেইসূত্রে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের যে মিলন হয় সেই মিলনের ফল হচ্ছে দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ—তাই দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মাথায় M. R. Ry. ছাপ মারা থাকে।

উপরোক্ত রঙ্গস্বামী একজন দুর্দ্ধর্ষ extremist. রাজনীতির ক্ষেত্রে লিবাড়াটি ইকোয়াড়িটি ও ফেড়াটাড়নীটি এই কথা ক'টি ইনি এবং এঁর দলবল এমনি তারস্বরে ঘোষণা করেন যে তা শুনলে ভুলে যেতে হয় যে এ দেশটা ভারতবর্ষ আর এ কালটা বিংশ শতাব্দী। মনে হয় আমরা সশরীরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের প্যারিস নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অথচ এঁরা পাটেল বিলের যখন নাম শোনেন তখন "গেল ধর্ম্ম" "গেল সমাজ" বলে সমান তারস্বরে ত্রাহি পবননন্দন বলে চীৎকার করতে সুরু করেন। তখন এঁদের উচ্চবাচ্য শুনে মনে হয় যে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ দুঃখ করে বলেছেন যে এই পরস্পর বিরোধী মতামত কি করে এক অন্তরে বাস করতে পারে তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। দ্রাবিড়লজিকের থৈই সিংহ মহাশয় যে ধরতে প্যারেন না এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা তিনি উত্তরাপথের লোক। দক্ষিণাপথ যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করে তখন সে

মূর্ত্তি দেখে আমাদের চমকে ওঠবারই কথা। তবে দ্রাবিড়ব্রাহ্মণেরা কেন যে উল্টোপাল্টা কথা বলেন, সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে ইংরেজি বচন কেন যে মেলাতে পারেন না তার কারণ ও-দুই হচ্ছে তাঁদের মুখস্থ বুলি, ওর একটিও তাঁদের নিজস্ব ভাষা নয়। তা ছাড়া তাঁদের ভাষার সঙ্গে, কি আমাদের কি ইংরাজের ভাষার কোনই সম্পর্ক নেই, কেননা এ দুটিই হচ্ছে আর্য্য ভাষা এবং তামিল অনার্য্য। তাই ইংরেজি তাঁদের মনে ঢোকে না, ঠোঁটের উপরই থেকে যায়, আর সংস্কৃতও তাঁদের মনে ঢোকে না, কর্ণারূঢ় হয়ে তাঁদেরকে যন্ত্রবৎ চালায়। এঁদের কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যখন এঁরা তামিল বলেন। আজকের দিনে দ্রাবিড়শূদ্ররা কি বলছে সে কথা কি কারো বুঝতে বাকী আছে? দ্রাবিড়ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে দ্রাবিড়শূদ্রের এই বিদ্রোহের কারণ, দক্ষিণা-পথের শূদ্রেরা জানে যে তারা শূদ্র, সে দেশের ব্রাহ্মণেরা সে দেশের অব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে দেয় নি। সুধু তাই নয়, দ্রাবিড়ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে আস্কারা পেয়ে আমরা তাঁদের অনুরূপ শূদ্রপীড়ন করিনে বলে আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও তামিল শূদ্রের সামিল করেছেন। এস্থলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি নে।

আজ বছর দেড়েক আগে বড়লাটের দরবারের জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মেম্বর একদিন বাঙলার জনকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে 'ল-ড়য়োর ভেদাত্মক' ইংরাজি ভাষায় ঘোর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি এক-জন দুরন্ত ডিমোক্রাট, তাই বেচারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই যে তাদের অন্তরে ডিমোক্রাটিক মনোভাব মোটেই জন্মায় নি। মানুষে মানুষে যে কোনই প্রভেদ নেই, সবাই যে সমান

স্বাধীন, সবাই যে সমান প্রধান, এই সত্য সকলের মনে বসিয়ে দেবার জন্য তিনি "ভাড়াটেয়াড়" কি বলেছেন "ড়বরসোপিয়েড়" কি বলেছেন সেই সব কথা অনর্গল আউড়ে যাচ্ছিলেন। বকতে বকতে তাঁর জল-পিপাসা পেল, জল এল কিন্তু তা পান করবার সময় তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে নববধূর মত অবগুণ্ঠনবতী হলেন। কেন জানেন?—পাছে বাঙালী ব্রাহ্মণের অনার্য্য দৃষ্টিপাতে তাঁর পানীয় জল অপেয় হয়ে ওঠে! তিনি তাঁর পিপাসা নিবারণ করে ঠাণ্ডা হবার পর আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হলুম, "মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে"। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি প্রমাণ"? আমি উত্তর করলুম, "প্রমাণ ত সুমুখেই রয়েছে। আপনাতে আমাতে প্রভেদ বিস্তর। ও ঘোমটা আমি কখনই দিতে পারতুম না, কেননা ওরূপ ঘোমটা দেওয়ায় ভদ্রসমাজে আভিজাত্যের নয় নির্লজ্জতার পরিচয় দেওয়া হয়।" বলাবাহুল্য এর পর আমাদের আলোচনা আর এগুলো না, রুশো দাঁতোঁর মতামতের মাদ্রাজিভাষ্য শোনবার সুযোগে আমরা বঞ্চিত হলুম।

(৪)

এস্থলে আমার একটি নিবেদন আছে। একথা যদি সত্য হয় যে ভবিষ্যৎ অতীতের জের টেনে চলে, তাহলে ভারতবর্ষের নব-সভ্যতা উত্তরাপথের লোকদেরই গড়ে তুলতে হবে, এ দায় আমাদের পৈতৃক, ধর্ম্ম বলো, নীতি বলো, জ্ঞান বলো, বিজ্ঞান বলো, কাব্য বলো, দর্শন বলো, রাষ্ট্র বলো, সমাজ বলো সেকালে সবই বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তর ভূভাগেই জন্মলাভ করেছে অতএব ভবিষ্যতেও করবে। ইংরাজির সঙ্গে সংস্কৃত আমরাই মেলাতে পারব, কেননা

ও-দুই হচ্ছে আর্য্যভাষা, অর্থাৎ—ও-দুই হচ্ছে আর্য্যমনের শব্দদেহ। আমরা যদি ভারতবর্ষের নব সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি তাহলে দক্ষিণাপথ সে সভ্যতার দেদার টীকাভাষ্য লিখবে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি।

কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দ্রাবিড় জাতির উপর কোনরূপ কটাক্ষপাত করছি। দ্রাবিড় সভ্যতা আমার কাছে অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অজ্ঞেয়, সুতরাং তার দোষগুণ বিচার করতে আমি অপারগ। কিন্তু আমার কাছে যা অজ্ঞেয় নয় অবজ্ঞেয়, সে হচ্ছে মাদ্রাজি আর্য্যামি। মাদ্রাজি শূদ্রদের আমি যেমন ভক্তি করি তেমনি ভয়ও করি। দেখতে পাচ্ছি তারা যেখানে আছে সেখানে আর থাকতে রাজি নয়, তারা উঠতে চায় একলম্ফে একেবারে লাট-দরবারে। অতএব আশা করা যায় যে, রিফরম দরবারে মাদ্রাজের মনের খাঁটি কথা পাওয়া যাবে। আর খাঁটি কথাকে আমি চিরকালই ভক্তি করি।

তবে ভয়ের কথা এই যে উচ্চপদস্থ হলে মানুষের মেজাজ উঁচু হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে আর্য্যত্ব মানুষের রক্তে নেই—আছে তার পদে ও মস্তিষ্কে। দ্রাবিড় শূদ্র ও depressed class যখন লাটসভায় ঢুকবে তখন তারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে যাবে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণের ছোঁয়াচ লেগে তারা খুব সম্ভবত ভীষণ আর্য্যামিগ্রস্থ হয়ে উঠবে। তারপর পাটেল বিলের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করবে! তাদের ভবিষ্যৎ বক্তৃতার কথা সব আজ আমার কানে আসছে। আমি দিব্যকর্ণে শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের যত অস্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধিরা সমবেত সমস্বরে ও তারস্বরে বলছেন—

"আমাদের আর্য্য পিতামহরা যে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেছেন, যে বর্ণাশ্রম-প্রথার তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সমাজ যাবে, ধর্ম্ম যাবে, হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, তারপর পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, আর আমাদের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতা আধিভৌতিক হয়ে পড়বে।"

এহেন বক্তৃতা শুনে যিনি হাসি চাপতে পারেন—তিনি নিশ্চয়ই একজন somebody—আমি পারি নে কেননা আমি হচ্ছি nobody.

বীরবল।

আমার কথা।

——:০:——

আমার জানলার সাম্‌নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে' ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ঐ বট গাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা সুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারচ না ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সব বুঝেচি : তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; আবার সেই থর্‌থর্, ঝর্‌ঝর্, ঝল্‌মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে ; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে তোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্‌তে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্ত্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি : আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে বিশ্বের অণুপরমাণু থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌চে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষায় সেই এক-খুসির কথা চল্‌চে।

ও আমাকে বল্‌চে, "আছ হে বটে ?"

আমি সাড়া দিয়ে বল্‌চি, "আছি হে মিতা!"

এমনি করে "আছি"তে "আছি"তে একতালে করতালি বাজ্‌চে।

(২)

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ সুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তারপরে আষাঢ়ের বর্ষা নাম্‌ল; ওরও পাতার রং মেঘের মত গম্ভীর হয়ে এসেচে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীনের পাকা বুদ্ধির মত নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী; যেন পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝলমলিয়ে আমাকে বল্‌লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন? আমার মত একেবারে ভরপূর বাইরে এস না!"

আমি বল্‌লেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠ্‌ল, "বুঝতে পার্‌লেম না।"

আমি বল্‌লেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়?"

—"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

—"সেখানে কর কি?"

—"সৃষ্টি করি।"

—"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত সৃষ্টি। একই জিনিষ ঘেরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে কোথাও হীরের টুক্‌রো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার ঘেরটা কি রকম শুনি!"

আমি বল্‌লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়চে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌চে।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার সেই বেড়া-দেড়া সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?

আমি বল্‌লেম, "চন্দ্রসূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্র-সূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

—"তাহলে মাপবে কি দিয়ে?

—"সুখ দিয়ে—বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বল্‌লে, "এই পূবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রানে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্‌লে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "বোঝাই কি করে? তোমার ঐ পূবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেম্‌নি বেঁধে ফেলেচি অম্‌নি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আরেক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়! এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায় তা আমিও ঠিক জানি নে।

মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

—"আর ওর কাল?"

—"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

—"দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।"

—"নাই বা বুঝলে।"

—"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?"

—"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল ত সে বোঝা, যদি গান বল ত গান, কল্পনা বল ত কল্পনা।"

(৩)

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বল্‌লে, "একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।"

শুনে আমার মনে হল, "একথা সত্যি।" আমি বল্‌লেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস দোষে চুপ করে করেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মত আলোকবীণায় দ্রুততালে ঘা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠ্‌ল, "এই তুমি যা দেখ্‌চ আর এই আমি যা ভাব্‌চি এর মাঝখানের যোগটা কোথায়?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ কর।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বল্‌লে, "কেমন, সব বুঝেচ?"

আমি বল্‌লেম, "বুঝেচি।"

(৪)

সেদিন ত চুপ করেই কাট্‌ল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠ্‌লে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত?"

আমি বল্‌লেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে ঐ গাছের দিকে।

—"কি রকম দেখ্‌লে?"

—"দেখ্‌লেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্‌ছিলেম, "ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি তাকে

ডাক দিয়ে বলেচ, "ওরে আয়নারে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা!"

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড় করচি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন?"

—"তার কথা আর কইব কি! সে নিজেই নিজের টঙ্কারে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ক্রেঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। ভেবে পাই নে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠ্‌বে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

—"বটে? কি জবাব, শুনি।"

—"সে বল্‌চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপ্‌নি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দর-কেই দেখ এই বনবিহারী। তারি বাঁশি ত বাজচে বটের ছায়ায়।"

(৫)

তখন কবেকার কোন্ ভোর রাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই ; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না দেখা দিয়েচে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখ্‌লেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বল্‌লে, "নমস্কার !"

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চল্‌চে কেমন বল ত ?"

সে বল্‌লে, "বেশ চল্‌চে, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের শার ; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এম্‌নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি ! তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীন তেমনি কঠোর ; তুমি ছোট, তোমার তূণ ছোট, তোমার তীর ছোট, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু ত দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়্‌ল ; দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেচ, পাথর মান্‌চে হার, ধূলো দাসখৎ লিখে দিচ্ছে।"

বট বল্‌লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখ্‌লে ?"

আমি বল্‌লেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্ম্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্ত্তিতে। সেই জন্যেই ত তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেচে ঐ সহজ যুদ্ধ-

জয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারি পাঠশালা খুলেচ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেনাঁর কয়েক পৃষ্ঠা।*

অতীতের প্রতি M. de Sacy-র টান স্পষ্ট, ফলে তিনি যে বর্ত্তমানের উপর কঠোর হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। M. de Sacy-র স্বভাব মন্দের ভাগটাই বেশি করিয়া দেখা, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কোনই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এমন সময়ও আসিয়া থাকে যখন কেবল ভাল দেখাই যার স্বভাব, তাঁর যে মনের একটা সঙ্কীর্ণতা, অন্তঃকরণের একটা নীচতা আছে—এ সন্দেহ আমাদের আপনা-হতেই হয়। প্রাচীন জগৎকে শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছিল এত যে সৎগুণ, সে সব হারাইয়া আধুনিক সমাজ বিশেষ সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—M. de Sacy-র এ কথার সহিত আমি একমত। কিন্তু আমাদের যুগে যে জ্ঞানচর্চ্চা চলিয়াছে তাহার মূল্য যে কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতের একটু পার্থক্য আছে। আমাদের এ যুগ, জগতের ও মানবজাতির সঠিক তত্ত্বটি যতদূর তলাইয়া দেখিয়াছে আর কোন যুগ তাহা করে নাই; আমার মনে হয়, আমাদের সমসাময়িক হাজার কয়েক ব্যক্তির মধ্যে যে পরিমাণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্মঅনুভূতি, সত্য তত্ত্বজ্ঞান, এমন কি মার্জ্জিত অন্তঃপ্রকৃতি দেখিতে পাই, সমস্ত যুগগুলি একত্র করিলেও সেখানে তাহা পাই না। কিন্তু এই যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ, যদিও আমি বলিতেছি

---

* মূল ফরাসী হইতে—।

ইহার তুলনা কোন যুগে নেই, তবুও এটি আমাদের যুগের বাহিরেই পড়িয়া আছে, ইহার প্রভাব আমাদের যুগের উপর খুব অল্পই। একটা স্থূল জড়বাদ ক্রমে ক্রমে মানুষকে যেন চালাইয়া লইতে চাহিতেছে, সাক্ষাৎ কাজের হিসাবেই সব জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্যবোধকে বা শুধু কৌতূহলকে চরিতার্থ করা ছাড়া যে জিনিষের অন্য কোন সার্থকতা নাই, তাহাকেই একপাশে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। ঘর-গৃহস্থালীর ভাবনা চিন্তা লইয়া প্রাচীন জনসঙ্ঘ খুব কমই ব্যাপৃত থাকিত, বর্ত্তমানে তাহাই কিন্তু হইয়া পাড়য়াছে মহৎ অনুষ্ঠান। আমাদের পিতৃপুরুষদের পুরুষোচিত প্রয়াস সমূহের স্থান অধিকার করিয়াছে যত তুচ্ছ ক্লেশ। যে ধর্ম্মের বা যে তত্ত্ববাদেরই ভাষায় বলি না কেন, মানুষ ইহজগতে আছে ভোগের লাভেরও উপরে একটা অতীন্দ্রিয় আদর্শোচিত লক্ষ্যের জন্য। ঐ লক্ষ্যটির কাছে পৌঁছাইয়া দিতে আধিভৌতিক উন্নতি আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? আগের তুলনায় মানুষ মোটের উপর বেশি বুদ্ধিমান, বেশি চরিত্রবান, স্বাধীনতার জন্য বেশি লালায়িত, সুন্দর জিনিষের উপর বেশি আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি? ইহাই জিজ্ঞাস্য। উন্নতি হইতেছে, বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কতকগুলি সুখসুবিধা হইবে এই আশায় অন্তঃকরণকে ছোট হইতে দেখিয়াও যে লজ্জা পায় না, উন্নতির প্রতি তাহার মত দারুণ অতিবিশ্বাস না থাকিলেও চলে। মানবজীবন স্পৃহনীয়, কেননা মানবজীবনের আছে একটা অর্থ, একটা মুল্য যাহাকে হারাইয়া ঐ সুখসুবিধা লাভ করাকে প্রকৃত উন্নতিকামী মানুষ কখন যথেষ্ট মনে করিবেন না।

সত্য বটে, আধিভৌতিক উন্নতি হেয় নয়; দুইটি সমাজ যদি

বুদ্ধিতে ও চরিত্রে সমান হয় কিন্তু একটিতে যদি থাকে বাহ্যিক উন্নতির বহুল বিকাশ, আর একটিতে যদি তাহা না থাকে, তবে নিঃসন্দেহচিত্তে প্রথমটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে যে কথাটা মানিয়া লওয়া উচিত নয় তাহা এই যে, ভৌতিক উন্নতি নৈতিক অবনতির ক্ষতিটা পুরণ করিয়া দিতে পারে। সমাজ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তার চিহ্ন আমরা একেবারে নিঃসন্দেহে পাই তখন, যখন দেখি বড় উদ্দেশ্য লইয়া দ্বন্দ্ব আর নাই, ফলে যখন ব্যবসাবাণিজ্য ও দণ্ডবিধানের সমস্যার তুলনায় মহা রাজনৈতিক সমস্যা সব গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই জীবন-ইতিহাসে এমন একটা প্রলোভনের সময় উপস্থিত হয়, সয়তান যখন তাহাকে জগতের সম্পদ দেখাইয়া দিয়া বলে, "এ সবই তোমাকে দিব, আমাকে যদি পূজা কর।"

তাই বলিয়া নৈতিকবল যে সকল প্রাচীন যুগেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল, এ অত্যুক্তিও যেন আমরা না করিয়া বসি। কারণ, চিরকালও জিনিষ ছিল অল্প কয়েকজনেরই অলঙ্কার। স্বল্প সংখ্যক এক অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যেই ন্যস্ত রহিয়াছে মানুষের মহত্ত্ব; এই অভিজাত শ্রেণী বাঁচিয়া থাকিবার, আপনাকে ছড়াইয়া দিবার আবহাওয়া পাইতেছে কি না, সেই অনুসারেই স্থির করিতে হইবে মানবজাতির ধর্ম্মবল বাড়িতেছে না কমিতেছে। ফলত এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মহা বিস্তার ব্যবসাদার নয় যাহারা, অর্থাৎ—পুরাকালে যাহা-দিগকে বলা হইত সম্ভ্রান্ত (noble) তাহাদের উপর একটা বিপুল দাবি খাড়া করিয়া জগৎকে যেন নিজের ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলিতেছে। আধুনিক সমাজের একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মের তাড়ণায় প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রতিভা বা যে মূলধনের অধিকারী হইয়াছে সেটিকে খাটাইয়া লইতে ক্রমেই

বাধ্য হইয়া পড়িতেছে, টাকার হিসাবে যে ব্যক্তি কিছুই উৎপাদন করিতেছে না তাহার জীবন যাত্রা অসম্ভবই হইয়া উঠিতেছে। নব্যতন্ত্রের দলভুক্ত কেহ কেহ এই পরিণামটি স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে যতদিন তাঁহাদের মত সব শ্রেণীই বৈশ্য না হইয়া উঠে ততদিন বৈশ্যবৃত্তি কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে অনিষ্টকর হইবেই। এ রকম অবস্থা যদি চরমে যাইয়া পৌঁছে (অবশ্য আমি মানি তাহা কখনো ঘটিবে না), তবে তাহার ফল হইবে এই যে, যাঁহাদের কর্ম্মটি হইতেছে আর্থিক সুবিধার কাছে অন্তরের স্বাধীনতাকে কখনো বলি না-দেওয়া, তাঁহাদের পক্ষে এ পৃথিবী আর বাসের যোগ্য থাকিবে না—এ কথা কে না বুঝিবে? শিল্পীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, সে কি ক্রেতার হুকুম অনুসারে, মূর্ত্তি গড়িবে, না ছবি আঁকিবে? ইহার অর্থ কি এই নয় যে উঁচুদরের শিল্পকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা? এ শিল্প ত, যে-শিল্প তুচ্ছভাব ও ইতর রুচির সঙ্গে মিশ খাইয়া চলে, তাহার ন্যায় লাভের নয়। জ্ঞানীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, তিনি কি সাধারণের জন্য গ্রন্থ রচনা করিতে থাকিবেন? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে রচনা যত মূল্যবান হয় তাহার পাঠকও তত কম হইতে বাধ্য। আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, তিনি আবার সেই সঙ্গে ছিলেন গুণীপুরুষ, নাম তাঁর 'আবেল' (Abel), তিনি ত দারিদ্র্যেরই মধ্যে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং মানুষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি সম্বন্ধে, এ কথা স্পষ্টই দেখা যায় যে কাজের মূল্য আর তার পরিশ্রমের মূল্য, এই দুইএর মধ্যে আছে একটা বিপুল অসামঞ্জস্য, অথবা আরও ঠিক বলিতে গেলে, কাজের মূল্য আর পরিশ্রমের মূল্য, এ দুটি চলে বিপরীত

অনুপাতে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যে-সমাজে স্বাধীন জীবন কঠিন হইয়া পড়িতেছে, যেখানে সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে যে উৎপাদন করে সে, যে কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে পদদলিত করিয়াই চলিয়াছে, সে-সমাজে পরিশেষে সকল উচ্চবৃত্তিই লোপ পাইয়া বসে, অর্থাৎ—সে-সমাজের উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া পড়ে। মধ্যযুগ এই সত্যে এতদূর অনুপ্রাণিত হইয়া গিয়াছিল যে তখন এমন উদ্ভট ব্যবস্থাও দেওয়া হয় যে দারিদ্র্যও একটা সৎগুণ, আধ্যাত্মিক কর্ম্মে ব্রতী যিনি, তিনি ভিক্ষা দ্বারাই জীবনযাপন করিবেন। এ মতে স্বীকার করা হইয়াছিল যে জগতে দাম দিয়া কেনা যায় না এমন জিনিষও আছে; বাহিরের কোন মূল্য দিয়াই ভিতরের বস্তুকে নিরূপণ করা যায় না, আর অন্তরাত্মার জন্য যে সেবা, তাহার এমন কোন পারিশ্রমিকই নাই যাহাকে বেতন নাম দেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় চার্চ্চ যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া এই নীতিটিই ধরিয়া রথিয়াছে; অর্থ দিয়া তাহার দাবি যে চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, একথা সে কখনও স্বীকার করিবে না, সে বলে সে চিরদিনই গরীব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইলেও সে বলিতে থাকিবে, জড়বস্তু বিষয়ে, সে কিছুই চাহে না, চাহে শুধু সেণ্টপল যাহা চাহিয়াছেন—গ্রাসাচ্ছাদন।

জড়বস্তুর উপর মানুষের আধিপত্য যে বাড়িয়া উঠিয়াছে ইহা একটি স্পষ্ট লাভ, এদিক দিয়া আমাদের যুগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাকে প্রশংসা করিতেই হইবে। কিন্তু এ রকম উন্নতি যদি প্রকৃতির বাধাসমূহের উপরে জয়ী করিয়া মানুষকে আপন আদর্শ সাধনের সহায়তা করিতে পারে তবেই শুধু তাহার পূর্ণ সার্থকতা। প্রয়োজনের ভোগের জিনিষকে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে

লইয়া আসা অপেক্ষা একটি সুন্দর চিন্তা, একটি মহৎভাব, একটি সৎকার্য্যের স্রষ্টা বলিয়াই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির রাজা বলা চলে। এই রাজত্ব হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মায়। যে জড়বাদী জীবনের দিব্য অর্থটি না বুঝিয়া ভূমণ্ডলের উপরে উপরেই ওলট-পালট খাই-তেছে, সে নয়, কিন্তু থৈবাইদ মরুভূমির তপস্বী, হিমালয়শৃঙ্গের ধ্যানী নানাহিসাবে প্রকৃতির দাস হইলেও তাঁহারাই হইতেছেন উহার অধীশ্বর, তাঁহারাই অন্তরাত্মার দিক দিয়া উহার- ব্যাখ্যা দিতেছেন। আমাদের তুচ্ছ আনন্দ অপেক্ষা তাঁহাদের দুঃখবাদও সৌন্দর্য্যে ভরপুর অতএব অনেক শ্রেয়। তাঁহাদের উন্মত্ততাই মানবপ্রকৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে—আর যে সব মানুষের জীবন স্থিরবুদ্ধি-পরিচালিত বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু শুধু লাভলোকসানের হিসাব গত স্বার্থাভিমানের তুচ্ছ কলহে পরিপূর্ণ।

সুতরাং M. de Sacy-র এ অনুযোগ ন্যায়সঙ্গত যে আমাদের সমাজে কত শত ভাল জিনিষের আর স্থান নাই, তাহারা আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এসব জিনিষ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে আসে না, ইহাদের অভাবও তাই চক্ষে ধরা পড়ে না; কিন্তু একদিন দেখা যাইবে ইহারা চলিয়া গিয়া জগতের মধ্যে কি বিপুল ফাঁকাই রাখিয়া গিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যুগের ভুল এই যে আমরা বুঝিতেই চাই না, যে বিশেষ বিশেষ বিদ্যা—যে বিদ্যা ব্যবহারে আসে, তাহার উপরে আছে একটা সাধারণ জ্ঞানমাহাত্ম্য। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা সেই একই ভুল করিতেছি। প্রয়োজনের খাপে খাপে যাহা মিলিয়া যায় না তাহাকেই আমাদের মনে হয় আড়ম্বর-অলঙ্কার। সত্য বটে, ভদ্রলোক লোপ পাইলেও ক্ষুণ্ণ

হইবার কিছু নাই; কারণ এ নামটি দেয় জন্মের পরিচয়, আর আজকাল সকল শ্রেণী হইতে প্রায় সমান পরিমাণেই কৃতী লোকের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইতে হয় সৎলোক হারাইয়া—এ কথাটি আমি ব্যবহার করিতেছি ১৭শ অব্দে ইহার যে অর্থ ছিল সেই অর্থে, অর্থাৎ—সেই লোক যিনি বিশেষ কোন পেশার দিক দিয়া কোন জিনিষকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন না, যাঁহার মনে বা চলনে বিশেষ কোন শ্রেণীর ভঙ্গিমা নাই। বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম প্রায়ই বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের সৃষ্টি করে, এমন কি সে কর্ম্মে ভাল রকম সফল হইতে হইলে, প্রত্যেকের, যাহাকে বলা হয় বৃত্তিগত মন, সেটি থাকা চাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব (nobility) জিনিষটি ত ঠিক এইখানেই, যে তাহার এরকম কোনই বন্ধন নাই; কোন বিশেষ ব্যবসা নাই যাহাদের, তাহাদের দিয়াই ত বিশেষ ব্যবসা আছে যাহাদের, তাহাদের পার্থক্যটি দেখান সম্ভবপর। এসব লোকের ধনী হওয়া উচিত নয়, কারণ টাকার হিসাবে ইহারা সমাজকে কিছুই দেয় না। কিন্তু ইহাদেরই হওয়া উচিত আভিজাত্য—আভিজাত্য কথাটি এখন হইতে এই নিতান্ত বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে; তবেই মানুষ যে-সব জিনিষ লইয়া চলে তাহাদের মোট ধরণটির মর্য্যাদা বজায় থাকিবে, তবেই নানা বিভিন্ন-দিক হইতে জীবনকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইবার লোক মিলিবে। যে-সব লোক বিশেষ কাজে ব্রতী, বিশেষ দিক দিয়াই দেখিতে অভ্যস্ত যাহারা, তাহারা ত হৃদয়ঙ্গম করে না জীবনের নানা বিভিন্ন দিকের কি প্রয়োজন।

যে-সব জিনিষ সূক্ষ্ম, যাহা সুদূরের দিকে চাহিয়া আছে, আধুনিক সমাজসংস্কারকগণ সে সকলকে দিয়াছেন একটা অতি সঙ্কীর্ণ ভিত্তি;

আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এই জন্য উহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। যাহা মহৎ, তাহা যে হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। সুপরিপক্ক পূর্ণাঙ্গ হইতে, জিনিষের দরকার দুই বা তিন শত বৎসর আয়ু, আমরা দেখি যে আমাদের জীবনকালের মধ্যে বিধাতা ও তাঁর বিধান দশবার বদলাইয়া যাইতেছে। মানুষের মধ্যে কাব্যকলার আসন্নমৃত্যুও ঐ জন্যই। কবিতা জিনিষটি সমস্তই অন্তরাত্মার ভিতরে, ভাবুকতার মধ্যে। কিন্তু আমাদের যুগের প্রবৃত্তিই হইতেছে সব জায়গায় ভিতরের যন্ত্রের পরিবর্ত্তে বাহিরের যন্ত্র দিয়া কাজ করা। খুব তুচ্ছ একটা জিনিষ, এই সামান্য একখণ্ড বস্ত্রও প্রায় ভিতরের জিনিষ হইয়া, মানুষভাব ধরিয়াই উঠে যখন দেখি, তাহার প্রত্যেক বুননটির সাথে সাথে মিশিয়া আছে শতাধিক সজীব সত্ত্বার নিশ্বাসপ্রশ্বাস, তাহাদের হৃদয়ানুভূতি, হয়ত বা তাহাদের দুঃখ কষ্ট, যখন দেখি তাঁতিনী ঝাঁপটি উঠাইতে নামাইতে তাঁতী মাকুটি স্বল্পাধিক দ্রুততালে ঠেলিতে ঠেলিতে কাজের সাথে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের কাহিনী, তাহাদের গান জড়াইয়া সে বস্ত্রখানি তৈয়ার করিয়াছে। আজ কিন্তু সে সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে প্রাণহীন সৌন্দর্য্যহীন একটা যন্ত্র। প্রাচীনকালের যন্ত্রটি মানুষের সাথে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাই ক্রমে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল জীবাধারেরই মত জীবন্ত ঐক্য, একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য। আধুনিককালের যন্ত্রটি হইতেছে কিন্তু কদর্য্য, তাহার না আছে শ্রী, না আছে সৌষ্ঠব; সে কখনো মানুষের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহার সেবা যে করে সে আপনাকেই ক্ষুদ্র পশুস্বভাব করিয়া ফেলে, প্রাচীন যন্ত্রটির মত সে আর তাহাকে বন্ধু ও সহায়রূপে পায় না।

মানুষের দেবভাব শুধু তাহার অন্তরাত্মারই দিক দিয়াই; বুদ্ধিকে ও স্বভাবকে সে যদি কতক পরিমাণে নির্দ্দোষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তবেই সে তাহার জীবনের লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিল। এই সুমহৎ উদ্দেশ্যের যাহা সহায় হইতে পারে, তাহা কিছুই অদরকারী নয়; কিন্তু স্থূলজগতের যে-সব উন্নতি, সাথে সাথে তাহারা মনকে ও স্বভাবকে উন্নত করিতে পারে না, অতএব তাহাদের নিজস্ব যে কিছু মূল্য আছে, এ বিশ্বাস একটি মস্ত ভুল। বাহিরের বস্তুর ততখানিই মূল্য, যতখানি মানুষের ভিতরের ভাবের সহিত তাহার মিল আছে। আজকাল অতি সামান্য একটি বাগানে যে-সব ফুল পাওয়া যায়, এককালে তাহা থাকিত শুধু রাজার উদ্যানে। কিন্তু ভগবানের গড়া ক্ষেতের ফুলই যে মানুষের প্রাণে গিয়া কথা কহিত, মানুষের প্রাণে যে জাগাইয়া তুলিত প্রকৃতির প্রতি একটা সুমধুর ভাব, তাহাতে কি আসে যায়? আজকাল সকল রমণীই যে রকমে সাজসজ্জা করিতে পারে, আগে কেবল রাজরাণীরাই তাহা পারিতেন; কিন্তু সেজন্য আজকালের রমণী যদি বেশি সুন্দর বেশি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? ভোগের পন্থা সহস্রভঙ্গীতে সূক্ষ্ম করিয়া অসংখ্যগুণে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে; তবে ইহা সব ক্লান্তির বিরক্তির বিষে জর্জ্জরিত, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিল বেশি আনন্দ, বেশি তৃপ্তি; কিন্তু কি আসে যায় তাতে? ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে সেই অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইয়াছে কি? আমাদের পূর্ব্বেই যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সমাজের একটা জ্বলন্ত জীবন্ত গতিধারা, আজ পর্য্যন্ত তাহাই ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—তাঁহাদের মত সুন্দর জিনিষ

ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে কি? শিক্ষাকে কি আরও উদার করিয়া তোলা হইয়াছে? মানুষের প্রকৃতি কি শক্তিতে, মহত্ত্বে বাড়িয়া উঠিয়াছে? নূতন যুগের মানুষের মনে উচ্চভাব, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব, জ্ঞানের চর্চ্চা, আপন মতের উপর নিষ্ঠা, ধন ও ক্ষমতার প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজ বেশি পরিমাণে কি পাওয়া যায়? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব না। আমি শুধু বলিব, এ সব জিনিষ ছাড়া উন্নতি আর কিছুতে নাই। যতাদন এ রকম উন্নতি না হইতেছে, ততদিন অতীতের সৎগুণরাশী হারাইয়া পাইলাম আরামে থাকার সুব্যবস্থা কিন্তু সুখের মাত্রা তাহাতে বেশি হইল না, পাইলাম নিষ্কণ্টক শান্তিভোগ, কিন্তু হইল না স্বভাবের উৎকর্ষ; এই বিনিময়ে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে যাহারা তাহারা কোনই সান্ত্বনা পাইবে না।

পত্র।

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

তুমি আমার গত পত্রের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেছ যে—

"না হয় মনস্থির করলুম যে—অতঃপর সাহিত্যেরই চাষ করব। কিন্তু লিখি কি? লেখবার বিষয় নিয়েই ত যত গোল।"—

এ প্রশ্ন আমার মনকে যে ব্যতিব্যস্ত করে নি, তা নয়। অনেক দিন এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি। তারপর একদিন এর একটা সদুত্তর আপনা হতে আমার মনে এসে গেল, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে সাহিত্যের কোনো বিষয় নেই। এই নব আবিষ্কৃত মত পাছে আবার হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে তখন মনের মধ্যে যে সব কথা উদয় হয়ে ছিল—সে সব আর কাল বিলম্ব না করে লিপিবদ্ধ করে ফেললুম। সে লেখা অবশ্য প্রকাশ করবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কেন যে তা প্রকাশ করি নি, তার কারণ শুনবে?—পাছে লোক আমাকে dilettente বলে, এই ভয়ে লেখাটা চেপে রেখেছিলুম। জানই ত আমি সেই সব ইংরেজি কথাকে বড় ডরাই যার ঠিক মানে আমরা কেউ জানি নে অথচ সবাই যখন-তখন আওড়াই। যে লেখা প্রবন্ধ হিসাবে চলবে না, সেটা পত্র হিসাবে চলতে পারে, এই বিশ্বাসে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সাহিত্যের বিষয়।

আজ আমার একটি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যখন সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় তখন আমার জনৈক আকৈশোর বন্ধু আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করেন। কি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করব জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন যে, কোন বিষয়েই নয়। এ প্রস্তাবে আমি নিজেকে মহা সম্মানিত মনে করি, কেননা এ অনুরোধ হচ্ছে আকাশ-কুসুম রচনা করবার অনুরোধ, অতএব আমি ধরে নিলুম যে বন্ধুবরের মতে সাহিত্য-জগতে আমি একটি অদ্ভুতকর্ম্মা-ব্যক্তি এবং আমার লেখনী হচ্ছে অঘটন-ঘটন পটিয়সী।

আমি অবশ্য তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি নি। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলুম তাঁর প্রস্তাবটি একেবারে অসঙ্গত নয়। মানুষে যা করেছে মানুষে তা করতে পারে। এই ভূতাকাশে মানুষ যে ফুল ফুটিয়াছে সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত নেই। আমরা যাকে আতসবাজি বলি তার উদ্দেশ্য আকাশে ফুল ফোটানো ছাড়া আর কি? সকলেই প্রত্যক্ষ করেছে যে প্রকৃতির হাতে-গড়া ফুলের চাইতে মানুষের হাতে গড়া এই সব আকাশকুসুমের বর্ণ ঢের বেশি উজ্জ্বল, আর ঢের বেশি বিচিত্র, এমন কি তুবড়ির ফুলের পাশে আকাশের তারাও হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। এই অমূলক ফুলের উপরে গাছের ফুল শুধু এক বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে, সে হচ্ছে তার স্থায়ীত্বে। প্রকৃত ফুলের জীবনের মেয়াদ একসন্ধ্যে, আর কৃত্রিম ফুলের এক মুহূর্ত্ত। কিন্তু এ প্রভেদ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কার আত্মা এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ

করে, আর কার আত্মা এক প্রহরে, অনন্তকালের হিসেবে তা গণনার মধ্যেই আসে না। এ জগতে সবই অনিত্য, সম্ভবত হয় পরমাত্মা নয় পরমাণু ছাড়া, সুতরাং কালের হিসেবে সব পদার্থেরই মূল্য সমান, কিন্তু আমাদের হিসেবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর মূল্যের তারতম্য অগাধ এবং সে তারতম্য নির্ভর করে, হয় বস্তুর রূপের নয় তার গুণের উপর। পৃথিবীতে যার কোনো মূল নেই এমন ফুল যদি কেউ আকাশে ফোটাতে পারে তাহলে এক রূপের গুণেই তা আমাদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

ভূতাকাশের আঁধার ঘরে আলোর ফুল ফোটানো, মানুষের পক্ষে ছেলেখেলা হতে পারে, কিন্তু চিদাকাশে ঐ ফুল ফোটানোই হচ্ছে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতীত্ব। আমরা যাকে কাব্য বলি,—তার প্রতিটিই এক একটি আকাশ কুসুম, কেননা সে সব ফুলের মূল বস্তুজগতে নেই, আছে শুধু মনোজগতে। মেঘদূতের অলকা আর শকুন্তলার তপোবন, দুটি অপূর্ব্ব সুন্দর আকাশ কমল বই আর কি? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ শুধু বর্ণে; একটির রঙ লাল আর একটির শাদা। অলকা কবির হৃদয়ের তাজা রক্তে রঞ্জিত আর মালিনীর তীরস্থ তপোবন কবির আত্মার শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। এ উভয়ই আকাশ দেশের বস্তু, অর্থাৎ—এ উভয়ই চিরদিন মানুষের হাতের বাইরেই আছে এবং থেকে যাবে। এবং এ উভয়ই অজর এবং অমর, কেননা মর্ত্ত্যভূমির সঙ্গে উভয়ই সম্পর্কশূন্য। সুতরাং সাহিত্য-জগতে আকাশকুসুম রচনা করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, ঐ হচ্ছে কবিপ্রতিভার চরম সৃষ্টি। এই কারণেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কবির ভারতীকে "নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতাহ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা" বলা হয়েছে। তবে যে আমি

আমার বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করি নি, তার কারণ এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমি কবি নই, আর এক শ্রেণীর জীব।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি ছাড়া অপর কেউ যদি আমাকে এ অনুরোধ করতেন, তাহলে আমি মনে ভাবতুম যে উক্ত প্রস্তাবের অন্তরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে। উক্ত বন্ধুবর সম্বন্ধে সে সন্দেহ মনে উদয় হয় না, কেননা তিনি হচ্ছেন একজন পরম থিয়োজফিস্ট। আমরা সম্ভব অসম্ভবের ভিতর যে লজিকের সীমারেখা বসিয়ে দিই, তাঁর কাছে সে রেখার আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। সুতরাং তাঁদের ভাষায় অসম্ভব বলে কোনো শব্দই নেই। সে যাই হোক, অপর কেউ যদি আমাকে এমন একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করতেন যার কোনো বিষয় নেই, তাহলে আমি ধরে নিতে পারতুম যে তিনি ঐ অনুরোধচ্ছলে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমার লেখার ভিতর কোনো বস্তু নেই। আমার লেখা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য মধ্যে মধ্যে আমার কর্ণগোচর হয়েছে। কারো কারো মতে আমার লেখার অন্তরে কোনো সার নেই, যা আছে সে হচ্ছে শুধু হাসি-তামাসা, কথার মারপেঁচ, অর্থাৎ—তাতে শ্লেষ আছে, উপমা আছে, অনুপ্রাস আছে, বক্রোক্তি আছে, ব্যঙ্গোক্তি আছে, আর কিছু নেই। আর কিছু যদি থাকে ত সে হচ্ছে অ-বস্তু। এক কথায়, সাহিত্যে আমি বিনি সূতোয় কথার মালা গাঁথি, এ কথা যদি সত্য হত তাহলে আমি সত্য সত্যই নিজেকে ধন্য মনে করতুম। আমার কলমের মুখ দিয়ে যদি কথার রঙ-বেরঙের ফোয়ারা ছুটত—তারপরে তার পুষ্পবৃষ্টি হত তাহলে সকলকেই স্বীকার করতে হত যে আমার ভারতী "নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী এবং অনন্য পরতন্ত্রা" অর্থাৎ—আমি একজন জাতকবি। সমালোচকেরা ভুলে যান

যে, একমাত্র আর্টিষ্টের লেখনীর ডগা দিয়েই ভাব ফুলের আকারে ফুটে ওঠে, আর ভাষা তারা কাটে। সুতরাং এ ব্যাজস্তুতি আমি আত্মসাৎ করতে একেবারেই অপারগ। এ জ্ঞান আমার আছে যে আমি কবিও নই, আর্টিষ্টও নই,—আমি হচ্ছি একজন একেলে নৈয়ায়িক, সাহিত্যের আসরে তর্ক করাই হচ্ছে আমার পেশা, এবং আমার লেখার ভিতর যদি কোনরূপ কৌশল থাকে ত সে হচ্ছে সহাস্য তর্ক করবার কৌশল। সম্ভবত ঐ হাসির আবরণই অনেককে তর্কিত বিষয়ের স্বরূপ দেখতে দেয় না। সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের বিশ্বাস, যে-কথা গম্ভীর ভাবে বলা হয় নি, সে-কথার ভিতর কোনো গুরুত্ব নেই। যে-কথা চোখের জলে ভিজে নয় তার ভিতর রস নেই। আমি ত কোন্ ছার,—যে অসামান্য প্রতিভাশালী লেখকের মতামত আজকের দিনে ইউরোপের দার্শনিক সমাজের মনের উপর প্রভুত্ব করছে সেই অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্‌কে তাঁর ক্লাসের একটি ছাত্র একদিন জিজ্ঞাসা করে "Can't you ever be serious"? বলা বাহুল্য সে সময়ে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচার দিচ্ছিলেন।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, এ সব কথা আমি সাহিত্যসমাজে সাফাই হবার জন্যে বলছি এবং প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা করছি। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পরনিন্দা করবার চাইতে আত্মপ্রশংসা করা ঢের বেশি নিরাপদ। নিজের প্রশংসা নিজে করলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু পরের নিন্দা করলে কেউ তা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা কি বলি, তার চাইতে তা আমরা কি করে বলি,—তার মূল্য কম

ত নয়ই, বরং অনেক বেশি। আজকের মতামত যে কাল টেঁকে না তার প্রমাণ ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছাপা রয়েছে। মানুষের জ্ঞানের সম্পদ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং এক যুগের স্বল্প-জ্ঞানের উপর যে মতামত প্রতিষ্ঠিত পরযুগের প্রবৃদ্ধজ্ঞানের আলোকে তার হীনাঙ্গতা ধরা পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেগেলের দর্শন ইউরোপের মনের উপর কি রকম একাধিপত্য স্থাপন করেছিল তা সকলেই জানে। আর আজ সে দর্শনের কি দশা! সে দিন ষ্টেইন নামক জনৈক জর্ম্মান দার্শনিকের গ্রন্থে পড়লুম যে, এ যুগে হেগেলের গ্রন্থ কোনো জর্ম্মান দার্শনিক স্পর্শ মাত্রও করে না। ও হাড় নাকি জর্ম্মানির দার্শনিক সমাজের কোন কুকুরেও চিবয় না! অপর পক্ষে প্লেটোর দর্শন অদ্যাবধি সকল দার্শনিকই শ্রদ্ধাভরে, ভক্তিভরে, সানন্দে ও সোৎসাহে পাঠ করেন। এর কারণ কি? প্রথমেই চোখে পড়ে যে Style-এর গুণে প্লেটোর দর্শন মানুষের চির-আনন্দের অতএব চির-আদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে, আর Style-এর দোষে হেগেলের দর্শন চিরদিনই কষ্টপাঠ্য ছিল, এবং যখন তাঁর মত অগ্রাহ্য হল, তখন তাঁর গ্রন্থ যথার্থই অপাঠ্য হয়ে পড়ল। এক কথায়, হেগেলের মতের পিছনে কোনো বড় মন নেই—আর প্লেটোর মতের পিছনে যে-মন আছে তার সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের কোনোই সীমা নেই। এই কারণে প্লেটোর দর্শন সাহিত্য, আর হেগেলের দর্শন হয় বিজ্ঞান, নয় ত কিছুই নয়।

এই সব দেখে শুনে এ কথা বলতে সাহস হয় যে, সাহিত্য হচ্ছে সেই বস্তু যার অন্তরে কোনো বিষয়ের নয়, মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সে মন যত মহৎ, যত সুন্দর, যত শক্তিশালী হবে

তার প্রকাশও তত উজ্জ্বল, তত মনোহারী হবে। সাহিত্য মানুষকে কোনও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের শিক্ষা দেয় না। যাঁদের মন বড়, তাঁরা তাঁদের মনের মহত্ব আমাদের সকলেরি মনে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত করে দিতে পারেন; এই কারণে মানুষে যত কিছু করেছে, সাহিত্যের স্থান সে সবের উপরে। কবিই হচ্ছে মানুষের যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা, কেননা তাঁর বাণী মানুষকে তার হৃদয়ের ও মনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে।

আর এক কথা, সাহিত্যে যে মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, সাহিত্যে এবং একমাত্র সাহিত্যেই মানুষের পূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়—অপর পক্ষে যাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলি তাতে মানুষের শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই খেলা দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই জানে যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট যে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন তার একখানির বিষয় ছিল pure reason, আর একখানির practical reason, আর একখানির Æsthetic judgment, অর্থাৎ তিনি প্রথমে সত্যাসত্য জ্ঞানের, তার পরে ভালমন্দ জ্ঞানের এবং সর্ব্বশেষে সুন্দর অসুন্দরের জ্ঞানের বিচার করেন। বলা বাহুল্য মানুষের অন্তরে এ কটি স্বতন্ত্র শক্তি নয়—আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর এ তিনটি শক্তি একটি শক্তিরই ত্রিমূর্ত্তি। আমাদের মন যখন কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখন সেটিকে আমরা আমাদের সমগ্র মন দিয়ে—হয় চেপে ধরি, নয় ঠেলে দিই এবং তার সত্যতা, তার উপাদেয়তা, তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের আত্মা একযোগে রায় দেয়। বিষয় বিশেষের স্পর্শে যাঁর সমগ্র মন সাড়া দেয় এবং যিনি সেই সমগ্র মনের জীবন্ত ছবি বাণীর সাহায্যে লোকের

চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারেন তিনিই যথার্থ সাহিত্যিক অতএব যথার্থ সাহিত্য একাধারে দর্শন বিজ্ঞান এবং আর্ট।

আর এক কথা, আমরা সকলে মানুষ হলেও সকলেই এক প্রকৃতির মানুষ নই। আমাদের কি দেহ কি মন কি চরিত্র কিছুই আর এক ছাঁচে ঢালাই হয় নি। তারপর শিক্ষা দীক্ষার গুণে অভ্যাসের বশে কতকটা অবস্থার প্রভাবে কতকটা স্বীয়কর্ম্মের ফলে আমাদের এই জন্মসুলভ বিশেষত্ব হয় ফুটে ওঠে, নয় চেপে. যায়। সুতরাং সকল বিষয়ের সংস্পর্শে আমাদের সকলের মন সাড়া দেয় না, এবং যাদেরও দেয় তাদেরও একভাবে দেয় না। যাঁর বাণীর অন্তরে একটি বিশেষ মনের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর লেখাই সাহিত্য, এবং এই কারণেই সাহিত্যে style-এর মাহাত্ম্য এত বেশি, কেননা style-এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে মানুষের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গী, সাহিত্যের বিষয় ত হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের মনও বিভিন্ন এবং তার প্রকাশের ভঙ্গীও বিচিত্র, সে কারণ সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্যও এত অসীম। আমার এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় সাহিত্য বলে কোনো পদার্থই নেই, আছে—শুধু নানা জাতীয় সাহিত্য, কেননা যে সব লোকের ব্যক্তিত্ব শিক্ষা দীক্ষার গুণে এবং আত্মচেষ্টার ফলে ফুটে ওঠে তাঁরা সত্য সত্যই পরস্পর বিভিন্ন জাতের মানুষ হয়ে ওঠেন।

দেখতে পাচ্ছ ঘুরে ফিরে আবার সেই individualism-এরই গুণকীর্ত্তন করছি—যার নাম শুনলে আঁতকেওঠা এদেশে পেট্রিয়ট্‌জমের একটা প্রধান নিদর্শন, কিন্তু কি করা যাবে? ও কথা বলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমাদের সকলেরই যদি, এক জ্ঞান, এক ধ্যান

এক মত, আর এক ভাষা হত, তাহলে আমাদের হাত থেকে যে সাহিত্য বেরত, তা এক কলে তৈরি জিনিষের মত সব এক আকার এক বর্ণ এক মাপ এক মূল্য হত। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় আমাদের একাধিক গ্রন্থ পড়বার কোনো প্রয়োজন থাকত না। পড়বার কথা দূরে থাক লেখবার কোনো প্রয়োজন থাকত না, কেননা কেউ এমন কোন কথা বলতে পারতেন না, যে কথা সকলের কথা নয়। এ অবস্থা অবশ্য খুব আরামের অবস্থা, কেননা ও অবস্থায় মনের কোন খাটুনিই থাকত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেয়, এমন কি যা কিছু প্রেয়, তার রচনার ভিতরও আরাম নেই, ধারণার ভিতরও আরাম নেই। ইহজীবনে মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় হচ্ছে—সত্যকে সুন্দর করে তোলা, আর সুন্দরকে সত্য করে তোলা এবং এ দুই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, অল্পবিস্তর সাধনার আবশ্যক। সুতরাং সাহিত্য রচনার জন্য রচয়িতার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ—নিজের ব্যক্তিত্ব বিকসিত করে তোলা। Pericles এর যুগে আথেন্সের এবং এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্য যে এত বেশি, তার কারণ এ উভয় যুগে উভয় দেশেই বহু লোকের ভিতর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ স্ফূর্ত্তিলাভ করেছিল। অপর পক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের জর্ম্মানীর সাহিত্যের যে কোনো ঐশ্বর্য্য নেই তার একটি প্রধান কারণ জর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শাসন এবং জর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শিক্ষা দেশশুদ্ধো লোকের মন ও চরিত্র একই ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেছিল এবং জর্ম্মানীর দুর্ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিল। আমাদের সমাজ-শাসন এবং আমাদেরও শিক্ষাদীক্ষা মানুষের individualism-

এর স্ফূর্ত্তির মোটেই অনুকূল নয়, সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের উন্নতির জন্ম আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যকে individualism-এর স্বপক্ষে লড়াই করতেই হবে। অর্থাৎ—বিষয়কে গৌণ করে বিষয়ীকে মুখ্য করে তুলতে হবে।

বীরবল।

পুনশ্চ—

এ প্রবন্ধ বহুদিন পূর্ব্বে লেখা হয়েছিল, যখন লেখবার কোন নতুন বিষয় ছিল না। যদি নতুন বিষয় চাও ত আজকের দিনে তার ত কোন অনাটন নেই। আমি একটা ছোট ফর্দ্দ ধরে দিচ্ছি, তার ভিতর থেকে যেটা খুসি তুমি বেছে নিতে পার।

১। Einstein-এর আবিষ্কার। আকাশের উঠোন বাঁকা, না আলোর চলন বাঁকা, এই সমস্যার আশ্রয়ে হরেকরকম দার্শনিক আকাশ-কুসুম রচনা করা যেতে পারে।

২। Marconi-র কাছে তারা থেকে বে-তার তার আসছে। এ তার পাঠাচ্ছে কে, দেবতারা, না যারা যুদ্ধে মরে জ্যোতির্ল্লোকে গিয়েছে? যুদ্ধে মরলেই যে মানুষ স্বর্গে যায় এ কথা ত সকল শাস্ত্রেই বলে। অতএব নক্ষত্রলোক হতে আগত টরেটক্কার অর্থ নিয়ে দেদার কল্পনা খেলানো যেতে পারে।

৩। যদি এই সব বিশ্বসমস্যা নিয়ে মাথা বকাতে না চাও ত Khalifate নিয়ে অনেক কথা বলতে পারো—যার ভিতর ঐহিক পারত্রিক সকল বস্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে,

অর্থাৎ কলমের বাঁটানে সসীমকে অসীম আর ডানটানে অসীমকে সসীম করতে পারবে।

৪। ওর চাইতে যদি নিরীহ বিষয় চাও তাহলে সুমুখেই ত Exchange পড়ে রয়েছে। রূপোর দর বাড়ে নি, সোনার দরও কমে নি, অথচ টাকার দাম যেমন বেড়েছে গিনির দাম তেমনি কমেছে। টাকা ও গিনির এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে দেখ দেখি বুদ্ধি খেলাবার কি সুযোগ পাওয়া গেছে আর বলা বাহুল্য যে পৃথিবীতে হেন লোক নেই রজত-কাঞ্চনের এই মায়ার খেলায় যাকে মুগ্ধ না করবে।

আর যদি চাও ত উপরোক্ত চারিটি বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারো, যেহেতু ও চারিটিরি গোড়ায় রয়েছে একটি মাত্র সমস্যা—ভূলোকে সঙ্গে দ্যু-লোকের যোগাযোগের রহস্য। আলো বেঁকে যায় কেন? Einstein বলেন মাটির টানে। দেবতারা পৃথিবীতে তার পাঠাচ্ছেন কেন? উত্তর একই, মাটির টানে। Khalifate সমস্যার মূলে কি আছে, ইউরোপের মাটির টান, সোনারূপো এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায় কেন?—মাটির টানে।

এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রথমে পৃথিবীতে যা ঘটে মানুষ যা করে তার মূলে আছে মাটির টান। দ্বিতীয় দ্যুলোক থেকে ভূলোকে যা কিছু আসে তা আলোকই হোক আর আকাশবাণীই হোক, সব বেঁকে যায়, সব বিগড়ে যায় ঐ মাটির টানে।

অতএব মানুষের কৃতীত্ব হচ্ছে সেই বস্তু সৃষ্টি করায়, যার উপর মাটির টান নেই, অর্থাৎ—আকাশকুসুম। ওবস্তু যে আমরা ভূলোক থেকে দ্যুলোকে পাঠাই।

বাপ ও ছেলে।

—"বাবা! বাবা! একটা গল্প বল।"

—"কিসের গল্প বাবা?"

—"এই—এই—এক্‌তা—এক্‌তা—বাগেল—এত্তবল বাঘেল—না, না, সেই কুমীলেল—সেই যে হাঁ ক'লে খেতে আসে।"

—"আচ্ছা,—এক যে ছিল কুমীর, সে করতো কি—না গর্ত্তের মধ্যে থাক্‌তো—"

—"না—না, গত্তেল মধ্যে নয়, তুমি জান না, জলেল মধ্যে। তালপল বলবো? শুন্‌বে? তালপল—তালপল—একদিন—এই যে সে—এই যে—একদিন—গত্তেল থেকে বেলিয়ে—সে—তালপল কি বাবা?"

—"তারপর সে দেখ্‌লে, একটা গরু—"

—"না—না, তুমি বল্‌চো কেন? আমি বল্‌বো। তালপল সে দেখ্‌লে—দেখলে—গলু—এক্‌তা গলু জল খাবো—না বাবা?"

—"হাঁ, হাঁ, লক্ষ্মী—কেমন গল্প শিখেচে আমার বাবা।"

স্নেহকাতর পিতা শিশুর কচি গাল দুটিতে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন। পিতার এই অসাময়িক অর্থহীন দৌরাত্ম্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে শিশু দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌লো!

—"তালপল—শোন না বাবা—না, তুমি শোন—তালপল, কুমীল আস্তে আস্তে—এম্‌নি ক'লে—আস্তে আস্তে না গিয়ে—আঁ—ক্।"

শিশু নিজেকে কুমীর এবং বাবাকে গরু করে পিতার হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো। পিতাকেও সহাস্যমুখে কুম্ভীর কবল গ্রস্ত গরুর মত ছট্‌ফট্‌ করতে হল কিন্তু ছেলে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিমানের সুরে বল্‌লে—"তুমি কাঁদ বাবা কাঁদ—আঁ—আঁ—আঁ।"

—"গরু কি কাঁদতে পারে বাবা।"

—"হাঁ, পালে—কাঁদে।"

—"আচ্ছা, কাঁদ্‌চি—হাম্‌মা—"

—"গলু হাম্—মা বলে কাঁদে? গলুল মা কোথায় বাবা? হাঁসপাতালে? আবাল আসুবে?—আবাল গলুকে কোলে নিয়ে—হাম্—?"

মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি পিতাকে বলতে হল।

—"বাবা, কেমন ছবির বই!—কেমন ভাল ভাল ছবি!"

—"কৈ বাবা? কৈ? দেখবো।"

—"এই যে, এই দেখ—এই অজগর সাপ—এই ঈগল পাখী—"

—"এই উত্"।

—"হাঁ হাঁ—এই উট আর এই এক্‌কা গাড়ী"।

—এক্‌কা গালী খুব ছুটেছে"।

—"লক্ষ্মী, লক্ষ্মী—সব জানে বাবা আমার—এই গুল—এই—"

পিতা তাড়াতাড়ি পাতা উল্‌টে গিয়ে বল্লেন—"এই ক'য় কুকুর"

—"না কুকুল না—ঐ যে তুমি দেখালে না—ঐ যে ওলেন পল—"

—"ও কিছু না"।

অভিমানী ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বাপের দিকে একটি ছোট মুঠো তুলে বল্লে—"মাল্‌বো"।

বিপদ্‌গ্রস্ত পিতা বলে উঠ্‌লেন "বাবা, এই দেখ—উঃ কত বড় সিংহ—কত বড় কেশর"।

"—না ছিংহ না" মাটিতে শুয়ে পড়ে নির্ম্মমভাবে বইখানার উপর লাথি ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বাপের কোলে মুখ লুকালো।

মা ছেলেকে অসুধ খাওয়াচ্চে এ ছবি কি সে না দেখে থাক্‌তে পারে? যে তার মা-ই তাকে কতবার দেখিয়েচে—সে জানে ও তার মায়েরই ছবি—অমন লম্বা চুল, অমন গয়না কাপড়—আর কোন্‌ স্ত্রীলোকের আছে!" তার মা-ই যে তাকে কতবার পাছ্‌ড়ে কোলে ফেলে কাল-মেঘের রস খাইয়েচে।

বইখানাকে টেনে নিয়ে এসে পিতা বল্লেন—"আচ্ছা কেঁদোনা বাবা, দেখাচ্ছি" শিশু লাফিয়ে কোলের উপর উঠে বসলো। একটু-খানি দেখিয়েই তিনি আবার পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিশু তার গোল গোল কচি হাত পাতার উপর চাপা দিয়ে বল্লে—

—না, দেখি বাবা—মাকে আমি ভাল কলে দেখি"—

সে আজ কতকাল মাকে দেখে নি—কতদিন—কতমাস।

টস্‌ করে এক ফোঁটা গরম জল পিতার চোখ থেকে বইয়ের উপর পড়লো, তাড়াতাড়ি সেটাকে মুছে নিয়ে, ছেলেকে আরো ভাল করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন—

—"হয়েচে ত বাবা ছবি দেখা? এইবার বন্ধ করে রাখি—কেমন"?

ছেলে কোন উত্তর দিলে না—বিষাদ গম্ভীর মুখে শুধু বল্লে—

"বাবা, আমি ঘুমুবো—তোমার কোলে শুয়ে"।

তার শরীর ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েচে।

কোলে শুইয়ে তাকে নাচাতে নাচাতে পিতা বল্লেন—তুমি চোখ বোজ বাবা, আমি ঘুমপাড়ানো গান গাই— ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি আমাদের বাড়ী এসো—খাট নেই, চৌকি নেই—

"না বাবা, সেইটে—এ ধন যাল ঘলে নেই তাল"—

"ধন, ধন, ধন— আমার বাড়ীতে ফুলের বন—এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন—তারা কিসের গরব করে—তারা –"

আর গাইতে হল না—পিতা দেখ্‌লেন—শিশুর নিশ্বাস স্থিরভাবে পড়্‌চে—সে ঘুমিয়েচে। একদৃষ্টে তার চাঁদমুখখানির দিকে চেয়ে তিনি কার সাদৃশ্য তাতে দেখছিলেন কে জানে? কতক্ষণ নিশ্চলভাবে পাষাণে-গড়া মূর্ত্তির মত বসেছিলেন—সহসা চম্‌কে উঠে শুনলেন, শিশু ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলচে—

"আমি আলো অসুদ খাবো—আমি আল কাঁদব না।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

রায়তের কথা।

——ঃ০ঃ——

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

সুহৃদ্বরেষু—

বাঙলার নতুন কাউন্সেলের নতুন ইলেকসানের জন্যে কি প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে লোকের সুমুখে আমাদের খাড়া হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছ। এ কথা শুনে লোকে হাসবে। একজন সখের সাহিত্যিকের কাছে কাজের পলিটিক্সের পরামর্শ চাওয়াটা সখের দলের পলিটিসিয়ানদের কাছে নিশ্চয়ই কামারের দোকানে দইয়ের ফরমায়েস দেওয়ার মত হাস্যাস্পদ ব্যাপারহিসেবে গণ্য হবে। তবুও তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কারণ কি জানো?—এ যুগের পলিটিক্সে অধিকারীভেদ নেই। ডিমোক্রাসীর অর্থই কি এই নয় যে, রাজনীতি সম্বন্ধে সকলের সব রকম কথা কইবার সমান অধিকার আছে? এ ক্ষেত্রে লোকমত ত বেদবাক্য! আর অসংখ্য "আমার মতকে" ঠিক দিয়েই ত "আমাদের মত" পাওয়া যায়। এ হিসেবে আমারও মুখ খোলবার অধিকার আছে।

আর এক হিসেবে আমি বলতে পারি যে, তুমি এ ক্ষেত্রে ঠিক লোকের কাছেই এসেছ, কেননা আমি আমার কথা বাঙলায় বলতে

পারি। রিফরম বিলের ফল কি হল না হল, আর কি হবে না হবে—এ সব বিষয়ে ঢের মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই আইনের বলে আমাদের রাজনীতির ভাষা একদম বদলে গেল। এতদিন সে ভাষা ছিল রাজার, এবার হল তা প্রজার। ষোলআনার মধ্যে পোনেরোআনা ভোট যখন প্রজার হাতে তখন সে ভোট আদায় করতে হলে মাতৃভাষারই শরণাপন্ন হতেই হবে। ভিক্ষাটা, ভিক্ষাদাতার ভাষাতেই করতে আমরা বাধ্য ; এই কারণেই ত সে ভাষা জানি আর না জানি—আমরা এ-যাবৎ আমাদের রাজনৈতিক আরজি-দরখাস্ত সব ইংরাজিতেই করতে বাধ্য হয়েছি। এখন থেকে দরখাস্ত যখন বাঙলা-তেই লিখতে হবে তখন যার ও-ভাষার কলম হাতে আছে তাকে বাদ দিয়ে পলিটিক্স করা আগেকার মত আর চলবে না। আর আমি যে বাঙলা জানি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কেননা আমার লেখা পড়ে লোকে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে। হাল পলিটিক্স সম্বন্ধে কথা কইবার বিশেষ অধিকার যে আমার আছে এই হচ্ছে তার প্রথম দলিল। আর যে সব দলিল আছে তা ক্রমে পেশ করছি।

(২)

কেন প্রোগ্রাম চাই।

তুমি ঠিক ধরেছ যে এ-ফেরা আমাদের যা-হোক্ একটা প্রোগ্রাম চাই-ই চাই। ইতিপূর্ব্বে যে সব ইলেকসান হয়ে গেছে তাতে প্রোগ্রামের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভোটারের সংখ্যা ছিল দশ বিশটি আর সে ভোট যে যাঁর খাতির রাখে তিনি তাঁকে দিতেন। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা দেখতেন ভোটপ্রার্থী

লোকটা কে ; তাঁর মতটা কি, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত না। পূর্ব্বের ইলেকসান ছিল একরকম সামাজিক ব্যাপার, এমন কি সে ব্যাপারকে পারিবারিক বললেও অসঙ্গত হয় না, কেননা আমাদের দেশের পরিবার শুধু আত্মীয় স্বজন নিয়ে নয়, তার ভিতর আশ্রিত অনুগত লোকও ঢের থাকে। উকিল মোক্তার যেখানে ভোটার সেখানে জমিদারের সাহায্য ব্যতীত জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভোট আদায় করা কোনো অ-জমিদারের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ছিল, তা তিনি যতই বিদ্বান বুদ্ধিমান, যতই স্বদেশী ও "স্বরাজী" হোন না কেন। তোমার মনে থাকতে পারে যে গত ইলেকসানে, একটি জমিদার ভোটারের দল ভোটপ্রার্থী কি জাত সেই হিসেবে নিজেদের ভোট দেন। ফলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডিডেটকে হারিয়ে রাঢ়ী কায়স্থ কাণ্ডিডেট পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে লাট সভায় ঢুকে গেলেন। বলা বাহুল্য এ দলে বেশির ভাগ ভোটার ছিল রাঢ়ী কায়স্থ।

কিন্তু রিফরম বিলের প্রসাদে ভোটারের সংখ্যা যখন দশ-লাখের উপর উঠে গেছে, তখন আর ইলেকসানের মামলা পারিবারিক ভোটে ফতে করা চলবে না। সুতরাং প্রোগ্রাম চাই।

প্রোগ্রাম চাই দু কারণে। এই নতুন ভোটারের দল প্রায় সবাই নিরক্ষর। পলিটিক্সের "প" অক্ষর তাদের কাছে হয় গোমাংস, নয় হারাম। তুমি অবশ্য জানো যে এই অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকারী করবার বিরুদ্ধে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল তাদের এই শিক্ষার অভাবটা, বাঙালী স্ত্রীলোকের দেহের মত, যাদের মনের পক্ষে "ঘর হতে আঙিনা বিদেশ", তাদের হাতে ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য নির্ব্বাচন করবার ভার দেওয়াটা যে প্রহসন মাত্র এ কথা দেশী বিদেশী, সরকারী বে-সরকারী অনেক লোক অনেক ভাবে বলেছেন, কেউ চটে কেউ হেসে, কেউ ধীরে কেউ জোরে। এ আপত্তির সার্থকতা আমি অবশ্য কখনো দেখতে পাই নি। গভর্ণমেণ্ট বলতে কি বোঝায়, গভর্ণমেণ্টের কটি সেরেস্তা আছে, প্রতি সেরেস্তার গঠন কি, কার অধীনে থেকে কি নিয়মে প্রতি সেরেস্তার কাজ চালাতে হয় এবং নানা বিভিন্ন সেরেস্তার আভ্যন্তরিক যোগাযোগটা কি, এ সব না জানলে যদি রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মত দেবার অধিকার না থাকে ত বাঙলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরও সে অধিকার নেই। অধিকার নেই যে কেন তা শুনবে?—ডু'বছর আগে পর্য্যন্ত কলিকাতার ল-কলেজে Constitutional Law পড়াবার ভার আমার হাতে ছিল। আমার ক্লাসে প্রতি বৎসর গোণাগাঁথা তিনশ' করে ছাত্র জড় হত এবং এরা প্রত্যেকেই হয় B. A., নয় B. Sc., অর্থাৎ—যুগপৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। এই অধ্যাপনাসূত্রে আমি কি আবিষ্কার করি জানো?—আমি নিত্য পরিচয় পেতুম যে এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর প্রভেদ যে কি সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল নন। এ কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না, কেননা কোনো আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের অজ্ঞতা যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে "শতং বদ মা লিখ" এই পরামর্শ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানদের সে পন্থা অবলম্বন করবার ত উপায় নেই। এগজামিন আমাদের দিতেই হবে, লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে আমরা বাধ্য, এবং কার কত বিদ্যে তা মুখ খুললেই ধরা পড়ে।

আমি আজ বছর দুয়েক আগে একবার Constitutional Law-এর কাগজ পরীক্ষা করি। "ভারতবর্ষের আইন কে তৈরী করে" এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর শতকরা নব্বইটি ছাত্র দিতে পারে নি, তাতে কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পাকা জবাব পাবার আশা আমি কোনো কালেই রাখি নে। মুখস্থজ্ঞান পত্রস্থ করতে গেলে কম বেশি গলদ হবেই হবে, বিশেষত সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ বিলেতি পুঁথিগত। কিন্তু কতকগুলি উত্তর পড়ে আমারও চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল।

একজন লিখেছেন "ভারতবর্ষের সব আইন মুনিঋষিরা তৈরী করে গেছেন এবং আজও সেই সব বাহাল রয়েছে" আর এক জনের বিশ্বাস যে "ইংলণ্ডের রাজা হিন্দুস্থানের বড় লাটকে যে সব চিঠি পত্র লেখেন, সেই সব চিঠিতে তিনি যে হুকুমজারি করেন সেই সব হুকুমই হচ্ছে এদেশের আইন"। আর একজনের উত্তর—"ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আইন-কানুন তৈরী করে Native Prince-রা"। কিন্তু এঁদের সকলের মন ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়—এ দেশের আইন কর্ত্তার তল্লাসে বাঙলার নবীন ভাবুকদের কল্পনা "ভারতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ", অবশেষে "উপনীত হয়েছিল হিমালয়শিরে"। শেষে দেখলুম একজন লিখেছেন, "ভারতবর্ষের আইন বানান নেপালের রাজা"।

এরকম সব গাঁজাখুরি জবাবের কারণ আমি জানি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে Constitutional Law-এর কোনো বই কখনো চক্ষেও দেখে নি, কেননা তারা জানে যে এ বিষয়ের কোনো জ্ঞান না থাকলেও তাদের পাশ আটকাবে না এবং পরে ওকালতিরও ঠেকা হবে না। কিন্তু এই সব উত্তরই প্রমাণ যে আমাদের দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই, এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। এ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি লাটসভায় বসবার অধিকারী হন তাহ'লে অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেখানে বসাবার অধিকার কেন না পাবে? এদেশের জনগণ নিরক্ষর বলে যে ভোটের অধিকারী হতে পারে না, এ আপত্তি মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে অগ্রাহ্য হয়েছে। কি কারণে অগ্রাহ্য হয়েছে তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৮৫ হতে ৯৫, এই দশ পৃষ্ঠার ভিতর পাওয়া যাবে। ঐ পাতাক'টি বাঙলায় অনুবাদ করে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে খাটুনি খাটবার অবসর আমার নেই। যাঁরা পলিটিক্সের ব্যবসা করেন তাঁদের ঐ দশ পৃষ্ঠা ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়্‌তে অনুরোধ করি। এস্থলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রিফরমের স্রষ্টাদের মতে এই ভোটসূত্রেই জনগণ পলিটিক্সের শিক্ষা লাভ করবে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাদের সে শিক্ষা দেওয়া, বই পড়িয়ে নয়—মুখে মুখে। অর্থাৎ—ইলেকসানের ক্ষেত্রই হবে এ দেশের যথার্থ পলিটিক্যাল স্কুল, যেমন আদালতই হচ্ছে আইনের যথার্থ স্কুল।

জানই ত এ যুগের পলিটিক্সের গোড়ার কথা হচ্ছে প্রতি লোকের নিজের অধিকারের জ্ঞান। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ—একশ' আঠারো বৎসর আগে তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা জানবার জন্য জিলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করে পাঠিয়ে দেন তার একটি প্রশ্ন ছিল এই—এদেশের প্রজাদের কি কি অধিকার আছে

এ প্রশ্নের উত্তরে মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্ট্রেচি সাহেব লেখেন :—

"অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি, এদেশের জনসাধারণের কস্মিন্‌কালেও যে তা ছিল এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, তাদের কোনোরূপ অধিকার নেই, কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই। যদি কোথায়ও দেখা যায় যে তারা সুখ শান্তিতে বাস করছে তার অর্থ এ নয় যে, তাদের সুখে থাকবার কিম্বা শান্তিতে থাকবার কোনোরূপ অধিকার আছে। ও-দুই বস্তু হচ্চে তাদের শাসনকর্ত্তাদের দত্ত বরস্বরূপ। শাসনকর্ত্তারা উচিত জ্ঞান কিম্বা স্বার্থজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়ে তাদের উপর যদি জুলুম জবরদস্তি না করেন তাহলেই তারা নিজেদের কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত মনে করে"—(Fifth Report, Vol. II, page 596.)

এ কথা যে সত্য তা কে অস্বীকার করবে? একটু চোখ-চেয়ে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আজকের দিনেও অধিকার সম্বন্ধে তারা যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। আজও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন-যাত্রা উপরওয়ালাদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। হুজুরের মেহেরবানি ও ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহের জন্য আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত।

মানুষের এই অধিকারজ্ঞান আমাদের দেশে ভুঁইফুঁড়ে ওঠে নি, সাগরপার থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে। মনুষ্যত্বের দাবী আমরা ইংরাজি শিক্ষার গুণে করতে শিখেছি। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে দেখ তাতে আছে শুধু কর্ত্তব্যের কথা, অধিকারের 'অ' পর্য্যন্ত তাতে নেই। মানুষমাত্রেরই অধিকারের কথা (Rights of man) ইউরোপেও সেদিন উঠেছে, এই ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। ও-জ্ঞান কোনো সমাজেই পুরাতন নয়। আমরা যে ভাবি ও-জ্ঞান সনাতন, তার কারণ আমরা

জন্মেছি ঐ জ্ঞানের আবহাওয়ার ভিতর, আর ইংরেজি স্কুলে ঢুকে পর্য্যন্ত ঐ বস্তু হয়েছে আমাদের মনের নিত্য নিয়মিত খোরাক। ইংলণ্ডের ইতিহাসের মত তার কাব্য সাহিত্যও স্বাধীনতার গন্ধে ভুরভুর করছে; স্বুতরাং ও-বস্তুর ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন আমাদের সবারই হয়ে গেছে।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে জনসাধারণের মনে তাদের অধিকারের জ্ঞান ঢুকিয়ে এবং বসিয়ে দেওয়া। ওর থেকে পালাবার জো নেই, কেননা সে পালানো হবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য থেকে পালানো। কেউ কেউ অবশ্য বলবেন যে ও আমাদের মোটেই কর্ত্তব্য নয়, কেননা আমরা পরের জন্য ডিমোক্রাসি চাই নি, নিজেরা হতে চেয়েছিলুম স্বদেশী বুরোক্রাসি। পলিটিসিয়ানদের অনেকের নজর যে দেশের দিকে নয়, সিমলার উপর ছিল সে কথা আমরা জানি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে বললে গোল ত চুকেই যেত।

"অচল বলিয়া উচল সেবিনু
পড়িনু অগাধ জলে"—

অবস্থাটা যদি সত্য সত্যই তাই হয়ে থাকে ত ভদ্রলোকের পক্ষে সে কথা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। স্বুতরাং কি চেয়েছিলুম আর না-চেয়েছিলুম, তা নিয়ে হা-হুতাশ করা নিষ্ফল। ঘটনা যা ঘটেছে তাতে চাষার ভোট দিন দিন বাড়বে বই কমবে না, স্বুতরাং পলিটিক্যাল হিসেবে লোকশিক্ষার ভার আমাদের হাতে নিতেই হবে। অতএব প্রোগ্রাম চাই।

(৩)

(অধিকার সামান্য ও বিশেষ)

এ পর্য্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। কিন্তু আর বেশি এগোবার আগে অধিকার কথাটার ঠিক মানে যে কি তা বোঝবার একটু চেষ্টা করা যাক। এ চেষ্টা ফুজুল নয়, কেননা কথাটা হচ্ছে দ্ব্যর্থবাচক।

আমি এই খানিকক্ষণ হ'ল বলেছি যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মানুষকে শুধু তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হয় আদেশ করা হয়েছে, নয়ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সে শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বিধি-নিষেধ-সম্বলিত বচন, অর্থাৎ—মানুষকে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে, তাই জানানো হচ্ছে ধর্ম্মশাস্ত্রের কাজ। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের শাস্ত্র।

সে শাস্ত্রে এই ধর্ম্ম আবার দু'ভাগে বিভক্ত। শাস্ত্রের ভাষায় দু-রকম ধর্ম্ম আছে, এক সামান্য ধর্ম্ম আর এক বিশেষ ধর্ম্ম। চুরি করো না, খুন করো না, পরদার হরণ করো না—এসব হচ্ছে সামান্য ধর্ম্মের কথা, কেননা এ সকল ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিচারে সকলের পক্ষে সমান মান্য। অপর পক্ষে বেদপাঠ করা ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য ধর্ম্মের কথা এক রকম উহ্য রয়ে গিয়েছে। মেধাতিথি বলেন, যে-ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ তার বিশেষ করে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই, কেননা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-ধর্ম্ম সর্ব্বলোকবিদিত। অপর পক্ষে বাইবেলে যিশুখৃষ্টের সব উপদেশই সামান্য ধর্ম্মগত। টাকা ধার

নিলে, কি হারে সুদ দিতে হবে সে বিষয়ে যিশুখ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নীরব। অর্থাৎ—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে আইন আর বাইবেল হচ্ছে নীতিকথা।

বলাবাহুল্য এই সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মের ভিতর দা-কুমড়োর সম্পর্ক নেই, এদুয়ের উপরই সভ্য সমাজের ভিত্তি। বাইবেলে বিশেষ ধর্ম্মের কথা উহ্য রয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয় নি। কেননা যিশুখ্রীষ্ট এককথায় এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন, "সিজারের প্রাপ্য তাঁকে দিয়ো", অর্থাৎ—আইন মেনে চলো।

তারপর কর্ত্তব্য ও অধিকার হচ্ছে দুটি আপেক্ষিক শব্দ। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবা করা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহলে শূদ্রের কান ধরে সে সেবা আদায় করবার অধিকার ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এ দু'-ই পরস্পর পরস্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীন সভ্যতা ও নব সভ্যতার ভিতর আসল প্রভেদ এই যে, সেকালে লোক একমাত্র কর্ত্তব্যটাই মানুষের চোখের সুমুখে খাড়া করে রাখত, একালে বিশেষ করে অধিকারটাই আমরা খাড়া করতে চাই।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই কথাটা স্পষ্ট করা যে, কর্ত্তব্যের মত অধিকারও দুভাগে বিভক্ত, এক সামান্য অধিকার আর এক বিশেষ অধিকার। খুন করবার অধিকার যেখানে কারো নেই, বেঁচে থাকবার অধিকার সেখানে সবারই আছে, এই হচ্ছে মানুষের সামান্য অধিকারের প্রথম দফা। কিন্তু তুমি জান, আমি জানি আর সবাই জানে ফাঁসি দেবার, অর্থাৎ—মানুষের প্রাণবধ করবার বিশেষ অধিকার State-এর আছে, অর্থাৎ—সমাজ যখন প্রাণহিংসার বিশেষ অধিকার বিশেষ বিশেষ লোককে কিম্বা সম্প্রদায়কে দেয় তখন তা হয় বৈধহিংসা। অতএব

সামান্য অধিকারের কথাগুলো অনেক অংশে ফাঁকা, মস্ত হলেও ফাঁপা।

এখন আমার কথা এই যে মানুষের পক্ষে তার বিশেষ অধিকারের জ্ঞানটাই হচ্ছে তার পক্ষে সবিশেষ দরকারী। মানুষের সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই একটা দূর সম্পর্ক অবশ্য আছে কিন্তু প্রতি লোকের, কোনো কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে যে বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাই নিয়েই তার জীবন। বাপ ও ছেলে, স্বামী ও স্ত্রী, মুনিব ও চাকর, এদের পরস্পরের ভিতর কর্ত্তব্য ও অধিকারের নানা রকম বিশেষ বন্ধন আছে। এবং সেই সব অধিকারের উপর দাঁড়িয়েই সামাজিক লোকে সংসার চালায়। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। মোটামুটি ধরতে গেলে এ সব ক্ষেত্রে যে প্রবল, অধিকারটা বেশি করে তার হাতেই থাকে আর যে দুর্ব্বল কর্ত্তব্যটা বেশি করে তার ঘাড়েই পড়ে। আর এই দেনা-পাওনার হিসেবটা যতদূর সম্ভব দু-দিকে সমান করে নিয়ে আসাটা এ যুগের পলিটিক্সের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব জনসাধারণের মনে প্রধানত তাদের বিশেষঅধিকারের জ্ঞান জন্মিয়ে দিতে হবে এবং সামান্য অধিকারের কথা সেই স্থলেই পাড়তে হবে যেখানে আমরা তাদের অধিকার বাড়াতে চাইব। যা আছে সেই টুকুকে শুধু রক্ষা করার অর্থ স্থিতি, উন্নতি নয়। কিন্তু আমরা সবাই উন্নতি চাই, এ-ও হচ্ছে এ যুগের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। বিশেষ অধিকারের নিঃসম্পর্কিত সামান্য অধিকারের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণকে ভোগা দেওয়া। সে দিন কংগ্রেস মানুষ মাত্রেরই সামান্য অধিকারের ফর্দ্দ ধরে দিয়েছেন। পলিটিসিয়ানরা যদি দেশের

লোকের কাছে সেই ফর্দ্দ পড়তে সুরু করেন তাহলে বোঝা যাবে যে তাঁরা চাষা-ভূষোকে কোনো বিশেষ অধিকার দিতে নারাজ। যাতে সকলের সমান অধিকার আছে তাতে কারো কোনো বিশেষঅধিকার না-ও থাকতে পারে।

(৪)

(দেশের অবস্থা)

তার পর প্রশ্ন ওঠে দেশের লোককে পলিটিক্যাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি ?

বই পড়ানো যে নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে ? তাও অবশ্য নয়। কেননা ও-সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করা দরকার—B.A., M.A., পাশ করবার জন্যে এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্তত চাষাভুষোর পক্ষে ত নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে, তাদের কাছে rights of man-এর ব্যাখ্যান করার অর্থ গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে ? তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে সব বুঝবে না, নয় উল্টো বুঝবে আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্ত্তব্য ? উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায় এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্চে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য আর অসাধারণ জন, অর্থাৎ—ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দ্দশাপন্ন সে জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাঙলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক্, সে দেশের অবস্থাই বা কি আর দেশবাসীদেরই বা অবস্থা কি? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। আমরা সকলে লাটদরবারে ঢুকতে চাচ্ছি শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্য, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তার ছেলেদের ডেকে বলেন যে তার ক্ষেতে ধনরত্ন পোঁতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তার ছেলেরা সেই ক্ষেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলট-পালট করলে; কিন্তু পোঁতাধনের কোথায়ও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাঙলা দেশ হচ্ছে ঐ রকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র, ওর বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাঙলা দেশ যে সোনার খনি নয়, এ বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাঙলা দেশ যে শস্যক্ষেত্র এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাঙলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান জমিতে সার দিয়ে! তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয় তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানব জমিন আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত—এ দু-ই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। আগামী ইলেকসানের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে, বাঙলার কৃষকের ওরফে বাঙলী জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্রজাতির দুরবস্থা দূর করা যে কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই একথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে কেননা সে চেষ্টার ফল ভাল না হয়ে যায় না।

(৫)

(কৃষকের অবস্থা)

ইলেকসানের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিসিয়ানদেরই তৈরী করতে হবে, কেননা দেশ উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেই মর্ম্মে প্রোগ্রাম তৈরী করা অবশ্য আমাদের পলিটিসিয়ানদের পক্ষেই কর্ত্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্ত্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরী করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই তুমি যখন আধ আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে :—

"জমিদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন"—

বঙ্কিমের যুগে পলিটিসিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাঙলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালতি ও ডাক্তারীর উপর। ডাক্তারী-কেরাণীগিরির সঙ্গে জমি-জমার কোনই সম্পর্ক নেই, আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিল সম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিরোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু Bengal Tenancy জানা এক কথা আর Bengal Tenantry জানা আর এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস বেশিরভাগ সহুরে উকিলরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন্। আর যাঁরা জানেন তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন কিন্তু তার কথার কথক নন। বাঙলার উকিলের দল জমিদারের মিত্রপক্ষ। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল; অতএব এঁরা গাছেরও পাড়েন তলার-ও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধ-দৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয় এবং আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজামুড়ো দু-ই। পলি-টিসিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবী করতে প্রস্তুত নন, আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয় তাহলে তার জন্য প্রধানত পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মডারেট, একষ্ট্রিমিষ্ট কোন দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনরূপ অভিপ্রায় আছে তার কোনরূপ আভাষও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে, নায়েব গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের Co-operation-এর উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁদের প্রোগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। "জোর যার ভোট তার" এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে Extremist দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে চেষ্টায় কোনো ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্ত্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাঙলা দেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন যে-দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ—যে-দেশে—

"লোকে গাই বলদে চষে।
দাঁতে হীরে ঘষে ;
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে"—

এ উদ্দেশ্য যে অতি মহান সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু সন্দেহ আছে তার উপায় নিয়ে। স্বদেশকে "ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা" করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা ছেলেভুলোনো ছড়া ভাল করে বাঁধতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্ত্তব্য, ও-জিনিস গদ্যে খাপ খায় না। আর পলিটিক্সের তুল্য ঝুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে, হয় তাঁদের কোনও মত নেই আর না হয়ত সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে রকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে

প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না বুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে আমাদের ন্যাসনলিষ্টরা আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে স্বদেশী ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুরসৎ নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজরাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন মুখে রাজা উজির মারতে বসে তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

(রায়তের প্রোগ্রাম)

দেশের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসিন্য দেখাচ্ছেন, তখন যা হোক একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরী করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন ঃ—

"যার কর্ম্ম তার সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে"—

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকার চর্চ্চা নয়, এর ভাল ভাল নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে-শ্রেণীর লোকদের আমরা গুরু বলে মান্য করি তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। এ বিষয়ে কথা কইবার এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় দলীল।

তুমি আমি যখন বালক সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রজার অবস্থা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে রায়তকে যে-অবস্থায় আমরা রেখেছি তার ফল ত্রিবিধঃ—

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব

তারপর তিনি আবার বলেন যেঃ—

"ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে, ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়"।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ আজকের দিনেও বাঙলার রায়তের দল দরিদ্র, মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ সে বিষয়ে ত আর কোনো মতভেদ নেই। তারপর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস, "ক্রীতদাস" না হলেও যে "গর্ভদাস" এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরাজের আইন তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। Tenancy Act আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙ্গীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও ত করো উচ্ছেদের মাম্‌লা, সত্ত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসলক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকী খাজানার নালিশ, আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও—কর তার নামে বাকীপড়া।

তবে যে প্রজা টিঁকে আছে তার কারণ বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফ বাবুরা জমিদারের

দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক খুমারেরই হোক, পারৎপক্ষে প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি সব সময় সুবিচার করেন তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচে বর্ত্তে থাকে সে মুন্সেফবাবু ও Settlement office-এর গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজ-কর্ম্মচারীরাই হচ্ছেন বাঙলার রায়তের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী-রাজনীতি-ব্যবসায়ী উকিল মোক্তারেরা নন। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন Bengal Land-holders-দের তরফ থেকে গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেছেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Bengal, if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community—seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent of the peasantry out of the seventy-seven per cent of the whole population is so poor, that the income *per capita* is not more than a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal. (Statesman, 5th March 1920).

অন্য বাঙলা :—

বাঙলা, যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়, বাঙলা সম্ভবত বাকী ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। ইহা অস্বীকার করবার জো নেই যে কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথা পিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র, এবং তারা পেটভরে না খেয়েই শুতে যায়"—

চক্রবর্ত্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে যে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাঙলা দেশে শতকরা সত্তর জন লোক যে বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায় তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা যাঁর তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে চক্রবর্ত্তী সাহেবের কখনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষত তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে বসেছি।

প্রজার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবত সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীরগতিক কি রকম তার পরিচয় সরকারের তরফ

থেকে বৰ্দ্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable." (Statesman, March 6, 1920.)

অস্য বাঙলা :—

"মোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাঙলা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, যে-সব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে তার একটিও অনিবার্য্য নয়।"

এই ত গেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ। আর বলাবাহুল্য যে এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজা সাধারণকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ সে কথা উল্লেখ করবার কি আর কোনো দরকার আছে। যারা বারোমাস এক সন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে শুতে যায় তারা যে রোগ-শয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে।

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে যার বলে বাঙলার রায়ত মূর্খতা, দারিদ্র্য, দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাঙলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিসিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সঙ্গত হয় তাহলে তা আমাদের শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

(প্রোগ্রামের পরিচয়)

কিছুদিন আগে "ইংলিসম্যান" কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে বেহারের রায়তেরা মজফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে।

প্রথম। দেশময় Compulsory Primary Education প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চারমাইল অন্তর একটি করে Charitable Dispensary থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্ব্বত্র আইনত হস্তান্তর যোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ—প্রজা সে গাছের সত্ত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলী-সত্ত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজা পক্ষের প্রথম দুটি দাবী যে ন্যায্য সে বিষয়ে কোনোরূপ মত-ভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিসিয়ানরা ত সমান চীৎকার করছেন। এবং গভর্ণ-মেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না ,বলে' আমরাও, সরকার কর্ত্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে, তাঁর প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তারপর প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গভর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তব্য সে কথা গভর্ণমেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.—

সুতরাং দেখা গেল যে প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদার পক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তাঁর পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে বাঙলার ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টকে এই দুই কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে পালন করতে হবে:—

1. Sanitation involving, as it must, ways and

means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similiar scourges.

অস্যার্থ—

"বাঙলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে, অর্থাৎ—ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।"

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the ligt of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ—

"নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাঙলার ঘাড়ে পড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিসনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য যে, মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্ট যা দু-কথায় বলেছে, জমিদার পক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে ও ফলিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিস্‌পেন্‌সারি আর জমিদার পক্ষ চান দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন। অবশ্য এ দু-ই চাই। তবে সর্ব্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে। যদি আমরা হাত হাত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি তাহলে Sanitation-এর দৌলতে দেশকে যে-দিন স্বর্গ করে তুলব সে দিন হয়ত দেখব যে দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিস্‌পেন্‌সারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ—তার উন্নতি

ঘটায়। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপরও আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার সম্বন্ধে একজন জার্ম্মেন লেখকের বই সে দিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিষ্টার উক্ত জার্ম্মেন ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি।

—"আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না করা বড়লোকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যাহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নেই। যে শিলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে ও উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ দুয়ের ভিতর কোনই তফাৎ নেই, দু-ই এক জাতীয় ঘটনা। (Hugo Ganz-Le Debacle Russe).

আমি জিজ্ঞেস করি যে আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাৎ আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস'-মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সব চেয়ে সর্ব্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আব-হাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের sanitation বই আর কিছুই নয়। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে:—

"His mind has been made up for him by his landlord or banker or his priest or his relatives or the nearest official"—

অর্থাৎ—রায়তের মন, হয় তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়-স্বজন আর না হয়ত হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তোলেন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে একটা জিনিস জন্মাবে।

দেখা গেল যে রায়তদের শিক্ষার দাবী ও স্বাস্থ্যের দাবী সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের সত্ত্বের দাবীর কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যারা সমর্থন করতে উদ্যত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে Bolshevic; কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা, সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে, এ সকল অপবাদ কতদূর অমূলক। প্রথমত Bolshevic জন্তুটি যে কি তা তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে দেখানো অনুচিত, দেখাও ছেলেমি।

দ্বিতীয়ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের

পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে State-এর। সমস্ত বাঙলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয়-খাজানা কমবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত। নতুন অধিকারের দাবী যে-কেউ করে তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাঙলার জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কু-সংস্কার আমার নেই, আর থাকতে পারে না। আমার আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব—সবাই জমিদার, কেউ বড় কেউ ছোট কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আব-হাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন সে আক্রমণ আমি করতে পারি নে, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়। ভালমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাজন নয়। আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, প্রজার সত্ত্বের দাবী মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়ত দু-দিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবী যদি গ্রাহ্য হয় ত আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবীগুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তর যোগ্য, কিম্বা নয় এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্চে যে, যে-জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে—সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে—আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই সেস্থলে তার দান বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতেও পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জানো?—ও-জোত সমগ্র বাঙলায় নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা মেনে নিচ্চেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন সে শুধু দাখিল-খারিজের মোটা রকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথায়ও বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই—যাঁর যে-রকম প্রবৃত্তি ও শক্তি, তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সে অনুসারে দুয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তরজন বারোমাসে একদিনও পেটভরে খেতে পায় না, তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিল-খারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্য্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারী সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

আছে তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। জোত-খরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব-গোমস্তা জমানবীশ মুমোর-নবীশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশাকরি Bolshevism-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

তার পর নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা-শস্য কাটবার অধিকার আছে তার নিজের পোঁতা-গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে।—উকিল বাবুরা আমাদের Transfer of Property Act পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে বাঙলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও ত property সম্বন্ধে অনেক শেখা বিদ্যে ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্যে, প্রজার আম কাঁটালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুঁটির জন্যে; আর যদি বলো যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই তাহলেও তাদের কাঠের দরকার আছে—মলে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে অধিকার আছে—তার গর্ভে অনন্ত শয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নয় যার জন্যে তাকে জরিমানা দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের কথাটা

স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম্ম ?

তার পর আসে কুয়ো খোঁড়া কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্ছে একটা বেজায় রহস্য। আইনে বলে যাতে জোতের উন্নতি হয় তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক, দেদার নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা লূতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ী তৈরী করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হতে হবে এর চাইতে আর অদ্ভুত ব্যবস্থা কি হতে পারে ? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে বোনা-আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাঙলার প্রজা আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবী এই যে তার জোত মৌরসি ও মোকররি হবে। অর্থাৎ—অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য্য করে দেয় সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—যতদিন State-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবী অপূর্ব্বও নয় অদ্ভুতও নয়। ১৮৩২

খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লেমেণ্টারি কমিশনের সম্মুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবী উপস্থিত করেছিলেন। বাঙলা দেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য্য। তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তারপর আমার মতের স্বপক্ষে আবার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন যে :—

"It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation"—

অস্য বাঙলা :—

"এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর টেক্স বসানোর চিন্তাও পাপ কার্য্য হবে এবং আমার কমিটি এস্থলে আবার নূতন কোনো টেক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোরগলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে"—

উপরোক্ত কথা কটির মধ্যে "টেক্স" কথাটি বদলে তার জায়গায় "খাজনা" বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। টেক্স অবশ্য State আদায় করে আর খাজানা জমিদার, অর্থাৎ—প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে-টাকা জাতীয় কার্য্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপ কার্য্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি এর উত্তরে পলিটিসিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্ত্তমান State ত আমাদের জাতীয় নয়, ও-হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে State-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তাথাস্তু। কিন্তু নূতন টেক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তীসাহেবপ্রমুখ জমিদার বর্গের জোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন টেক্সের চাপ আর বিন্দুমাত্রও সইতে না পারে তাহলে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তবে আমি বুঝতে পারি নে বলে যে পলিটিসিয়ানরা বুঝতে পারেন না, তা অবশ্য হতেই পারে না। সুতরাং জমিদার কর্ত্তৃক হত-দরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কি সব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিষ্ট ওরফে "স্বদেশী" ও "স্বরাজী" যুক্তি আছে তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিয়ানদের 'পেট্রিয়টিক'-জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভাল চান তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবী ক'টি প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমত, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস' বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটানো।

পূর্ব্বে যে রাশিয়ান ব্যারিষ্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি

তিনিই তাঁর জর্ম্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সে কথা এই :—

"আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সব চাইতে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?—স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে সত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এদেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।"

বাঙলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠা-বাড়ী করবার, কুয়ো খোড়বার অধিকার পায় এবং সেই সঙ্গে তার জোত মৌরসী-মকররি হয়, তাহলে সে ইংরাজিতে যাকে বলে peasant proprietor, তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ—বর্ত্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে সত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে-কি হয় তার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ বর্ত্তমান রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে-রকম দিনকাল পড়েছে তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই ত কাল তারা তা কেড়ে নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক উন্নতির পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)

প্রজার এক নম্বর ও দু'নম্বর দাবী আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই তার কারণ, কাজে তা পূরণ করা অতিশয় কঠিন। দেশ-যোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয় বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতবি থাকবে। কত দিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ প্রস্তুত হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের যে সব অকিঞ্চিৎকর বন্দোবস্ত করা হবে তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনই সুসার হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবীগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবা-মাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে দিতে পারি। Tenancy Act-এর গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য্য উদ্ধার হয়ে যায়। এতে কোনো খরচা নেই।

তবে বর্ত্তমান Tenancy Act-এর উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব

যে, ও-কার্য্য করাও যা আর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই ত আজকাল ধর্ম্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ—সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম্ম, সে কালে ধর্ম্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে প্রজার দাবী অনুযায়ী Tenancy Act-এর বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জানো?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্য্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে, এর বেশি কিছুই নয়।

আমার এ কথা যে সত্য, তা যিনিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্ম-বৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয় স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে-জিনিস ইংরাজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা মান্ধাতার আমলে রবলে মেনে নিই। অতএব এস্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা দেশে ঘোর অরাজকতা ঘটে-ছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এদেশের রাজা হয়ে বসলেন এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে

আসলে একটি emergency legislation, যেমন গতকল্যের Ghee Act এবং আগামী কল্যের Rent Act; এ রকম আইন অবশ্য মেয়াদীই (temporary) হয়ে থাকে; কিন্তু জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ আর কতকটা ইংরাজের বুদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাঙলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

"সুজা খাঁ নবাবসুত সরফ্‌রাজ খাঁ।
দেয়ান আমলচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব॥

* * * * *

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥

* * * * *

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥

এই ত গেল মোগলের ব্যবহার। তারপর শোন মারহাট্টার কীর্ত্তি :—

* * * * *

স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

* * * * *

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুটি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥"

* * * * *

নবাব বর্গির ভয়ে পালিয়ে রইলেন বটে কিন্তু বাঙালীর উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বই কমল না। আবার ভারতচন্দ্রের কথা শোনো :—

* * * * *

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥

নদীয়া প্রভৃতি চার সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শাস্ত্রমতি ॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে' বারো লক্ষ টাকা চায় ॥

*   *   *   *   *

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার-লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ ॥
বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥"

*   *   *   *   *

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—খাঁটি ইতিহাস। আলিবর্দ্দি খাঁ যে প্রজাপীড়ন করে' টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌৎ দেবার জন্য। একদিকে দিল্লীর বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তার নবাবী থাকে না, কাজেই বাঙলার প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্ম্মচারী যে সরকারের তরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলিত। এবং এই সব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা অংশ উদ্ধৃত করে দিতে এই কারণে বাধ্য হলুম যে "অন্নদামঙ্গল" আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে "মেঘনাদবধ"। বাঙলার চেয়ে লঙ্কা আমাদের মনকে বেশি পেয়ে বসেছে।

১৭৫৬ খৃস্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাঙলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরুতেই বাঙলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ, দু-ই হারালেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্ত্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর বাঙলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ পরগণার জমিদারীসত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্য্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙলার অরাজকতা বাড়ল বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙলার প্রজার রক্ত শোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি।—রাজা টোডর মলের সময় বাঙলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে।

মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষাৎ পাবে Fifth Report-য়ে। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ— সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় বায়-রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার নবাবের কর্তৃক নিযুক্ত হতেন আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙলার অর্দ্ধেক রাজস্ব আর বাকী অর্দ্ধেক রইল নবাব নাজিমের হাতে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে—দিল্লীর বাদশা Diarchy-র সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল রাজকার্য্য নবাব নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করলে। বলা বাহুল্য নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষে (বাঙলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে

প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা শ্মশানে পরিণত হল তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে Hastings সাহেবকে বাঙলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয় তার পূর্ব্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় Hunter's Annals of Rural Bengal-য়ে পাবে। এর ভোগ বাঙালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এ মন্বন্তরের ধাক্কা বাঙলা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহেব কলকাতায় এসে—বাঙলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্ব্বিচারে সর্ব্বোচ্চ ডাককারী-কেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য ইজারাদার বাঙলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্‌সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে Hastings সাহেবের পরম শত্রু Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি

ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টার-মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক একটি মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলাকওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হল সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল সত্ত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে:—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে— প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে ?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের টেক্স কালেক্টর ?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে ?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল খাজানা চিরদিনের মত নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না ?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ Fifth Report-য়ে দেখতে পাবে। এস্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে

Sir John Shore প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমি-জমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ব করা অসম্ভব। বিশেষত তাঁরা যখন বাঙলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার খাজানা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার হিসাব কিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেব নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়ম মত ও নিয়মিত আদায় করতে হয় তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিম্বা টেক্স কালেক্টর তা বলা অসম্ভব; কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় সত্বের অর্থ হচ্ছে ঃ—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration"—

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ সত্ব আছে এ কথা সে কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি'। কেননা তাঁরা জানতেন যে,

রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এঁদের ভিতর যাঁর খুসি তিনিই যখন তখন জমিদারী জমিদারের গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ব্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয় ত, আইনত: তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused.* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietory right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zamin-

dar to the simple principles of landlord and tenant". (Fifth Report, Vol. II, p. 520).

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই, কেননা কি বাঙলা কি সংস্কৃত এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-বস্তু কস্মিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের কথাই প্রমাণ যে এদেশের জমিদারের সঙ্গে এদেশের রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্ত্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর ত্বর সইল না। তিনি আইনের ঠুক-ঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে সত্ব-স্বামীত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নির্ব্যূঢ় সত্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন তাহলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ সে কালের ইংরাজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল; কালক্রমে তার মর্ম্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে

রায়তের আর যাই থাক জমির উপর কোনোরূপ মালিকীসত্ব নেই এবং পূর্ব্বেও ছিল না লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এস্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরাজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"It is well-known that in the only place where the "Laws of Manu" allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source—still so universally acknowledged throughout India—that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that out of his grain heap at the threshing floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers, have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring

from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual "property" may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.

(Baden Powell—Village Community. p. 130-31).

কষ্ট করে এর বাঙলা করবার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চ্চা করে যাঁদের মন ও মত Sir John Shore-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে তাঁদের দৃষ্টির জন্যই Baden Powell সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজা, তারপর আর পাঁচ জনের, যথা—গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে Badan Powell সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজ-রাজ যখন বিদেশীরাজ তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরাজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরাজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহুল্য তখন সে মালিকী স্বত্ব চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। যে

সত্ব unlimited in point of duration নয়, সে সত্ব ইংরাজের মতে আইনত মালিকীসত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তারপর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য্য করে দেবার প্রস্তাব Francis সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুর বাঙলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা not a tribute imposed on a conquered people but its land revenue"।

মনে রেখো যে এ সময়ে জন কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীর বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয় সংকুলান করবার জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা Francis সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসঙ্গত। তাঁর নিজের কথা এই :—"The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for; with an allowance of a reasonable reserve for contingencies......I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the Government needed to

raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and "fixed for ever".

(Fifth Report, Vol. I, p. ccc").

সংক্ষেপে Francis সাহেবের মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয় আয়ের একটা বজেট তৈরী করে আবহমান-কালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাঙলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক যে এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিষই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাসত্ত্ব)

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সত্ত্ব চিরস্থায়ী হ'ল কিম্বা একদম কেঁচেগল।

প্রজার যে ভিঁটে ও মাটী দুয়ের-ই উপর কিছু কিছু সত্ত্ব ছিল সে-সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত—উভয়েরি যে একযোগে সত্ত্ব-স্বামীত্ব কি করে থাকতে পারে এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেমনা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law—ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না।

ফলে যে-সম্বন্ধ ছিল মিশ্র তাকে তাঁরা শুদ্ধ করতে চাইলেন। ভারতবর্ষের মাটীর এমনি গুণ যে সে মাটী যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্তু ও ক্ষেত দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা। আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে স্বরতজমি চাষ করে তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাসত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামীত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ সত্ব ছিল না।

সে কালের প্রজাসত্বের মোটামুটি ফর্দ্দ নেই।—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ—তার জোত ছিল দখলীসত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার সত্ব যে মালিকীসত্ব, এ বিষয়ে Privy Council-এর নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন—এ দুয়েরি বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

(৩) জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি

প্রমাণ এই যে, বাঙলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র। সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার রাজারও ছিল না।

খালি বাঙলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল সত্ত্বে সত্ত্ববান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মিরাসদার বা মিরাঠী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাইকস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজানা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর সত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। * * * * * মিরাসীরা গ্রাম প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। * * * অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্ম্মচারীগণ "পাটীলের" (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন—" (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬, পৃঃ ৪১১)।

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপসত্ত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এই রাজস্বেরই

এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে টেক্সকালেক্টর, অর্থাৎ—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিসন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাঙলার মাটীর সত্ত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপসত্বের আংশিক অধিকারী।

. কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কোম্পানীর বড় কর্ত্তারা সচ্ছন্দ চিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম Francis সাহেবের, তারপর Lord Cornwallis-এর; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made an indispensable "condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the

zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই :—

"The former is the custom of the country, this will become a new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zsmindar's quit rent—" (Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক্ ।—

"—unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindar's :—every *begha* of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more.—"

(Fifth Report, Vol. II, p. 532).

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল সত্ত্বের দাবী করছে সে-সকল সত্ত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সত্ত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—"It being the duty of

the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necssary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil.—" (*Vide.* cl. I, s. 8, reg. I of 1793).

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারণীর আমল সুরু হল তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে Tenancy Act-এর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures; অর্থাৎ—আধা-ড়া ব্যবস্থা, তার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হলে, প্রজা যে হাঁফছেড়ে বাঁচবে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জমিদার-বর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার

প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে সুরু না করি তাহলে দু-দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :—

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে, অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে সেও তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন সে তোমারই ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা—"

তিনি আরও বলেন যে :—

"এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীব সর্ব্বত্র চলিবে—"

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো?—ইংরাজিতে যাকে বলে Communal property. এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাঙলার প্রজাকে peasant proprietor না

করি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশি দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের co-operation-এর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য।—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।